২ . ২ .

অষ্টম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৬ - আষাঢ় ১৩৫৭

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৬ - আষাঢ় ১৩৫৭

রচনাসূচী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

গান্ধীজি ১৬৮

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

গোটে ও তাঁর দেশকাল ২৩৪

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

গ্রন্থপরিচয় ১৪৪

শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল

গান ও গায়কি ১২৬

গীত ও স্বরলিপির প্রয়োজনবোধ ১৯১

শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ২০২

স্বরলিপি ৮৪, ১৫২

শ্রীঊর্মিলা দেবী

সরোজিনী-স্মরণে ১০৭

শ্রীকানাই সামন্ত

গ্রন্থপরিচয় ২৮৭

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ৪৩

শ্রীনন্দলাল বসু

টাচের কাজ ১৮৮

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মহামনীষী গ্যেটে ২২৯

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গয়্টে ও রবীন্দ্রনাথ ২৩৯

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ১৯

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

গ্রন্থপরিচয় ৬৭

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ১৫৪

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

গোটে ও অর্বাচীন কালের সাহিত্য ২৫৮

রক্তকরবী ১১২

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ১৫৪

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ওড়িয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি ৬১

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য ৫৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ২১৫

বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান ২৬৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পথের দাবী' ও 'ষোড়শী' ৯৬

পালকি-বেহারার গান। অনুবাদ ৮৭

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া ১, ১৫৫, ২২৩

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
গ্রন্থপরিচয় ৭৯

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থপরিচয় ২৮১

সরোজিনী নাইডু
কবিতাগুচ্ছ। অনুবাদ
পালকি-বেহারার গান ৮৭
জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন ৮৮
একাকী ৮৯
একান্তে ৮৯
মৃত স্বপ্ন ৯০
ঘুমপাড়ানী গান ৯১
বাসন্তী ইন্দ্রজাল ৯২
চারণ ৯২
গাঁয়ের গান ৯৩
প্রেমগাথা ৯৩
হয়দ্রাবাদ-নগরে সন্ধ্যা ৯৪
বৃন্দাবনের বাঁশরিয়া ৯৫

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থপরিচয় ১৩৯

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার
সরোজিনী নাইডুর কবিপ্রতিভা ১০০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ্রন্থপরিচয় ১৪৮

চিত্রসূচী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নন্দিনী ১২৫
যক্ষপুরী ১১৮

শ্রীনন্দলাল বসু
কৃষ্ণকলি ১৫৫
চলচ্চিত্রমালা ১৫৮-৫৯, ১৬২-৬৩

প্রতিকৃতি
কামিনী রায় ২৭১
ফকীরমোহন সেনাপতি ৬১
মহাকবি গোটে ২২৩, ২৩৮-৩৯
মহাত্মা গান্ধী ১৭৮-৭৯
সরোজিনী নাইডু ৮৭, ১০২
সহধর্মিণীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৭
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৭০

প্রাচীন চীনা চিত্র
টাচের ছবি ১৯১
প্যানী ভিক্ষু ১৯০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রাবলী ১, ৫৩, ৬০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯০ সালের ২৬ অগষ্ট রবীন্দ্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত সমভিব্যাহারে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। ইটালি ও ফ্রান্স হইয়া লণ্ডনে পৌছিয়া সেখানে কিছুকাল কাটাইয়া ৪ নভেম্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।— এই আড়াই মাসের দিনলিপি ও চিন্তা পুনর্লিখিত হইয়া 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' নামে দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৯৮ ও ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড তৎপূর্বে 'সাধনা' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মূল ডায়ারিখানি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে। দেখা যায়, সাময়িক পত্রে তথা গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রভূত মার্জিত করিয়াছেন। ফলে অনেক ঔৎসুক্যজনক আলোচনা, ও ঘটনার বিবরণ বাদ পড়িয়াছে বা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই বিস্তারিত বিবরণ পাঠকসাধারণের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে মনে করিয়া বর্তমান সংখ্যা হইতে মূল ডায়ারির প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।

বন্ধনীমধ্যে [ ] য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি গ্রন্থ হইতে তারিখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পড়িতে চান তাঁহাদের সুবিধার জন্য। বানান ও চিহ্নাদি পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ পাওয়া গিয়াছে তাহাই রাখা হইয়াছে।

সবুজ সমুদ্র, নীল তীর, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ভারতবর্ষের প্রতি একান্ত আকর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন বাহু বাড়িয়ে রয়েছে। জীবনের যত সুখ যত ভালবাসা ঐখেনেই। বেচারা দরিদ্র অক্ষম স্নেহময় ভারতবর্ষ। ক্রমে সন্ধ্যা। ক্রমে তীর তিরোহিত। lighthouse— সাগরে ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার জাগ্রত দৃষ্টি। মনে হল মিথ্যা সভ্যতা, মিথ্যা জীবনসংগ্রাম— মিথ্যা য়ুরোপীয় উন্নতিচক্রের আকর্ষণ— নিষ্ফল দুরাশা— বাঙ্গলার এক প্রান্তে ভালবাসার একটু সুরক্ষিত নীড়, এই আমাদের ঢের। এই মহা প্রবহমান মানবস্রোতের মধ্যে আমাদের পড়বার কি দরকার ছিল। আমরা চতুর্দ্দিকে মানসিক বেড়া দিয়ে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে বেশ আরামে গুছিয়ে বসে ছিলুম। কোন্ ছিদ্র দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত এসে পড়ে আমাদের সমস্ত ছারখার গুলিয়ে দিয়ে গেল। আজ আমাদের এই মৃদু ক্ষীণ প্রাণের মধ্যে এত দুরাশার আক্ষেপ কেন এনে দিলে? কেন দুরাশা ঐ য়ুরোপীয় বহ্নিশিখার প্রতি আমাদের

আকর্ষণ করচে ? আমাদের মাথার উপরে হিমালয় এবং পদতলে সমুদ্র বাধা আরো দুর্গম হল না কি? বেশ অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে একদল মানুষ আট্‌কে থাকৃত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে বদ্ধ হয়ে একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর একটি হ্রদ যেমন নিস্তরঙ্গভাবে চিরদিন কেবল আকাশের প্রভাত সন্ধ্যার ছায়া আপনার মধ্যে অঙ্কিত করে।

২২ অগষ্ট— শুক্রবার। ১৮৯০। শ্যাম। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একটা দিন বলে ধরা যেতে পারে। Seasickness। রাত্তিরে পরের ক্যাবিনে ঢুকে পরের কম্বল অপহরণ।[১] স্বপ্ন।[২] লোকেনের প্রতি মানসিক অসদ্ভাব।— মঙ্গলবারে ডেকে উঠে লোকেনের প্রতি অসাধারণ আসক্তি। বুধবারে প্রশান্ত সমুদ্র, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, কবিত্ব চিন্তা ও তজ্জাতীয় কথোপকথন। বৃহস্পতিবারে চমৎকার দিন— চিঠি লেখা। রাত্রে চন্দ্রালোকে একটা দেড়টা পর্য্যন্ত আলোচনা। ঘন বৃষ্টি। তার পরদিন সমস্ত দিন বৃষ্টি। সল্লিকে:[৩] চিঠি। অতি ধীর গতি। দুই একটা পাহাড়পর্ব্বতের রেখা। চমৎকার সন্ধ্যা। চন্দ্রালোকে এডেন। হঠাৎ জাহাজ বদল। দীর্ঘ জাহাজ, সহস্র আলোকচক্ষু। জিনিষপত্র গোলমাল। দুই দল দুই দিকে। মাসেলিয়া জাহাজ। নতুন লোকজন।

পুরোণো জাহাজের সহযাত্রী— মাতৃহীন কতকগুলি মেয়ের একটি রুগ্ন বাপ— বেচারা।[৪] একটি চিরহাস্যময় বালক civilian। Gambling।— নতুন জাহাজের সর্ব্বোচ্চ ছাত। অনেক রাত্রে ছাড়লে। শান্ত সমুদ্র, জ্যোৎস্না রাত, বেশ বাতাস। "ডেকে" নিদ্রা। নতুন লোক। একটি মেয়ের প্রতি বহু পুরুষের দৃষ্টি। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আজ শনিবার [৩০ অগষ্ট]। ব্যাণ্ড্ বেশ লাগ্‌চে। সল্লি ও কুমুদের[৫] চিঠি— বেশ রৌদ্র— সবসুদ্ধ বেশ। লোকেন নীরব। দূর সমুদ্রতীরের আরবদেশের পাহাড়গুল রৌদ্রে ক্লান্ত ও ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে— যেন তন্দ্রার ছায়া পড়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়েচে।

(আমি লোকটা স্বভাবত একটু চুপচাপ এবং একটু কোণ ভালবাসি। দুই একজন যাদের ভালবাসি তাদের কাছের গোড়ায় নিয়ে বেশ একটুখানি সন্ধ্যালোক এবং একটু মধুর চিন্তার মধ্যে থাকা আমার জীবনের একমাত্র সাধ। দুশ্চিন্তা দুশ্চেষ্টা প্রবল কর্ম্মপ্রখর আমোদ আমার নয়। কিন্তু আমি কাউকে পাইনে— কারো চুপ করে বসে থাক্‌বার সময় নেই, পৃথিবীতে আমি এবং সন্ধ্যা এবং আকাশ এবং সৌন্দর্য্য ছাড়া আরো ঢের জিনিষ আছে, কত কর্ত্তব্য কত উদ্দেশ্য আছে, পৃথিবী খুব বেগে চল্‌চে। কাজেই আমাকে কেবল একলা বসে থাকৃতে হয়। তাও পেরে উঠিনে— কাজেই যারা উদ্দাম বেগে কর্ত্তব্যের দিকে এবং আমোদের দিকে যাচ্চে— তাদের সঙ্গ রাখ্‌বার জন্যে আমার চিন্তা ফেলে সন্ধ্যা ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটতে হয়, সুতরাং আমার ভাবটা, না তাদের মত না আমার মত, না খাট্‌তে পারি হাস্‌তে পারি, না ভাব্‌তে পারি উপভোগ কর্ত্তে পারি— না আমি পৃথিবীর সেবক না আমি পৃথিবীর নবাব।

---

১ এই 'অপহরণ'-এর কৌতুকজনক বিবরণ বিস্তারিত আকারে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—পৃ ৭-৯; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ৫৮৮-৮৯

২ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১, ২৯, অগষ্ট ১৮৯০ তারিখের চিঠি

৩ ভাগিনেয়ী সরলা দেবী

৪ চিঠিপত্র প্রথমখণ্ডে ২৯ অগষ্ট তারিখের চিঠিতে ইহাদের বিস্তারিত উল্লেখ দ্রষ্টব্য

৫ কুমুদনাথ চৌধুরী

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়, ভারি প্রাচীন ভারি শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রাচীনত্ব অনুভব করি— বিশ্রাম এবং চিন্তা এবং বৈরাগ্য। আমাদের যেন এখন ছুটির সময়। যা উপার্জ্জন করা গেছে তারি উপরে নিশ্চিন্তে শেষ বেলাটা কাটাবার সময়। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে— যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভাল দলিল দেখাতে পারিনি বলে নতুন রাজার রাজত্বে ক্রোক হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরীব। পৃথিবীর চাষারা যে রকম খাট্‌চে এবং খাজনা দিচ্চে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতকে নতুন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে। চিন্তা রাখ বিশ্রাম রাখ গৃহকোণ ছাড়— কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙ্গ— পৃথিবীকে উর্ব্বরা কর এবং নব-মানব রাজার রাজস্ব দেও। উঠেছি ত, চলেওচি— দেখাচ্চি খুব কাজের লোক হয়েচি— কিন্তু ভিতরে ভিতরে কতটা নিরাশ্বাস কতটা নিরুদ্যম। থেকে ২ মনে হয় আমরা কাজের লোকের সঙ্গে কিছুতেই তাল রেখে চল্‌তে পারব না— অথচ আমাদের বিশ্রাম এবং শান্তির অবসর রইল না। হায় ভারতবর্ষের বেড়া ভেঙ্গে মনুষ্যস্রোত কেন আমাদের মধ্যে এসে পড়ল— কেন আমাদের লজ্জা দিচ্চে, কেন আমাদের দায়ে ফেলে নিস্ফল কাজে লাগাচ্চে— পুরাতন বনেদী বংশের দারিদ্র্য কেন পৃথিবীর সাম্‌নে প্রচার করচে। তবে ওঠ— Political agitation কর— Joint stock company খোল— শিথিল মাংসপেশি নিয়ে মাঞ্চেষ্টরের সহস্র লৌহবাহুর সঙ্গে লড়তে আরম্ভ কর— দেখ কি হয়। কিন্তু আমি যুবা বটে, তোমাদের বয়সী বটে, তবু সভায় যাইনে, চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরিনে, খবরের কাগজে লিখিনে— আমি নিতান্ত জীর্ণ ভারতবর্ষীয় —আমি ভাবি কি হবে! শেষ রক্ষা করবে কে! অথচ ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেচে, বিচিত্র কল্লোল, প্রবল গতি, মহান্ বেগ— অবিশ্রাম কর্ম্ম, তখন আমার মন নেচে ওঠে, তখন ইচ্ছা করে সহস্র বৎসরের গৃহপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে পড়ি। আবার তখনি মনে হয় যখন পিছিয়ে পড়ব তখন ফিরব কোথায়, যখন সবাই ফেলে যাবে তখন দাঁড়াব কোথায়! তার চেয়ে পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাস ভাল, এই ক্ষুদ্র সুখ এবং অগাধ শান্তি ভাল।— তখন মনে হয় আমরা কিছু অসভ্য বর্ব্বর নই; আমরা যন্ত্র তৈরি কর্ত্তে পারিনে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় খবর বের কর্ত্তে পারিনে— কিন্তু খুব ভালবাস্‌তে পারি— ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে পারি। অপেক্ষা করে দেখা যাক্ পৃথিবীর এই নতুন সভ্যতা কবে আমাদের কোমলতা দেখে আমাদের ভালবাস্‌বে— কবে আমাদের দুর্ব্বলতা দেখে অবজ্ঞা করবে না, কবে তাদের নূতন উন্নতি যৌবনের বলাভিমান এবং জ্ঞানাভিমান কালক্রমে নরম হয়ে আস্‌বে এবং আমাদের স্নেহশীলতা দেখে আমাদের প্রতি স্নেহ করবে— দুর্ব্বল হয়েও অনেকগুলো বিষয়ে নূতন সংবাদ না রেখেও— আমাদের কেবল কোমল হৃদয়টুকু নিয়ে মানবপরিবারের মধ্যে স্থান পাব। গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা দেখে আপাতত সেদিন কল্পনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আচ্ছা না হয় তাই হল, আমরা না হয় একপাশেই পড়ে রইলুম, Timesএর স্তম্ভে আমাদের নাম না হয় নাই উঠ্‌ল— আপ্‌না আপনি ভালবেসেই কি যথেষ্ট সুখ পাব না। নিদেন আমি ত আপনাকে তাই বোঝাচ্ছি। তোমরা কাজ করচ বোধ হয় ভালই করচ, আমি পারিনে, আমার বিশ্বাস এবং উৎসাহ জাগে না, আমি কাছাকাছির মধ্যে ভালবেসে যতটা পারি সুখে থাকি এবং যতটা পারি সুখে রাখি।

কিন্তু দুঃখ আছে দারিদ্র্য আছে, ক্ষমতার অত্যাচার আছে, অসহায়ের অপমান আছে কোণে বসে ভালবেসে তার কি করবে! হায়, ভারতবর্ষের সেই ত দুঃসহ কষ্ট! আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব!

রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্ব্বলতার প্রতি নির্ম্মম, আমরা সেই আদিম পশু প্রকৃতিকে কি করে জয় করব? সভা করে, দরখাস্ত করে? আজ একটু ভিক্ষে নিয়ে কাল একটা লাঠি খেয়ে? তা কখনই হবে না। প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কত দিকে প্রবল কত কারণে প্রবল— যখন এই অসীম শক্তিকে একবার সর্ব্বতোভাবে অনুভব করে দেখি তখন কি আর আশা হয়। তখন মনে হয় এস ভাই সহিষ্ণু হয়ে থাকি, প্রবল হতে না পারি তবু ভাল হবার চেষ্টা করি এবং ভালবাসি।

আমি যখন Matthew Arnoldএর কবিতা পড়ি তখন মনে হয় য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যতটুকু প্রাচীন হয়ে পড়েচে তারি যেন আপনার কথা শুনতে পাচ্চি। হঠাৎ এই অবিশ্রাম কর্ম্ম এবং জীবনসংগ্রামের মধ্যে একটা শ্রান্তি এবং সন্দেহ এসে ক্ষীণ স্বরে বল্‌চে ওগো একটু রোসো, একটু থামো— এসব কি হচ্চে, একটু ভাবো, একটু ভাব্‌তে সময় দাও। মানুষ কেবল হাঁসফাস্ করে খাট্‌বার জন্যে হয় নি মাঝে মাঝে চুপচাপ করে ভাবা আবশ্যক। যখনি একটা জাত আপনার কাজের হিসেব নিতে যায়, যখনি সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে এতদিন যা করলে তার থেকে অবশেষে হল কি, তখনি বোঝা যায় তার পাক ধরতে আরম্ভ করেচে। যখন মানুষ কেবল কাজের প্রবাহে প্রাণের উৎসাহে আপনি কাজ করে যায় তখনি তার বল। য়ুরোপে এখন সকল বিষয়েরই নিকেশের খাতা বেরিয়েচে। ধর্ম্ম বল মানবহৃদয়ের সহস্র উচ্চ আশা মহৎ প্রবৃত্তি বল সকলেরই খানাতল্লাসী চল্‌চে। একটা বড় বিশ্বাসের জায়গায় ছোট২ সহস্র মত বাসা করচে। যেমন একটা বৃহৎ প্রাণীর মৃত দেহে সহস্র ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মগ্রহণ করে— কিন্তু সেটা জীর্ণতারই লক্ষণ। [।]

শনিবারটা [৩০ অগষ্ট] চল্‌চে। খানিকটা ভাবচি খানিকটা লিখ্‌চি— খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখ্‌চি— খানিকটা Band শোনা যাচ্চে— মাঝে২ জাহাজ, মাঝে২ পাহাড় অনুর্ব্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনহীন, মাঝে২ তীরশূন্য সমুদ্র— এইরকম করে সূর্য্যাস্তের সময় হল। Band বাজচে। Castle of Indolence যদি কোথাও থাকে ত সে হচ্চে জাহাজ— বিশেষত গরম দিনে প্রশান্ত Red seaর উপরে— ইংরেজতনয়রাও সমস্ত দিন ডেকের উপর আরামকেদারায় পড়ে দিবাস্বপ্ন দেখ্‌চে— কেবল জাহাজ চল্‌চে, এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া খেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণস্বরে পাশ কাটিয়ে একটুখানি সরে যাচ্চে— আর বিকেলের দিকে বাতাসও একটু২ বইতে আরম্ভ করেচে— জগতের আর সমস্ত স্বপ্ন দেখ্‌চে— দুই একটা শাদা লঘু মেঘখণ্ড তারাও নড়চে না।—

সূর্য্য অস্ত গেছে। আকাশের এবং জলের চমৎকার রং হয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি নিটোল সুডোল কোমল পরিপূর্ণ যৌবনের মত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় এসেছে যার উর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই, যা' অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সন্ধের সময় চিল আকাশের যে একটা সর্ব্বোচ্চ নীলিমার সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত পাখা সমতল রেখায় বিস্তার করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়— চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা চরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ করে স্থির

হয়েছে।উড়িয়েছে। জলের যে চমৎকার রং হয়েছে তাকে আকাশের ছায়া বল্লে যেন ঠিক বলা হয় না— যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ধ্যাকাশের স্পর্শ লাভ করে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ অন্ধকার গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়েচে— সে কতটা তার কতটা আকাশের বলা যায় না। আমাদের কত কবিতা কত গান আরেকজনের দুখানি নেত্রের ছায়া— এও সেই রকম। সমুদ্রের এবং আকাশের সেই আশ্চর্য্য রং দেখে কেবল মনে হচ্ছিল ঠিক এইটেকে ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা কোথায়? আবার তখনি মনে হল দরকার কি? আমার মধ্যে এ চঞ্চলতা কেন? এই সমুদ্রের এবং আকাশেরই মত আমার মনের সমুদয় চেষ্টা নির্ব্বাণ লাভ করে না কেন— হৃদয়ের সমুদয় তরঙ্গকে একেবারে থামিয়ে দিয়ে কেন কেবল চেয়ে থাকিনে? এই বৃহৎকে ছোটর মধ্যে বেঁধে আপন আয়ত্তের মধ্যে পেতে চাই কেন? সবই ধরতে হবে রাখ্‌তে হবে এই কেবল চেষ্টা। অনেক সময় এই রকম দুশ্চেষ্টার বশে, যতটুকু পাওয়া যেতে পারে তাও ভাল করে পাবার সময় থাকে না।— কিন্তু মনে হয় সমুদ্র এবং আকাশের মধ্যেকার এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকু যদি পারিজাতপুষ্পের মত তুলে নিয়ে কারো হাতে না দিতে পারি তবে কিছুই হল না। এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখ্‌বার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়— কিন্তু মানুষের ভালবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্যে। ঠিক এই উজ্জ্বল ম্লান নিভৃত উদার সন্ধ্যার ঠিক মর্ম্মস্থলে যদি আমরা দুজনে দাঁড়াতে পারি তাহলে আমরা যেন আপনাদের আরো বেশি বুঝ্‌তে পারি আরো বেশি ভালবাসি। কারণ ভালবাসা বোঝাতে গেলে সৌন্দর্য্যের ভাষা চাই এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতা চাই। এমন আলোক এমন বর্ণ এমন ভাষা আমরা নিজের মধ্যে কোথায় পাব— এই বৃহৎ প্রকৃতি যখন তার একটা চরম মুহূর্ত্তে আমাদের আচ্ছন্ন করে আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত করে বলে তখন আমাদের আর কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না— কেবল ভালবাসবার পূর্ণ অবসর পাওয়া যায়— ভালবাসা প্রকাশ করবার আবশ্যকটুকুও থাকে না। একথা হয়ত সকলে বুঝ্‌তে পারবে না— কিন্তু একথা নিশ্চয় সত্যি যে ঐ আকাশ আমারই অসীম দৃষ্টির মত, এবং এই সমুদ্র আমারই ভালবাসামুগ্ধ হৃদয়ের মত— এই মুহূর্ত্তে এই সমুদ্রে আমার আপনাকে ব্যক্ত করবার জন্যে একটি কথা বলবার আবশ্যক থাক্‌ত না। যদি এর অনুরূপ একটি কথা থাক্‌ত তাহলে সেইটি লিখে নিয়ে যেতুম যে শুন্‌ত সে সমস্ত বুঝ্‌তে পারত। থাক্‌গে— কবিত্ব থাক্। রাত্তিরে ডিনার টেবিলে Inspector-General of Policeএর সঙ্গে লোকেনের তর্ক— আরো দুই একজন যোগ দিয়েছিল।

রবিবার [৩১ আগষ্ট]। সকালে Evansএর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের[৬] বিষয় এবং ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল— তাতে সে কতকটা আশ্বাস দিলে— কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়। আজ সকালে এখানে উপাসনা হল। একটা মেয়ে ভারি বিরক্ত করেছিল— একে ত সে যোগ দেয়নি— তার পরে হো হো করে হাস্‌ছিল— এমন খারাপ লাগছিল, যখন উপাসকরা সবাই মিলে গান গাচ্ছিল আমার বেশ লাগছিল। এর মধ্যে সমস্ত মানবের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়— চিরঅজ্ঞাত চিররহস্যের দিকে ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের কি একটা বিশ্বাসের গান উঠ্‌চে! আশ্চর্য্য!— ঐ মেয়েটা মাঝে মাঝে যখন সেই গানে যোগ দিচ্ছিল তখন আমার নিতান্ত blasphemous বলে ঠেকছিল— তার

৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র। দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ২৪৮-৪৯

অট্টহাস্যও তত খারাপ ঠেকেনি। বিশ্বাস না থাক্‌লে কি হৃদয়ও থাকতে নেই?— আজ Breakfast-এর সময় একটা খবরের সৃষ্টি করা গেল। রুটি কাটতে গিয়ে ছুরিটা ছিট্‌কে সবলে আমার দুটো আঙ্গুলের উপর পড়ল— রক্ত ছিট্‌কে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল— খানিকটা বরফ দিয়ে ন্যাপকিনে আঙ্গুল জড়িয়ে ক্যাবিনে ছুট্‌— গা বমি করতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ বাদে ডাক্তারের ঘরে গেলুম সে আমার হাত বেঁধে দিলে— দিতে দিতে মাথা ঘুরে এল অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লুম কানে শুন্‌তে পেলুম না— এমনি লজ্জা করতে লাগ্‌ল। অনর্থক অনেক রক্তব্যয় করেছি— না দেশের জন্যে না ধর্ম্মের জন্যে না স্বার্থের জন্যে। সমস্তদিন কিছু না কিছু লিখেছি। আমরা এদের সকলকে দূরে পরিহার করে যেরকম একটা কোণ ঘেঁষে আছি তাতে বেশ বোঝা যায় এরা একটু Piqued হয়— আমার সেটা মন্দ লাগে না। ভাবে এরা কজন বিদ্রোহী নব্যবঙ্গবাসী।

এমন মধুর করে' (তুমি) ভাবিতে পার না মোরে,
এমন স্বপন এমন বেদন এমন সুখের ঘোরে।
এমন বাতাস জলের বিলাস এমন আকাশ মাঝে,
শুনিতে পাও না কেমন করিয়া উদাস বাঁশরী বাজে!
এমন অলস বেলা— অলস মেঘের মেলা
সারাদিন ধরে জলেতে আলোতে এমন অলস খেলা!
জীবন তরণী ভাসিয়া চলেছে মরণ অকূল বাগে,
দিবসে নিশীথে সুদূর হইতে তোমার বাতাস লাগে।
এমনি করিয়া ধীরে, মিশাব সুদূর নীরে
যেমন করিয়া সন্ধ্যা নীরদ মিশায় নিশীথতীরে।
তখন বারেক চাহিয়া দেখিয়ো করুণ নয়ন তুলি
বিদায়ের পথ আঁধারে ঢাকিবে তার পরে যেয়ো ভুলি।
সন্ধ্যা আসিবে যবে তোমার মধুর ভবে
দিবসের শেষে শ্রান্ত হইবে জীবনের কলরবে—
তখন বারেক আসিয়ো আবার দাঁড়াইয়ো ঐখানে,
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখো ঐ অস্ত অচল পানে।
যেখানেতে শেষ দেখা রাখিয়া গিয়াছে রেখা
জ্যোতির্ময় এক অমর অশ্রু তারা আলোকেতে লেখা—
বাকি আর সব স্তব্ধ নীরব তিমির নিরাশ নিশি
অজানা অপার অকূল আঁধার প্রসারিয়া দশদিশি।

Cancelled

সোমবার [১ সেপ্টেম্বর]। সকাল বেলাটা শরীর ভাল ছিল না চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছি। দুই একজন লোক আপনি আলাপ করে গেল। এরা কাল থেকে জানতে পেরেছে আমরা Tagores, তাই কাল থেকে কাছাকাছি ঘুর্‌ঘুর্ করচে। একটা কবিতা লেখবার চেষ্টা করা গেছে সেটাতে মনের ভাব

ভাল ব্যক্ত হয়নি।[৭] বদ্‌লাতে হবে। টিফিনের পর সেলুনে বসে বাবিকে[৮] চিঠি লিখ্‌তে বসেছি— তরঙ্গ উঠে আমাকে এবং আমার চিঠিগুলোকে ভিজিয়ে দিলে তাতে দুই একজন এসে আহা উহু করে গেল। সন্ধের পর আহারান্তে চুপচাপ করে ডেকের উপর জমিয়েছি, লোকেন একটা চৌকির উপরে অগাধ নিদ্রামগ্ন— মেজদাদা চুরট টান্‌চেন— এমন সময়ে নীচেকার ডেকে নাচের বাজ্‌না বেজে উঠল— সকলে মিলে নাচের ধুম পড়ে গেল। মহা ঘুরপাক মহা উত্তেজনা চলচে— তখন পূর্ব্বদিকে নবকৃষ্ণপক্ষের ঈষৎ ভাঙ্গা চাঁদ ধীরে ধীরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেচে— এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্ব্বসীমান্তে চাঁদের পাণ্ডুর আলোক পড়ে সেদিকটা ভারি একটা অসীম ঔদাস্য এবং নৈরাশ্যের ভাবে পূর্ণ দেখাচ্ছিল। চাঁদের উদয়পথের নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্ করচে— এই বিজন সমুদ্রের মাঝখানে প্রকৃতি চুপিচুপি আপন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। সমস্তই ধীরে নীরবে সুন্দর হয়ে উঠ্‌চে, রাত্রির সুমধুর শান্তি একটি রজনীগন্ধা কুঁড়ির শুভ্র পাপড়ির মত অলক্ষিত নিঃশব্দে ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে যাচ্চে— আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মত ঘুরপাক্ খাচ্চে— ভারি আমোদ করচে— সর্ব্বাঙ্গের রক্ত গরম হয়ে মাথায় ফেনিয়ে উঠ্‌চে, বিশ্বসংসার সমস্ত ঘুরচে, হাঁপাচ্চে, তপ্ত হয়ে উঠ্‌চে,— আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েচে, এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে অনন্তকালের চিরপুরাতন গাথা সমস্বরে গান করচে— এই রজনীতে এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত লোক জুড়ি-জুড়ি জড়াজড়ি করে লাঠিমের মত বোঁ বোঁ করে ঘুর খাওয়াকে খুব সুখ মনে করচে— একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমি এটা কিছুতেই ভাল বুঝ্‌তে পারিনে।[৯] যাক্‌গে, মরুক্‌গে, যাদের ঘুরুনি পায় ঘুরুক্‌গে— আমার যা আছে তাই আমার থাক্। আমার এই চন্দ্রালোককে নিয়ে কোন ইংরেজের ছেলে Polka নাচ্‌তে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক ভয় হয় পাছে সর্ব্বজয়ী ইংরেজতনয় আমার জীবনের কোন একটি অচল শান্তিসুখকে টেনে নিয়ে এমনি করে Polka নাচায়।

মঙ্গলবার [২ সেপ্টেম্বর]। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় Evansএর সঙ্গে আমার বেশ দীর্ঘ আলাপ হয় বেশ লাগে। আজ সকালে দেখ্‌লুম সে একটা নিতান্ত বেচারা ইংরেজবাচ্ছার কাছে Modern thoughts and modern scienceএর কথা পেড়েছে— সে ব্যক্তি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে খানিকটা ইতস্তত করে দে-ছুট দিলে। Evans হতাশ্বাস হয়ে চৌকিতে বসে পড়ল। আমি তার কাছে একটা কথা পাড়লুম। আমি বল্লুম আমি Ibsenএর নাটক পড়ছিলুম তাতে একটা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌লুম, যত সব স্ত্রীলোকেরাই সমাজবিপ্লবের জন্যে ব্যাকুল এবং পুরুষেরাই সমাজের প্রাচীন সংস্কারসকলের উপর আকৃষ্ট হয়ে আছে। বরাবর জানি মেয়েরাই সমাজের বন্ধন। আমার

৭ পূর্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত। কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে "Cancelled" মন্তব্য লিখিত আছে। ফিরিবার পথে একাধিক কবিতায় এটির 'ভাব অভিব্যক্ত' করিয়াছেন বলা যাইতে পারে— তুলনীয় 'মানসী' গ্রন্থের 'বিদায়', 'আমার সুখ' ইত্যাদি— ভাষাগত মিলও লক্ষ্যণীয়

৮ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

৯ এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতি (১৩৫৪ সং) গ্রন্থপরিচয়ে ২৭০-৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সমসাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য

বোধ হয় বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা এমন আকার ধারণ করেছে যাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অসুখী হয়ে আছে। জীবিকাসংগ্রাম এতদূর প্রবল হয়েছে যে সমস্ত শক্তি তাতেই প্রয়োগ করতে হচ্চে গৃহের জন্যে অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে— লোকেরা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে পুরুষেরা বিয়ে করতে চাচ্চে না, এরকম স্থলে স্ত্রীলোকের অবস্থা সেই অনুসারে পরিবর্ত্তিত না হলে তারা সুখী হতে পারে না। এইজন্যে য়ুরোপীয় মেয়েদের মধ্যে একটা বিপ্লবের ভাব দেখা দিয়েচে। নিহিলিষ্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মেয়ে আছে তারা পুরুষের চেয়ে প্রচণ্ড। ক্রমে ভারতবর্ষের কথা উঠ্‌ল। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই জাত। জনসংখ্যাবৃদ্ধিবশতঃ বেহার প্রভৃতি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা— কুলি-চালান্ নিয়ে বাঙ্গলা কাগজের পাগ্‌লামি। Elective Principle। আমি বল্লুম আসল ব্যাপারটা হচ্চে তোমরা আমাদের অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে অবজ্ঞা কর— তোমরা আমাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার কর না বলেই আজকাল এইসব গোলমাল উঠেছে— আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে ভদ্রতা কথঞ্চিৎ সম্মান ও সদয় ব্যবহার পেতুম তাহলে আমরা বেশ সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করতুম— But the very small courtesy with which you nationally treat us hurts our selfrespect and we try to make up for it by striving to get a larger share in the administration, and by making ourselves thoroughly obnoxious to you. আমি বললুম অ্যাংলোইণ্ডিয় সমাজে তোমরা সচরাচর এমনভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কও যে আমাদের প্রতি রূঢ় হওয়া তোমাদের স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত হয়ে যায়। Evans এ কথা খুব মেনে নিলে, সে বল্লে এখন যে সব সিভিলিয়ান আসে তাদের অধিকাংশের কোন বংশমর্য্যাদা নেই, তারা ভদ্রতা কাকে বলে একেবারে জানে না ইত্যাদি। আজ সমস্ত দিন প্রায় চিঠি লিখ্‌তে গেল।

বুধবার [৩ সেপ্টেম্বর]। আবার Evansএর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা। Lord Riponএর Policyর নিন্দা— Lord Dufferinএর প্রশংসা, ডফারিন সম্বন্ধে আমাদের পেট্রিয়টদের ব্যবহার নিতান্ত নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। দশটার সময় সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ থাম্‌ল। চমৎকার রংয়ের খেলা— কত রকম নীল এবং কত রকম হল্‌দে— পাহাড়ের উপর রৌদ্র ছায়া এবং নীলবাষ্প, বালির তীররেখা ঘন হল্‌দে, ঘন নীল সমুদ্রের ধারে চমৎকার দেখাচ্ছে। খালের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন জাহাজ অতি ধীর গতিতে চল্‌চে দুধারে তরুহীন বালি— কেবল মাঝে২ এক একটি ছোট২ কোটা বহুযত্নবর্দ্ধিত গাছপালায় বেষ্টিত হয়ে বড় আরামজনক দেখাচ্চে। আজও সমস্ত দিন চিঠি লেখা। অনেক রাত্তিরে অর্দ্ধচন্দ্র উঠ্‌ল— চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট— ধূ ধূ করচে— কাল অনেক রাত জেগেছি— কেবল বাড়ির জন্যে প্রাণ টানে— আমার মত গৃহপোষ্য জীব পাওয়া যায় না।[১০] রাত ২।৩টের সময় পোর্ট সৈয়েদে পৌছন গেল— সেখানে কয়লা তোলার ধূম। বিশেষ দ্রষ্টব্য সহর নয়।

বৃহস্পতিবার [৪ সেপ্টেম্বর]। Mediterranean। এই আসলে ইয়ুরোপে পড়লুম— ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্চে। সমস্ত দিন Spectator প্রভৃতি কাগজ পড়েই কেটে গেল। Mediterranean চমৎকার নীল।

১০ তুলনীয় চিঠিপত্র ১, ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র— "আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মতন এমন জায়গা আর নেই— এবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।"

(৮ম পৃষ্ঠার আনুষঙ্গিক)[১১]— এমন নয় যে আমাদের কিছুই নেই, আমরা একেবারে বর্ব্বর জাতি। এমন নয় যে বেদুয়িনদের মত আমাদের মাথার উপরে কেবল শূন্য আকাশ এবং পায়ের নীচে উদাস মরুভূমি। আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি— এত প্রাচীন যে এর ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, মানুষের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে— সেই জন্যে ভ্রম হচ্চে এ নগর যেন মানব ইতিহাসের অতীত, যেন প্রাচীন প্রকৃতির এক রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে লিখে রেখেছে— সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্ন রেখে গেছে এবং সহস্র বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ চির-হরিৎ অঙ্কে অঙ্কিত করে গেছে। একদিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, একদিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এর মধ্যে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস কর্ত্তে পারে— এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্ম্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটিল শাখাপ্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে সহস্র সহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে ছায়াময়ী বলে ভ্রম হয়— এখানকার এই প্রাচীন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মত নির্ব্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্ম্মাণ করেছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে এবং বয়স্ক লোকেরা স্বপ্ন দেখে, প্রখর সূর্য্যালোক ছিদ্রপথে সেখানে প্রবেশ করে ছোট ছোট মাণিকের মত দেখায়। প্রবল ঝড় শত শত সঙ্কীর্ণ শাখাপথের জটিলতার মধ্যে প্রতিহত হয়ে সেখানে এসে মৃদু মর্ম্মরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এখানে জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন মিলিয়ে এসেছে— অদৃষ্টবাদ এবং কর্ম্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসার-যাত্রা একসঙ্গে চলেছে। এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার জায়গা— এখানকার জীর্ণ ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের শৃঙ্খলিত অগ্নিগর্ভ দুরন্ত লৌহদৈত্যদের কারাগার নির্ম্মাণের যোগ্য! তোমাদের প্রবল উদ্যমের বেগে এর শিথিল ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করতে পার বটে— কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন শ্রান্ত জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্ম্মাণ করেনি— সেই এদের মহৎ গর্ব্ব যে প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয়নি, কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য অনেক বংশবৃদ্ধি অনেক নূতন সুবিধে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে, নূতনকে এবং পুরাতনকে সুবিধেকে এবং অসুবিধেকে সেই পিতামহপ্রতিষ্ঠিত একভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে, সামান্য অসুবিধের খাতিরে এরা কখনো স্পর্দ্ধিতভাবে নূতন গৃহবৃদ্ধি, বা পুরাতন গৃহসংস্কার করেনি, যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র হয়েছে সেখানে বটের শাখা অথবা কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে ছায়া দান করেছে। এই মহা নগরারণ্য ভেঙ্গে গেলে একটি বৃহৎ প্রাচীন শ্রান্ত জাতি একেবারে গৃহহীন— কেবল তাই নয়— একটি সহস্র বৎসরের প্রেতাত্মা এখানে যে চিরনিভৃত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেও নিরাশ্রয়— তার আর কোন ইতিহাস নেই তার জন্মমৃত্যুর তারিখ নেই, সে কেবল এই প্রাচীন অধিবাসীদের ভগ্ন গৃহের মধ্যে বহুকাল আপন প্রাণহীন প্রাণ বহন করে আস্‌চে। তোমরা হঠাৎ এসে বল্‌চ— ওঠ তোমরা জেগে ওঠ— এ সমস্ত ভেঙ্গেচুরে বদ্‌লে ফেল— ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক

১১ পাণ্ডুলিপির ৮ম পৃষ্ঠার, অর্থাৎ এই সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা ১৭ ছত্রের অনুবৃত্তি। পাণ্ডুলিপিতে যে পর্যায়ে লিখিত আছে এখানেও সেইভাবেই মুদ্রিত হইল।

পরিবর্ত্তন হয়েছে— এখন কর্ম্মের যুগ পড়েছে, অমূলক চিন্তার সময় নেই। আমরা ভীত হয়ে তোমাদের বল্‌চি এবং আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করচি— ঠিক কথা— মানবের উন্নতি সাধনের জন্যে কর্ম্ম আবশ্যক, কিন্তু এমন কর্ম্মস্থান আর কোথায় আছে— দেখ, এইখানেই মানব ইতিহাসের প্রথম যুগে আর্য্য বর্ব্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে— এইখানে কত রাজ্যপত্তন কত নীতিধর্ম্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে, এই সমস্ত ভগ্নস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান করলে তার সহস্র চিহ্ন পাওয়া যাবে। অতএব আমাদের সমস্ত প্রস্তুত আছে— কিছুই করবার আবশ্যক নেই। তোমরা শুনে হাস্‌চ, মনে করচ অনেক দিন নিদ্রামুগ্ধ থেকে "ছিল এবং আছে"র মধ্যেকার প্রভেদ আমরা ভুলে গেছি— মধ্যে স্বহস্তে কিছু পরিবর্ত্তন করিনি বলেই মনে করচি যা ছিল ঠিক তাই আছে। মনে করচ এ একটা আলস্যের নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র। কিন্তু আমরা মুখে যাই বলি আমাদের আসল কথাটা বুঝে দেখ। আসল কথাটা হচ্চে, আমরা কাজ করতে পারব না, কিন্তু তা বলে আমাদের অধিক লজ্জার বিষয় নেই— কেননা আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি, আজকাল আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমরা মানবসভ্যতার খানিকটা ভিত্তি গেঁথে বিশ্রাম কর্ত্তে বসেছি এখন তোমাদের পালা, তোমরা কাজ কর। অবিশ্বাস কর যদি, অকর্ম্মণ্য বলে যদি লজ্জা দাও, তবে আমরা বল্‌ব, তোমাদের ঐ তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদাল দিয়ে ভারতভূমি থেকে যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির মৃত্তিকাস্তর উঠিয়ে দেখ মানবসভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের হস্তচিহ্ন আছে কিনা! তোমরা যে নতুন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তার শেষ হয়নি এখনো তার সমস্ত সত্য মিথ্যা স্থির হয়নি— মানব অদৃষ্টের যা চিরন্তন সমস্যা এখনো তার কোনটার মীমাংসা হয়নি— তোমরা অনেক জেনেছ অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরচ তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে বর্ত্তমান সভ্যতাকে পরম জটিল করে প্রচণ্ড জীবিকাসংগ্রাম বাধিয়ে দিয়েছ এর শেষ ফল কি তোমরা দেখতে পাচ্চ? তোমরা যে অহর্নিশি নূতন নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্চ, স্বাস্থ্যজনক গৃহের বিশ্রাম থেকে অবিশ্রাম কর্ম্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্চ— কর্ম্মকে সমস্ত জীবনের কর্ত্তা করে প্রবল উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেচ, এমন কি স্ত্রীলোকদেরও গৃহকর্ম্ম থেকে বের করে হয় আমোদের মত্ততা নয় জীবনের রণক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাচ্চ, তোমরা কি জেনেছ তোমরা কি করচ তোমরা কি জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্চে? আমরা জানি আমরা কোথায় এসেছি আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকট কর্ত্তব্যসকল পালন করে যাচ্চি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে দূর ও নিকট সম্পর্কীয়ে আত্মীয় অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েচি যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে কাটিয়ে দিচ্চে, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না। এই সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতবর্ষ জীবনের এই এক মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছে সুখের যথার্থ উপায় সন্তোষ— এবং সমস্ত সমাজনীতির দ্বারা ভারতের গৃহে গৃহে ও অন্তরে অন্তরে সেই সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েচে। যেটা খুঁজেছে সেটা পেয়েচে এবং সেটা দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তার আর কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবনউপপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমরা

যখন একদিন কাজ বন্ধ করবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পার্ব্বে? আমাদের মত এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে২ লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয় উত্তপ্ত দিন যেমন অবশেষে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে অলক্ষ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অবগাহন করে সেই রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যেরকম হঠাৎ বিগ্‌ড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যেরকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্ত্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ থেমে যায় সেইরকম প্রবলবেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি লাভ করবে? যাই হোক তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেচ। অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি এই কথাই ভাল!

কিন্তু গৃহ রক্ষা হয় কি করে! যদি বাইরের কোন উৎপাত না থাক্‌ত তা হলে ত কোন কথাই ছিল না— কিন্তু অজানা অচেনা লোক আমাদের এই নিভৃত নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে— আমাদের ইটগুলি খুলে আমাদের গাছগুলো কেটে তারা আপনাদের ঘর বানাতে চায়— বহু যত্নে আমাদের ছেলেদের মুখে যে অন্নের গ্রাসটি তুলে দিচ্চি, পরের ছেলের বাপগুলি এসে তা কেড়ে নিচ্চে। এখন বিশ্রাম থাকে কোথায়? প্রাচীন হও আর শ্রান্ত হও আর নিজের প্রতি যেরকম স্তোকবাক্যই প্রয়োগ কের— আর প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেকে যতই সম্মান ও সমাদর কর, আহার ত চাই, অপমান এবং দারিদ্র্য থেকে সন্তানদের রক্ষা করা ত চাই, যখন চারদিকে অসংযত বলের খেলা এবং নিষ্ঠুর জীবিকাসংগ্রাম তখন আত্মরক্ষার জন্যে সক্ষমতা লাভ করা ত চাই। এ কথা ত বল্লে চল্‌বে না, আমরা প্রাচীন হয়েছি অতএব মরণ হলে দুঃখ নেই।

আরো একটা কথা। সুখ বলে একটা জিনিষ কিছুই নেই— সুখটিকে একটি দুর্লভ রত্নের মত সংগ্রহ করে একটি কৌটোর মধ্যে পুরে ট্র্যাকের মধ্যে গুঁজে কেউ বল্‌তে পারে না বাস্ হয়ে গেল, আমার আর কিছু করবার নেই। বিচিত্র মানবপ্রবৃত্তির চর্চ্চাই সুখ। জীবনের প্রবাহই সুখ। অভাব যত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম যত দুরূহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশি। সন্তোষ আর সুখ এক নয় সে কথা আমরাও জানি। আমরা যখন বলি সুখের চেয়ে সান্ত্বনা ভাল তখনই স্বীকার করি সুখ ও সন্তোষ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সুখের চেয়ে সন্তোষ আমরা প্রার্থনীয় মনে করি। কেননা দুর্ব্বলের জন্য সুখ নয়— সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্সিজেন যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেই রকম আমাদের দাহ করে। যৌবনে এই দাহ যে রকম প্রবল, বার্দ্ধক্যে সে রকম নয়— কিন্তু তাই বলে বৃদ্ধেরা বলতে পারে না যে তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন এবং সন্তোষই যথার্থ সুখ— এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে আমার পক্ষে আবশ্যক নেই।* অতএব কোণে বসে য়ুরোপের সুখ য়ুরোপের প্রাণ অস্বীকার করবার কারণ দেখা না।

কেবল বিচার্য্য বিষয় এই, এর একটা সীমা আছে কিনা। যতই প্রকৃতির উত্তেজনা ও আকাঙ্খার বিকাশ বাড়চে ততই তার কিয়ৎপরিমাণ চরিতার্থতাও একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠ্‌চে কিনা? ততই জীবনের সফলতা লাভের জন্যে গুরুতর ক্ষমতার আবশ্যক হচ্চে কিনা, এবং সে ক্ষমতা স্বভাবতই

অপেক্ষাকৃত অল্পতর ও সুযোগ্যতর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হচ্চে কিনা— এই রকমে উত্তরোত্তর দুঃখী লোকের সংখ্যা বাড়চে কিনা, সমাজে সুখবিভাগের যত বৈষম্য হয় ততই তার পক্ষে বিপদ কিনা? ভারতবর্ষে যেমন জ্ঞানসম্পদ কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলে জ্ঞানের অনেক বিভাগের আরম্ভ মাত্র হয়েছিল কিন্তু পরিণতি হয় নি, চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বিপুল ভ্রান্ত সংস্কারের স্রোত এসে তাকে প্লাবিত করে দিয়েছিল তেমনি সৌভাগ্য যদি সমাজের এক অংশের মধ্যেই বদ্ধ হতে থাকে তাহলে ক্রমে দারিদ্র্য-দুঃখের সংঘর্ষে তা বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে কিনা?

দ্বিতীয় কথা— Fittestরাই survive করে, কিন্তু Fitness অনেক রকমের আছে। কেউ বা কঠিন বলে বাঁচে কেউ বা কোমল বলে বাঁচে। কেউ বা উন্নত হয়ে বাঁচে, কেউ বা নত হয়ে বাঁচে। গাছ একরকম করে বাঁচে, লতা আর একরকম করে বাঁচে। আমরা যে মনে করচি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচব, বাস্তবিক আমাদের সে যোগ্যতা আছে কি? জাতির মধ্যে কি বৈচিত্র্য নেই? সকলেরই কি টেঁকবার একরকম উপায়? খুব সম্ভবতঃ সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা ছাড়া আমাদের আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। অতএব আমরা যে য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করচি সে কি বাঁচবার পথে যাচ্চি, না মরবার পথে যাচ্চি? আমরা যদি আমাদের স্বাভাবিক মৃদু কোমলতা রক্ষা করি তাহলেই কি প্রবলের কঠিনতা সহজে সহ্য করতে পারব না— আমরা যদি কঠিন হই তাহলেই কি কঠিনতরের আঘাতে ভেঙ্গে যাব না?— কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা। স্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্চে। ইংরাজী শিক্ষা যখন স্বভাবতই আমাদের একমাত্র প্রধান শিক্ষা হচ্চে, দুর্ব্বলের প্রতিও যখন জীবনের প্রবলতার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তখন বিজ্ঞ বিবেচনার কথা বলা বাহুল্য— এবং কে জানে সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কিনা এবং কে জানে ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন এবং বহির্ঘটনা পরস্পরে মিলে আপনাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপন করবে কিনা।

শুক্রবার [৫ সেপ্টেম্বর]। দিনটা লিখ্‌তে লিখ্‌তেই কেটে গেল। আজ আর ডেকে শোওয়া হল না। ঠাণ্ডা পড়ে আস্‌চে। ক্যাবিনে শয়ন। আজ জাহাজের ডেকে stage বেঁধে একটা entertainment হবে তার উদ্যোগ। Baldwinএর দল অভিনয় করবে। প্রথমে amateurদের কাণ্ড, কারো বা পিয়ানো টিং টিং, কারো বা ক্ষীণ কণ্ঠে গান। তার পরে Mrs Baldwin প্রথমে পুরুষ masher সেজে তার পরে midshipmanএর বেশ ধরে বেশ comic গান গেয়েছিল এবং বেশ নেচেছিল। তার পর ব্যালে নাচ, নিগ্রোর গান, যাদু, একটা ছোট প্রহসন প্রভৃতি বহুবিধ কাণ্ড হয়েছিল। মাঝে Sailors' Home এর জন্যে চাঁদা আদায়ও হল। সকলে খুব আমোদ পেয়েছিল। আজ বিকেলে Crete দ্বীপের তীরপর্ব্বত দেখা দিয়েছিল।

শনিবার [৬ সেপ্টেম্বর]। আজ ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খেয়ে অবধি বাড়িতে চিঠি লিখ্‌চি।[১২] ইতিমধ্যে একটা জলস্তম্ভ দেখা দিয়েছিল— গ্রীসের তীর আমাদের দক্ষিণে দেখা দিয়েছে— লোকেনের টানাটানিতে একবার চিঠি রেখে উঠে গিয়ে দেখে এলুম। এই সেই গ্রীস!— লিখ্‌তে লিখ্‌তে

---

১২ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১

একসময়ে বাঁয়ে চেয়ে দেখি Ionian islands দেখা দিয়েচে। পাহাড়ের মাঝে২ ছোট ছোট শাদা বাড়ি— আরো একটু এসে পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ধারে একটি বড় সহর, মানুষের শ্বেত মৌচাক্ সন্ধান করে জান্‌লুম দ্বীপের নাম Zanthe সহরের নামও তাই। উপরে গিয়ে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি— আকাশে মেঘ করে এসেছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের দোতালা ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেল্লে। পর্ব্বতের উপর ঘন মেঘ নেবে এসেচে— কেবল দূরে একটা পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক পড়েছে আর সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটু প্রবল বাতাস এবং খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল— তাতেই কেটে গেল আর ঝড় এল না। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অনেক সময়ে অনিশ্চিত। আমরা যেখান দিয়ে এলুম এ জায়গা দিয়ে সচরাচর জাহাজ আসে না। জায়গাটা নাকি ভারি খোড়ো। রাত্তিরে ডিনারে Woodroff কাপ্তেনের Health প্রস্তাব ও সকলে মিলে তার গুণগান করলে। আজ রাত্তিরে জিনিসপত্র বাঁধতে হবে, কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব।

রবিবার [৭ সেপ্টেম্বর]। সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছন গেল। লাগেজ তদারক এক বিষম ল্যাঠা। এক প্রকাণ্ড Omnibus— দুটি রোগা ঘোড়া। লোকে ও মালে পরিপূর্ণ। আস্তে২ চল্ল। রাস্তা পাথরে বাঁধান। এক জায়গায় লোকে পরিপূর্ণ— আজ হাট— ব্যাণ্ড বাজ্‌চে— খুব যেন একটা কিছু ধুমধামের ব্যাপার আছে। বিবিধ রকমের ফলের ঝুড়ি— সারি২ জুতো সাজানো দেখলুম। ষ্টেশনে এসে লোকেন আমাদের চিঠিগুলো এবং তার মাশুল একজন লোকের হাতে দিলে— কিন্তু সে ব্যক্তি যে রীতিমত মাশুল লাগিয়ে পোষ্ট্ করবে আমার বিশ্বাস হল না। অবশেষে একটা গাড়ি নিয়ে আবার বেরলুম। ডাকঘরে চিঠি দিয়ে বাঁচলুম। জ্যোৎস্নাকে[১৩] meet করবার জন্যে সতুকে[১৪] একটা এবং তারকবাবুকে[১৫] একটা পৌঁছসংবাদ টেলিগ্রাফ করা গেল। দুই এক থোলো আঙুর পথ থেকে কিনে আবার ষ্টেশনে ফিরলুম। এখন ত পুল্‌মান্ গাড়িতে চড়েছি। একটা মস্ত গাড়ি— ডাইনে বাঁয়ে সারিসারি কতকগুলো মক্‌মলমোড়া যোড়া যোড়া মুখোমুখী ছোট seats— মাথার উপরে শোবার বন্দোবস্ত লট্‌কানো বোধ হয় রাত্তিরে টেনে দিয়ে বিছানা করে দেবে। গাড়িতেই খাবার সেলুন। একটা মাত্র নাবার ঘর আছে বোধ হয়— এত লোকে মিলে হাত মুখ ধোয়া নাওয়া নিয়ে বোধ হয় কিঞ্চিৎ গোল বাধবে। যা হোক ট্রেনে চড়ে বসে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ হচ্চে। মেঘ করে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হচ্চে। আহার করে এলুম। প্রথমে দুই দিকে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে Olive বাগান। বামে দূরে পর্ব্বত দক্ষিণে সমুদ্র মধ্যে কেবল অলিভ বন। বাঁকাচোরা গ্রন্থি ও ফাটল বিশিষ্ট বলিঅঙ্কিত গাছ— পাতাগুলো যেন উর্দ্ধমুখ— খুব যত্নে যেন চাষ করা— আমাদের দেশের মত জঙ্গল নয়— ফাঁক২ পোঁতা— পাহাড়ে জায়গা— চষা জমির মধ্যে পাথরের কুচি— এক এক জায়গায় গাছতলায় ভেড়া চরচে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে এক একটি ছোট সহর আসচে— চর্চ্চচূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরটি সমুদ্রের নীল চিত্রপটের উপর চমৎকার দেখাচ্চে। (ব্রিন্দিসিতে নাব্‌বার সময় Evans আমাকে দেখালে ইটালীর

---

১৩ ভাগিনেয় শ্রীজ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র

১৪ তারকনাথ পালিতের পুত্র ও লোকেন্দ্রর ভ্রাতা সত্যেন্দ্র

১৫ তারকনাথ পালিত

পুলিসম্যানেরা সৈনিকবেশে তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। বল্লে এর থেকে বোঝ এখানকার গবর্মেণ্ট কি রকম। এদের অনেক রকমের institutions আছে কিন্তু freedom নেই। আমরা সাড়ে এগারোটার সময় ব্রিন্দিসি ছাড়ি।) এক একটা অলিভ্ গাছ এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েচে যে পাথর উঁচু করে২ তাকে ঠেকো দিয়ে রাখ্তে হয়েচে। শীত তেমন বেশি নয়। আমাদের পৌষের চেয়ে কম বোধ হয় তবে শীত গ্রীষ্ম সম্বন্ধে তুলনা ভারি শক্ত। প্রায়ই একটা না একটা সমুদ্রতীরের সহর। ঐ সাম্নের সহরটা মস্ত মনে হচ্চে।— দুধারে কেবল ফলের বন এবং আঙুরের ক্ষেত— মাঝে২ এক একটা পাথরের বাড়ি। ছোটখাট সহর, শাদা সোজা রাস্তা। ক্ষেতগুলো পাথরের টুক্‌রো উঁচু২ করে বেড়া দেওয়া। এখনো ডাইনে সমুদ্র দেখা যাচ্চে— বামের পর্ব্বত গেছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাথর উঁচু করে গোলাঘরের মত করে রেখেছে বোধ হল। মাঝে মাঝে কূপ— চক্রযন্ত্রে জল তোলে। থোলো২ বেগুনী আঙুর ফলে রয়েচে।— সমুদ্র আর দেখ্তে পাচ্চিনে ডাইনে বাঁয়ে তরুহীন অপার সমতল চষা মাঠ। ডাইনে খুব দূরদিগন্তে পাহাড়ের নীল রেখা অবিচ্ছিন্ন অলিভের বন আঙুরের ক্ষেত আর দেখচিনে— চষা মাটি, এক২ জায়গায় ঘাস। দূরে২ মাঠের মধ্যে২ এক একটা শাদা বাড়ি। আবার আঙুর এবং অলিভ্— বামে ঈষদ্দূরে এক সহর। এক২ জায়গায় ভুট্টার চাষ।— সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল— ঠাণ্ডা হয়ে আসচে। দুধারে চষা মাঠ, সমভূমি শূন্য— দক্ষিণ বাম দিগন্তে দুই পর্ব্বতশ্রেণী।

আমাদের দুধারে জমি উঁচুনীচু তরঙ্গিত হয়ে এসেছে। দূরে একটা নীল হ্রদ দেখা যাচ্চে তার একধারে একটি ছোট সহর। আমি বসে বসে যে আঙুর খাচ্চি তার গন্ধ অনেকটা গোলাব জামের মত। আঙুরের থোলো কি চমৎকার দেখ্তে। রেলোয়ে ষ্টেষনে একটি ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হল ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙুরের মত নিটোল সুগোল টস্‌টসে, যৌবনের রসে যেন পরিপূর্ণ এবং ঐ আঙুরেরই মত তাদের মুখের রং— খুব বেশি শাদা নয়। একটি মেয়ে দেখ্লুম প্রায় আমাদেরই মত কালো কিন্তু দেখ্তে মিষ্টি— এখানকার বেগ্নি আঙুরের মত। আবার সমুদ্র দেখা দিয়েছে— বোধ হয় যাকে হ্রদ মনে করেছিলুম তা হ্রদ নয় সমুদ্রের একটা বাহু। তীরে বালির উপর অযত্নজাত গুল্ম উঠে আচ্ছন্ন করে রেখেচে। আমাদের ঠিক নীচেই সমুদ্র— আমরা তার একটা উঁচু তটের উপর দিয়ে চলেচি। গোটা চার পাঁচ পালমোড়া নৌকো ডাঙ্গার উপর তোলা রয়েছে— ভাঙ্গা জমি ঢালু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে প্রবেশ করেছে— সে জমিটুকু চাষ করা— দুটো ছেলে খেলা করচে। নীচেকার তীরপথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। এক একটা গাধার উপর দুটো লোক। আমাদের বাঁদিকে পাহাড়। সূর্য্য অস্ত গেছে। এখনো সমুদ্রতীরে কতকগুলো গরু চরচে— কি খাচ্চে তারাই জানে, মাঝে মাঝে শুক্‌নো খড়কের মত দেখা যাচ্চে মাত্র— একটা বাছুর রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেচে। এখানকার সমুদ্র তেমন নীল দেখাচ্চে না— মেটে রকমের। ঢেউগুলো ফেনিয়ে ফেনিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসচে।

রাত্রে টঙ্গের উপর চড়ে ত বেশ নিদ্রা দেওয়া গেল। আজ সোমবার [৮ সেপ্টেম্বর]। সকালে উঠে দেখা গেল চারদিকে সুন্দর শ্যামল— পরিপাটি রকম চাষ করা, ভুট্টার ক্ষেত— প্রত্যেকের ক্ষেত বড় অলিভ গাছদিয়ে ঘেরা— তাই পাশাপাশি দুই ক্ষেতের মাঝখানের ব্যবধানটুকু বেশ সুন্দর ছায়াপথের মত দেখাচ্চে। কোথাও তিলমাত্র জঙ্গল নেই। কাল যে রকম আঙ্গুরের ক্ষেত দেখেছিলুম আজ সে রকম দেখ্‌চি নে—

সে আঙ্গুরগুলো ছোট ছোট গুল্মের মত— আজ দেখচি লম্বা২ এক একটা কাঠি পোঁতা তার উপরে আঙ্গুর লতিয়ে উঠেছে। উচু নীচু জায়গা, ছোট ছোট ভুট্টার ক্ষেত তার চারদিকে আঙ্গুরের বেড়া— এবং এক২ জায়গা কেবলি আঙ্গুর— মাঝে২ তুটো একটা বাড়ি এক আধটা চার্চ্চ বেশ দেখাচ্চে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে— তারি মাঝখানে একটি সহর। তুঁতের ক্ষেত। ছোট ছোট চতুষ্কোণ তৃণক্ষেত্র এবং তাকে বেষ্টন করে বেঁটে২ পল্লবিত তুঁত গাছের শ্রেণী। কোথাও ভুট্টাক্ষেতে তুঁতের বেড়া। কোথাও তুঁত এবং দ্রাক্ষা এক সার বেঁধে চলেছে। আমরা অ্যাড্রিয়াটিক্ তীর প্রদেশ ছাড়িয়ে এখন লম্বার্ডির মধ্য দিয়ে চলেছি। এখানে রেশম ভুট্টা এবং আঙুরের চাষ। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাশে একটি কুটীর— এক হাতে তারি একটি তুয়ার ধরে, এক হাতে কোমরে দিয়ে একটি ইটালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করচে। একটি ছোট বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রশস্তস্কন্ধ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধরে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে— কি বল, এবং তার কি বন্ধন! তার থেকে আমাদের বাঙ্গলা দেশের নবদম্পতি মনে পড়ল— মস্ত একটা গ্রাজুয়েটপুঙ্গব এবং ছোট্ট একটি বারো তেরো বৎসরের নব বধূ— দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্চে এবং মাঝে২ ড্যাবাড্যাবা নেত্রে তার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করচে। ট্যুরিন্ ষ্টেষনে আশা গেছে। এদেশে পুলিষম্যানের আচ্ছা সাজ যা হোক! মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, অনেক জরিজরাও, মস্ত তলোয়ার— খুব একটা সেনাপতির মত। আমাদের দেশে এরকম পাহারাওয়ালা থাকলে তাদের চেহারা দেখে আমরা ডরিয়ে ডরিয়ে আরো কাহিল হয়ে যেতুম। চোরে যত চুরি করে এদের কাপড়চোপড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি যায়।— আমাদের বাঁয়ের পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটু একটু বরফের শ্বেত চিহ্ন পড়েচে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে কিন্তু কিছুমাত্র শীত করচে না। (কাল রাত্তিরে আমরা যখন ডিনার খাচ্ছিলুম— একদল লোক প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখ্‌ছিল। তার মধ্যে তুটি একটি বেড়ে স্থন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল — তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্ত অনেকটা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। ট্রেন ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রী পুরুষগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি ও রুমাল আন্দোলন অনেক চুম্বনসঙ্কেত প্রেরণ অনেক তারস্বরে উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে, তারাও গ্রীবা আন্দোলনে আমাদের অভিবাদন করতে লাগ্‌ল।) আমাদের দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত স্থনীল পর্ব্বতশ্রেণী। বামে অরণ্য— এবং ডাইনে পাহাড়ের তলদেশে সহর ও শস্যক্ষেত্র। কি ঘন ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের বিচ্ছেদ সেইখান থেকে অম্‌নি একটা দৃশ্য খুলে যাচ্চে শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্ব্বত। একটা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে একটা পুরোণো তুর্গ দেখা যাচ্চে। এবং তলদেশে একটি ছোট গ্রাম। যত এগোচ্চি অরণ্য পর্ব্বত খুব ঘন হয়ে আসচে। গাড়িতে আলো দিয়ে গেল— এইবার বোধ হয় পর্ব্বতভেদী মণ্ট্‌সেনিস্ গহ্বর আসবে। আজ রীতিমত পর্ব্বতের জায়গায় এসে পড়েছি। এই অরণ্য পর্ব্বতের মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসচে সেগুলো তেমন উদ্ধত শুভ্র পরিপাটি নয়— একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত— একটি আধটি চর্চ্চের চূড়া আছে মাত্র— কিন্তু কারখানার উর্দ্ধমুখী ধূমোদ্‌গারী বৃংহিত শুণ্ড নেই। আর একটা ভাঙ্গা তুর্গ। শাদা উপলপথের মধ্যে দিয়ে একটি ছোট অগভীর নদীস্রোত চলেছে। ক্রমে একটু২ করে পাহাড়ের উপর ওঠা যাচ্চে। সাপের মত পর্ব্বতপথ এঁকে বেঁকে চলেচে। চষা ক্ষেত ঢালু পাহাড়ের উপর সোপানের মত থাকে থাকে উঠেছে। পর্ব্বত স্রোত স্বচ্ছ সলিল

রাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়চে। মাঝে মাঝে প্রায়ই একটা২ রেলোয়ে গহ্বর এসে প্রাণ হাঁপিয়ে দিচ্চে। মণ্ট্‌সেনিস্‌ টানেল এখনি আস্‌বে— বোধ হয় দম আট্‌কে মরব। দুধারে Fir গাছ দেখা দিয়েচে। আমাদের ডান পাশে বালি ও পাথরের শাদা প্রশস্ত জলপথ। তারি একধার দিয়ে জল নেবে আস্‌চে— তার পরপারে দীর্ঘ Fir গাছের অরণ্য, তারি পর থেকে পর্ব্বত উঠেচে। এইবার টানেলে ঢুক্‌চি। ১ বাজ্‌তে ১৮ মিনিট। ১ বেজে দশ মিনিটে বেরোলুম। ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে২ চলেচে। ফরাসী জাতির মত দ্রুত চটুল চঞ্চল উচ্ছসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী— কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বিমল এবং শিশুস্বভাব। মাশুল নিয়ে বেশি উপদ্রব করলে না— একবার একজন এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করে গেল মাশুল দেবার মত কিছু আছে কিনা। আমরা তামাকের কৌটো দেখালুম সে চলে গেল। ইটালিয়ান ডাকাতরা এইটুকু তামাকের জন্যে পাঁচ শিলিং এবং দুটো বাক্স ব্রেকে নিয়ে ৩১ ফ্রাঙ্ক নিয়েছে। এ জাতের মধ্যে যে ডাকাতের সংখ্যা বেশি হবে তার আর আশ্চর্য্য কি। সেই স্রোতটা এখনো আমাদের পাশ দিয়ে ছুটেছে তার দক্ষিণেই Fir অরণ্য নিয়ে পাহাড় উঠেছে— বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে পাথরগুলোকে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে race দিয়েছে। এক জায়গায় খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে— তার দুধারে সারি২ সরল দীর্ঘ গাছ উঠেছে মাথায়২ ঠেকাঠেকি করে আছে। মাঝে২ লোহার সাঁকো। উপর থেকে ঝরণা নেবে তার সঙ্গে মিশ্‌ছে। ডান দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পার্ব্বত্যপথ স্রোতের পাশ দিয়ে সমরেখায় একে বেঁকে চলেচে। এতক্ষণ পরে আমাদের নির্ঝরিণী সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। সে আমাদের বাঁ দিক দিয়ে কোন্‌ এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথ দিয়ে অন্তর্হিত হল। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন রেখাঙ্কিত পাষাণচূড়া প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবল মাঝে২ এক২ জায়গা খানিকটা করে Fir অরণ্যের শ্যামল আবরণ রয়েছে— ঠিক মনে হচ্ছে যেন একটা দৈত্য তার সহস্র নখ দিয়ে ওর শ্যামল ত্বক ছিঁড়ে নিয়েচে, এবং সহস্র বিদারণরেখা রেখে দিয়ে গেছে। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পুর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বাঁ দিকে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে একবার অন্তরালে— যেন ফরাসী ললনার মত কৌতুকপ্রিয়া, বিবিধ বিলাস চাতুরী জানে। ঐ দুতিন শাখায় বিভক্ত হয়ে সুদূর দক্ষিণে চলে গেল। আবার পর্ব্বতের এক জায়গায় মোড় ফিরে ওর সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে জানে। সেই প্রত্যাশায় রৈলুম।— ফ্রান্সের গাড়ি ইটিলির চেয়ে অনেক বেগে চলে— আমার লেখা দায় হয়ে এসেচে। বহুকষ্টে লিখ্‌তে হচ্চে।

আবার সে বাঁয়ে এসেচে। দক্ষিণে পর্ব্বতগুলো একেবারে হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেচে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র। মাঝে২ ক্ষেতের মধ্যে খড়ের গাদা— পাহাড়ের গায়ে বিরল সন্নিবিষ্ট বাড়ি। স্রোত এখনো বাঁদিকে চলেছে। সেই অলিভ্‌ এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিচিত্র শস্যক্ষেত্র— এবং সুদীর্ঘ Poplar শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানা শাকশব্‌জি। মনে হয় কেবলি বাগানের শ্রেণী। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপরে মানুষের কত যত্ন ও ভালবাসা প্রকাশ পাচ্চে। প্রকৃতিও তার প্রচুর প্রতিদান দিচ্চে। এখানকার লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালবাস্‌বে তার আর কিছু আশ্চর্য্য নেই। কত যত্নে আপনার দেশকে তারা আপনার করেছে— একটি বিঘাও যেন অনাদরে ফেলে রাখেনি। আপন বাসস্থানকে কানন করে

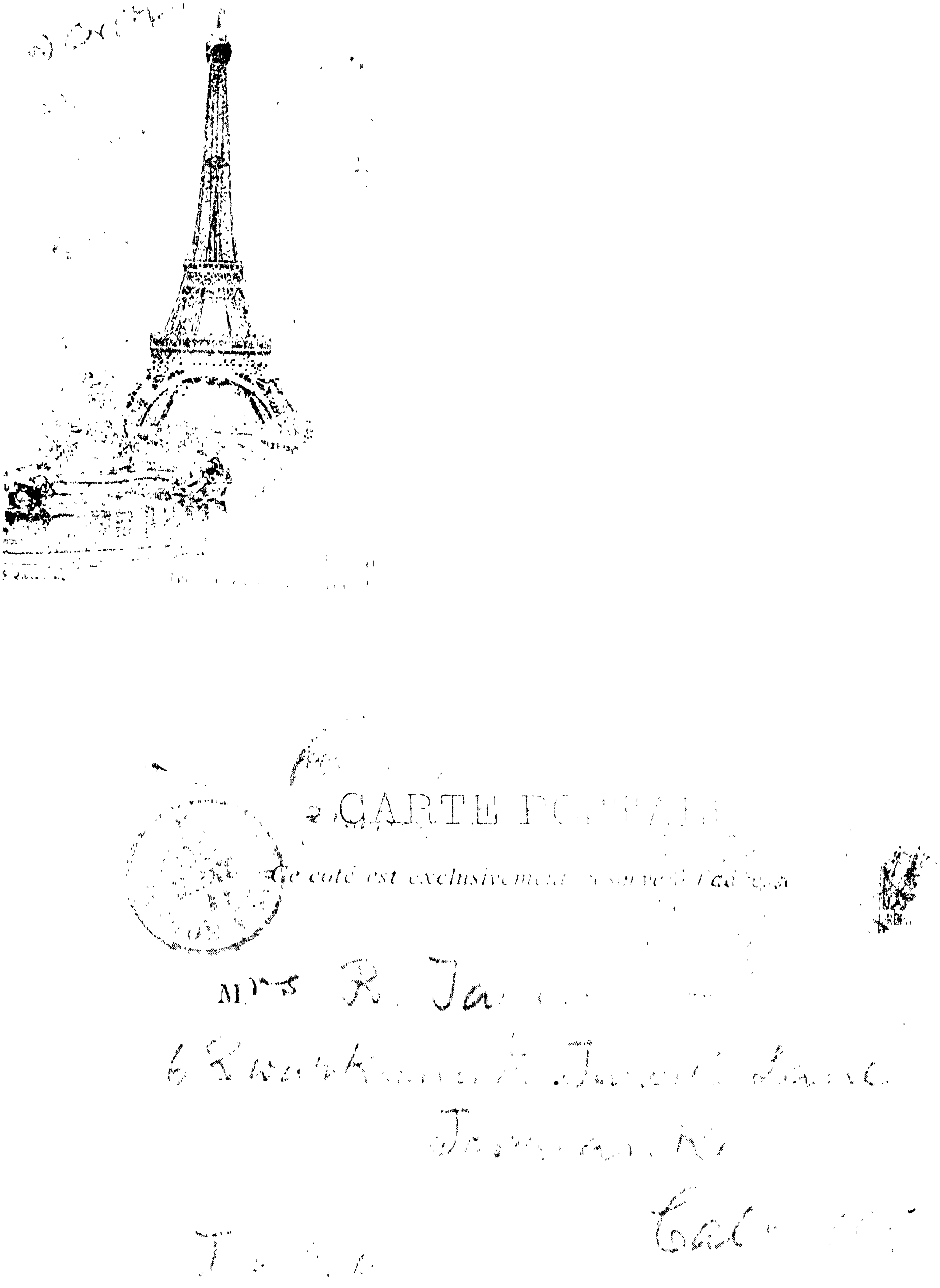

'টাউয়ারে চড়ে ছোটবৌকে পোষ্টকার্ড পাঠিয়ে দিলুম।'   পৃ ১৭-১৮

তুলেচে— এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে ত কিসের জন্যে দেবে। আমাদের দেশ অযত্নে অনাদরে পড়ে আছে — কোথাও জঙ্গল হচ্চে, কোথাও পাষাণস্তূপে কঠিন হয়ে আছে— কত ধনরত্ন গুপ্ত পড়ে রয়েছে। আমাদের কাছে আমাদের দেশের কোন মূল্য নেই।— চমৎকার ব্যাপার। এ কেবলি বাগান। পর্ব্বতের মধ্যে নদীর ধারে হ্রদের তীরে পপ্‌লার উইলো বেষ্টিত বাগান— সমস্ত ছবির মত। এইমাত্র বামে পর্ব্বতের পদতলে এক হ্রদ দেখা গেল। বিস্তীর্ণ চলেচে। প্রকৃতি এবং মানুষে মিলে কেবল সাজাচ্চে এবং উৎপন্ন করচে।— সেই হ্রদ চলেচে। দশ মাইল আয়ত। কিন্তু আর কি লিখ্‌ব! কত অরণ্য, কত পুর্ব্বত, কত নদী, কত সহর।

আমাদের প্যারিসে নাববার কথা হচ্চে। কিন্তু প্যারিসে আমাদের ট্রেন যায় না, একটু পাশ দিয়ে চলে যায়। যে ষ্টেশন দিয়ে প্যারিসে যায় সেইখানে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা হয়েচে। একবার শোনা যাচ্চে রাত এগারোটার সময় ট্রেন বদ্‌লাতে হবে, একবার শুনচি একটা, একবার দুটো, একবার ৩॥ একবার সাড়ে চারটে। কাপড় চোপড় পরেই শুয়ে রইলুম। রাত দুটোর সময় জাগিয়ে দিলে। জিনিষপত্র বেঁধে উঠে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। দূরে একটা প্ল্যাটফর্মে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে— কেবল একটি এঞ্জিন, একটি ফাষ্ট্‌ ক্লাস্‌ এবং একটি ব্রেক্‌ ভ্যান্‌— আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয় চল্লুম। রাত তিনটের সময় শূন্য প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পৌছন গেল— সুপ্তোত্থিত দুটো একটা মশিয়ো আলো নিয়ে উপস্থিত— অনেক হাঙ্গাম করে কাষ্টম্‌ হৌস্‌ এড়িয়ে গাড়িতে উঠ্‌লুম— তখন প্যারিস্‌ দ্বাররুদ্ধ করে সহস্র দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে দিয়ে নিদ্রিত। আমরা Hotel Terminusএ হাজির হলুম— liftএ করে চতুর্থ তলায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করা গেল। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বিদ্যুদ্দীপ্ত কার্পেটাবৃত দর্পণশোভিত নীলবর্ণ যবনিকাখচিত চিত্রিত-ভিত্তি নিভৃত কক্ষ— বিহঙ্গ-পক্ষ-সুকোমল শয্যা। জিনিষপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, একটি পরের Overcoat নিয়ে এসেছি, চিন্তা করে দেখা গেল, সম্ভবতঃ যার কম্বল আমি রাত্তিরে নিয়েছিলুম তারই Overcoat— সে বেচারা বৃদ্ধ, শীত-পীড়িত, বাতে পঙ্গু অ্যাঙ্গ্লোইণ্ডিয় পুলিষ অধ্যক্ষ— পুলিযের কাজ করে যদি তার পৃথিবীর উপরে অবিশ্বাস জন্মে থাকে তাহলে আজ প্রাতঃকালে উঠে আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে তার বড় ভাল opinion হবে না। সে এতক্ষণে কত swear কত curse করচে।

মঙ্গলবার [৯ সেপ্টেম্বর]। লোকেনের পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্চেনা। ভারি গোল বাধিয়ে দিয়েচে। আমার বিশ্বাস সেটা রেলগাড়ির বেঞ্চির নীচে রয়ে গেছে। সকালে আমরা তিন মূর্ত্তি পদব্রজে বেরোলুম। প্যারিসের কি বর্ণনা করব! প্রকাণ্ড কাণ্ড। রাস্তা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা ইত্যাদি। অনেক ঘুরে২ এক বইয়ের দোকানে গেলুম সেখানে গোটাকতক বই কিনে এক খাবারের জায়গায় যাওয়া গেল— সুসজ্জিত চিত্রিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত স্ফটিকখচিত প্রকাণ্ড ঘরের একটি প্রান্তটেবিলে আহারাদি করে এক গাড়ি নিয়ে ইফেল টাউয়ার দেখতে বেরোলুম— এক মস্ত দৈত্য তার সহস্র লৌহকঙ্কাল নিয়ে আকাশে মাথা তুলে চায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। Liftএ করে প্রথমে আমাদের এক তলায় চড়িয়ে দিলে— চতুর্দ্দিকে প্যারিস উদ্ঘাটিত হয়ে গেল— ক্রমে আমরা চতুর্থ তলায় উঠ্‌লুম— সমস্ত বিরাট প্যারিসের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম— আশ্চর্য্য ব্যাপার। টাউয়ারে চড়ে বাবি সল্লি আর

ছোটবৌকে[১৬] তিনটে পোষ্টকার্ড[১৭] পাঠিয়ে দিলুম। সন্ধের সময় Hippodrome দেখ্‌তে গেলুম। তখন আরম্ভ হ্‌য়ে গেছে। বাদ্যি বাজ্‌ছে। প্রকাণ্ড জায়গা। চারদিকে গ্যালারি উঠেছে। রোমান্‌ নাট্যশালার মত মনে হয়। লোক গিস্‌গিস্‌ করচে। নিদেন দশ হাজার লোক হয়েছিল— তবু এখনি season নয়। তুটো মেয়ে Tight পরে Barএর উপর যে কাণ্ড করলে সে আশ্চর্য্য। তার পরে Jeanne d'arcবলে একটা Pantomime হল। প্রথমে একটা গ্রামের দৃশ্য করেছিল সেটা বেড়ে লেগেছিল— তার পরে বিদেশী সৈন্য লুটপাট করতে এল— তার পরে Jeanne দৈববাণী শুন্‌লে সবশেষে তার চিতাশয্যা। তার পরে সমস্ত ফ্রান্সের সৈন্য এবং ভিন্ন২ প্রদেশের মূর্ত্তিস্বরূপ মেয়েরা ত্রিবর্ণ ফ্ল্যাগ হাতে ঘোড়ায় চড়ে একটা মহাসমারোহ করে দাঁড়াল। আগাগোড়া সমস্ত বাজনা এবং গান চল্‌চে। বেশ বুঝ্‌তে পারছিলুম— ফরাসী দর্শকদের মনটা কি রকম হচ্চিল।

---

১৬ পত্নী মৃণালিনী দেবী

১৭ পত্নীকে লিখিত পোষ্টকার্ডটির প্রতিলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশনবসন বিলাসব্যসন চলনবলন আমোদ-উৎসব খেলাধূলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এগুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মননকল্পনা ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মননকল্পনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

যুক্তি

কিন্তু, প্রাচীন বাংলার এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অন্তত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্যরচয়িতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে সুবিধা ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাজেই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। দৈনন্দিন জীবনচর্যার যে-সব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ বর্তমান, শুধু সেই-সব দিক সম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিতেছি। কালক্রমানুযায়ী সবিস্তারে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নাই; আহারবিহার বসনভূষণ খেলাধূলা আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য শুধু বর্তমান। বিশেষ ভাবে এ-সব সংবাদ বহন করিবার জন্য কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই; অন্তত এ-যাবৎ আমরা জানি না। এমন কাব্য বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুসংবদ্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। স্পষ্টতই, যে-সব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই।

উপাদান

আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো রূপে বর্তমান। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই-একটি বিষয়ে ছাড়া এইসব উপাদান কতটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; শেষোক্ত গ্রন্থটির সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, বিশেষভাবে বিলাসব্যসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাংলার নাগরসভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তপর্বের বাংলার দৈনন্দিন জীবনের কোনো খবর আর কোথাও দেখিতেছি না।

গুপ্তপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুক্‌রা-টাক্‌রা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদানসমূহে। দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত; সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মননকল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দির-গাত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বস্তুময়তায় প্রতিফলিত; যে-সব দিক সম্বন্ধে অন্যত্র কোনো সংবাদই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের সে-সব দিকের নানা ছোটবড় তথ্য একমাত্র ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। ফলকগুলির লোকায়ত শিল্পই সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের ইঙ্গিত আমাদের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয়াছে। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু খবর বাংলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহারবিহার বসনভূষণ এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতিপালন মাত্র, হয়তো যথার্থ বাস্তবজীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসনভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সে-সব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ-সাহিত্যে। বাংলার সুবিস্তৃত স্মৃতিসাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতো কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। কোনো সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই; তবু এইসব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়। সদ্যোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই বাংলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙালীত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নয়, তবে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বাঙালীত্বের যে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে নৈষধচরিতের বিবরণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিবাহ ও আহারবিহার সম্বন্ধে কিছু কিছু রীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাংলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এ-সবের প্রচলন থাকিলেও শ্রীহর্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙালী হউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এইসব রীতি আচার অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখণ্ড হইতেছে বাংলাদেশ।

২

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সেকথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আহারবিহার

ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান্য যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং 'হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালী-জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃতসহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি। প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি?)

প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য দেখিতেছি কলাপাতায়, 'ওগ্গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা', গো-ঘৃতসহকারে সফেন গরম ভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর : পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর-একটি বিচ্ছিন্ন (ঝর্‌ঝরে ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮)। দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬।৭০)।

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সব্জী তরকারি। ডাল খাওয়ার কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও নাই। নানা শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ প্রাকৃতপৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থের প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখযোগ্য :

ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা(ই) পুনবন্তা

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে, বরযাত্রীরা শাকসব্জীর তরকারি পছন্দ করিতেন না।

বিবাহভোজ

দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবর্ণ পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হইয়াছিল। বরযাত্রীরা মনে করিলেন বুঝি বা শাকান্ন পরিবেশন করা হইয়াছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলিলেন, আপনাদের শাক পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলিয়াই অন্নব্যঞ্জন সবুজ দেখাইতেছে। এই বিবাহভোজে যে-সব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারি প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙালী সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া এমনকি গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ৎসিঙও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রীহর্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাংলাদেশে তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। যে-সব ব্যঞ্জনাদি এই বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে; দই ও রাইসরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল); হরিণ, ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম বিবিধ উপাদানযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি; নানা প্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদি। পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা মসলাযুক্ত

পানের খিলি। অবান্তর হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে লোকায়ত স্তরে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান সুপারী এবং অন্যান্য মসলা পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া। পূজা-পার্বণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কৌমসমাজের রীতিও তাহাই। পান খিলি করিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী আর্য-ভারতীয় রীতি এবং উচ্চকোটি লোকস্তরে ক্রমশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত।

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এগুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মৎস্য ও মাংস আহার

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগমাংসও বহুল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো কোনো প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কৌমে, বোধ হয় শুকনা মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেবভট্ট কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুকনা মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া যে ছিল জটিল এবং নানা উপাদানবহুল তাহা নৈষধচরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

বারিবহুল, নদনদী-খালবিলবহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আহার্যতালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট। মাংসের প্রতিও বাঙালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্য-ভারতে ছিল; বিশেষভাবে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধিতেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই। বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্টভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-ছাগলেয় প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করিয়া ভবদেব বলিতেছেন, ইহাদের নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ স্পর্শে না। বস্তুত মাংস ও মৎস্য আহার

বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তাহাই করিয়াছেন; বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া আর কোনো দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ কিছু নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস(ইলিস বা ইল্‌সা)মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না; যে-সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন, বাণমাছ), কদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁশ নাই সে-সব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুক্‌না মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা সিহুলী বা শুক্‌না মাছ খাইতে ভালবাসিত (যত্র বঙ্গালবচ্চারণাং প্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যূহ পক্ষী, উট, গোরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে। তবে, সন্দেহ নাই, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কৌমের লোকদের মধ্যে আজিকার মতই শামুক কাঁকড়া মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁশ ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণমাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা শশক সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, একথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে। বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়; মাছ-কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দু'টি অতিবাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ। শবর পুরুষ হরিণ শিকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে সে-চিত্রও বিদ্যমান। শবর পুলিন্দ নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী শিকার। হরিণ-শিকারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে একাধিক চর্যাগীতে। একটি গীতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন।

হরিণশিকার ও হরিণমাংস আহার

তেন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জাণী ॥
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দাসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই ॥

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল খায় না; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না; ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর-একটি গীতিতে। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইঙ্গিতও আছে একটি চর্যাগীতে। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মায়াজাল॥

তরকারি

যে-সব উদ্ভিদ্ তরকারি আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন বেগুন লাউ কুমড়া ঝিঙ্গে কাঁকরুল কচু (কন্দ) প্রভৃতি, আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এ-সব তরকারি বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালীর সুপ্রাচীন।

ফল

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঁঠাল নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের দান; প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল; ইক্ষুরস জাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড' চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্যাগীতিতে।

কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিনমাসে কোজাগরপূর্ণিমারাত্রে আত্মীয়বান্ধবদের চিপিটক বা চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশা খেলায়। খই-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খই বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খই-বর্ষণের বর্ণনায় এবং লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

পানীয়

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত গম গুড় মধু ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানাপ্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেব-

ভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাঁহার এই স্মৃতি-নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ মদ্য রক্ত মৎস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য হইলেও শক্তিপূজায় এইসব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিল না, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনো পূজায়ই তেমন নিষেধ কিছু ছিল না। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যেভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শুঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শুঁড়ির স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করিতেন, এবং ক্রেতারা সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শুঁড়িখানার দরজায় বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন আঁকা থাকিত, এবং মদ্যাভিলাষীরা সেই চিহ্ন দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন। একজাতীয় গাছের সরু বাকল (অন্য মতে, শিকড়) শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ চোলাই করা হইত। বেলের খোলা করিয়া মদ্য-পানের উল্লেখ আছে সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে ; চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায়। বিরুবাপাদ বলিতেছেন,

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥···
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল ॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই ; সেই চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে ; গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর) ! সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে— বিরুপা সাবধান করিতেছেন, সরু নল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুণী ঢাল।

প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না ?

প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যতালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাংলা আসাম ও ওড়িষ্যায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয়— এ ব্যবহার ক্রমশ বাড়িতেছে সমাজের সকল স্তরেই— তাহার খুব স্বল্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়। পূর্বেও তাহাই ছিল ; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্তমহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য ডালের

চাষও নাই। বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্তরে বহু ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ও আমিষ ব্যঞ্জনাদি খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাংলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না; প্রাচীনকালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। আর সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্য-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না, আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথহীন রাঢ় ও বজ্রভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কৌমসমাজের মৎস্য ও শিকার-মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর উদ্ভিজ্জ-ব্যঞ্জনাদি, এবং তাহাদের আদিম রন্ধনপ্রণালী ভিন্‌প্রদেশী জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সে অশ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান।

শিকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রিয়া

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের শিকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই। ইঁহাদের কিছু কিছু শিকারচিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর-ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। পবনদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া।

গৃহক্রীড়া

দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবাখেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশাখেলাটা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবাখেলার প্রচলন যে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা') 'মন্ত্রী' 'গজবর' এবং 'বড়ে', এই চারি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন—

> করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবল।
> সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
> ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
> উআরি উএসেঁ কাহ্নু নিঅড় জিনউর॥
> পহিলেঁ তোড়িয়া বড়িআ মারিউ।
> গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।
> মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
> অবশ করিআ ভববল জিতা॥

ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুনিয়া লেহুঁ।

করুণার পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদগুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিওনা; উপকারীর উপদেশে কাহ্নুর নিকটে জিনপুর। প্রথমে বড়িয়া তুড়িয়া মারিলাম (অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল); তারপর গজবর (হাতী) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতিনিবৃত্ত করিলাম (ঠেকাইলাম); অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষট্টী কোঠা গুনিয়া লই।

নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুঁটি বা ঘুন্টিখেলা বাঘবন্দী ষোলঘর দশপঁচিশ আড়াইঘর প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু মাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবদ্ধ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অড্ঢ' বা 'আঢ' অর্থাৎ বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা জুয়া খেলিতেও অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সমতটেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈলান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অশ্বক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন (গজতুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন)। রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই।

নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়

নৃত্যগীতবাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। রামচরিত পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোহাকোষের নানা জায়গায় নানাসূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামা ও দেবদাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীয়সী হইতে হইত। তাঁহারা যে নানা কলানিপুণা ছিলেন, এ-কথার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবনদূতেও আছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা ভরতের নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী, এবং এই নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ভরতানুমোদিত নৃত্যগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে। এখনও বাঙালীসমাজের নিম্নস্তরে এক ধরনের গায়ক-গায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গাহিয়া এবং নাচিয়াই যাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন; ইঁহারাই বোধ হয় উপরোক্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চকোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সংগীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে নানা প্রকারের

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে; যেমন, কাঁশর করতাল ঢাক বীণা বাঁশি মৃদঙ্গ মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ (মৃদঙ্গ) বাদ্য প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্যত্র বোধ হয় অন্য প্রকারের মুরজের প্রচলন ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে আছে, তুম্বীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে— কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত উভয়েরই, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও। নিম্নশ্রেণীর নটনটীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন—

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টী পাপড়ী; তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী।

লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাঁট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণাজাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ইঁহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তিধ্বনি বিলসই রুণা॥···
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

সূর্য লাউ-এ শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড— সব এক করিয়া দিল অবধূতী। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজিতেছে; শোন্, তন্ত্রীধ্বনি কি সকরুণ বাজিতেছে।··· বজ্রাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিতেছে— এইভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধনাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে?) রূপদান করা হইত।

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে যে, নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য তথাকথিত নীচজাতীয়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চঞ্চল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণীসংস্কারমুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোনো বাধা তাহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না।

কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরী ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী॥···
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী॥

হালো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী! তোর (এক) অন্তে কুলীন-জন, (আর) মধ্যে কাপালী! কেহ কেহ তোকে

বলে বিদ্রূপ (তাহাদের প্রতি), (কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্ন গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেহ নাই।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্যাগীতির একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহীআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল; মনপবন দুই করণ্ডক শালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন চলিল ডোম্বীকে বিবাহ করিতে। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে (লাভ) করিলাম অনুত্তরধাম (অর্থাৎ, নীচু জাতের ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব পূরণ হইয়া গিয়াছে, এই ভাব)।

বিবাহযৌতুক

তখনকার দিনে বাংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান।

যানবাহন— নৌযান

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙ্গা এবং নৌকাযোগেই যাতায়াত করিত। ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই অস্ট্রিক্ ভাষার দান; এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌবন্দর, নৌঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালীজীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে। রূপকছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাকা, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতি এমন সহজভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে। খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। চর্যাগীতির একটি গীতিতে দেখিতেছি পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈকা ডোম্বী—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তাহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই।

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পঅিপত্র জাইব পুনু জিন উরা॥
পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দোলে সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধী॥…
কবড়ী ন লেই বাড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কূলে কূলে বুলই॥

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা; মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী তাহাতে জলে ডুবিয়া ডুবিয়া লীলায় পার করিতেছে। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি হইয়া যাইতেছে; সদ্‌গুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধ; সেঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করিতে পারে। … কড়িও লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানিল না, তাহারা শুধু কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিল।

সহরপাদের একটি গীতে আছে,

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতিবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সর বি বোলিআ॥
কূল লই খর সোঁন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণে সমাঅ॥

কায় (হইতেছে) নৌকা, খাঁটি মন (হইল তাহার) দাঁড়; সদ্‌গুরু বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা টানে গুণে; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে) যাইও না। পথে (আছে) ভয়, বলবান দস্যু; ভব উল্লোলে (তরঙ্গে) সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়; সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে।

অন্যত্র কম্বলপাদ বলিতেছেন—

খুণ্টী উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ॥

খুঁটি (গোঁজ) উপড়াইয়া কাছি খুলিয়া দাও; হে কামলি (পূর্ব-বাংলায় মাঝি প্রভৃতি দিনমজুরদের আজও বলে কামলা বা কামুলা), সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকা বাহিয়া চল। পথ চড়িয়া (মাঝনদীতে আসিয়া) চারিদিকে চাহিয়া দেখ; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে?

নদ-নদী-খাল-বিলের বাংলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥

ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহিয়া চলে; দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।

এ-ছবি তো একান্তই বাংলার নদনদীগুলির— দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা; আর নদীর গভীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই। সরহপাদের একটি গীতে আছে,

বাম দহিন জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা॥

(পথে) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চল (অর্থাৎ, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও)।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের। এত খাল-বিখালই বা আর কোথায়! শান্তিপাদের একটি গীতে আছে,

কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এস অট মহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুঝিঅ বাট জাইউ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ পথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝপথে) চলিতে হইবে। এই সহজপথে ঘাট-ঝোপ কিছু নাই, বাধাবিঘ্ন কিছু নাই; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায়।

গোযান

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গোরুর গাড়ি। মহিষের গাড়ির উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।

হস্তী ও অশ্বযান

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তীবল। অসংখ্য লিপিতেও হস্তী-সৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর। সুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতে হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ও কামরূপে, হাতী ধরা ও হাতীর চিকিৎসা

ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাংলার অন্যতম প্রধান গৌরব। রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় ভূম্যধিকারীরা হাতীতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে হাতীর রূপক আশ্রয় অনেকগুলি গীতে স্থান পাইয়াছে এবং রূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল। খেদা পাতিয়া আজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতী ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতী এবং হাতীশিশু (করভ) ধরা হইত। বন্য হাতী সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। চর্যাগীতিতে কাহ্নপাদের একটি গীত আছে,

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥

কিন্তু বন্য হাতী কোনো বাধাবন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল খুঁটি ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পদ্মবনে গিয়া প্রবেশ করিত। পাগলা হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে,

মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা।
গঅন টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠি নিবানা॥

আমার মত্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে; নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া যাইতেছে। পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সকল থাম্বা মাড়াইয়া গগন-শিখরে গিয়া পৌঁছিয়া সে একেবারে শান্ত হইয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব-বাংলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতীরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেচ্ছভাবে। সরহপাদ বলিতেছেন,

মুক্কউ চিত্তগজেন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅন গিরী ণইজল পিএউ তিহঁ তড় বসউ সইচ্ছ॥

চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর; এ-বিষয়ে আর কোনো বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগনগিরির নদীজল সে পান করুক, তাহার তটে স্বইচ্ছায় সে বাস করুক।

হাতী ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতীর মনকে বশ করিতে হইত। বীণাপাদের একটি গানে আছে,

আলি কালি বেণি সারি মুনিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণি আ।

গোরুর গাড়ির চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাংলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ। বরযাত্রায়ও গোরুর গাড়ি ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সংগতিসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন।

পালকির ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে দেখিতেছি, একটু প্রচ্ছন্নভাবে হস্তীদন্তনির্মিত স্বহদণ্ডযুক্ত পালকির উল্লেখ। বল্লালসেন নাকি তাঁহার শত্রুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের পালকি চড়াইয়া।

ঘরবাড়ি

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড় রামপাল মহাস্থান দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্মে বাস করিতেন; রাজপ্রাসাদও তৈরি হইত ইটকাঠেই। কিন্তু এইসব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে ইটকাঠের বাড়ি বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কোনো গ্রাম-বর্ণনাতেই সেরূপ কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা ত বটেই, এমনকি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি খড় বাঁশ কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বাস করিতেন; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরি হইত বের্ড়া, আর খুঁটি হইতে বাঁশের বা কাঠের। চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারি দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাশে ছাইলা রে দিয়া চঞ্চালী)। মাটির দেওয়ালও ছিল; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল; পূর্বাঞ্চলে চাঁচারির বেড়া। প্রস্তর ও মৃৎফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডাকৃতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে; 'প্রচুর পয়সি' প্রাচ্য এবং বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশে বর্ষায় দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনির্ভর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি বার ছবি আঁকিয়াছেন,

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে আজিকার মত তখনও সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এবং এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিড়িয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গিদ্বারা ইহাকে শক্ত করা হইত,

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥

তৈজসপত্র

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি রামচরিত পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ লোকেরা সোনা

ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণতঃ মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা প্রত্নস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙা টুক্‌রা প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকার-যুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। এ-সব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই। তবকাত-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন একটু সবিস্তারে তাহার উল্লেখ করিতেছি। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী; ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার; এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম; তবু, পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয় কাশ্মিরী মানদণ্ডে বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোক্তির কারণ)। ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক সেদিক দোলান! হাঁটিবার সময় তাঁহার ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত দন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন-তিনটি করিয়া স্বর্ণ-কর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি; দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্ত্যক্ত করেন।

বসনভূষণ বিলাসব্যসন

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইসব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

পরিধানভঙ্গি

পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে সেলাই-করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিল না; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই-করা জামা বা গাত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানি করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজ্‌রাতি মারাঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া ঢিলা বা চুড়িদার পা'জামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার; যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছোট ছিল; হাঁটুর নীচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নীচেই দুই-তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টিকে কোমরে আটকানো; কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নীচেই তুল্যবান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মত ঝুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ি ধুতির মত এত খাটো নয়, পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলানো, এবং বসন-প্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না; তাঁদের উত্তরদেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সংগতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে— হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়— কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা করিতেন চোলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বডিস্' জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-উর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং

পুরুষের ধুতি প্রভৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে— সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সাক্ষ্যে এ-তথ্য সুস্পষ্ট— নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতির নক্‌শাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নক্‌শা-মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে, এবং সিন্ধু সৌরাষ্ট্র ও গুজরাত ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও ক্রমশ তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই নক্‌শা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরাণ-মধ্যএশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। কিন্তু সে-কথা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। যাহাই হউক, নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বস্তুত, সমগ্র প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয়-পলিনেশীয়-মেলানেশীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বলিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভাসমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভাসমিতির জন্য পৃথক পোষাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কব্জি পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পা'জামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; নৃত্যের গতিতে ওড়নার প্রান্ত উড়িত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্রসমাজ শ্রমিকেরা পরিতেন নেঙ্গোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পা'জামা, সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোষাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিধেয় ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি নাহয় আঁট পা'জামা, আর কটিতলে জড়ানো ধটি; তাহাদের কণ্ঠে দুল্যমান এক বা একাধিক পাটা বা পদক-সম্বলিত সূত্রহার।

কেশবিন্যাস

আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ কিছু ছিল না। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাব্‌ড়ীর মতন চুল রাখিতেন; কুঞ্চিত থোকায় থোকায় তাহা কাঁধের উপর ঝুলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি প্যাঁচানো ঝুঁটি; কপালের উপর দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ফিতার মতন করিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোপা করিয়া বাঁধা; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাদ্দিকে এলানো। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ'গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা।

পাদুকা

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন; এবং সে-পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত এমনভাবে যাহাতে পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমুখ সেই জুতা ছিল ফিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না,. যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান সংগতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠ-পাদুকার চলন খুব

বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর; লাঠির সাক্ষ্য স্বল্প হইলেও বিদ্যমান। প্রহরী, দ্বারবান্, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন।

প্রসাধন

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ্ এবং সীমন্তে সিঁদুরের রেখা; পায়ে পরিতেন লাক্ষারস, অলক্তক, ঠোঁটে সিঁদুর; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফ্রান প্রভৃতি। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি না, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে। প্রসাধনক্রিয়ায় কর্পূর-ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি-লিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে। ঠোঁটে লাক্ষারস (অলক্তরাগ) এবং খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ, এ-কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি সাঞ্চাধরও বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সীমন্তের সিঁদুর যাইত ঘুচিয়া, এ-কথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা-লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

> বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্য।
> সিন্দূরিত সীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব॥

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলার ফুলের মালাদ্বারা বক্ষ ঢাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগরসমাজের উচ্চকোটি স্তরের। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা, প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বক্ষযুগলে কর্পূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা বেশভূষা প্রসাধন অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগরসমাজে রাজপরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সক্রিয় হয়। নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে—

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনানাম্॥

দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা); গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মতন নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ — বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে!

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন; 'রসময় সুহ্মদেশে' নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণাভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে—

[রসময় সুহ্মদেশঃ] শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালিপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শুধু গৌড়-রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড।

আর্দ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ
সীমন্তচুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ
দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচিরাম্বগুরূপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ॥

বক্ষে আর্দ্রচন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচির', অর্থাৎ দূর্বাদলের মত শ্যাম— ইহাই হইতেছে গৌড়াঙ্গনাদের বেশ।

নগর ও পল্লী বাসিনী

একদিকে নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে সরল স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচালন পছন্দ করিত না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন,

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি॥

সখি, সোজা পা ফেলিয়া চল, নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পল্লীপতি (গ্রামপতি) ডাকিনী বলিয়া দণ্ড দেন।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র—

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥

কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিলপল্লব— অনাগর (অর্থাৎ পল্লীবাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুত্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপ কর্মব্যস্ত মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময় কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরণ। তাঁহারা যে একবস্ত্র পরিহিতা সে-কথাও শরণের এই শ্লোকটিতে জানা যায়। অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি; এখানে শুধু একটি মর্মানুবাদ রাখিলাম।

এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা, তাহাদের দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত (অরুণবর্ণ)। দ্রুত ধাইয়া চলিবার জন্য তাহাদের স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছে। ঘরের চাষী সেই সকালবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময়—এই কথা ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পথ সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে, আর ব্যস্ত হইয়া হাটে কেনাবেচার দাম আঙ্গুলে গুনিতেছে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানা প্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্যুতিখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা। সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশম-বস্ত্রের কথা তো নানাসূত্রেই পাওয়া যাইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্যও নয়। বাংলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ-কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসিয় মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক ফা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উদুম্বর গঙ্গাসাগর গাঙ্গোর লক্ষ্মীবিলাস দ্বারবাসিনী এবং শিলহটী পট্টাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র; কারণ ইহার পরই জ্যোতিরীশ্বর বলিতেছেন নির্ভূষণ বঙ্গাল বস্ত্রের কথা। কিন্তু 'ক্ষৌম' বা 'কৌষেয়', 'দুকুল' বা 'পত্রোর্ণ' বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কার্পাসবস্ত্র যাহাই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকদের এ-সব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নির্ভূষণ কার্পাসবস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তত কবি বীর এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর দারিদ্র্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ 'স্ফুটিত' জীর্ণ বস্ত্র। এই দুইটি শ্লোকই সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রন্থেরই অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি; বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন; অনেকে নিজেরাই যে সে কাপড়ের সূতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের নিম্নোদ্ধৃত রাজপ্রশস্তি শ্লোকটিতে—

কার্পাসাস্থি প্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যা প্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
ত্বৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি॥

যে-সব দরিদ্র শ্রোত্রিয়দিগের ঝটিকাহত কুটিরের প্রাঙ্গণ কার্পাসবীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (হে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

অলংকরণ

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী অঙ্গুরীয়ক কণ্ঠহার বলয় কেয়ুর মেখলা ইত্যাদি নরনারী নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের নৈহাটি-লিপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীরাও নাকি হার কর্ণাঙ্গুরী মালা মল এবং স্বুবর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন, মূল্যবান্ পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রাজ-পরিবারে মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি)। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাখচিত নানা স্বন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা মরকত নীলকান্তমণি চুণী প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এইসব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড়জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। দেওপাড়া-প্রশস্তিতে কবি উমাপতি-ধর বলিতেছেন, পল্লীবাসী নির্ধন ব্রাহ্মণরমণীরা রাজার কৃপায় নগরে আসিয়া বহুবিভবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউফুলে, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলে পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না!

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কিভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত, তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসবসজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে আল্‌তা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আল্‌তা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কার্যগুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরি ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাজাইতেন, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানাপ্রকার বাদ্যের মধ্যে বাঁশি বীণা করতাল মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসর ঘরে (কৌতুকগৃহে) আজিকার মতন তখনও চুরি করিয়া চুপি দেওয়া এবং আড়িপাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত্ পুরন্ধ্রিভিঃ সহস্র রন্ধ্রোকৃতমীক্ষিতুংততঃ। অধাত্ সহস্রাক্ষতমুত্রমিত্রতাং অধিষ্ঠিতং যত্ খলু জিষ্ণুনামুনা॥); এবং বরকন্যার গাঁটছড়াও বাঁধা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পরিবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং তাঁহাদের লইয়া বরযাত্রীরা নানা

প্রকার ঠাট্টা-রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না ; সে-সব ঠাট্টা ও রসিকতা আজিকার দিনে খুব মার্জিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযাত্রীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন করা হয়। নল-দময়ন্তীর বিবাহবর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহবাড়িতে চার-পাঁচ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরযাত্রীরা বারসুন্দরী বা বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না! বস্তুত, সৌখীন উচ্চস্তরে যুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুক্‌রাটাক্‌রা খবর নানা দিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, "গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্"— অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুক্ত। রাজশেখর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে অঙ্গ-বঙ্গ-সুহ্ম-ব্রহ্ম-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেষ) বর্ণনা উপলক্ষ্যে গৌড়-নারীর বেশের (বেষের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

দেহবর্ণ

প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে—

শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বহ্লিকাদয়ঃ
প্রায়েণ গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরাং যে শ্রিতাদিশম।
পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোড্রমাগধাঃ
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামা কার্যাস্তু বর্ণতঃ॥

(নাটকেয়) শক-যবন-পহ্‌লব-বাহ্লিক প্রভৃতি যে-সব (পাত্রপাত্রী) উত্তর দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর ; পঞ্চাল শূরসেন উড্র মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।

রাজশেখরও বলিতেছেন, "তত্র পৌরস্ত্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাশ্চাত্যানাং পাণ্ডুঃ, উদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ, শ্যামো গৌরশ্চ।" গৌরাঙ্গনাদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি ; অন্যত্রও তিনি বলিতেছেন,

শ্যামেষ্বঙ্গেষু গৌড়ীনাং সূত্রহারৈহারিষু।
চক্রীকৃত্য ধনুঃ পৌষ্পমনঙ্গো বল্গু বল্গতি।

এইসব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নরনারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর, তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, "বিশেষস্তু পূর্বদেশে রাজপুত্র্যাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ"।

ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাধনাগত যোগ বহু কালের। ভগবৎপ্রেমে, ভক্তিতে, চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যশিল্পে, জ্যোতিষ-চিকিৎসাদিশাস্ত্রে, কাব্যে-সাহিত্যে, সামাজিক উৎসবাদিতে, কোথায় সেই যোগ দেখা যায় নাই? কাব্য-সাহিত্য সামাজিক উৎসবাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় সংগীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের সাধনাগত যোগ কম নহে। আর-সব ক্ষেত্র বাদ দিয়া শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে দেখিলেও দেখা যায় উভয়ের সাধনাগত যোগ বিস্ময়কর।

অতি পুরাতন কাল হইতেই ভারতে সংগীতের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। ফলে যুগে যুগে দেখা যায় সেই সাধনার নব নব লীলা ও রূপ।

আকাশে সব গ্রহ-নক্ষত্র এই পৃথিবী হইতে মনে হয় যেন একই তলে অবস্থিত। কিন্তু তাহা তো সত্য নয়। অতিদূরত্ববশতই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আমরা বুঝিতে পারি না। এখন আমরা যাহাকে প্রাচীন সংগীতরীতি বলি তাহাতেও নানাযুগ-গত প্রচুর প্রভেদ আছে। সেই সুদূর অতীতেও এক যুগের সংগীতের সঙ্গে অন্য যুগের সংগীতের অনেক প্রভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়াছে। পরে আবার কোনো নবতর সংগীতধারা আসিয়াছে, তখন প্রাচীন নানা দলের সংগীত নিজেদের ঝগড়া মিটাইয়া সকলে এক হইয়া সেই নূতন ধারাকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিয়াছে এবং রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপ চতুরতা শুধু রাজনীতিওয়ালাদেরই একচেটিয়া নয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি কোনো বিশেষ একটিমাত্র দলের সাধনার ফলে গড়িয়া ওঠে নাই। এই সংস্কৃতির মধ্যে আর্য-আর্যেতর বৈদিক-অবৈদিক কাহার সাধনা নাই? তারও পরেকার শক-হূন-যবনাদির সাধনাও ইহাতে প্রভূত পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে।

আর্য-সাধনার প্রাচীনতম ভাণ্ডার হইল বেদ। সেই বেদও কিছু একই কালের বা একই দলের বস্তু নয়। বেদে-বেদে বিরোধও সে-যুগে কম দেখা যায় নাই। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদকেই মোটামুটি প্রাচীনতম বলা যায়। সামবেদ ও সামগান তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত নূতন। এই সামবেদকেও একদিন ঋগ্বেদ সহিতে পারে নাই। সামবেদ গান ঋগ্বেদীয়দের কানে পেচক-শৃগাল-কুকুর-গাধার ডাকের মতই মনে হইত।

সামগান অনেকটা সেকালের লোকসংগীতের মত ছিল। তাহাতে যজ্ঞ-মন্ত্র স্থগিত করিয়াও লৌকিক 'হুবা-হোই-হোয়ী' প্রভৃতি সুরের টান দেওয়া হইত। অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিতেই লোকপ্রচলিত এইসব দীর্ঘ সুরের টান দিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। তাই ঋগ্বেদীয়গণ সেই সামগানকে কখনও বলিতেন তাহা শুনিতে কান্নার মত, কখনও বলিতেন কোনো বাদ্যের সুরের মত, কখনও বলিতেন শৃগাল-কুকুর-পেচক-গাধার চিৎকারের মত। মোট কথা, অতিশয় পূতিগন্ধ উপস্থিত হইলে যেমন গান থামাইয়া দিতে হয় তেমনি সামগান শুনিলে তাঁহারা ঋগ্বেদ গান একেবারে থামাইয়া

দিতেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে আমরা সেইসব ইতিহাস দেখিতে পাই। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন আপস্তম্বের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা আচার্য হরদত্ত তাঁহার "উজ্জ্বলা" ব্যাখ্যায়। কাজেই এখনকার দিনের মার্গসংগীতের ওস্তাদেরা রবীন্দ্রনাথের গানে যখন ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন না, তখন বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যুগে যুগে এই ইতিহাসই চলিয়া আসিতেছে।

একদিন বৈদিক যুগেরও অবসান হইল। অগ্নি-বরুণ-ইন্দ্রাদি দেবতার স্থানে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা আসিতে লাগিল। প্রাচীনপন্থী ঋষিরা তখন বাধা দিলেন। প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞে দক্ষযজ্ঞের মত হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। জৈন বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাগবতেরা সংগীতেও নূতন গানের রীতি প্রবর্তিত করিলেন। বেদপন্থী রাজারা তাহাতে বাধা দিলেন। অবশেষে রফা হইল এই যে, নারী ও শূদ্রগণ এই নূতন গান গাহিতে পারেন কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ভাগবতগান গাহিলে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড বা নির্বাসনদণ্ড হইবে। পুরাণে এইসব কথা চমৎকার ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। কাজেই রবীন্দ্রসংগীতের অপরাধে যে এখন প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন ঘটে না তাহাই পরম সৌভাগ্য।

যাহা হউক এই ভাগবত-সংগীতের প্রবর্তকদের মধ্যেও নারদ, মতঙ্গ, ভরত, দত্তিল প্রভৃতি মুনিদের নাম পাই। এই মুনিদের মধ্যেও পরস্পরে সব সময়ে যে ঐক্য ছিল তাহাও নহে। এইসব মুনিদের রচিত সংগীতশাস্ত্রও সব লুপ্ত হয় নাই। তাহাতেও দেখি কেমন করিয়া লোকপ্রচলিত রীতিতে পুরাতন সব রাগ ভাঙিয়াচুরিয়া নব নব বহু বিচিত্র রাগরাগিণী সৃষ্ট হইতেছে। কাজেই নারদকেও গান শিখিতে গিয়া নারী ও শূদ্রদের কাছে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। নব নব সুরসৃষ্টির এই অপরাধ শুধু এই যুগেরই নহে। প্রাচীনকালেও সংগীতের নূতন ধারা পুরাতন মালমশলা দিয়া নূতন নূতন রাগরাগিণী সৃষ্টি করে, আর পুরাতনের দল দারুণ হইয়া ওঠেন।

ক্রমে এই ভাগবত মুনিদেরও যুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠা পাইবার পরে মুনিদের মধ্যেও নানা মতভেদ দেখা দিল। এখনকার দিনেও রাজনীতিতে দেখা যায় কোনো একটা দল শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তখন নানা দল দেখা দেয়। তখনকার দিনেও দেখা যায় সংগীতে ভাগবত-মত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা মতবাদ চলিল।

এমন একজন মুনি নাই যাঁহার সঙ্গে অন্যের মতভেদ না আছে।

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ॥

এই মুনিদের যুগও তো চিরস্থায়ী নহে। আবার বাহিরের সব প্রভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনই আচার্যযুগ আসিল। আচার্যযুগের প্রাচীনতম সংগীতশাস্ত্ররচয়িতার নাম পাই শার্ঙ্গদেব। ১২১০ হইতে ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ সংগীতরত্নাকর রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থেই আমরা ভারতীয় সংগীতকলায় প্রথম মুসলমান প্রভাবের খবর পাই। সংগীতরত্নাকরে তুরুষ্ক-গৌড় ও তুরুষ্ক-তোড়ী রাগের নাম মেলে। হয়তো এই তুরুষ্কপ্রভাব লইয়াই এই নবীন আচার্যযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।

বৈদিক ভাগবতযুগ বিদায় হইল। তবু এই আচার্যযুগেও পুরাতন যাহা ছিল তাহা লইয়াই মার্গসংগীত কুলীন হইয়া বসিয়া রহিল। তখনও গানে এই দেশে কনকাঙ্গী ঠাটে এবং চচ্চৎপুট চাচপুট প্রভৃতি তালেই চলিতেছিল।

ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় সংস্কৃতের আওতায় বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বহুকাল নিষ্প্রভ ছিল। মুসলমান বাদশারাই এইসব লোকভাষাকে তুলিয়া ধরিলেন। সংগীতেও ঠিক তাই হইল। যেসব দেশী সুর পণ্ডিতজনের বহুকাল অবজ্ঞাত ছিল তাহাকেই উৎসাহ দিয়া মুসলমান গুণীরা ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি নব নব সংগীতকলারীতি প্রবর্তন করিলেন। তবু তখনও কনকাঙ্গী ঠাট ও পুরাতন সব তালই চলিতে লাগিল। দুই শত বৎসর পূর্বে মুসলমান ওস্তাদেরা তাহাও বদলাইয়া দিলেন। কনকাঙ্গী ঠাট গেল, বেলাওল ঠাটে ওস্তাদী গাহিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। সেই রীতি এখন পর্যন্ত বিদায় লয় নাই। যাহা হউক, ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে মুসলমানদের সাধনার কথা এখন দেখা যাউক।

একটা কথাতে বড়ই বিস্ময় লাগে। সংগীতকলা মুসলমানশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। অথচ বড় বড় ওস্তাদেরা তো প্রায় সকলেই মুসলমান। মুসলমানশাস্ত্রে যাহাই থাকুক তীর্থে তো সংগীত খুবই প্রচলিত। আজমীর মৈনউদ্দীন চিশ্‌তীর দর্গা হইল ভারতে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। সেখানে মূল তোরণে প্রহরে প্রহরে নহবত বাজে। ভিতরে প্রত্যেক পবিত্র স্থানে গায়কগায়িকারা যাত্রীদের পুণ্যার্থ সংগীত করেন ও যাত্রীরা তাহার জন্য রীতিমত দক্ষিণা দেন।

ভারতে পুরাতন তন্ত্রীবাদ্য ছিল বীণা। মুসলমানেরা তাহারও বহু অদলবদল করিয়াছেন। সেতার, রবাব, সুরশৃঙ্গার, সুরবাহার প্রভৃতি অপূর্ব সব তন্ত্রীবাদ্য মুসলমানেরাই ভারতে প্রবর্তিত করেন। কাশীতে মন্দিরে মন্দিরে প্রহরে প্রহরে অপূর্ব সানাই ও নহবত বাজে। এই সানাইর পূর্ব-রূপ ছিল খুবই সাদাসিধা। তাহার পরিচয় এখনও আমাদের আশেপাশে মেলে। কিন্তু কাশী প্রভৃতি স্থানের সানাইর এই মহত্ত্ব তানসেনী পরিবারের প্রভাবে। নহবতের বাদ্যও মুসলমানদের দেওয়া। নাকৃকাড়ায় বহু গৎ সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত। এখনকার পাখোয়াজেও ঠিক পুরাতন ভারতীয় রূপের পরিচয় পাই না। ইহাতে মুসলমান গুণীদের অনেকখানি হাত আছে। তবলা তো মুসলমানদেরই দান।

গাহিবার সময় ওস্তাদেরা যে রাগরাগিণীর মূল স্বরূপটি শোনান তাহার নাম 'নায়কী'। ইহা সেইসব সুরের শাশ্বত রূপ। তাহার উপর কলাবতেরা যেসব আলাপ করেন সেইসব নব নব পরিকল্পনাতেই তো ওস্তাদী। ইহাকেই বলে 'গায়কী'। ইহা মুসলমানী রীতি। এখন তো 'গায়কী' না হইলে শুধু 'নায়কী' গান কাহারও মনঃপূত হয়না। অথচ ইহা ভারতের প্রাচীন রীতি নহে।

ভারতে অমীর খুসরুর পূর্বেকার মুসলমান গুণীদের কথা বলা কঠিন। যদিও তাঁহাদেরই প্রভাবে সংগীতরত্নাকরে 'তুরস্ক-তোড়ী' ও 'তুরস্ক-গৌড়' দেখা যায়। ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে অমীর খুসরুর জন্ম। নদী যেমন সাগরগামিনী হইয়া পথে পথে নব নব ধারা সংগ্রহ করিয়া স্ফীততর হইতে হইতে চলে তেমনি ভারতের সংগীত জীবন্তধারার মত নব নব যুগের নব নব দেশের নানাবিধ বৈচিত্র্য লইয়া দিনে দিনে নূতন ও বিচিত্র হইয়াই চিরদিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মুসলমান-সাধনার সঙ্গে যোগের পরে তাহার আর বৈচিত্র্যের অন্ত রহিল না। তাহার পরে বহু নূতন নূতন সৃষ্টি হইয়া চলিল।

ভারতীয় সংগীতের প্রাক্-মুসলমানযুগের শুদ্ধ রূপ এখন পাওয়াই কঠিন। কর্ণাটকী সংগীতে এখনও ইহার কিছু পরিচয় মেলে। এখনকার সব সংগীত ষড়্‌জগ্রামীয় এবং দ্বাদশস্বরাত্মক। ইহাই এখনকার মার্গসংগীত। পুরাতন. মার্গসংগীত এখন অচল। চচ্চৎপুট চাচপুট তাল প্রভৃতির কথাও এখন বিস্মৃত। এইসব প্রবর্তনা যেসব মুসলমান গুণীদের, অমীর খুসরু তাঁহাদের একজন মুখ্য

পথপ্রদর্শক। প্রাচীনকালের কনকাঙ্গী ঠাট এখন অচল। এখন চলে মুসলমানদের প্রবর্তিত বেলাওলী ঠাট।

'ইমন' পারস্যদেশীয় রাগ। অমীর খুসরু ইহাকে ভারতীয় রূপ দিয়া আমাদের দেশে প্রবর্তিত করেন। এখন ইমন-কল্যাণের মত, ইমন-পুরিয়া ইমন-ভূপালী ইমন-বেলাওলা ইমন-বেহাগ ইমন-ঝিঁঝিট ও ইমনী ইত্যাদি রাগ কলাবতদের মধ্যে চলে। বাহার আলাইয়া সরফরদা সাজগিরি সাহানা অড়ানা সোহিনী সূহা সুঘরই জিল্ফ মারু এই কয়টি রাগ মুসলমানদের কাছেই পাওয়া। ইহারও পরে খুব অল্পদিন পূর্বে আমরা ইহাঁদের কাছে পিলু ঝিঁঝোটী প্রভৃতি রাগ পাইয়াছি। অথচ এইসব রাগের অনেকগুলির এখন সংস্কৃত ধ্যানও রচিত হইয়া গিয়াছে। রাধাগোবিন্দসংগীতসারে দেখা যায় এইসব নূতন রাগও শিবপ্রোক্ত। যথা সরপরদা বিলাওল (পৃ ১৮৫), বাহাদুর টোড়ী (পৃ ১৯৪), জোনপুরী টোড়ী (পৃ ১৯৬), কাফী টোড়ী (পৃ ২০১) হুসেনী কানাড়া (পৃ ২৪১) হিজেজ (পৃ ২৫৫) ইত্যাদি মুসলমানী হইলেও এইসব রাগকে আমরা শিবপ্রোক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং সংস্কৃতে তাহাদের ধ্যানও রচনা করিয়াছি।

মিঞাসারঙ্গ মিঞামল্লার তো তানসেনের সৃষ্ট। কলাবতদের মতে 'সাত সারঙ্গ, নও নট, বারো মল্লার, তেরো টোড়ী, আঠার কান্‌হড়া'— ক্রমে এই ভাবেই গড়িয়া উঠিল।

বাজাইবার পদ্ধতিতেও দেখা যায় ঢিমে তেতালায় সেতারের মসিতখানী গৎ। মসিত খাঁ তানসেনেরই বংশধর।

ফিরোদস্ত দাদরা বা পশ্‌তো প্রভৃতি তালও মুসলমানী।

ভারতীয় গোঁড়া সংগীত-আচার্যেরাও এইসব অভিনব বস্তু স্বীকার করিয়াছেন।

অমীর খুসরুর পূর্বপুরুষেরা বিদেশ হইতে আসিলেও ইহাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করেন। অমীর খুসরু হইলেন দিল্লীর সূফী ভক্ত নিজামউদ্দীন ঔলিয়ার শিষ্য। তিনি একাধারে ভক্ত কবি ও কলাবত। তিনি প্রাচীন বহু দীর্ঘ তালের স্থলে কওয়ালী দাদ্‌রা প্রভৃতি আট-মাত্রার ও ছয়-মাত্রার তাল প্রবর্তন করেন। খুসরু তুর্কী-আরবীর মত ভারতীয় সব ভাষা ও বিদ্যাও সাদরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একজনের সঙ্গে একটি কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "আমি তুর্ক হইলেও ভারতীয়। হিন্দী (ভারতীয়) ভাষাতেই তোমাকে আমি জবাব দিতে পারি। আরবভাষা ও আরব-দেশের বর্ণনাতেই আমি আমার রচনার সবটুকু মাধুর্য ঢালিয়া দিতে পারি না। বস্তুত আমি ভারতেরই কবি। হিন্দীতে প্রশ্ন করিলে আমি হিন্দীতেই উত্তর দিতে প্রস্তুত।"[১] ভারতের সতী নারী যেখানে স্বেচ্ছায় পতির সহমৃতা সেখানে প্রেমের মহত্ত্বে তিনি মুগ্ধ।[২] কবিরূপে সেই প্রেমের জয়গান তিনি করিয়াছেন।

প্রাচীন আচার্যদের মতে যে উনিশটি বস্তু খুসরু প্রবর্তন করেন তাহার মধ্যে সাজগিরী ইমন জিল্ফ সরফরদা ফিরোদস্ত কৌল তরাণা কউয়াল সাহানা সুহিল প্রভৃতির নাম পাই।[৩]

পারস্যদেশেও খুসরুর কবিতার বহু সম্মান ছিল। বহু কবি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন।

---

১ H. M. Mirza, pp. 227-228

২ ঐ p 186

৩ ঐ p 238

কলাবন্তরূপে তিনি ভারতীয় লোকসংগীতকে একটু অদলবদল করিয়া সুলতান হুসেন ও সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীস্টাব্দ) ধ্রুপদের গোড়াপত্তন করেন। এদেশে তিনিই সেতারের প্রবর্তক। দিগ্বিজয়ী গোপাল নায়কও খুসরুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। এইসব দেখিয়াই এখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতাচার্য ফৈয়াজ খাঁ ও পণ্ডিত ওংকারনাথ উভয়েই বলেন, ভারতীয় সংগীত হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার ফল।

সংগীতবিষয়ে খুসরু-রচিত কোনো পুস্তক মেলে না। অমীর খুসরুর পত্রাবলী (*Insha-i-Amir Khushru*) নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহা আসলে বহু পরবর্তী কালের লেখা। শাহজহানের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতের অমীনাবাদ হইতে মুনশী আবদুল বাকী তাহা রচনা করেন। অন্যসব প্রাচীন লেখকের লেখা হইতে খুসরু ও তাঁহার সাধনার কথা জানিতে হয়। এই সময় হইতে ভারতীয় সংগীত বিষয়ে মুসলমানদের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বহু পারসী গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে।

খুসরুর পরে ভারতীয় সংগীত বিষয়ে ১৩৫৫ খ্রীস্টাব্দে *Kanz-ul-Tuhal* (উপহারকোশ, উপহারের ভাণ্ডার) গ্রন্থ রচিত হয়।

১৫১৮ সালে পারসী ভাষায় 'রাগহা-এ-হিন্দ' সংগৃহীত হয়। ইহাতে বখস্থর সব ধ্রুপদ স্থান পাইয়াছে।

১৫৬০ সালে লেখা তানসেন-রচিত সংগীতসার ও রাগকলা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তানসেন পূর্বে হিন্দু হইলেও মুসলমান গুরু ঘৌসের শিষ্য হন এবং বিবাহসূত্রে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতিই তাঁহাতে মূর্তিমন্ত হইয়াছে।

১৫৮৩ সালে আকবরের রাজত্বকালে কবি আলিম 'মাধবনাল কন্দলা' গ্রন্থ লেখেন। তাহার এক অংশ রাগমালা। শিখদের গ্রন্থসাহেবে রাগপরিচয়ের জন্য রাগমালা গৃহীত হইয়াছে। আপনাদের ধর্মগ্রন্থে শিখেরা আরও মুসলমান ভক্তদের রচনাকে স্থান দিয়াছেন।

আইন-ই-আকবরী আকবরের প্রবর্তনায় আবুল ফজলের লেখা অপূর্ব গ্রন্থ। ইহার তৃতীয় খণ্ড সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে। তাহাতে বাইশ শ্রুতি ছয় রাগ ও তাহাদের রাগিণীর সুন্দর বিচার আছে। মার্গ ও দেশী এই রীতির গানেরই পরিচয় তাহাতে দেওয়া আছে। দক্ষিণ-ভারতীয় গুণীদের কথাও আইন-ই-আকবরী উল্লেখ করিয়াছেন।

দেশী রীতির কথা বলিতে গিয়া ধ্রুপদসংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে আইন-ই-আকবরী বলেন—শূরসেন অর্থাৎ গোয়ালিয়র প্রদেশে যে লোক-গীত প্রচলিত ছিল সংগীতের পরমরসজ্ঞ রাজা মানসিংহ তোমরের তাহা খুব ভালো লাগিল। তখন পণ্ডিতরা সেই গীত উপেক্ষাই করিতেন। কিন্তু রাজা মানসিংহ তাহাকে মহাগুণী নায়ক বকশূ, মচ্ছু ও ভনূর সহায়তায় এমন করিয়া সমাদৃত ও উন্নীত করিলেন যে কেহ আর তাহাকে তখন অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। রাজা তোমরের ও তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বকশূ কালিঞ্জরের রাজা কীর্তিসিংহের দরবারে আশ্রয় লন। সেখান হইতে তিনি গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের দরবারে যান (১৫২৬-১৫৩৬) ও ধ্রুপদ গান চালাইতে থাকেন।

১৫৩৫ সালে বাদশা হুমায়ুন মাণ্ডু নগর জয় করিয়া যখন বহু লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন তখন তাঁহাদের মধ্যে বকশূও ছিলেন। সকলে সমস্বরে বলিলেন, "জাঁহাপনা, ইঁহাকে বধ করিবেন না।

এত বড় গায়ক এখন এই সারা ভারতে নাই।” বকশূর গানে বাদশা মুগ্ধ হইয়া তাহাকে রাজপরিচ্ছদ খেলাত দিয়া বকশূকে দরবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। দরবারের প্রচুর প্রসাদ ও জাঁকজমকে কলাদরদী বকশূর তৃপ্তি হইল না। তিনি সকল বৈভব এমনকি আপন প্রাণও তুচ্ছ করিয়া [illegible] গুজরাটের কলারসিক সুলতানের কাছে পলাইয়া গেলেন। এইরূপ কলানুরাগ ও প্রীতি দেখিয়া সুলতান নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। কলাবতেরা অরসিকের কাছে সেবাকে প্রাণদণ্ডের চেয়ে গুরুতর দুর্গতি মনে করেন।

গোপালনায়ক দক্ষিণভারতের কলাবত। গোপালনায়ক খুসরু প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া শূরসেন প্রদেশের দেশী সব সংগীতকে কলাবত বকশূ মহনীয় করিয়া তুলিলেন। এই কাজে বৈজু বাওরা, ভুমু, পণ্ডরী, লোহঙ্গ, জরজু, ভগবান, ঢূংঢী, দলূ প্রভৃতি কলাবতেরাও সাধনা করিয়াছেন। এমন করিয়াই ধ্রুপদ সংগীত সৃষ্ট হইল। রাজা মান তোমরই এই ধ্রুপদের চারি তুকের রূপ দিলেন।

যেসব সুর লইয়া তাঁহারা প্রথমে এই কাজে হাত দিলেন তাহা হইল পূরবী, ধানশ্রী, রামকলী, কুরাই (বাদশাহ ইহার নাম দেন সুঘরই), সুহা, দেশকাল ও দেশাখ। এইসব লোকপ্রিয় সুর দিয়াই ধ্রুপদকে দেশী হইতে মার্গসংগীতের আসনে ইঁহারা উঠাইলেন।

আকবরের সময়ে পেশাদার নটনটীদের বহু শ্রেণী ছিল। ঢাটীরা পাঞ্জাবী বীরগাথা গান করিত। করালেরা দিল্লী ও জৌনপুরী রীতিতে গাহিত। সুরকিয়া পুরুষেরা গাহিত, সুন্দরী মেয়েরা সাথে সাথে নাচিত। আইন-ই-আকবরী বলেন, “আগে তাহারা ‘কিরকে’ গান করিত, এখন এইসব নটনটীরা ধ্রুপদ গায়। কারণ ধ্রুপদ লোকপ্রিয় দেশি গান। আকবরের দরবারে ভারতীয় ইরাণী তুরাণী গান হয়। কাশ্মীরী পুরুষ ও নারী গুণীও আছেন। সপ্তাহের সাত দিন সাতটি মণ্ডলী পালাক্রমে সংগীত করেন।”

আকবরের দরবারে সর্বাপেক্ষা বড় কলাবত ছিলেন তানসেন। তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়েরাই পরে ভারতে সংগীতকলাকে জীবন্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে না বলিলে চলে না। বহুজনের মধ্যে তানসেনের নাম করা চলে না। তানসেন রবাবে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মল্লারের মধ্যে গান্ধার মিশাইয়া তানসেন মিঞামল্লার সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া বাহার দরবারী-কানাড়া, দরবারী-টোড়ী প্রভৃতি তানসেনেরই সৃষ্টি।

আকবরের সময়ে প্রধান ছত্রিশ জন গায়ক ও বাদক গুণীদের মধ্যে একত্রিশ জন গুণীই মুসলমান, পাঁচ জন মাত্র হিন্দু। আকবরের সময়ে ভারতীয় সংগীতের অতিশয় মহনীয় যুগ। আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থে সেই যুগের সংগীতকলার ও কলাবতদের উত্তম পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে ছত্রিশ জন কলাবতের প্রত্যেকের নাম ও পরিচয় দেওয়া আছে।

তুজুক ও ইকবালনামা গ্রন্থেও দেখা যায় জাহাঙ্গীরের সময়ে ছত্রিশ জন গুণী না হইলেও বহু কলাবত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরদাদ পররীজ খুর্‌রম মখ্‌ হমজান প্রখ্যাত। শাহজাহানের সময়ে ছিলেন কবি-গায়ক জগন্নাথ। বাদশাহ ইহাঁকে ‘কবি রায়’ উপাধি দেন। তাহা ছাড়া দীরঙ্গ খাঁ, লাল খাঁ প্রভৃতি ছিলেন। বাদশাহ প্রীত হইয়া জগন্নাথ ও দীরঙ্গকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া সমতুল্য রৌপ্য কলাবতদের বিতরণ করেন।

বাদশাহ ঔরংগজেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সংগীতশাস্ত্রকে যদি তিনি নিষিদ্ধ করেন, এইরূপই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঔরংগজেবের দরবারে প্রিয় কবি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় আলম পণ্ডিত। তিনি ভারতীয় রসশাস্ত্রে প্রবীণ, হিন্দীতে লিখিতেন। বাদশাহের পৌত্র আজিমুশ্‌শান ঢাকার শাসনকর্তা হইয়া যান। তিনি বাদশাহের কাছে আপন প্রবাসজীবনের দুঃখ দূর করিতে সহচররূপে কবি আলমকে চাহেন। আলম তাঁহার প্রণয়িনীকে ছাড়িয়া এতদূর গেলেন না। তখন আজিমুশ্‌শান কবি কালিদাসকে চাহিলেন। কলাবত কালিদাস ত্রিবেদীকে ছাড়িতে বাদশাহ চাহিলেন না। অগত্যা বৃন্দ কবিকে লইয়াই আজিমুশ্‌শান ঢাকা গেলেন। তাই 'বৃন্দ-সতসই' ঢাকা শহরে সমাপ্ত হয়। 'সতসই'র সমাপ্তি-বাক্যে সেকথা আছে।

এইসব আলোচনা করিলে দেখা যায় ঔরংগজেব হিন্দী কবিতা ভালোবাসিতেন। কলাবতদের কৃপায় জানা যায় ঔরংগজেবের দরবারে বড় বড় গায়কও ছিলেন। প্রত্যেক বৎসর তাঁহার জন্মদিনে ও অভিষেকদিনে নূতন নূতন ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি গান রচিত হইত। তাঁহাদের রচিত সেইসব গান এখনো সুরক্ষিত আছে এবং তাঁহাদের গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিতও হইয়াছে। সেইসব গানের সুরতানও ওস্তাদেরা রক্ষা করিয়াছেন। রাগ টোড়ীতে রচিত এইরূপ একটি গান দেখি—

অকবর সুত জহাঁগীর তাকে শাহজহাঁ
তাকো সুত ঔরংগজেব ভয়ো হৈ ভুর পর। ইত্যাদি

টোড়ী প্রভৃতি কয়েকটি রাগ বোধ হয় ঔরংগজেবের প্রিয় ছিল। তাই ইহার পরের বৎসর উৎসবেও টোড়ী-ঝাঁপতালে রচিত হয় এই গান—

শাহ্ ঔরংগজেব প্রীতম। ইত্যাদি

গান্ধার রাগে তাঁহার জন্য রচিত তিনটি গান পাইয়াছি। আসাবরী রাগেও তিনটি গান পাই। ইহা ছাড়া আড়া-চৌতালে আসাবরী রাগে গান আছে—

প্যারে ঔরংগজেব সো তূহী কৌন দৃষ্ট জোহী ॥

ধানশ্রী চৌতালে গান আছে—

শাহ্ ঔরংগজেব রীঝ রহে ॥

মালশ্রী সুরফাক্তায় আছে—

শাহ ঔরংগজেব—
লীন্হী গলেহী লগায় কিন্হী নিহাল।

শ্রীরাগ চৌতালে পাই—

শাহ ঔরংগজেব বহুত ভলে হো।

তখনকার সব বিখ্যাত গায়কেরা উৎসবদিনে দরবারে ঔরংগজেবের কাছে এইসব গান গাহিয়া প্রচুর পারিতোষিক পাইয়াছেন। তাই বৎসরের পর বৎসর নব নব রাগে ও তালে নূতন নূতন গান রচিত ও গীত হইয়াছে। এই সাক্ষ্য তো উপেক্ষণীয় নহে। প্রাণ দিবার জন্য কে গান গাহিতে চায়?

ঔরংগজেব অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন। চরিত্রগত নীতির শৈথিল্য তিনি সহিতে পারিতেন

না। গায়ক ও কলাবতদের মধ্যে নীতিগত শৈথিল্যে হয়তো তিনি রুষ্ট হইয়া থাকিবেন; তাই তাঁহাদের গানকে তিনি নিষিদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

আইন-ই-আকবরীর পর ইব্রাহিম আদিল শাহ সংগীত বিষয়ে 'নবরস' রচনা করেন। জহুরী এই গ্রন্থের বিস্তর প্রশংসা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা এই গ্রন্থের জহুরী-রচিত ভূমিকাও পাওয়া যায়।

শাহজহাঁনের (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রী) উৎসাহে বহু সহস্র ধ্রুপদ সংগৃহীত হয়। আবার তাহার মধ্যে বাছাই-করা হাজার ধ্রুপদ 'সহসরস' নামে পারসীতে লেখা হয়। ইহাদের রাগ-রাগিণীর নাম ও লক্ষণাদি সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে মিফতার-উল-সরূর নামে সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ পারসী ভাষায় রচিত হয়।

ফকীরউল্লা-রচিত রাগদর্পণ বিখ্যাত গ্রন্থ। নাম সংস্কৃত হইলেও গ্রন্থখানি পারসীতে লেখা। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে ইহার রচনাকাল। পরলোকগত মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মতে ইহা ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে লেখা। বুহার গ্রন্থমালা রচয়িতার মতে ইহা ১৬৬৫ সালে রচিত। ফকীরউল্লার আসল নাম সৈফউদ্দীন মহমূদ। ইনি দারাশিকোহের অনুবর্তী ও অনুরাগী ছিলেন। তাই ঔরংগজেব ইঁহাকে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া গোয়ালিয়রে বন্দী রাখেন। সংগীতে ও রাগশাস্ত্রে ফকীরউল্লার গভীর অনুরাগ ছিল। তাই তিনি তখন বসিয়া বসিয়া গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত মালমশলা লইয়া রাগদর্পণ লেখেন। এই গ্রন্থে সংগীতের অধিকারীর লক্ষণ, স্বর-শ্রুতি-রাগ বিবেক, রাগোচিত কাল, ভারতীয় সংগীতের পূর্বাচার্যদের গ্রন্থ ও পরিচয় প্রভৃতি আছে। গানের দোষগুণবিচারও ইহাতে আছে। ইহা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশদভাবে লেখা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র। সেই যুগে সকলেরই ইহা মাননীয় হইয়াছিল। সেকালের প্রসিদ্ধ কবি নাসিরআলী বলেন, "জগতে আসিয়া যদি ফকীরউল্লার রচনা না পাইতাম তবে এই জগতে আসিবার কোন অর্থই ছিল না।"[৪]

তাহার পরই অতি বিখ্যাত গ্রন্থ তুহফতুল হিন্দ। ইহার রচয়িতা মির্জা খাঁ ইবন্ ফকরুদ্দীন মহম্মদ। ১৬৮৫ সালের পূর্বেই আজম শাহের উৎসাহে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে এই বিরাট বিশ্বকোষখানি তিনি রচনা করেন। আজম শাহ ছিলেন ঔরংগজেবের পুত্র। বিহারী সতসইর এক সংস্করণ তাহার সম্পাদিত। তাঁহারই উৎসাহে দেবকবি 'রসবিলাস' 'প্রেমচন্দ্রিকা' প্রভৃতি বৈষ্ণব রসগ্রন্থ লেখেন। তুহফতুল হিন্দ গ্রন্থে মির্জা খাঁ সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন, ইহাতে সোমেশ্বর হনুমান কল্লিনাথ ভরত প্রভৃতির মতের আলোচনা আছে। সংগীতের সৃষ্টি ও স্রষ্টা, স্বর, রাগ, তাল ভালো করিয়া আলোচিত হইয়াছে। এইসব কাজে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের ও সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছেন। ২২ শ্রুতি, ২১ মূর্ছনা, রাগজাতি, গায়কদের গুণ-দোষ, বৃন্দসংগীত (chorus), ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা বরবৈ (পূর্ব-ভারতীয়), কৌল, তিলানা প্রভৃতির আলোচনা তিনি করিয়াছেন। পূর্বাচার্য ও কলাবতদের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ে সংগীতশাস্ত্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভাতখণ্ডেও তাঁহার গ্রন্থে এই পুস্তকের কথা লিখিয়াছেন। ভারতীয় সংগীতের তথ্য জানিতে হইলে এই গ্রন্থে সবাই উপকৃত হইবেন।

৪ মাসির উল উমর

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে চাই, আমার পরলোকগত ছাত্র ও বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীন মির্জা খাঁ এই বিরাট গ্রন্থের ব্রজভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানখণ্ড সম্পাদন করিয়া পরলোকগমন করেন। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে বহু কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জিয়াউদ্দীনের ছিল। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাহা সফল হয় নাই। তুহফতুল হিন্দ ভারতীয় সংস্কৃতির, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের, ব্রজভাষায় সার্বভৌম গ্রন্থ। সংগীত তাহার অন্যতম বিষয়।

ইহা ছাড়া ভারতীয় সংগীত বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থ আছে। যথা, মিরজা রোশান জমিরের সংগীত পারিজাতের পারসী অনুবাদ (১৭২৪ খ্রী)। উসুল-ই-গিণা পারসীতে লেখা সংগীতশাস্ত্র হইলেও ইহা হিন্দু রায়চাঁদের রচিত। রিসালা-ই-মুসীকীও পারসীতে লেখা একখানি সংগীতশাস্ত্র। রিশালা-দয়-ইল্চ-এমুসীকীও তাই। *Ilham-ud-tarab* (আনন্দপ্রকাশ) গ্রন্থে রাগরাগিণীর লক্ষণ ও তাহাদের কালবিচার আলোচনা হইয়াছে।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের বিষয়ে আরও বহু পারসী গ্রন্থ আছে। এই প্রসঙ্গে কত আর নাম করা যায়; ১৮১৩ সালে পাটনায় মহম্মদ রেজা *Nagmat-ul-Asafi* গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে ছয় প্রকরণ ও বহু অধ্যায়। স্বরসাম্যানুসারে তিনি নূতন করিয়া ভারতীয় সংগীতের বর্গীকরণ করেন। বহু পণ্ডিত ও গুণীর সঙ্গে আলোচনার ফলে তাঁহার এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল।

পূর্বে কলাবতেরা গাহিতেন কনকাঙ্গী ঠাটে। মহম্মদ রেজার মত অনুসারে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তখন হইতে বেলাওল ঠাটেই গাহিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। কলাবতদের মধ্যে এখন তাহাই সারা ভারতে চলিতেছে। কাশীর বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রী সলামত আলী খাঁর উপদেশ অনুসারেই ১৮৩৪ সালে Captain Willard ভারতীয় সংগীত বিষয়ে যাহা কিছু তাঁহার লিখিবার ছিল তাহা লিখিয়াছেন।*

কাশীতে সলামত আলী যে সংগীতপরিমণ্ডল রচনা করেন পরে তাহাতে আসিয়া যোগ দেন তানসেনবংশীয় আলী মুহম্মদ খাঁ বা বড়কু মিঞা। বড়কু মিঞার ভাই নিস্‌শার আলী খাঁ আগে হইতেই কাশীতে ছিলেন। ধ্রুপদী অল্লাবকস্‌ও কাশীতে ছিলেন। তাঁহার যোগেই কাশীতে ধ্রুপদী অঘোর চক্রবর্তী, বীণকার মহেন্দ্রবাবু, কলাবত চিন্তামণি বাপুলী ও ভৈরব বাজপেয়ী প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

এইসব গুণী গুরুদের নামে ভূমিগত প্রণামেই তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি জানাইতেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনো প্রভেদ ছিল না।

সম্প্রদায় বিচার না করিয়া এইরূপ গুরুভক্তির কথা বুঝাইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। রাজপুতানার বীর কবিগণ সাধারণত অত্যন্ত গর্বিত। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা গুরু হইলে আচার্য মুসলমানের চরণেও অতুলনীয় ভক্তি জানাইয়াছেন।

বীররসাবতার মহাকবি সূর্যমল্ল ১৩৪ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার রচিত 'বংশভাস্কর' গ্রন্থে তাঁহার গুরু মুহম্মদের নামে লিখিয়াছেন, "সন্তোষসম্পন্ন-আল্লার পদদ্বয় পুজক মুহম্মদ নামে পরিচিত আমার মুসলমান অধ্যাপককে প্রণাম করি।"

---

* *Music of Hindusthan*

সন্তোষাদি গুণৈঃ পূর্ণং পূজিতাল্লাপদদ্বয়ম্।
ঈড়ে মহম্মদাভিখ্যং যাবন্যধ্যাপকং মম ॥ পৃ ১৫

তাঁহার সংগীতগুরু বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ রাগতালবিচক্ষণ মুসলমান গুরুকেও তিনি [illegible] ভোলেন নাই। 'বংশভাস্করে' তিনি লিখিয়াছেন—

বীণাবাদ্যসতত্ত্বং রাগতালবিবেচনম্।
শিক্ষিতং গায়কাদ্ যস্মাদ্ যবনঃ সোঽপি মোদতাম্ ॥ পৃ ১৬

তানসেনের পরিবারে অর্থাৎ বংশে ও শিষ্যপরম্পরায় তো হিন্দু-মুসলমান বলিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ করাই চলে না। এক এই তানসেন-পরিবারের আলোচনা করিলেই দেখা যায় ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা বরাবর কিভাবে চলিয়া আসিতেছে।[৬]

---

৬ মৎপ্রণীত 'তানসেন ঘরানা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য

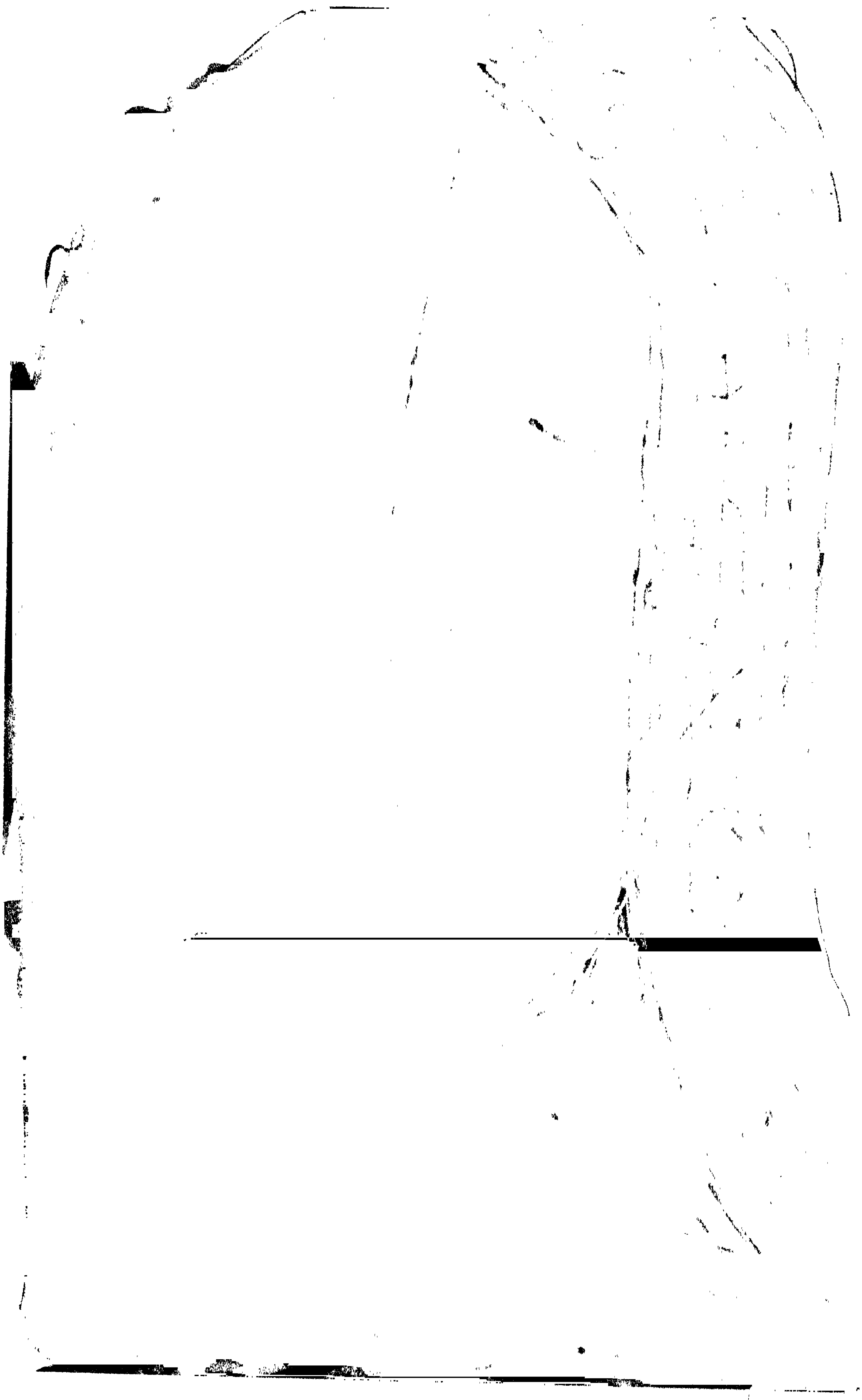

রবীন্দ্রনাথ [illegible]

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে নানা জনে করেছেন। এই সকল আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার উল্লেখ দৈবাৎ পাওয়া যায়। কেবল চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব-বিচারের জন্যই যে এইদিকের আলোচনা দরকার তা নয়, তাঁর শেষ কুড়ি বৎসরের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝবার জন্য তাঁর ছবির বিশেষ মূল্য আছে; আমাদের মনে হয় কবি-রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্ররচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, যে জগতের সত্তার বিষয় ইতিপূর্বে তিনি হয়তো এমন তীব্রভাবে অনুভব করেন নি।

ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন world of gesture, যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে world of meaning সামান্য। তাঁর শেষজীবনের রচনা 'রক্তকরবী' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা এই world of gestureকে অনুসরণ করে চলেছে।

একথা সকলেই জানেন যে, সাহিত্য প্রকাশ করে ভাবকে বহু বিচিত্রের সংঘাতে, বাক্য ও অর্থ এখানে তার সহায়। কিন্তু, ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে দরকার তার দেহরূপ, যা দেয় ভাবকে ভঙ্গি এবং সেই ভঙ্গিকেই অনুসরণ বা আশ্রয় ক'রে আমরা পুনরায় উত্তীর্ণ হই ভাবের জগতে। শিল্পের গতি ভিন্নমুখী, আগে ভঙ্গি তার পরে ভাব তার পরে অর্থ। শিল্পবস্তু আমাদের মনে দাগ ফেলে পলকে, কিন্তু তার ভাবগ্রহণে, তার অর্থ-উপলব্ধিতে বিলম্ব হয়। সাহিত্যে ভাব বোঝবার এবং অর্থ জানবার পরেও তার দাগ মনে স্থায়ী হয় না, যদি না তা ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়। দুইই এক, কিন্তু দুইএর গতি বিপরীতমুখী।

কাজেই world of gestureএর ধারণা কবিমাত্রেরই থাকবে। ছবি আঁকবার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের সে ধারণা ছিল, তা না হলে 'হে বিরাট নদী' তিনি লিখতে পারতেন না। তবুও, সে-জানা আর সেই world of gestureকে একান্ত নিবিড়ভাবে অনুভব করার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে এই উপলব্ধির নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু চিত্ররচনার মধ্যে দিয়ে তিনি যে এই উপলব্ধি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন একথা মনে করবার কারণ আছে, এবং সেইজন্যই চিত্রের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথের কাছে কবি-রবীন্দ্রনাথ যে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ কর্ম ধর্ম দর্শন সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যত-কিছু আলোচনা করেছেন তার কোনো বিষয়টিই তাঁর কবি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি যখন দর্শনের কথা বলেছেন, তখন সেকথা যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টায় নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন মাত্র; দার্শনিক-

রবীন্দ্রনাথের মূল্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ বদলে যাবে যদি আমরা কবি-রবীন্দ্রনাথকে একেবারে উহ্য করে তাঁর দার্শনিকতার বিচার করি। তাঁর ছবির সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা; ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তাঁর কবি-জীবনকে আর-একবার নূতন করে উপলব্ধি করলেন এবং এই উপলব্ধির ফলে তাঁর সাহিত্যরচনার ভঙ্গি বদলে গেল এবং পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'বলাকা'র কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ মিলেছে হরগৌরীর মত। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে পারা যায় প্রকৃতি হলেন রূপ বা দেহ, আর মানুষ সেই দেহের আবেগের প্রতীক। প্রকৃতির দেহসৌন্দর্য ও মানুষের আবেগ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। অর্থাৎ, প্রকৃতি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন কবির বাঁশিতে। অন্যদিকে কবি তাঁর দেহের সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। কবির এই আনন্দখেলায় মাঝে মাঝে স্তব্ধতা এসেছে, কবি বিস্মিত হয়েছেন প্রকৃতির আনন্দদানের অসীম ক্ষমতা দেখে, তখন তিনি তাঁকে বন্দনা করেছেন আনন্দের প্রতীকরূপে— নিজেকে তিনি ক্ষুদ্র করে দেখেছেন, অথচ প্রকৃতির বুকে মানুষের যে একটি আসন নির্দিষ্ট করা আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁর মনে জাগে নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এটি অবশ্য একটি দিক মাত্র।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা দেয়, এবং ১৯৩০ থেকে তাঁর তিরোধানকাল পর্যন্ত এই পরিবর্তিত পথেই তাঁর কাব্যের গতি প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনাকালও ১৯২০ থেকে ১৯৩০।[১] তাঁর কাব্যের নূতন যুগ এবং তাঁর চিত্ররচনার কাল এক। কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই এখন জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির আদিরূপ তাঁর রচনার খাতার কাটাকুটির মধ্যে থেকে জেগেছে। লেখার অপ্রয়োজনীয় বাতিল-করা অংশগুলিকে সংযুক্ত করে, প্রয়োজনীয় অংশকে আলাদা করে দেবার চেষ্টা ছাড়া, প্রথম দিকের খাতার পাতায় যে নকশা দেখা যায় তার অন্য কোনো সার্থকতা ছিল না। এগুলির জন্ম প্রয়োজনের মধ্যে, এগুলির গতি যান্ত্রিক গতির ন্যায় নিয়ন্ত্রিত। এর পরে রবীন্দ্রনাথের লেখার খাতায় একটু ভিন্ন রকমের নকশা দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এগুলির জন্ম প্রয়োজনের মধ্যেই, তবু প্রয়োজনের পরেও এগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট গতি দেবার চেষ্টা দেখা যায়। লেখার অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে কেন্দ্র করে নানা দিকে নানা গতিতে রেখার জাল তৈরি হয়েছে— এখানে একমাত্র চেষ্টা লেখার অপ্রয়োজনীয় কাটা অংশগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে ফেলার।

এই চেষ্টার ফলে কতকগুলি আকার (form) ধরা পড়েছে তাঁর রেখার জালে। সে আকারে কোনো সাদৃশ্যগুণ নেই, শুধু আকারের ভঙ্গি আছে এবং সেই ভঙ্গি আকারের নিজস্ব নয়, বরং রেখাছন্দের আশ্রিত। এই জাতীয় নকশার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর কোন্ পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পাওয়া যাবে তা বলতে না পারলেও 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপির নকশা যে এই দিক দিয়ে একটা চরম পরিপক্বতায় পৌঁছেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

---

১ রবীন্দ্রনাথ প্রথমজীবনে যে ছবি এঁকেছিলেন, 'ছিন্নপত্রে' যার উল্লেখ দেখা যায়, সে ছবির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আলোচনার বিষয় ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর ছবির ক্রমবিকাশ।

সাহিত্য বা শিল্পের আলোচনায় আমরা ছন্দ কথাটির উল্লেখ পাই। ছন্দ রসসৃষ্টির প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এই ছন্দকে কোনো আশ্রয় ছাড়া অনুভব করা কঠিন। ছন্দের abstractরূপ কল্পনা করা শক্ত, যেমন বর্ণের abstractরূপ কল্পনা করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দ কবিতায় গানে বারবার অনুভব করেছেন অকস্মাৎ সেই ছন্দের মূল রূপকে তিনি যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলেন। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। অর্থ নেই অথচ তার প্রাণশক্তির অভাব নেই ; ভাব নেই অথচ ভঙ্গিতে এই রেখার রচনা প্রাণবন্ত।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছুক তাঁদের এই রেখাছন্দের ছবিগুলি বিশেষভাবে দেখা দরকার, কারণ তাঁর ছবির গড়নের মুল উপাদান তিনি পেয়েছেন এই নকশাগুলি থেকে। রেখাবিন্যাসের মধ্যে যে কতকগুলি আকার অপরিহার্য কারণে প্রকাশিত হয়েছিল, একসময়ে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে নিলেন। ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এই রূপগুলি প্রকাশ পেল আরো একটু স্থিতিশীল (static) হয়ে। রবীন্দ্রনাথের ছবির এই প্রথম পর্ব। এগুলি কোনো বাঁধা কারণে হয় নি, এগুলির উৎপত্তি নিছক গড়নের আকাঙ্ক্ষা থেকে। জার্মান সমালোচকেরা এইগুলিকেই রবীন্দ্রনাথের সত্যকারের সৃষ্টিকার্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

পূর্বে বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের রচিত রেখার জালে যে গড়ন(form)গুলি ধরা দিয়েছিল সেগুলির সাদৃশ্যগুণ ছিল না। যখন তিনি এই গড়নগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখবার চেষ্টা করলেন তখন থেকেই ধীরে ধীরে তার মধ্যে দেখা দিল সাদৃশ্যগুণ। এই সময়ে তার বিচিত্র গঠন নানা ভঙ্গিতে আমাদের আকৃষ্ট করে, ভঙ্গির মধ্যে আমরা আভাস পাই সাদৃশ্যের, কিন্তু গঠনে কোনো সাদৃশ্য দৈবাৎ থাকে এবং যখন থাকে তখন তা বিশেষ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করতে হয়। এই রকমের একটি ছবি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের মলাটে মুদ্রিত হয়েছে। হাতের ভঙ্গিটি ঢেকে দিলে ধরা শক্ত এটা মানুষ কি ফুল কি অন্য কিছু অথবা কিছুই নয়। আরো-একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে যে, এই ভঙ্গির সাদৃশ্য বাদ দিলে যে গড়নটি বেরিয়ে আসে তা ইমারতের মত স্থিতিশীল। রবীন্দ্রনাথের ছবির স্থিতিশীলতা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল ইমারতের ভারি জ্যামিতিক গড়ন নিয়ে। সাদৃশ্য এখানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তা অদ্ভুতভাবে প্রকাশিত। এখানেও ভঙ্গিতেই সাদৃশ্য প্রকাশিত কিন্তু বস্তুর গড়নও নিজের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে ; অদ্ভুত জন্তু রচিত হয়েছে যার পরিচয় কোনো প্রাণীতত্ত্বের বিবরণে নেই কিন্তু জন্তুর জন্তুত্ব সেখানে বর্তমান-- অতিপ্রাকৃত রূপকে সে সত্য করে সামনে উপস্থিত করে। ১৯৩০ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষরকমের রচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার ছবিগুলি দেখতে দেখতে কেউ যদি 'রক্তকরবী'র কথা স্মরণ করেন তাহলে তিনি এই দুইএর মধ্যে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করবেন।

কেউ কেউ মনে করেন 'রাজা' নাটকের রাজা এবং 'রক্তকরবীর' রাজা একই রকম। মিল হয়তো কিছু আছে, কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। কেউ যদি কালির আঁচড়ে আঁকা একটা ছবি দেখে পাথর কেটে মূর্তি গড়েন তাহলে মিল হয়তো দুইএর মধ্যে কোথাও থাকবে কিন্তু তফাৎ হবে আসমান-জমিন। এই রকম তফাৎ 'রক্তকরবী'তে ও 'রাজা'তে।

'রক্তকরবী'র রাজাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু

নেই ; যেমন অন্ধকারে পাথরের মূর্তির সামনে এলে মূর্তি দেখি না, কিন্তু জানি সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ। 'রক্তকরবী'র রাজা প্রকাশ পেয়েছে ভাব ভাষা বা তার অর্থের দ্বারা নয়— বলবার ভঙ্গি বসবার ভঙ্গি হাতের মুঠোয় মৃত জন্তু নিয়ে রক্তকরবীর রাজা রূপের জগতে জীবন্ত। 'রাজা' নাটকের রাজা ভাষার নীহারিকার মধ্যে ভাবের আভাসে শুধু তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়— আকারে-ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করে না।

'রক্তকরবী'র ভাবকে আকার দেবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই সময়ে যে একটা দিক-বদল করেছে তা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠছে 'যোগাযোগে' এবং পরিণতি লাভ করেছে 'শেষের কবিতা'য়। তারপর 'ছেলেবেলা'য় দেখা দিল ঐ ভাষার চিত্রময় রূপ। 'ছেলেবেলা'র ভাষার গাঁথুনি অসাধারণ কিন্তু তাতে ছন্দোবেগ ও ছন্দোবৈচিত্র্য কমেছে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। 'রক্তকরবী'র কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে প্রধানত গদ্যের আশ্রয়ে। কিন্তু তাঁর এই গদ্যরচনা 'গল্পগুচ্ছ' বা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের গদ্য নয়, তাঁর সূক্ষ্ম ও সুকুমার বিষয় আলোচনার গদ্য নয়। এখনকার এই গদ্য পাথরে-গাঁথা ইমারতের মত— ভাব এখানে আপাতদৃষ্টিতে দেখতেই পাওয়া যাবে না— বাক্যের গাঁথুনি দিয়ে চারদিক থেকে ভাবকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরবার চেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই যুগে আর-একখানি বইএর উল্লেখ করছি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি 'গোরা' বা 'ঘরেবাইরে'র মত নয়। ছবির সঙ্গে ভাস্কর্যের যে তফাৎ 'যোগাযোগে'র সঙ্গে 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা'র সেই তফাৎ। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের সকল চিন্তা, সকল সমস্যা, সকল উপলব্ধি ছন্দের আশ্রয়ে তার গতিবেগ পেয়েছে। যেখানেই কোনো বস্তু স্থূলভাবে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে সেইখানেই তিনি নানা অলংকারে, নানা বাক্যের ঝংকারে সেই বস্তুর স্থূলত্ব আমাদের ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেমন, 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর বর্ণনা অসাধারণ অতুলনীয় কিন্তু তা কেবলই আমাদের স্বপ্ন দেখায়, বস্তুর কোনোটাই ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না ; বিরাট অট্টালিকা, অরালী পর্বতের ঝড়, স্থিতস্তার অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত রূপ— কিছুই ধরতে পারি না। একেই বোধ হয় পণ্ডিতরা বলেন রোম্যান্টিসিজম।

যাই হোক, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন করলেন কেন সে বিষয়ে কৌতূহল হওয়া সম্ভব। চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কবি-রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলেই আমাদের মনে হয়।

বিচিত্রবর্ণব্যঞ্জিত রঙ্গমঞ্চ এবং বহুকক্ষবিশিষ্ট অট্টালিকায় যে প্রভেদ, কবিতার ভাষা ও গদ্যের ভাষায় সেই প্রভেদ। বস্তুর সত্তাকে ইমারতের মত করে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন ; কিংবা উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাঁকে গদ্যের বাঁধন এবং গদ্যের যে সম্ভাবনা তার অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। 'রক্তকরবী'র পর 'যোগাযোগে' আমরা পাই যেমন ইমারতি বাহার তেমনি গঠনের কাঠিন্য। 'শেষের কবিতা' কিন্তু ইমারত নয়, এ হল তাজমহলের জালিকাজ ; স্থাপত্যের অলংকার, কিন্তু স্থাপত্য নয়। আবার, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র বর্ণময় ভাষার সঙ্গেও এর তুলনা চলে না।

'রক্তকরবী'র কাল (১৯২৪*) থেকে 'শেষের কবিতা' (১৯২৮*) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভাবে চিন্তায় যা পরিবর্তন দেখা যায় তার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর কবিমন রূপকারের মত গঠনপ্রিয়

* সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ

হয়ে উঠেছে। এই গঠনপ্রিয়তার প্রথম ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন তাঁর ছবিতে এবং সেই ছবির প্রথম আবেগ শেষ হয়েছে 'যোগাযোগ' রচনাকালের (১৯২৭*) মধ্যে। 'শেষের কবিতা' রচনার সময় তাঁর চিত্রের দিক্-পরিবর্তন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের মনের গতি যে অর্থের চেয়ে ভঙ্গির দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে স্থিতির দিকে ঝুঁকেছিল তার পরিচয় আরো পাওয়া যায় তাঁর পুরাতন নাটকের সংশোধিত সংস্করণ পড়লে।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হয় ; ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তন প্রায় শেষে সীমায় এসে পৌঁছয়। এর পরে চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গির চেয়ে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছেন বেশি। বর্ণে রেখায় তাঁর ছবি ভূষিত হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, যে-সময়ে তাঁর চিত্র অলংকারে ভূষিত হতে চলেছে, সে-সময়ে তাঁর কাব্য নিরলংকার হয়ে আসছে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে গদ্যছন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "অতিনিরূপিত ছন্দোবন্ধবিহীন কবিতা ও অতিনিরূপিত রূপরেখাহীন চিত্রশিল্প রচনায় তিনি যে একই সময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটা নেহাৎ আকস্মিক নয়।"—আকস্মিক তো নয়ই, যা তিনি করতে চেয়েছিলেন তার ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন তাঁরই রচিত ছবির জগৎ থেকে। এই ছবির জগৎ থেকে তিনি world of gesture আবিষ্কার করলেন এবং দেখলেন অর্থযুক্ত না হলেও গঠন-রূপ মাত্রেই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারছে। অর্থের আশ্রয় নিয়ে যেমন ভাব ব্যক্ত করা যায়, তেমনি গঠন-রূপ তার ভঙ্গি দিয়ে ভাবের জগতে নিয়ে যেতে পারে— ছবির ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটি পেলেন এবং ভাষায় সেই উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর শেষজীবনের বহু রচনা এই প্রমাণই দেয়।

'রক্তকরবী'র পরে 'পুনশ্চ' কাব্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এমন ভাব এমন ভঙ্গি পাই যা ঠিক পারম্পর্য বজায় রেখে চলছে বলে প্রমাণ করা শক্ত। 'শিশুতীর্থে'

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেননা অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলোকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই। —পুনশ্চ

প্রকৃতি এই প্রথম নিরুত্তর রইলেন কবির প্রশ্নে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কাছ থেকে তাঁর সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা পেয়েছেন। এবার যখন উত্তর পেলেন তখন তিনি বুঝলেন যে, বসুন্ধরাকে একদিন তিনি 'ওগো মা মৃন্ময়ী' বলে সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল মৃন্ময়ী মাতাই নন, তার অন্যরূপও আছে। তাই সেই মহাবীর্যবতী বীরভোগ্যা পৃথিবীকে প্রণাম নিবেদন করেছেন কোনো আশা কোনো প্রত্যাশা না রেখে। বললেন—

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

---

* সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ

অস্তগামী সূর্য শ্যামলশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
"আমি আনন্দিত"। —পত্রপুট (১৯৩৬), ৩

'শিশুতীর্থে'র পর 'পত্রপুটে'র "আজ আমার প্রণতি" দেখলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বজীবনের ইতিহাসের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন; তারপর শুরু হয়েছে তাঁর নূতন জীবনের অনুসন্ধান। কবি-রবীন্দ্রনাথের এই অনুসন্ধানের পথে সহায় হয়েছিলেন চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ— এই আমার বক্তব্য।

পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রচিত্রের পরিণতি ঘটেছে ১৯৩০এর মধ্যে। তারপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর ছবি নানা সাদৃশ্যযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ অর্থযুক্ত করে রূপকে হৃদয়গ্রাহী করবার চেষ্টা চলেছে— বর্ণের বৈচিত্র্য ও জৌলুস বেড়েছে, অর্থাৎ তাঁর সেই প্রথমদিকের আকস্মিকভাবে-পাওয়া রূপগুলিকে নানাভাবে তিনি সাজিয়ে চলেছেন।

এর সঙ্গে তুলনীয় তাঁর কাব্য ও কাব্যের ভাষা। কবিতা হয়ে এসেছে নিরাভরণ তাপসের মত, একদিকে যেমন তার উদাসীনতা অন্যদিকে কিছুই তার কাছে তুচ্ছ নয়। অতিসাধারণের সঙ্গে অতি-নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছাই এই সময়ের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখন রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিমুহূর্তের প্রতিটি চিন্তা প্রয়োজনীয় নয়, প্রতিটি মুহূর্ত স্পর্শ করাই তাঁর প্রয়োজন—

আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এলো চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর। —আরোগ্য (১৯৪১), ৪

এখন থেকে তিনি রূপজগতকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চেয়েছেন এবং যতই তিনি তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে চেষ্টা করেছেন ততই প্রশ্ন জেগেছে। এই জিজ্ঞাসা 'জন্মদিনে' (১৯৪১) গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে।

যে প্রাণের তরঙ্গ তাঁর কাব্যে ছন্দের দোলা দিয়েছিল সেই প্রাণের তরঙ্গই আজ বাধা—

প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা— শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে॥ জন্মদিনে, ২

এ যেমন একটা দিক, তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের তেমনি অন্য একটা দিক আছে— সাক্ষাৎ পরিচয়ের আনন্দ। কি, কেন, কোথায় কোনো প্রশ্ন সেখানে নেই—

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়ি চুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়িমালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরীতে। —পত্রপুট, ৫

সোনার রোদের বহু বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রয়েছে— অপূর্ব তার সৌন্দর্য, কিন্তু এই বর্ণনা ভিন্নস্তরের। সকালের এই রোদ কোথা থেকে এল, কে পাঠালে এ রকম কোনো তত্ত্ব নেই, তবু ঝুড়িতে কলসীতে ফুলের মঞ্জরীতে রোদ যে পড়েছে এ সত্য মনে ছবি হয়ে জেগে থাকে, এ ভোলা চলে না। বিলাতি নন্দন-শাস্ত্রবিদরা একেই বোধ হয় objectivism বলবেন। কিন্তু ঐ সংজ্ঞায় সবটা ধরা যাবে না, কারণ 'মধুময়' এ পৃথিবীর যা কিছু তিনি তাঁর নূতন প্রেরণায় দেখছিলেন প্রত্যেকটিকে আপন সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে পাচ্ছেন, বস্তু ও ঘটনা এখানে তাঁকে ইঙ্গিতে চালিত করেছে অর্থশূন্য ভাষাহীন এক জগতে। এক সময় তাঁর কাব্যে দেখি ছন্দ থেকে ভাব, ভাব থেকে অর্থ— কিন্তু যে কালের কথা বলছি সেকালের কাব্য রূপ থেকে রূপের ভঙ্গিতে জেগেছে— যে ভঙ্গি অবচ্ছিন্ন এক অনুভূতিতে পৌঁছে দেয়।

যে সময় তাঁর কাব্য এমনি অর্থকে এড়িয়ে চলেছে বারে বারে, সে সময়ে তাঁর ছবি নানা অর্থে ভরে উঠছে। পূর্বে বলেছি যে, 'পুনশ্চ' থেকে এই পরিবর্তনের শুরু। এই সময়ের ছবি কিন্তু ক্রমশ ভাব-ব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। নানা প্রকৃতির নানা মুখভাব নিয়ে নরনারী তাঁর চিত্রে দেখা দিয়েছে। এরই পাশে পাশে দেখি নানা বর্ণের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নানা রঙের ফুল আর পাখি। যখন এইসব চিত্র আঁকছেন তিনি তখন তিনি ১৯৩০ পেরিয়ে এসেছেন, গদ্যকবিতার প্রথম পর্ব শেষ হতে চলেছে। এই আলোচনার শুরুতে 'রক্তকরবী' ইত্যাদি তৎকালীন কাব্যের সঙ্গে সমকালীন ছবির তুলনা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি দুএর অন্তর্নিহিত মিল। শেষদিকের এই ভাবব্যঞ্জক ছবিগুলির সঙ্গে সমকালীন কাব্যের তুলনা করলে দেখি উভয়ের পার্থক্য কতটা।

একদিন যেমন কবি-রবীন্দ্রনাথ চিত্রের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত world of gestureএর মধ্যে নিয়ে এলেন কাব্যকে, তাকে এমন রূপ দিলেন যা প্রায় হাতের ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, রূপের সঙ্গে রূপের পরিচয় নিতে নিতে কবি যখন চলেছেন, তখন চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছেন চিত্রের অখণ্ড ভাষাহীন গড়নকে ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে পরিচয়ের জগতে নিয়ে আসতে। এই চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের স্মৃতিকে বাঁধতে চেয়েছেন; মায়ার খেলা কড়ি কোমল ও মানসীর নরনারীরা ফিরে এসেছে বাক্যের অলংকার ছেড়ে বর্ণের অলংকারে। তাঁর পদ্মা, জলের ধারে পাতাঘেরা কুটির, দ্বারের 'পরে নুয়ে-

পড়া নিমের শাখা, এইসব ছবি, যা ছিল কাব্যের পটভূমি, সেইগুলিই দেখা দিয়েছে সেদিনের সেই স্মৃতি নিয়ে।

১৯৩০ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তন একটা সীমায় এসে পৌঁছেছে আর তাঁর কাব্য চলেছে নূতন বিবর্তনের পথে। সে বিবর্তন তাঁর সাহিত্যকে কোথায় নিয়ে গেছে সে আলোচনা করেছি। সাহিত্য যখন চলেছে বস্তুর ইঙ্গিত অনুসরণ করে, ছবি তখন চলেছে স্মৃতির জগতে, অতীতের দিকে। তাই মনে হয়, যে ছবি তাঁকে প্রথমে একটি নূতন সত্য দিয়েছিল, যা তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন— কাব্যে সেই সত্য যতই প্রকাশিত হয়েছে, ছবির ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমেছে, এবং শেষ পর্যন্ত ছবি হয়ে উঠেছে তাঁর অবসরবিনোদনের বস্তু; যা তিনি পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন ভাবে ভাষায় একদিন তাঁর সাহিত্যে, সেইসব ভাব ও ভাবনাকে রঙের অলংকার তিনি দিয়েছেন কিন্তু কোনো নতুন আবেগ কোনো তীব্র উদ্দীপনাকে জাগাতে তিনি চান নি। প্রথমজীবনের কাব্যে যেমন বাক্যালংকার সকল অভাব পূরণ করেছে এবং সকল দুর্বলতা ঢেকেছে শেষজীবনের ছবিতে বর্ণের স্থান সেই রকম।

কবি-রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধটা আমার মনে কি ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তারই পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম। এ আলোচনা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। তার কারণ বিচিত্রমুখী তাঁর প্রতিভা— তাঁরই রচিত চিত্রের জটিল রেখাজালের মত জীবনের নানা দিকে তা প্রসারিত। আরও বড় বাধা তাঁর প্রতিভার ক্রমবিবর্তনের ধীর গতি। যদিও তাঁর প্রতিভার গতি ধীর, তাঁর পদক্ষেপ কিন্তু দৃঢ় ও সুনিশ্চিত। কাজেই কোনো-একটা মীমাংসায় নিশ্চয় করে পৌঁছানো কঠিন। সুতরাং সে দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইনি। যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁরা আমার এই আলোচনাকে আমার মনের জিজ্ঞাসা বলে গ্রহণ করবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসপ্তাহে (৮ অগস্ট ১৯৪৮) পঠিত

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত

'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথে'র মলাটে ব্যবহৃত। দ্রষ্টব্য বর্তমান সংখ্যা পৃ ৫৫

ফকীরমোহন সেনাপতি

১৮৪৩—১৯১৮

ভারতীয় সাহিত্য

ফকীরমোহন সেনাপতি : ওড়িয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি

উপন্যাসের সৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশেষ লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রাচীনেরা সম্ভবত সাহিত্যের "সাম্রাজ্য" রাখিয়া যান নাই, "সাহিত্যসম্রাট" কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে যেমন খাটে, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের বিষয়ে তেমন মানায় না। কাব্য নাটক উপন্যাস— এই তিন যদি সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হয়, সাহিত্যপ্রবন্ধ সমালোচনাপ্রবন্ধ ছোটগল্প প্রভৃতি যদি ইহাদের উপাঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, তবে প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে কাব্যের যে সম্মান ছিল, বর্তমান যুগে তাহার খানিকটা, কেহ কেহ বলিবেন অনেকটা, উপন্যাসের প্রাপ্য। প্রদেশভেদে উপন্যাসের আকার ও প্রকারের ভেদ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশকেও পথ দেখাইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে ও দ্রাবিড় প্রদেশগুলিতে লোকে তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছে। তিনি আর এখন শুধু বাংলার নহেন, সমগ্র ভারতের উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা, আদি-ঔপন্যাসিক, একথা অত্যুক্তি নহে। উড়িষ্যায় ফকীরমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এবং আমাদেরও তিনি সমসাময়িক— তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলির রচনাকালে; আর তাঁহার শেষ-প্রকাশিত রচনার তারিখ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, যখন বাংলায় সবুজপত্রের আবির্ভাবে সাহিত্যে নবচেতনার সঞ্চার হইতেছে।

বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্য মুখ্যত তিনজনের সৃষ্টি বলিয়া মনে করা হয়— রাধানাথ, মধুসূদন, ফকীরমোহন। ইহার মধ্যে রাধানাথ বিশেষ করিয়া কাব্য-রচনায়, মধুসূদন বিশেষ করিয়া ছোট ছোট কবিতা ও গদ্যপ্রবন্ধ-রচনায়, ফকীরমোহন অনুবাদ সাহিত্য ও উপন্যাস-রচনায় পারদর্শী হন। রাধানাথের পূর্বপুরুষ বঙ্গীয় ছিলেন, মধুসূদনের মহারাষ্ট্রীয়; উভয়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সরকারি শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনজনের মধ্যে শুধু পরিচয় নয়, আকৈশোর আন্তরিক সৌহার্দ্যও ছিল। সাহিত্যিকদের বন্ধুজীবনের সন্ধানে যাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহারা ইঁহাদের ভাবসাধনায় অনেক ঐক্যবন্ধনের পরিচয় পাইবেন। এই তিনজনকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্য। আজ তাহার লেখক ও পাঠকের অভাব নাই, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ চর্চার আয়োজন হইয়াছে, সুদূর অতীত সম্বন্ধে তাহার গবেষণা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার আরম্ভ যে এই ত্রয়ী হইতে, তাহা এ-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

ফকীরমোহন অবশ্য প্রথমে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহার প্রথম-প্রকাশিত রচনার তারিখ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ; সে রচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -মহাশয় প্রণীত জীবনচরিতের অনুবাদ। তাহার পর তিনি ঘটনাবহুল জীবনযাত্রার অবকাশে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, চারি পর্ব মহাভারত ও সমগ্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পদ্যানুবাদ রচনা করেন। এইভাবে তাঁহার ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। একুশ বৎসরের সাহিত্য-সাধনা প্রায় অনুবাদ-সাহিত্য লইয়াই কাটিয়াছিল। পরবর্তী কালে খিল হরিবংশ ও উপনিষদেরও তিনি পদ্যানুবাদ করেন; তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে। ইহা ভিন্ন

তাঁহার খণ্ড কবিতার সংগ্রহ 'অবসর-বাসরে' অথবা 'উপহার' সেকালে রসিকজনের চিত্ত-বিনোদনে সার্থক হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধের জীবনকথা লইয়া তিনি ললিতবিস্তর ও কয়েকটি বাংলা পুস্তকের সহায়তায় বৌধাবতার কাব্য রচনা করেন। ওজন করিলে বা পৃষ্ঠা গণিলে কাব্যানুবাদের পরিমাণ বেশি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এসব তাঁহার মুখ্যকর্ম বলিয়া মনে করি না, আমরা মনে করি তাঁহার প্রধান কর্ম, ওড়িয়াভাষায় উপন্যাস রচনা। তাঁহার 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, 'মামু' ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, 'লছমা' ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, 'প্রায়শ্চিত্ত' ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই চারিটির বিষয়ে সামান্য কিছু বলিয়া ফকীরমোহনের পরিচয় দিব। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমের মাত্র পাঁচ বৎসরের ছোট, কিন্তু যখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন পঞ্চান্নের উপর বয়স হইয়া গিয়াছে, কেশব বঙ্কিম কেহই তখন ইহজগতে নাই। চারিটি উপন্যাসের তিনটি ফকীরমোহন লেখেন সত্তর বৎসর বয়সের পরে— ইহাও লক্ষ্য করিবার মত।

'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'—'মাণ' ও 'গুণ্ঠ' জমির পরিমাণ। ইহা গ্রাম্য জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজের ব্যঙ্গচিত্র, সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের করুণ চিত্রও বটে। গরিব বাঘিয়া ও তাহার স্ত্রী সারিয়ার সম্বল ছিল শুধু এইটুকু জমি; রামচন্দ্র কেমন করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদের হাত হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সর্বস্ব হারাইয়া বাঘিয়া কেমন করিয়া পাগল হইয়া গেল, সারিয়া প্রাণ হারাইল, ইহা তাহারই মর্মন্তুদ কাহিনী। কিন্তু পাপের জয় হয় নাই— রামচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীরা শাস্তির হাত এড়াইতে পারেন নাই, পাপের ফল ইহজীবনে দেহে মনে সর্বত্র ভুগিতে হয়, লেখক ইহা শিক্ষা দিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। এই উপন্যাসে গ্রাম্য পরিবেশ অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পাপের ও প্রলোভনের বশে মানুষের মন কেমন করিয়া সাড়া দেয় তাহা লেখক দেখাইয়াছেন, ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্‌সের মত পুলিশ ও আদালতের বিচারবিভ্রাট সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ডিকেন্‌সের মতই করুণরসের বিস্তারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। জমিদারের স্ত্রী সান্তানীর মৃত্যুদৃশ্য পড়িলে স্বীকার করিতে হয় যে লেখকের কলমের জোর আছে। গ্রাম্যদৃশ্যবর্ণনায় কৃতিত্ব ছাড়া এই প্রথম উপন্যাসে ফকীরমোহন যে ভাষা অবলম্বন করিলেন তাহা জোরালো, তাহা অতিমাত্রায় সংস্কৃতঘেঁষা তো নহেই, তাহাতে বরং আধুনিকতার আমেজ আছে; যেসব কথা গ্রামের লোকেরা ব্যবহার করে এবং হয়তো শিক্ষিতদের চেয়ে স্পষ্টভাবে দেখে ও অনুভব করে বলিয়াই প্রয়োগ করে, ফকীরমোহন সেইসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

এই উপন্যাসের বারো বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'মামু' প্রকাশিত হয়। এই দ্বাদশ বর্ষ কিভাবে কাটিল, জানি না। ইহাও গার্হস্থ্য উপন্যাস, সমাজের চিত্র। নরহরি ভাগিনেয়, তাহার মাতুল 'মামু'— নটবর দাস— হইলেন উপন্যাসের শয়তান, 'villain'। কিন্তু উপন্যাস জুড়িয়া আছে নরহরির মা চাঁদমণি। বঙ্কিমী কায়দায় (স্কটের উপন্যাসেও যেমন আছে) ফকীরমোহন মাঝে মাঝে পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিবার পূর্বে সংস্কৃত শ্লোকের এক-আধ টুকরা বসাইয়া দিয়াছেন। যেমন, চাঁদমণির মঙ্গলকৃত্যের প্রথমে দিয়াছেন শকুন্তলার শ্লোক— 'যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া…' এখানেও সেই পেসকার, নাজির, পরিচারিকা চিত্রা, প্রভৃতির চরিত্র চিত্রণে ফকীরমোহনের বর্ণনাশক্তির পরিচয় মেলে, রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট। বর্ণনাহিসাবে তাঁহার 'মামু' হইতে কটক জেলে নটবর দাসের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভের কথা উদ্ধৃত করি—

কটক জেলখানা মধ্যরে গোটাএ হাজত ঘর— কোঠা ঘরটা নিহাত বড় বা সান নুহে— মধ্যভলি। কান্থ উপরে কড়িকাঠর হাতে অন্দাজ তলকু চারিপটরে আঠগোটা গোলাকার কণা— সাধুভাষারে যাহাকু গবাক্ষ বোলাযাএ। এহি কণা বাটে তা মাফিকে আলুঅ ও পবন ঘর মধ্যকু আসিথাএ। গোটাএ বড় দ্বার— জাঁউলি কবাট লগা। কবাট কাঠ পটাভিড়া নুহে, মোটা মোটা লুহা বুলটিন লুহা বতা মধ্যরে গলাযাই প্রস্তুত। মোটা লুহা শিকুলিরে দুই কবাট ছন্দা যাই— গোটাএ বড় পিতল তালা পড়িছি। গোটিএ মাত্র দীপরে মিঞ্জি মিঞ্জি হোই আলুঅ জলুথিবারু ভিতরর হাল বাহার লোক পক্ষারে দেখিবার অসুবিধা হুএনাহিঁ। বাহার জগৎ সঙ্গে ঘরর মধ্যভাগ সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য— একাবেলকে নিস্তব্ধ। (৬৪ পরিচ্ছেদ) [গোটাএ = একটা ; সান = ছোট ; পট = দিক, হাতে = এক হাত, মিঞ্জি মিঞ্জি = মিটি মিটি।]

তৃতীয় উপন্যাস লছমা, গার্হস্থ্য উপন্যাস নহে, ঐতিহাসিক। রামশঙ্কর রায় ইহার পূর্বে ওড়িয়ায় 'বিবাসিনী' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, সুতরাং লছমা ওড়িয়ায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে— সেদিক দিয়া রামশঙ্কর রায়ের উপন্যাস ওড়িয়ায় প্রথম উপন্যাস। 'বিবাসিনী' ৪১ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ মারাঠা আমলের কাহিনী। ফকীরমোহনের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশি। লছমা পশ্চিমাঞ্চলের মেয়ে, স্বামী ও পিতামাতার সঙ্গে পুরীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল, পথে মারাঠা দস্যুদের হাতে পড়ে, যুদ্ধে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। লছমা নিজে একদিকে পালায়, স্বামী একদিকে যায়, লছমার বাপমা দস্যুদের আক্রমণে মারা পড়েন। অসহায় লছমা নিকটে রাইবণিয়া গড়ে আশ্রয় লয়, দুর্গাধিপতির স্ত্রী তাহাকে নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশে তখন ঘোরতর অশান্তি, ধন জন মান মর্যাদা কিছুই নিরাপদ নহে, বর্গীরা গড়ও আক্রমণ করে। দুর্গাধিপতি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেন। বেচারি লছম পানওয়ালির সাজে বর্গীদের শিবিরে ঘোরাফেরা করে—উদ্দেশ্য, প্রতিশোধ। এদিকে লছমার স্বামী ঘটনাক্রমে নবাব আলিবর্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া মারাঠা দস্যুদের উপর চড়াও হন। পিতামাতার মৃত্যুর জন্য উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল, ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল, কিন্তু ছদ্মবেশের জন্য উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন না। তা যা হউক, প্রতিশোধের শেষে উভয়েই ভিন্নপথে গয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, পিতামাতার তর্পণের উদ্দেশ্যে। সেখানে যখন মন্ত্রোচ্চারণের সময় পূর্বপুরুষদের নাম করিতে হইল তখন কণ্ঠস্বরে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন— ইহাই হইল "অপূর্ব মিলন"। উৎকল সাহিত্য -নামক ওড়িয়ার বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় যখন ইহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন ইহার এই নামই ছিল।

তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত ১৯১৫ সালে প্রকাশিত, ৫৫ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়বস্তু দুই পরিবারে কলহ ; প্রণয়দেবতার চেষ্টা সত্ত্বেও মিলন হইল না, কলহই থাকিয়া গেল, উভয় পরিবারেরই সর্বনাশ। সামন্ত বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক বিদ্যাধর মহাপাত্রের একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ; শিক্ষার জন্য গোবিন্দচন্দ্রকে কটকে রাখিতে হইল। তাহার পরিচর্যা করিবার জন্য পরিবারের পুরাতন ভৃত্য তো থাকিলই, কিন্তু দেখাশুনা করিবার ভার পড়িল সদানন্দের উপর। সদানন্দ সাস্তানীর বাল্যবন্ধুর

অনাথ সন্তান। গোবিন্দচন্দ্রের মাতা সান্তানীর আশ্রয়ে মাতৃস্নেহে পালিত। বিরোধী পরিবারের কর্তা সামন্ত সংকর্ষণ মহান্তি, তিনি বিপত্নীক। তাঁহার একমাত্র কন্যা ইন্দুমতী, কাব্যরচনায় পটু বলিয়া নাম আছে। নাম শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় লওয়ার ইচ্ছা হইল, বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় সরলমতি গোবিন্দচন্দ্রের এই পরিচয়ের পরিণতি ঘটিল প্রেমে। সদানন্দের চক্রান্তে, পিতা বৈষ্ণবচরণের অজ্ঞাতে, ইন্দুমতীর সহিত কুমার গোবিন্দচন্দ্রের শুভপরিণয় হইল। গোবিন্দচন্দ্র মিথ্যা এক পত্র পাইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন এবং মধ্যরাত্রে যখন গোপনে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া একেবারে অন্দরমহলে পৌঁছিলেন, তখন শ্বশুরালয়ের ভৃত্যাদি হঠাৎ অপরিচিত লোক দেখিয়া এবং অন্তঃপুরিকাদের চীৎকার শুনিয়া চোর সন্দেহে তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিল। পুরাতন ভৃত্যের সতর্কতায় ও সযত্ন শুশ্রূষায় গোবিন্দচন্দ্র প্রাণে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু পরিবার দুইটি হইল সর্বস্বান্ত।

ফকীরমোহনের লেখার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অপ্রসন্ন দৃষ্টি আছে। তিনি নব্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত নহেন। অশিক্ষিত প্রভুভক্ত গ্রাম্যবালক তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র। সইতা নাপিতের ছেলে, গোবিন্দচন্দ্রের হুকুম তামিল করাই হইল তাহার কাজ, কিন্তু শহরে সদানন্দের চক্রান্তে গোবিন্দচন্দ্রের ব্যাপার দেখিয়া তাহার আক্কেল গুড়ুম। ফকীরমোহনের ভাষায় শুনুন :

> এথর কটকর হালচাল দেখি সইতা ত কাব্বা হোই গলাণি। কথা কণ? বজারযাক দেণা—টঙ্কা তহবিলরে ন থিবারু দিনে দিনে নগদাৎ সউদা কিণা হোই পারু ন থিলা, হঠাৎ এতেগুড়াএ টঙ্কা কাহুঁ অইলা? সেদিন দেখিলি, বড় সান্ত বিড়াএ নোট বান্ধুথিলে, মোতে দেখি চঞ্চল্ ঢাঙ্কি পকাইলে। বড় সান্তঙ্কর ঠিক লেখাপড়া হিসাবকিতাব বোলি গোটাএ কেহি দিন নথাএ, এণে টঙ্কা কউড়িকু খাতর নাহিঁ। হিসাব নাহিঁ, কিতাব নাহিঁ, পচরা ওচরা নাহিঁ, দোকানিগুড়াক যে যেতে টঙ্কা কহুছি বঢ়াই দেউছন্তি, কটকিআ বেপারি ভল পটাএ রামানন্দি চঢ়াউথিবে।
>
> —পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[ওড়িয়াতে দুইটি ‘ল’ আছে, একটি ল সাধারণ, অন্যটি মূর্ধন্য, অর্থাৎ ‘ড়’ এর কাছাকাছি আসে। চঞ্চল্, বাংলা ‘চঞ্চলের’ মত উচ্চারণ করিলে চলিবে না। রমোনন্দি চড়ানো, অর্থাৎ পূজা দেওয়া। পচরাওচরা—জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ।]

বলিয়াছি, বাক্য অনুচ্ছেদ পরিচ্ছেদ সর্বত্র ফকীরমোহনের পরিমাণ সংক্ষিপ্ত। সম্ভবত অনুবাদের শিক্ষায় তাঁহার রচনা এই গুণ অর্জন করিয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তে ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এক অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদও ইহাতে আছে। নাটকীয় স্বগতোক্তির মত একটি ভঙ্গি যেন আপনা হইতে আসিয়া যায়। যেমন, সদানন্দের আত্মচিন্তায়—

> বাঃ! কিমিতিকা গোটাএ ফিকির বাহার কলি! মুঁ বিভাঘরকু সাঙ্গরে ন গলি বোলি গোবিন্দ মনরে দুঃখ করিথান্তা। রাজীবলোচনকু কহিলি—শুণুছি, উআসরু লোকমানে আসুছন্তি, আম্ভমানঙ্কু এঠারে ন দেখিলে সমসরপুর উআসকু ধাঁই যাই গোলমাল্ লগাইবে। সেমানঙ্ক কথারে পড়ি গোবিন্দর মন বদলি যাই পারে। তেতেবেলে ভারি গোটাএ অসুন্দর কথা হোই পড়িব।

মুঁ যেবে কটকরে রহিথাএঁ, গোবিন্দ পুরী যাইছি বোলি কহি সেমানঙ্কু অটকাই রখিবি কিম্বা সাঙ্গরে ধরি পুরী বাহারি যিবি। এথি মধ্যরে মামলা ফতে হোইযিব।— পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মূল পরিচ্ছেদ ইহার আড়াই গুণ— ইহাতে dramatic monologue-এর ভাব একটা আসিয়া যায়, তাহার রূপও খানিকটা ইহার মধ্যে আছে।

এইভাবে কথাবার্তার সহজ ভঙ্গিতে ফকীরমোহন গল্প করিয়াছেন। তাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সহজেই মনকে টানে।

ফকীরমোহনের ভাষার নমুনা উপরে দিয়াছি। তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে তাহার মধ্যে নূতনত্ব আছে, যদিও 'শিষ্টজনের' ভাষায় যে একটা 'পালিশ' থাকে, তাঁহার ভাষায় সে বস্তু পাওয়া যাইবে না। লোকে সংস্কৃত হইতে সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে তো তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানই ছিল— অনুবাদ ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম; তবু তাঁহার ভাষার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টভাব নাই, কোথাও শব্দের ছটাও নাই। 'সত্যবাদী' পত্রিকার জনৈক লেখক তাঁহার রচনাশৈলী সম্বন্ধে অতি সমীচীন মন্তব্য করেন—

লোকসাধারণঙ্ক ভাষারে কবি উপন্যাস লেখিছন্তি। অথচ রুচির অভাব নাহিঁ, গরিমা অছি অথচ গ্রাম্যতা নাহিঁ।

ভাষার এই শক্তি তাঁহার কোথা হইতে আসিল? দেশের মাটির সঙ্গে তাঁহার সত্যকার যোগ ছিল বলিয়া।

যৌবনের আরম্ভে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণের কথা বিশেষ করিয়া ভাবেন। এক সময় এমনও হইয়াছিল যে খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের ব্যবস্থা ঠিকঠাক, ফকীরমোহন ভাবিতেছেন, বাস্তবিকই তো প্রতি-গ্রামে গ্রামদেবতা, মন্দিরে-মন্দিরে কত দেবতা, কেমন করিয়া এতসব পূজা করা যাইবে? পূজা করিয়াই বা লাভ কি হইবে? ইহারা তো ত্রাণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার বন্ধু রাধানাথ রায় ও তিনি উভয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু রাধানাথ পিছাইয়া পড়িলেন; সমস্ত ব্যবস্থার ওলট্‌পালট্‌ হইয়া গেল। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সে নিমকমহলের জনৈক বাঙালি কেরানি প্রসন্নকুমার চাটুজ্যের উৎসাহে ফকীরমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। উপনিষদের অনুবাদ বা হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা তাহার পরিপন্থী হয় নাই, বরং তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া এই ধর্মভীরুতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার একাত্মতাও আছে।

ফকীরমোহনের উপন্যাস বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আরও-একটা কথা বলিতে চাই, তাহা না হইলে সবটা বলা হইবে না। আমাদের দেশে জীবনী লেখা বা আত্মকথা বলা সাহিত্যে বড়-একটা ছিল না, বাংলাদেশে তো চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালেই প্রথম, প্রামাণিক জীবনকথা রচিত হইতে লাগিল। ইংরেজিসাহিত্যের সম্পর্কে আসিয়া বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় জীবনী ও আত্মকথা রচনার ধুম পড়িয়া গেল। ফকীরবাবু আত্মজীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। যতদূর জানি, ওড়িয়া-ভাষায় ইহার তুলনা নাই— বাংলাভাষায় ইহার অনুবাদ করিলে বাংলার সম্পদ বাড়িবে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতের পাশে ইহাকে নিশ্চয় রাখা যাইবে— এরূপ মনে করি। এই আত্মকথার বাইশটি পরিচ্ছেদে লেখক তাঁহার বাল্যকাল হইতে স্থবির অবস্থা পর্যন্ত সবই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে

কেওনঝড়, ডোমপড়া, নীলগিরি, ঢেঙ্কানাল, দশপল্লা, পাল-লহড়া প্রভৃতি সামন্তরাজ্যে তাঁহার চাকুরি-জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণও আছে যথেষ্ট, আবার শিশুকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বঙ্কিমী যুগের অনেকখানি মিল আছে দেখিয়া বাঙালি পাঠক খুশি হইবেন খুব। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় কেমন ছিল, বালেশ্বরের অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহার চেয়ে আর সহজ সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে কে বলিতে পারে? সেই বৎসরে ফকীরমোহনের হাতে খড়ি হয়।

> চাটশালীরে পড়ারম্ভ সময়কু মোহর প্রায় ৯বর্ষ বয়স হোইথিলা। সহর মধ্যস্থ প্রত্যেক বড় গ্রামরে, গ্রাম সান থিলে, দুই তিনিটা গ্রামরে গোটিএ চাটশালী থিলা। স্বচ্ছল লোকমানঙ্ক ঘরে স্বতন্ত্ররূপে জনে জনে অবধান থিলে। গ্রামর বাউরী, কণ্ডরা অস্পর্শ্য জাতির পিলামানে মধ্য উচ্চ জাতীয় পিলামানঙ্কঠারু কিছি দূররে বসি চাহালীরে পাঠ পঢ়ু থিলে।
>
> সে সময়রে কটক জিল্লা, বিশেষতঃ কটকজিল্লাস্থ ঝংকড় প্রগণারু অবধানমানে বালেশ্বর জিল্লাকু আসুথিলে। চৈত্রমাসটা অবধান আমদানীর সময়। বেশভূষারু অবধান-কর্মপ্রার্থী বোলি চিহ্না পড়ন্তি।— তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশের ছবি কি চমৎকারভাবে লেখার মধ্যে ধরা দিয়াছে! লেখকের দেশের প্রতি প্রীতি আছে এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ আছে। আমরা আজকাল 'গণসংযোগ' নাম দিয়া যে বস্তুর সন্ধানে বেড়াই, ফকীরমোহনের জীবনের গতি তাঁহার পক্ষে তাহা সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছিল, দেশের জীবনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

এই যোগ ছিল বলিয়াই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। এ শিক্ষা যে মানুষকে পরিবারের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন করে, তাহাকে আত্মসর্বস্ব করিয়া তোলে, শান্তির পরিবর্তে অশান্তির, কর্তব্যের স্থানে নিষিদ্ধবস্তুর প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি করে— তিনি তাই 'প্রায়শ্চিত্তে' কুমার গোবিন্দচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নব্যশিক্ষার্থিসমাজের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অন্ধভাবে গ্রহণের অপচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। মূঢ় ম্লান মূক মুখের ভাষা তিনিই জোগাইয়া দিয়াছেন, 'প্রায়শ্চিত্তে' সইতা ও 'মামু'তে স্বল্পভাষিণী সহশীলা চাঁদমণির মুখে কথা ফুটাইয়াছেন, তাহা গ্রন্থকার জানেন, আমরাও শুনি, কিন্তু যাহাদের মুখে কথা জোগাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের মন তো সবই বুঝিতে পারিবে ও সমাদর করিবে।

দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়াই আজ দেশকালের ব্যবধান ছাড়াইয়া ফকীরমোহনকে আমাদের অত্যন্ত আপনার লোক বলিয়া মনে হয়। ত্রিশ বৎসরেরও বেশি হইতে চলিল, তাঁহার বাণী নীরব হইয়াছে; আর এই ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের ভাগ্য দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তথাপি ফকীরমোহনের ভাষাও পুরাতন হয় নাই, চিত্ররেখাও অস্পষ্ট হয় নাই। দুর্গতদের, সর্বহারাদের, পাশ্চাত্যমোহে সর্বস্বান্ত প্রতারিত নব্যশিক্ষিতদের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা কালমাহাত্ম্যে মলিন তো হয়ই নাই, হয়তো পূর্বাপেক্ষা তাহার বর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গ্রন্থপরিচয়

বাল্মীকি রামায়ণ—সারানুবাদ। শ্রীরাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

রামচরিতমানস—তুলসীদাসকৃত রামায়ণ। শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ছয় টাকা।

সদূষণাপি নির্দোষা সখরাপি সুকোমলা।
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন রম্যা রামায়ণী কথা॥

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামায়ণের স্থান কোথায় এবং ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে তার বিশিষ্ট প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে হলে এদেশের অন্যতর মহাগ্রন্থ মহাভারতের সঙ্গে তার তুলনা করতে হয়। কিন্তু তৎপূর্বে এই দুই মহাগ্রন্থের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দুই মহাগ্রন্থে ভারতবর্ষের একই রূপ প্রকাশ পায় নি, একটি আর-একটির পুনরুক্তিমাত্র নয়। ভারতবর্ষ এই দুই গ্রন্থকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, কোন্ গ্রন্থে ভারতবর্ষ তার কোন্ আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা বিচার করে দেখবার বিষয়।

বস্তুত ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতকে কখনও একইভাবে গ্রহণ করে নি। মহাভারত আমাদের জাতীয় চিত্তে কোন্ আসনে অধিষ্ঠিত আছে তা অতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে, একটি সামান্য প্রবাদবাক্যে: "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" বাক্যটির ভাবার্থ এই যে, ভারতবর্ষ সমগ্রভাবেই মহাভারত গ্রন্থে ধরা দিয়েছে; একমাত্র মহাভারতকে জানলেই সমগ্র ভারতবর্ষকে জানা হয়। এই প্রবাদবাক্যটি যে নিরর্থক নয় তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে—

"দেশে যে-বিদ্যা, যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, একসময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে।···এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্‌যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বলরূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।"

—বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, 'শিক্ষা'

বস্তুত মহাভারত হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার বা বিশ্বকোষ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতবর্ষের "সজীব বিশ্ববিদ্যালয়"; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী যে পায় না ভারতবর্ষ তার কাছে অজানা থেকে যায়। মহাভারতের মধ্যে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে সংকলন ও বিন্যাস করবার যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভারতবর্ষ তাকেই নাম দিয়েছে 'ব্যাস'। এই সংকলন ও বিন্যাস-প্রতিভা বা 'ব্যাস'কেই চতুর্বেদ, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংকলনকর্তা বা রচয়িতা বলে ভারতবর্ষ কল্পনা করেছে। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহাকোষ সংকলনে একই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতের স্থান হচ্ছে বেদ ও পুরাণ সংগ্রহের মধ্যস্থলে। তাই মহাভারতকে যেমন পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাকে আদিপুরাণ বলেও বর্ণনা করা যায়। মহাভারত আসলে একটি সাংস্কৃতিক মহাকোষ বলেই তার স্বরূপ-বর্ণনারও কোনো স্থিরতা নেই। মহাভারতেই দেখা যায়, এই গ্রন্থ বেদ ইতিবৃত্ত আখ্যান ইতিহাস সংহিতা পুরাণ কাব্য ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এই নামগুলির কোনোটাই নিরর্থক নয়; কেননা এই সমস্তেরই লক্ষণ মহাভারতে যুগপৎ বিদ্যমান আছে। এটাই এ-জাতীয় সংকলনগ্রন্থের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা। মহাভারত মূলত এরূপ সংকলনগ্রন্থ ছিল কি না এবং এর আসল রূপ কি ছিল তার বিশদ বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে শুধু এইটুকু বলা উচিত যে, পণ্ডিতদের মতে মহাভারত মূলত ছিল একটি ইতিহাস এবং তখন তার কলেবরও ছিল খুবই স্বল্পপরিসর। মহাভারতেই আছে, "জয়নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা"। তার শ্লোক-সংখ্যাও ছিল অল্প কয়েক হাজার মাত্র। ক্রমে তাতে উপাখ্যান তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি যুক্ত হতে হতে তার আয়তন বাড়তে থাকে। বর্তমানে মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। বস্তুত মহাভারত যেমন কোনো এক-ব্যক্তির রচনা নয়, তেমনি কোনো এক-কালেরও নয়। এই মহাগ্রন্থের আখ্যান-উপদেশাদি ভারতবর্ষের বিপুল জনতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান ছিল। ভারতের সংকলন-প্রতিভা এগুলিকে কালে কালে সংগ্রহ করে একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে। এইভাবেই ভারত-সংহিতার উৎপত্তি। মহাভারত ব্যাস কর্তৃক কথিত ও গণদেবতা কর্তৃক (বুঝে বা না-বুঝে) লিখিত হয়, এই কাহিনীর মধ্যেই মহাভারতের উৎপত্তির যথার্থ ইতিহাস নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, এই বিপুলায়তন ধারণ করতে মহাভারতের কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। তাই এই সাহিত্য-সংগ্রহে কোনো এক-যুগের নয়, বহু-যুগের ছাপ পাওয়া যায়। এর কাহিনীতে উপদেশে সমাজবর্ণনায় ও আদর্শগত বৈচিত্র্যে কালগত বিভিন্নতার প্রমাণ আজও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের প্রথম সূচনা হয় সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময়ে। এই সহস্রাধিক বৎসরের ভারতবর্ষের মর্ম-ইতিহাস সমগ্রভাবে বিধৃত হয়ে আছে মহাভারতে। এই ইতিহাসের আলোতে না দেখলে বর্তমান ভারতকেও যথার্থরূপে দেখা হবে না। কেননা আধুনিক ভারত এখনও মহাভারতের যুগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য—

"ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা

স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।"

—ধম্মপদং, 'ভারতবর্ষ'

রামায়ণকে কিন্তু বেদ পুরাণ সংহিতা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করবার রীতি নেই। এটি ব্যাসকথিত এবং গণেশলিখিতও নয়। ভারতবর্ষ রামায়ণকে যে বিপুল ব্যাসমণ্ডলের বহির্ভাগে স্থাপন করেছে এটা নিরর্থক নয়। রামায়ণ যে ব্যাসসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বস্তুত রামায়ণ একজন ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলেই স্বীকৃত। সে রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও দ্বিমত নেই। কেননা বাল্মীকি হলেন ভারতবর্ষের আদিকবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। রামায়ণের পূর্বে এদেশে কবিত্ব ছিল না একথা মানা যায় না। ঋগ্‌বেদের বহু অংশে (যেমন উষাবন্দনায়) চরম কবিত্বের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিকে কখনও কবিতা বলে বর্ণনা করা হয় না, বৈদিক ঋষিরাও ঠিক কবিপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য নন। উপনিষদ্‌গুলিতেও স্থলে স্থলে কবিত্ব উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাও সচেতন কাব্যরচনা বলে স্বীকৃত নয়। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবত রামায়ণের পূর্ববর্তী এবং তাতেও অতি উঁচুদরের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসদেবকে কখনও কবির আসন দেওয়া হয় নি এবং মহাভারতকেও ঠিক কাব্য বলে বর্ণনা করা যায় না। রামায়ণই যে আদিকাব্য তার অন্য প্রমাণ এই যে, এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গবিভাগই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ; কবির কল্পনাপ্রতিভার যে সৃষ্টি তারই নাম সর্গ। রামায়ণের পূর্ববর্তী সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। যেমন ঋগ্‌বেদের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে সূক্তে; মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মহাভারত এবং রামায়ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্য। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ চিরকালই ব্যাস-বাল্মীকি এবং রামায়ণ-মহাভারতকে এক-পর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য করেছে। বিদেশী মনীষীরাও এ-দুটিকে বিনাদ্বিধায় ভারতবর্ষের যুগল মহাকাব্য বা এপিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিশ্চয় কোনো নিগূঢ় ঐক্য বাহ্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পেলেই এদের বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। পূর্বেই বলেছি মহাভারত ছিল মূলত ইতিহাস, তার পরে ক্রমশ তাতে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদির লক্ষণ আরোপিত হয়। রামায়ণ কখনও যথার্থত ইতিহাস বলে স্বীকার্য নয়। অথচ "রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে একান্ত সত্য তাও অস্বীকার করা যায় না। কোন্ অর্থে রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বলা যায় তা বিচার করবার পূর্বে দেখা দরকার সাধারণ অর্থে এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি।

কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনাহিসাবে ঐতিহাসিক সত্য কি না তার কোনো প্রমাণ নেই, সম্ভবত সত্য নয়। তবে শান্তনু ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কৃষ্ণ পরীক্ষিৎ জনমেজয় প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এঁদের পারম্পরিক সম্পর্ক ও পৌর্বাপর্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কোথায়? ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ-বিবর্তনের চিত্র, আদর্শের বিভিন্নতা ও সংঘাত, নদীপর্বতজনপদ প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হলে মহাভারতের আশ্রয় নিতে হবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে কবির সমকালীন সমাজের চিত্র যেরূপ পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে সেভাবে হয় নি। ভারতবর্ষে যুগে যুগে যেসব আখ্যান-উপাখ্যান-উপদেশাদি প্রচলিত হয়েছিল মহাভারতে সেগুলিকে সচেতনভাবেই সংকলন করে রাখা হয়েছে। তাই এটি তৎকালীন ভারতবর্ষের চিন্তা ও চরিত্রের মহৎ ইতিহাসগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে।

রামায়ণ হচ্ছে প্রত্যক্ষত কবিকল্পনার সৃষ্টি, তৎকালপ্রচলিত কাহিনী ও জনশ্রুতিকে সংকলন করার কোনো অভিপ্রায় এই গ্রন্থ রচনার মূলে নেই। বরং কবি সচেতনভাবেই প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। যে কাহিনীকে অবলম্বন করে রামায়ণকাব্য রচিত সে কাহিনীটি অবশ্য কবিকল্পনা নয়। সে কাহিনীটি যে জনসমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এই যে, মহাভারতের সংকলিত উপাখ্যানসমূহের মধ্যে রামোপাখ্যান অন্যতম। বৌদ্ধ পালিসাহিত্যেও রাম-কাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। যে রামকাহিনী ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে যবদ্বীপ বলিদ্বীপেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাও কতকগুলি গুরুতর বিষয়েই রামায়ণ থেকে পৃথক। এই কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য ছিল কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিদেহরাজ জনক অবশ্য ঐতিহাসিক, কিন্তু জনক-দুহিতা সীতা ঐতিহাসিক নন। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাত্রদেরও অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এসব কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন রামায়ণ-কাহিনীর মূলে সম্ভবত বাস্তবঘটনামূলক কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমনকি অনেকেই মনে করেন যে, রামায়ণ-কাহিনী হচ্ছে মূলত রূপকাত্মক। রবীন্দ্রনাথও এই রূপকাত্মকতায় বিশ্বাস করতেন। নানা উপলক্ষ্যেই তিনি এ বিষয়ের আনুকূল্যে মত প্রকাশ করেছেন। এস্থলে তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের রূপকার্থের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এই কাব্যটির কেন্দ্রস্থলেই আছেন সীতা। সীতা মানে যে হলরেখা একথা সর্বজনবিদিত। জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি এবং তাঁর পাতালপ্রবেশ-কাহিনীর দ্বারাও সীতার স্বরূপার্থ সমর্থিত হয়। রামের নবদুর্বাদলশ্যাম বর্ণের দ্বারা বোঝা যায় রাম বস্তুত কৃষিজাতশস্যশ্যামল রমণীয়তারই নামান্তর। পুরাণোক্ত অপর দুই রামের স্বরূপও তাই বলেই মনে হয়। হলধর রামকে সীতাপতি রাম থেকে অভিন্ন মনে করা অযৌক্তিক নয়। তৃতীয় রাম হচ্ছেন রেণুকাপুত্র এবং তিনি মাতৃহন্তা, এই কাহিনীর মধ্যে মরুভূমির উষরতাকে বিনষ্ট করে শ্যামলতা সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলেই বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত সীতাপতি রামকেও পাষাণী অহল্যা (অর্থাৎ হলচালনার অযোগ্য কঠিন) ভূমির উদ্ধারকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার (১৮৯০) নিম্নোদ্ধৃত অংশটি স্মরণীয়—

জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরুদিগ্‌বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি, করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব।

—অহল্যার প্রতি, 'মানসী'

রাম মানে রমণীয়তা; আর লক্ষ্মণ মানে কল্যাণময় সম্পদ, এককথায় লক্ষ্মীবত্তা। এই লক্ষ্মণকে সীতা ও রামের সহচররূপে বর্ণনা করা হয়েছে এটা খুবই স্বাভাবিক। যেখানে সীতা সেখানেই তার এক দিকে সৌন্দর্য ও অপর দিকে সম্পদ। এই গেল রামায়ণের রূপকার্থের এক দিক। তার আর-এক দিকে আছে স্বর্ণলঙ্কার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়ে আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ-একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এই স্বর্ণ ঐশ্বর্যের ধন, কৃষিসম্পদ নয়। লঙ্কাধিপতির বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাই তাঁর দশ মাথা ও বিশ হাতের বর্ণনায়। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বজ্রবিদ্যুৎধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদ-দ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত।" এই বিপুল ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারীর নাম রাবণ। আর রাবণ মানে হচ্ছে রবকারয়িতা, আর্তনাদকারয়িতা। রামায়ণেই আছে—

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্॥

—উত্তরকাণ্ড ১৬।৩৭-৩৮

অর্থাৎ— হে রাজন্, (তোমার জন্য) এই লোকত্রয় ভীত ও রবযুক্ত হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে। দেবতা মানুষ যক্ষ এবং জগতের অন্য সকলে লোকরাবণ (জনসমূহের আর্তনাদ-কারয়িতা) তোমাকে রাবণ বলেই অভিহিত করবে।

মহাভারতেও অনুরূপ কথাই আছে—

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ॥

—বনপর্ব ২৭৪।৪০

অর্থাৎ— মহাবল দশানন দেবতাদেরও ভয় উৎপাদন করেছিলেন। তিনি সমস্ত লোককেই (ভয়ে) রব (আর্তনাদ) করিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় রাবণ।

এই রাবণ নামের সার্থকতাও আরও স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি যে, তাঁর পুত্র ছিলেন মেঘনাদ এবং তাঁর সহোদর বিভীষণ।

এই বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস হচ্ছে স্বর্ণ বা ধন। এই ধনের লোভেই আকৃষ্ট করে স্বর্ণাধিকারী যে কৃষিজীবীকে বিপন্ন করে তুলেছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে মায়াবী স্বর্ণমৃগের লোভে লুব্ধ সীতাহরণের কাহিনীর মধ্যে। যে স্বর্ণমৃগটি সীতাকে লুব্ধ ও রাম-লক্ষ্মণকে (অর্থাৎ কৃষিজাত শোভা ও সম্পদকে) বিপন্ন করেছিল তার যথার্থ নাম হচ্ছে মারীচ অর্থাৎ মরীচিকা। স্বর্ণমরীচিকায় মুগ্ধ মানুষ কিভাবে স্বর্ণাধিকারী রাক্ষসের কবলে পড়ে শোভাসম্পদহীন হয়, তার পরিচয় শুধু ত্রেতাযুগের কাহিনীতে নয় বর্তমান যুগেও আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।

রামায়ণের এই রূপকার্থ যতই যুক্তিসংগত হোক না কেন, কাব্য-হিসাবে এটা কখনোই রামায়ণের মুখ্য লক্ষ্য নয়। রামায়ণকে রূপককাব্য-হিসাবে গ্রহণ করলে তার আসল কথাটাই অজ্ঞাত থেকে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তাও যাবে অদৃশ্য হয়ে। রামায়ণের আসল সার্থকতা হচ্ছে তার মানবিকতায়, তথা তার কাব্যরসে। মানুষের স্নেহ-প্রেম স্বার্থ-সংঘাত বিরহ-মিলন সুখ-দুঃখ প্রভৃতিই কাব্যখানির আসল উপজীব্য। এই মানবিকতার গুণেই রামায়ণ চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের চিত্তকে জয় করে নিয়েছিল এবং পরবর্তী কোনো কাব্যই ভারতবর্ষের এই আদিকাব্যকে এই গুণে অতিক্রম করে যেতে পারে নি।

এদিক থেকেও রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনা করা দরকার। এক হিসাবে বলতে গেলে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতেই মানবচিত্তবৃত্তির প্রকাশবৈচিত্র্য বেশি, তাতে রাক্ষসাদি অ-মানুষের যেটুকু স্থান আছে তা অতি সামান্যই। পক্ষান্তরে রামায়ণে রাক্ষস বানরাদি যে অতি প্রাধান্য পেয়েছে তাতে অনেকের মতে এই কাব্যের মানবিক রস অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে রামায়ণের চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিত্তকে যেমন গভীরভাবে স্পর্শ করেছে মহাভারতের চরিত্রগুলি তা পারে নি। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ বটেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য আদর্শ নয়; রামরাজ্যই আদর্শরাজ্য। আজও রামলক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র রামসীতার দাম্পত্য যে আদর্শ স্থান অধিকার করে আছে, মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলিতে তার তুলনা নেই। রামের পিতৃভক্তি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি সীতার পতিভক্তি ভারতবর্ষের জাতীয় মনকে যে আদর্শের দিকে প্রেরণা দেয় মহাভারতের চরিত্র তা দেয় না। বস্তুত পঞ্চপাণ্ডবের কোনো চরিত্রই আদর্শরূপে অনুস্মরণীয় বলে স্বীকৃত নয়। একমাত্র অর্জুনের বীরত্ব অনেকাংশে আদর্শ বলে গণ্য হয়, কিন্তু তাও রামের বীরত্বের চেয়ে বেশি নয়। বস্তুত একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রগঠনে মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবই বেশি।

মহাভারতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ যুগপৎ প্রকাশিত ও প্রভাবিত হয়েছে। মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজ ও মনের ইতিহাসকে ধারণ করেছে; কিন্তু রামায়ণ নিজে ইতিহাস না হয়েও আমাদের ইতিহাসকে যুগে যুগে গঠন করেছে, রূপ দিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ রামায়ণের আদর্শে কালে কালে গঠিত হয়ে রামায়ণকে ইতিহাসই করে তুলেছে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে ভারতবর্ষের প্রতিফলন ঘটে নি, কিন্তু রামায়ণই ভারতবর্ষের মনে প্রতিফলিত

হয়েছে। এইভাবেই এই আদিকাব্যখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এটিকে আমাদের চিরকালের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের জাতীয় মনের উপরে রামায়ণের এই যে প্রভাব, তার পরিচয় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও। মহাভারতের মূল কাহিনীকে অনুসরণ বা অবলম্বন করে খুব কম কাব্যই রচিত হয়েছে, যা হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এবং তার প্রভাবও বেশি নয়। পক্ষান্তরে রামায়ণ যে কতভাবে অনুকৃত অনুসৃত ও অনূদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই দেখি মহাকবি অশ্বঘোষ রামায়ণের আদর্শে রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্য। এই কাব্যখানিকে যদি বুদ্ধায়ন নামে অভিহিত করা যায় তাহলেই এর স্বরূপ যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। তার পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্ররূপে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষভাবেই রামকাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য-নাটকাদি রচনা করেন। এ ধরনের রামকাব্যের দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য যুগে যুগেই অলংকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপদান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্তও কালে কালে নিজের প্রয়োজনমতো রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এইভাবে রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিত্তগত ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। রামকাব্যের এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের অন্তরের ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, সব বিবর্তনের ন্যায় এই বিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য অপরিবর্তিতরূপে নিত্যবিরাজমান আছে। এই সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রই ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানকে অচ্ছেদ্যরূপে গেঁথে রেখেছে। এইরূপেই রামায়ণ কাব্যখানি ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তথ্যগত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস। নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না। কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, জাতির অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই এবং আপনার কালের সীমাকে অতিক্রম করে নিত্যকালকে সে অধিকার করতে পারে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ নারদ ঋষির মুখে বাল্মীকি কবিকে সম্বোধন করে বলেছেন—

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

—ভাষা ও ছন্দ, 'কাহিনী'

এই সত্যের ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূতসলিলা গঙ্গার স্রোতের মতোই ভারতীয় চিত্তভূমিকে চিরশ্যামল করে রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক-একটি যুগের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তৎকালীন রামকাব্যের আশ্রয় নেওয়া অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আমাদের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ গুপ্তরাজত্বকালের যথার্থ রূপটি কালিদাসের রঘুবংশকাব্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যখন প্রাদেশিক ভাষাসমূহের অভ্যুদয় ঘটেছে তখনও রামকাহিনীর

আশ্চর্য প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নি। বাংলা রামায়ণের কথা স্মরণ করলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। সংস্কৃতসাহিত্যের আদিকবি যেমন বাল্মীকি, বাংলার আদিকবিও তেমনি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী চর্যাপদগুলিকে কাব্য না বলে ঋগ্‌বেদের রচনাগুলির ন্যায় সূক্তপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করাই সমীচীন। বাংলাসাহিত্যের আদিকাব্য যে রামকাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হল সেটা যেমন বিস্ময়ের বিষয় নয়, তেমনি সুখের বিষয়ও বটে। কৃত্তিবাসের পূর্বেও যে বাংলাদেশে রামায়ণচর্চা ছিল তার প্রমাণ অভিনন্দ (সম্ভবত খ্রীস্টীয় নবম শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রামচরিত কাব্যদ্বয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন আদি বাংলাকাব্য, অভিনন্দের রামচরিতও সম্ভবত তেমনি বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতকাব্য। যা হোক, ভাববার বিষয় এই যে, বাংলাদেশ কৃত্তিবাস বা অন্য কবির কোনো একখানি রামায়ণ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে নি। যুগে যুগে বাংলাদেশে কত রামায়ণ যে রচিত হয়েছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। যতগুলি মহাভারত আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, বাংলা রামায়ণের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে সব বাংলা রামায়ণের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয় সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণও একা কৃত্তিবাসেরই রচিত নয়। কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমগ্র বাংলার জাতীয় চিত্তই এই মহাকাব্যরচনায় যোগ দিয়েছে। ফলে এক-এক যুগের আদর্শ ও রুচি অনুসারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আপন রূপ অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছে। ফলে আজকাল আমরা যে রামায়ণখানি পাই তা যথার্থত কৃত্তিবাসী রামায়ণমাত্র নয়, সেটি হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের জাতীয় মহাকাব্য। বাংলার জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে এই রামায়ণের স্থান কতখানি সেকথা আমাদের বিচার্য নয়।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যই রামায়ণের অমৃতরসে পুষ্ট হয়েছে। তামিল (কম্বম-রামায়ণ), কানাড়ী (পম্পা রামায়ণ) প্রভৃতি দ্রাবিড়ী সাহিত্যও অকৃপণহস্তেই রামচরিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। এই প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রামায়ণখানি স্বমহিমায় অতি অনায়াসেই প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গৌরবান্বিত করেছে। বস্তুত তুলসীদাসী রামায়ণের স্থান শুধু ভারতীয় নয়, বিশ্বসাহিত্যেই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।

The most celebrated name in Hindi literature is undoubtedly that of Tulsidas, whose Hindi Ramayana has had great and deserved fame not only in India but throughout the whole world.

—F. E. Keay

ভারতীয় কবিসমাজে তুলসীদাসের আসন যে বাল্মীকি ও কালিদাসের পাশেই সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তুলসী-রামায়ণের দুই দিক, এক তার কাব্যসৌন্দর্য আর-এক তার নৈতিক সম্পদ। নিছক কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে রামচরিতমানসকে নিঃসংশয়েই বাল্মীকি-রামায়ণ ও রঘুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা যায়। নৈতিক প্রভাবের বিচারে রামচরিতমানসকে রঘুবংশের উপরেই স্থাপন করতে হয়। বস্তুত ভারতবর্ষের জাতীয় নৈতিক চরিত্রগঠনে রামচরিতমানস যে শক্তি

দেখিয়েছে, এক ভগবদ্‌গীতা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। গীতার সঙ্গেও তুলনা হয় কি না সন্দেহ। কেননা, গীতার প্রভাব মূলত তত্ত্বময়, সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিতসমাজেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ। তুলসী রামায়ণের আকর্ষণশক্তি প্রত্যক্ষ আদর্শগত, তা অতি সহজেই ব্যাপকভাবে বিপুল জনতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণে পাশ্চাত্য মনীষীরা এই রামায়ণকে উত্তরভারতের বাইবেল বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা Keayসাহেব বলেন—

Amongst all classes of the Hindu community in North India, with the exception of a few Sanskrit pandits, it is today everywhere appreciated and venerated whether by rich or poor, old or young, learned or unlearned, and it has sometimes been called the Bible of the Hindu people of North India.

সুবিখ্যাত ভাষাবিৎ পণ্ডিত জর্জ গ্রীআর্সন সাহেবের মতও উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

Pandits may speak of Vedas and the Upanishads, and a few may even study them, others may say that their beliefs are represented by the Puranas; but for the great majority of the people of Hindustan, learned and unlearned, the Ramayana of Tulsidas is the only standard of moral conduct.

রামায়ণের যে নৈতিক মর্যাদা, তার প্রধান কারণ রামচরিত্রের মহত্ত্ব। রামায়ণের সূচনাতেই দেখি বাল্মীকি নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করছেন, পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছেন যিনি

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈবা প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্‌ধৃত করছি—

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

—ভাষা ও ছন্দ, 'কাহিনী'

"রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"—রামায়ণ, 'প্রাচীন সাহিত্য'

তাই বাল্মীকির এই উক্তি—

"দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।"

বস্তুত বাল্মীকি রামচন্দ্রকে দেবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ রামকে নরদেবতারূপে পূজার অর্ঘ্য দিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে রামায়ণগ্রন্থেই। বাল্মীকি তাঁর মূল রামায়ণে (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ সর্গ) রামকে মানুষরূপেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নরচরিত্রের দেবমহিমায় মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী কালের কোনো কবি রামায়ণে যে দুই কাণ্ড (আদি ও উত্তর) যোজনা করেন তাতে রামচন্দ্র প্রত্যক্ষত দেবতা বলেই স্বীকৃত হয়েছেন। অতঃপর ভারতবর্ষের সমগ্র রামসাহিত্যেই তাঁকে দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রঘুবংশে তাঁকে বলা হয়েছে "রামাভিধানো হরিঃ।" কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাম বিষ্ণুর অবতার বলেই বর্ণিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের এই দেবত্ব সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তুলসী-রামায়ণে। অথচ তাঁকে মানবমহিমার অতীত ও সাধারণ মানুষের আদর্শবহির্ভূত করে রাখা হয় নি। এইজন্যই তুলসী-রামায়ণের নৈতিক প্রভাব ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে উন্নীত করতে পেরেছে। এই নৈতিক গৌরবেই রামায়ণ ভারতবর্ষের চিত্তে এমন অনন্য-সাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বাল্মীকির অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই এই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আদিকাণ্ডেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্ভব হয়েছিল তখনই যখন রামায়ণ ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিল, যখন এই কাব্যখানি দেশের চিত্তভূমিতে জাহ্নবী-হিমাচলের মতোই চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ম্যাক্‌ডোনেল তাই বলেছেন—

No product of Sanskrit literature has enjoyed a greater popularity in India down to the present day than the Ramayana.···Above all, it inspired the greatest poet of medieval Hindustan, Tulsidas, to compose in Hindi his version of the epic entitled *Ram-Charit-Manas*, which, with its ideal standard of virtue and purity, is a kind of Bible to a hundred millions of the people of Northern India.

রামায়ণের এই নীতিসম্পদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। ভারতীয় সাহিত্যের যে দুটি নরচরিত্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে দুটি হল রাম এবং কৃষ্ণ। এই দুই চরিত্রের প্রভাব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু তিনজন মনস্বী ব্যক্তির অভিমত উদ্‌ধৃত করেই নিরস্ত হব। হিন্দীসাহিত্যের ঐতিহাসিক Keayসাহেবের মত এই—

One most commendable feature of the Ramayana is its pure and lofty moral tone, in which it compares very favourably with the literature put forth by some of the devotees of Krishna. —*Hindi Literature* (1920) p. 53

মনস্বী ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন—

In the Rama cultus Sita is a dutiful and loving wife and is benignant towards the devotees of her husband.···There is no amorous suggestion in her story as in that of Radha, and consequently the moral influence of Ramaism is more wholesome.···The Rama cultus represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radha-Krishnaism.

—*Vaishnavism* (1913) p. 87

রবীন্দ্রনাথও বহুপূর্বেই অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন আরও বিশদভাবেই—

"একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল-পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোরগম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

—গ্রাম্যসাহিত্য (১৮৯৮), 'লোকসাহিত্য'

এর চেয়ে বিশদভাবে রামায়ণের মহত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। রামায়ণ-প্রচারিত এই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব ও ধর্মপ্রেরণার আদর্শ যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী-প্লাবিত বাংলাদেশে যথোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে গিয়েছেন। সুখের বিষয়, সেই আক্ষেপের কারণ দূর করবার একটা সুযোগ আজ উপস্থিত হয়েছে। বাল্মীকির মূল রামায়ণ এবং তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ, অর্থাৎ রামচরিতকথার মূল উৎস এবং তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি, এই দুয়েরই সঙ্গে বাঙালির সাক্ষাৎ পরিচয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এবং

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। রাজশেখরবাবু মূল সংস্কৃত রামায়ণকে কতকটা সংক্ষিপ্ত আকারে সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অথচ প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে রামায়ণের স্মরণীয় অংশগুলির পাঠও উদ্‌ধৃত করেছেন। এই বিশেষ প্রণালী অবলম্বনের ফলে রামায়ণ-অনুরাগী সাধারণ পাঠকের যে কত উপকার হল তা বলে শেষ করা যায় না। তাতে স্বল্প চেষ্টায় মূল রামায়ণের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের প্রায় সর্বাঙ্গীণ পরিচয়লাভই সহজসাধ্য হয়েছে। বিস্তৃত রামায়ণ-কাহিনীর অবান্তর অংশ বর্জিত হয়েছে, তাই মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাঠ দিয়ে বইখানিকে আয়তনে ও মূল্যে সাধারণের আগ্রহ ও ক্ষমতার বাইরে স্থাপন করা হয় নি। অথচ ঠিক যে-শ্লোকগুলির মূল জানবার আগ্রহ অনেকের মনেই দেখা দিতে পারে সেগুলির মূল দিয়ে খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সতীশবাবুর তুলসী-রামায়ণকে বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অলংকার বলে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি হবে না। তাতে মূল হিন্দী পাঠসহ তার সরল সুন্দর বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নটি এতদিন হিন্দী-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে অনধিগম্য ছিল। আজ সে পথ সর্বতোভাবেই সুগম হয়েছে। হিন্দী পাঠকে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণ করার ফলে লিপির বাধাও নেই। এই বৃহৎ বইখানিকে অতি অল্পমূল্যে সাধারণের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারই যে সতীশবাবুর উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই উদ্দেশ্য যে সর্বতোভাবেই সিদ্ধ হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, এই সুবৃহৎ হিন্দী রামায়ণটির প্রথম সংস্করণ মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় গ্রন্থখানি বাঙালি পাঠকের কাছে কত উপযোগী হয়েছে।

রাজশেখরবাবু তাঁর রামায়ণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও লিখেছেন। ভূমিকাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেও তিনি অনেক চিন্তনীয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাতেও সমগ্র বইটির প্রতি প্রথম থেকেই একটি আগ্রহ জন্মে। স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যকে জীর্ণ করার পক্ষে যথোচিত ক্ষুধার যে প্রয়োজন, এই ভূমিকাটির দ্বারা সমগ্র গ্রন্থখানিকে আয়ত্ত করার পক্ষে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

সতীশবাবুর সুবিস্তৃত ভূমিকার দ্বারা শুধু ক্ষুধা উদ্রেকের প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় নি। এই বৃহৎ ভূমিকার দ্বারা সমগ্র তুলসী-রামায়ণকে যথোচিতভাবে উপলব্ধিরই সহায়তা হয়েছে। এই গ্রন্থ ও তার রচয়িতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই ভূমিকায় নিবদ্ধ হয়েছে। এই রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষিত হয়েছে। ফলে এই ভূমিকাটিকেও গ্রন্থখানির একটি প্রধান অংশ বলে স্বীকার করতে হবে। এই ভূমিকাটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে বইখানি পড়তে শুরু করলে আর কোথাও অনধিগম্যতার ভয় থাকে না। এটা এই বৃহৎ গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে কম লাভ নয়।

এই দুটি গ্রন্থের দ্বারা একদিকে চিরন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে অপর দিকে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত বিশাল জাতীয় চিত্তের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যকে যুক্ত করা হল। বাংলাদেশের পক্ষে এর চেয়ে বড় লাভ কিছুই হতে পারে না। এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করে অনুবাদকদ্বয় শুধু সাহিত্যসমাজেরই নয়, পরন্তু সমগ্র বাঙালিজাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কেননা তাঁরা দুটি গ্রন্থমাত্রকেই অনুবাদ করেন নি, বৃহৎ ভারতবর্ষের আদর্শ ও সংকল্পকেই বাঙালিকে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত—সারানুবাদ। শ্রীরাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় টাকা।

মহাভারতের সমাজ: শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

জগতের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সব সাহিত্যই যে মনুষ্যবিশেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে তাহা নহে; কতগুলি সাহিত্য আছে যেগুলি একটা বিশেষ যুগে, বিশেষ দেশে আপনা-আপনিই যেন রচিত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ জিনিস দুর্লভ এবং বিস্ময়কর। এইরূপ একটি বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি ভারতবর্ষের 'মহাভারত'। এ-জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত হওয়া অপেক্ষা উৎপন্ন হওয়া কথাটাই অধিক প্রযোজ্য। বৃক্ষলতাফলমূলশস্যাদির ন্যায় সমগ্র একটা দেশ, সমগ্র একটা জাতির বুক জুড়িয়া ইহারা যেন জীবনের ফসলের মত ফলিয়া উঠিয়াছে। কোনো বিরাট প্রতিভা একটা বিরাট যুগব্যাপী এই জাতীয় জীবনের ফসলকে যেন একটি ভাণ্ডারে আহরণ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। ইহা তাই মহার্ঘ জাতীয়-সম্পদ্‌। এখানে রক্তমাংসের জীবন পাইয়াছি, ধর্ম পাইয়াছি, নীতি পাইয়াছি, রাজনীতি সমাজনীতি সবই পাইয়াছি; আর এই সমস্তের ভিতর দিয়া পাইয়াছি কন্যাকুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত একটি বিরাট ভূভাগের উপরে আবর্তিত একটা জটিল জাতীয় জীবনের পূর্ণতম পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের একটা কথা মনে পড়িতেছে— গণসাহিত্য। কথাটা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দ্বারা উহার অর্থ যে কি গিয়া দাঁড়ায় স্পষ্ট দিশা করিতে পারি নাই। মুশকিলটা ঠেকে কথাটির ব্যাসবাক্য: লইয়া। গণসাহিত্যের ব্যাসবাক্য কি? গণ-দ্বারা রচিত সাহিত্য, না, গণের জন্য রচিত সাহিত্য, না, গণকে অবলম্বন করিয়া রচিত সাহিত্য? সর্বোপরি আবার প্রশ্ন থাকিয়া যায়, গণ কাহাকে বলিব? এসকল কথা লইয়া বিশুদ্ধ তর্কও অনেক করা যাইতে পারে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তও অনেক গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলিকে বিশেষ-কোনো সাহিত্যসৃষ্টির উপরে প্রয়োগ করিয়া সংজ্ঞার সার্থকতা উপলব্ধি করা কষ্টকর মনে হইয়াছে। কিন্তু তর্ক ছাড়িয়া সহজবুদ্ধিতে সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথাটি প্রযোজ্যতার কথা ভাবিয়া মনে হইয়াছে গণসাহিত্য বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতকে— যাহার ভিতর দিয়া একটা বিশেষ যুগের একটা বিশেষ জাতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক। বিপুল মহাভারতকে তাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন গণেশ— যিনি জনগণের সহিত নিগূঢ়ভাবে যুক্ত থাকিয়াই লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার যাহা কিছু ঈশত্ব। মহাভারত-রচনার ভিতরে যে ব্যাসদেব ও গণেশের যৌথসাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল একথাটির তাৎপর্য গভীর।

আধুনিক যুগে আমরা জাতীয় সম্পদের দুইটি রূপ দেখিতে পাই। এক রূপে সে তাহার অভিজাত বিশুদ্ধ স্বর্ণকান্তি লইয়া বিভিন্ন রাজভাণ্ডারে বর্তমান; ঘরে-বাহিরে, হাটে-বাজারে, আপিস-আদালতে তাহাদিগকে লইয়া নিত্য কারবার চলে না; তাহাদিগকে লইয়া কাজ-কারবার বড় বড় রাজপুরুষদের দেশবিদেশের সহিত আদান-প্রদানের জন্য। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সদাসর্বদা কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের ছোটবড় বিভিন্ন রূপান্তর ঘটিয়াছে; সেই বিভিন্ন রূপান্তরে তাহারা সমপ্রদেশের আনাচে-

কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রতিদিনের আর্থিক জীবনকে চালু রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন জাতীয় সম্পদ মহাভারতেরও আমরা এই জাতীয় দুইটি রূপ দেখিতে পাই ; এক রূপে বিশুদ্ধ দেবভাষায় পণ্ডিত-প্রহরীগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাহা বড় বড় পুস্তকাগারে বিরাজ করিতেছে, বিদ্যার রাজপুরুষগণেরই তাহা লইয়া কাজ-কারবার। জনসাধারণের নিত্য জীবনের সহচররূপে সে নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া ছোটবড় অসংখ্য রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই রূপেই এখন পর্যন্ত জাতীয় জীবনের সে একটা সক্রিয় সম্পদ।

মহাভারতগ্রন্থের সহিত বাঙালি জাতির ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের জন্য বহুদিন হইতে বহু চেষ্টা চলিয়াছে। কবি মধুসূদনের ভাষায় বলিতে গেলে—

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

এই তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, বিজয়-পণ্ডিত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় অনেক কবি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতরে কাশীরাম দাসের স্থানই সর্ব-প্রধান। কাশীরাম দাস প্রভৃতির মহাভারত মূল মহাভারতের অনুবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও আসলে কিন্তু ইহা মূল মহাভারতের অনুবাদ নহে, ইহা বাঙালির নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব ভাবে মহাভারতকে নূতন করিয়া গ্রহণ। কেবলমাত্র পণ্ডিতগণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র জাতির জনগণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিলে মনে হয়, ইহার ব্যবহারিক ফল ভালোই হইয়াছে। মহাভারতের রসাস্বাদন এবং প্রভাব বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এই পন্থার ভিতর দিয়াই সহজ হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র এবং সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবার নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই যুগে জাতিকে নিজের বনিয়াদ হইতে নড়াইবার জন্য ধাক্কাও আসিয়াছিল প্রবল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার বাসনা ও সঙ্কল্পও হইয়া উঠিয়াছিল প্রবল। পুণ্যশ্লোক কালীপ্রসন্ন সিংহমহাশয় তাই মূল মহাভারতখানিকে প্রাঞ্জল গদ্যে বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলেন। এ কাজ সহজ তো নহেই, ইহার জন্য যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, প্রভূত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন ছিল, লেখক ইহার সব বিষয়েই অধিকারী ও সামর্থ্যবান্ ছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙালির পক্ষে ব্যাসদেবের মহাভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগরক্ষার অবলম্বন ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা-গদ্যের প্রাঞ্জলতা এবং আজিকার বাংলা-গদ্যের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা এক নহে। সত্য কথা বলিতে কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতি ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে একটু প্রাচীনগন্ধী হইয়া পড়িয়াছে, আমরা মনে মনে তাই ইহার একটা পরিবর্তন আশা করিতেছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসু মহাশয় পাঠকসম্প্রদায়ের এই আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় মনে মনে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের একটি নূতন যুগোপযোগী অনুবাদ আমাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে যুগোপযোগী কথাটি আমি দুইটি

অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। প্রথমত, ভাষা এবং বাক্যরীতির প্রাঞ্জলতার ভিতর দিয়া তিনি গ্রন্থখানিকে যুগোপযোগী করিবার সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া মহাভারতের সারানুবাদ করিয়াছেন। এই সারানুবাদের ফলে গ্রন্থখানি অনেকাংশে সহজও হইয়াছে, সংক্ষিপ্তও হইয়াছে। এই দুইটি জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল। মূল মহাভারত শুধু উপাখ্যানবহুল গ্রন্থ নহে, তথ্য এবং তত্ত্ব -বহুল গ্রন্থ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তথ্যের এই অজস্রতা এবং বিস্তার সর্বত্র অপরিহার্য নয়। তত্ত্বের দিক হইতেও দেখা যায়, মহাভারতে কথাপ্রসঙ্গে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা সর্বত্র স্বাদুও নয়, সুপাচ্যও নয়। লেখক তাই এই জাতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে অনেকটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায়ই এ বিষয়ে অনুবাদকের মত অতি স্পষ্ট— "এই পুস্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান-এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জক নয় সেইসকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশতালিকা, যুদ্ধবিবরণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনবিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি এবং পুনরুক্ত বিষয়। স্থলবিশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সারানুবাদের উদ্দেশ্য— মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা।"

আমরা যে যুগে বাস করি তাহা সব দিক হইতেই একটা ব্যস্ততার যুগ। একে দ্বাপরযুগ অপেক্ষা এই কলিযুগের শেষপ্রান্তে আমাদের আয়ুষ্কাল অত্যল্প, তাহাতে আবার আমাদের জীবনসংগ্রামের তীব্রতা উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ভিতরে একান্ত বিশেষ কোনো প্রয়োজন না পড়িলে লক্ষশ্লোকের মহাভারতের অনুবাদ পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয় না। সুতরাং মহাভারতকে বর্তমান যুগের বাঙালির নিকটে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহার ভিতরে এই সংক্ষিপ্ততার যুগানুগত্য একান্তই প্রয়োজন ছিল।

এই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত করিবার কাজটি পাঠকের নিকট যতখানি সুখপ্রদ হইয়াছে লেখকের পক্ষে বোধ হয় ততখানি সুখপ্রদ হয় নাই। প্রথমত, মহাভারতকে সাধারণ পাঠকের নিকটে সুখপাঠ্য করিতে হইবে, অথচ তাহার গাম্ভীর্য এবং মহিমা ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবে না। এই কাজে লেখকের দুইটি সূক্ষ্মবোধের প্রয়োজন হইয়াছে। একটি মহাভারতের বিপুলতা এবং আড়ম্বর নয়, তাহার যথার্থ মহিমাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করা; অপরটি আমাদের আধুনিক চলতি ভাষাকে সেই মহিমার প্রকাশযোগ্যত্ব দান করা। দ্বিতীয়ত, এই বহুলাংশের বর্জন এবং স্থানবিশেষের সংক্ষেপণের ভিতরে সর্বদা একটা নিপুণ নির্বাচনবোধকেও জাগ্রত রাখিতে হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত কলেবরের ভিতর দিয়াই যাহাতে একটা সমগ্রতার আস্বাদন পাওয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। মূল মহাভারতের অংশবিশেষের সহিত যাঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, তাঁহারা অনুবাদকালে লেখক কোথায় যে কি ছাঁটকাট করিয়াছেন, কোথায় অনেকখানি কথাকে লেখক নিজের মতন করিয়া সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ধরিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এক-আধটি স্থলে অবশ্য আমাদের মনে হইয়াছে, যেন একটু অন্য রকম হইলে ভালো হইত। যেমন ভগবদ্‌গীতার যেখানে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে সেখানে আমাদের মনে হইয়াছে, বিশ্বরূপদর্শনের কথা আর-একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া বরঞ্চ গীতার যেটা আসল কথা, অর্থাৎ

'কর্মসন্ন্যাস', সে সম্বন্ধে আর-একটু স্পষ্ট আভাস থাকিলে বোধ হয় ভালো হইত। মহাভারতের খুব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে লেখক দুই-একটি মূলের শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহার সারানুবাদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মহাভারত সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনাগ্রন্থের বড় অভাব। এখনও কি এ বিষয়ে বিদেশী পণ্ডিতগণের বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পড়িয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে? কিছু দিন পূর্বে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয় লিখিত 'মহাভারতের সমাজ' গ্রন্থখানি আমাদিগকে স্বস্তি এবং আনন্দ উভয়ই দান করিয়াছে। বৃহদাকারের পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় লিখিত এই গ্রন্থখানি মহাভারত-মন্থিত তথ্যের একটি বিরাট্ ভাণ্ডার। বহু শ্রদ্ধা পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের ফলে এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়। লেখক তাঁহার আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে ভাগ করিয়াছেন। বিবাহপ্রথাই সমাজবন্ধনের একটি মূলীভূত বস্তু, এইজন্যই প্রথম খণ্ডে মহাভারতের যুগের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিবাহপ্রথাকে অবলম্বন করিয়াই নানাবিধ সংস্কার, তৎকালীন নারীজীবন, সমাজে তাহার স্থান, চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা, চতুরাশ্রম প্রভৃতি বহু আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, এই খণ্ডে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, বৃত্তিব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প, আহার ও আহার্য, পরিচ্ছদ ও প্রসাধন, পারিবারিক ব্যবস্থা, প্রকীর্ণ ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ইহার ভিতরে তৎকালীন ধর্মের আদর্শ, সত্যের আদর্শ, দেবতার ধারণা, উপাসনা, আহ্নিক ও কৃত্যাকৃত্য, শবদাহ ও অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণবিধি, রাজধর্ম, যুদ্ধ, দায়ভাগ, প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে তৎকালীন বিবিধ শাস্ত্র, শিল্পকলা, বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতির অলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানির এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই বোঝা যায়, শাস্ত্রীমহাশয় মহাভারতের যুগের সমগ্র জাতীয়-জীবনের ধারাটি বুঝিবার জন্য যেসকল তথ্য সমাবেশের প্রয়োজন তাহার কিছুই বাদ দেন নাই। বাংলায় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পাদটীকায় তিনি এইসব বিষয়ে মূল মহাভারতের বহু শ্লোক ও শ্লোকার্ধের উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, অথবা অধ্যায় ও শ্লোকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলে, এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই মূল দেখিয়া তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া লইতে পারেন। এ কাজের জন্য পরিশ্রম যেটুকু করিবার শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রীমহাশয়ই তাহা করিয়া রাখিয়াছেন; অনায়াসে বা অল্পায়াসে কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার কাজটি মাত্র পাঠকের জন্য বাকি রহিল।

তবে গ্রন্থের উপকরণপ্রাচুর্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার না থাকিলেও এই প্রচুর উপকরণের পরিবেশন সম্বন্ধে আমাদের সামান্য কিছু বক্তব্য আছে। আলোচ্য বিষয়ের বিভাগ সম্বন্ধে দুএকটি কথা মনে হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের 'চতুরাশ্রমে'র আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ধর্মের আলোচনার ভিতরে শ্রেণীভুক্ত হইলে বোধ হয় আরও ভালো হইত। তেমনই আবার দ্বিতীয় খণ্ডের 'দায়বিভাগ' সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথম খণ্ডে স্থান পাইলে বোধ হয় ভালো হইত। মহাভারতের 'রাজধর্ম' একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; লেখকও এ বিষয়ে সাধারণ ক্ষাত্রধর্মের আলোচনা না করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে রাজধর্মের ছোটবড় খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র খণ্ডে আলোচিত হইলে বিষয়ের মর্যাদা হয়তো অধিকতর রক্ষিত হইত।

শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার গ্রন্থের তথ্যগুলিকে তাঁহার নিজস্ব মতামতের রঙের দ্বারা কোথায়ও রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সংযমের পরিচয়, পাঠকের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ লাভ। পদে পদে অপরের মন্তব্যাদির দ্বারা কণ্টকিত হইবার পরিবর্তে পাঠক এখানে তাঁহার স্বাধীন দৃষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে পারেন এবং নিজের মতামত নিজে স্থির করিয়া লইবার সুযোগ পান।

মহাভারতের সমাজ সম্বন্ধে এই বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করিলে গোটাকয়েক কথা স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। তাহা হইতেছে তখনকার দিনের সমাজজীবনের একটা স্বাধীন প্রবাহ এবং তাহার সঙ্গে তাহার প্রাণশক্তির বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে। যে লোক সুস্থ সবল, তাহার দেহে বিবিধ রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে, ভিতর হইতে ব্রণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, বাহিরের আঘাতে বহু ক্ষত সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু যেখানে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য রহিয়াছে সেখানে এইসবকেই দেহ তাহার আপন জৈবিক ধর্মে জয় করিয়া শুধু আত্মরক্ষা নয়, আত্মোন্নতিও করিতে পারে। কিন্তু নির্বীর্য দেহকে যে বীজাণু আশ্রয় করে, সে-ই তাহার সহজ প্রবাহকে ব্যাহত করিয়া গভীর অমঙ্গল সাধন করিতে পারে, যে-কোনো ক্ষুদ্র ব্রণ বা ক্ষত তাহার পক্ষে প্রাণসংশয়ী হইয়া ওঠে। সমাজদেহ সম্বন্ধেও একই কথা। মহাভারতের যুগে সমাজব্যবস্থায় বিধিনিয়মেরও অসদ্ভাব ছিল না, আবার সমাজজীবনে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর স্খলনপতন-ত্রুটিরও অভাব ছিল না। কিন্তু অফুরন্ত জীবনীশক্তি ছিল— সে সমাজ তাই ঠুনকা কাঁচের পাত্রের ন্যায় যে-কোনো আঘাতে কেবলই ভাঙিয়া চৌচির হইয়া যাইতে চায় নাই। তখন চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা চতুরাশ্রম-ব্যবস্থা সবই ছিল; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে কোথাও কোনো বাধা নাই; বিধাতাপুরুষ জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই অপরিবর্তনীয় জাতি-পরিচয়ের লেবেল আঁটিয়া দিতেন না। যে ব্যবস্থার উপরে সমাজের বনিয়াদ নির্ভর করে সেই বিবাহব্যবস্থার ভিতরেও সমাজের অনেক অবিধি, ব্যভিচার, অনেক পাপ শোষণ করিয়া লইবার শক্তি ছিল। শুধু শাসন, শুধু প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতার দ্বারা একটা বিরাট সমাজজীবনকে বেশি দিন টিকাইয়া রাখা চলে না। কেবল নিন্দা-ধিক্কারের সাহায্যে, কেবল ছাঁটিয়া দূরে সরাইয়া সমাজের বিশুদ্ধিসাধন হয় না। যে বিশুদ্ধি প্রাণশক্তিকে বর্ধিত হইতে কেবল চারিদিক হইতে বাধা দেয়, বন্ধন ও শুষ্কতার ভিতর দিয়া সে আনিবে সমাজের মৃত্যু। আলোচ্য 'মহাভারতের সমাজ' গ্রন্থখানি পড়িলে বেশ বোঝা যায়, সমাজজীবন একটা সচল বস্তু, সে তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়াই চলিয়াছে, শক্ত কাঠের ফ্রেমের ভিতরে ঠাসিয়া পুরিয়া নিজেকে সে কেবলই পঙ্গু করিয়া রাখিতে চায় নাই। ভিতর বা বাহির হইতে আঘাত আসিলে জীবন্ত সমাজ শুধু খোলস সৃষ্টি করিয়া আত্মসংহরণ এবং আত্মসংকোচনের দ্বারাই আত্মরক্ষা করিতে চাহে না, দৃঢ়তররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতরেই সে আত্মরক্ষার সুযোগ খোঁজে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

স্বরলিপি

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্ নে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে।
হেথায় বেলা হোথায় চাঁপা
শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্ রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে, "হেথায় বেলা,
হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি।
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব।"

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

II	সা	ঋা	।	[ঋ]গা	গা	-া	।	মা	মা	।	মা	মা	মা	I ‖
	গো	লা		প	ফু	ল্		ফু	টি		য়ে	আ	ছে	
I	মা	মা	।	[ম]পা	মা	গা	।	মা	-পদা	।	[ম]পা	-া	-া	I
	ম	ধু		প	হো	থা		যা	০স্		নে	০	০	
I	পদা	দা	।	দা	দা	দা	।	পা	[প]ণা	।	দা	পা	মপা	I
	ফু০	লে		র	ম	ধু		লু	টি		তে,	গি	য়ে০	

I (ম)গা গা । -া মা -গমপা । (ম)গা -মা । -গা (গ)ঋা -সা II
কাঁ টা র্ ঘা ০০০ খা ০ স্ নে ০

II (স)মা মা । -া মা মা । পা (প)ণা । -া র্সা র্সা I
হে থা য়্ বে লা হো থা য়্ চাঁ পা

I র্সা র্সা । (র্স)র্ঋা র্ঋা র্সা । ণা দপা । (ণ)দাঃ -পঃ -মগা I
শে ফা লি হো থা ফু টি০ য়ে ০ ০০

I মা (ম)দা । দা দা দা । পা (প)ণা । দা পা মপমা I
ও দে র কা ছে ম নে র ব্য থা০০

I (ম)গা -া । গা মা মপমা । (ম)গা -মা । গা (গ)ঋা -সণ্া II
ব ল্ রে মু খ০০ ফু ০ টি য়ে ০০

II সা ঋা । (ঋ)গা গা গা । মা মা । -া মা মা I
ভ্র ম র ক হে হে থা য়্ বে লা

I মা মা । -(ম)পা মা গা । মা পদা । (ম)পা -া -া I
হো থা য়্ আ ছে ন লি০ নী ০ ০

I পদা দা । -া দা দা । পা (প)ণা । দা পা মপা I
ও০ দে র্ কা ছে ব লি ব না কো০

I (ম)গা গা । গা মা গমপা । (ম)গা -মা । গা (গ)ঋা -সা I
আ জি ও যা হা০০ ব ০ লি নি ০

II (স)মা মা । মা মা মা । পা (প)ণা । -া র্সা র্সা I
ম র মে ঘা হা গো প ন্ আ ছে

I র্সা র্সা । ^র্স^র্জ্রা র্রা র্সা । ণা দপা । ^প^দাঃ -পঃ -মগা I
গো লা পে তা হা ব লিং ব ০ ০০

I মা ^ম^দা । দা দা দা । পা ^প^ণা । দা পা -মপমা I
ব লি তে য দি জ্ব লি তে হ ০০য়্

I ^ম^গা গা । গা মা মপমা । ^ম^গা -মা । গা ^গ^ঋা -সণ্া II II
কাঁ টা রই ঘা য়ে০০ জ্ব ০ লি ব ০০

ভ্রমসংশোধন

স্বরলিপি। "এতফুল কে ফোটালে"। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৩	৪	^প^দা পা -া } I ম রি ০	^ন^দা পা -া } I ম রি ০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক - পৌষ ১৩৫৬

কবিতাগুচ্ছ

সরোজিনী নাইডু

পালকি-বেহারার গান

মোরা   মন্দ মৃদু মন্দ তা'রে
          বাহিয়া যাই চলে,
সে যে   গানের হাওয়া লেগে যেন
          ফুলের মতো দোলে।
সে যে   পাখির মতো ছুঁয়ে চলে
          স্রোতের ফেনা-'পরে
সে যে   স্বপন-দেখা অধর হতে
          হাসির মতো ঝরে।
মোরা   সুখের তালে চরণ ফেলে
          ধাই গো মোরা গাই,
যেন   মালার মাঝে মোতির মতো
          তাহারে বাহি ভাই।

মোরা   মন্দ মৃদু মন্দ তা'রে
          বাহিয়া যাই চলে,
সে যে   গানের হিমবিন্দু-'পরে
          তারার মতো দোলে।
সে যে   বন্যামুখে ঊর্মিভালে
          রশ্মিসম ফুটে,
সে যে   বধূর নত নয়ন হতে
          অশ্রুসম টুটে।

মোরা মন্দ মৃদু মন্দ মৃদু
ধাই গো মোরা গাই
যেন মালার মাঝে মোতির মতো
তাহারে বাহি ভাই।

Palanquin-Bearers : অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১২

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে।
জাগরণে স্বপ্নসম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্রসম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর মৃগনাভিসম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায়।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি, 'রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে,
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়।'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
এ কি গো সমরলীলা তোমায়-আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমেরো মর্ম যাহা তাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার !

Humayun to Zobeida : অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
তীর্থসলিল, ১৩১৯

একাকী

একা-একা খুঁজে ফিরি, ওগো প্রেম, পুষ্পিত বনানী,
সুখের সে অলি-গলি, নিত্যোজ্জ্বল, চির-পুরাতন,
দাড়িম্বগুচ্ছের মত পক্ক-নম্র কোমল প্রভাত,
রাত্রির প্রচুর গাঢ় দীপ্ত শান্ত ফলের কানন।

একা-একা ঢেউ ভাঙি, ওগো প্রেম, জীবনের নদী—
পরিচিত জলধারে আবর্তের পরিবর্ত নানা,
আশার বিশাল সিন্ধু, কামনার খর নির্ঝরিণী,
চন্দ্র-ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ আলোকিত স্বপ্নের মোহানা।

সস্নেহ বাতাস নাই, নাই কোথা সান্ত্বনার তারা,
মধুর ঠিকানা তব কে বা দেবে, কোথা আছ স্থির ;
নির্ধারিত কোন ক্ষণে, হর্ষের না উদ্বেল অশ্রুর,
দেখা পাব তোমার মুখের সেই অভয় মন্দির ?

Alone : অনুবাদক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একান্তে

হে হৃদয়, চলো যাই যেথা বাজে আহ্বান সন্ধ্যার —
দূরে বহুদূরে এই বিজন ভীষণ ভিড় থেকে,
প্রান্তরে কান্তারে যেথা জাদু নিয়ে নামে অন্ধকার
দীপ্যমান মেঘ হতে স্বর্ণস্রোতা তটিনীরে ঢেকে।

বহুর জটলা থেকে ব্যথা-কোলাহল হতে দূরে
যেখানে বিশ্রাম আছে, শান্তি আছে সংঘাত-সীমায়,
রাত্রির প্রশান্তি যেথা পূর্ণ হয় আগামীর সুরে
জীবনসংগীতে যেথা মৌন যতি ভরে মূর্ছনায়।

ঈগল প্রহরী যেথা চলো সেই গিরির চত্বরে,
তালের ছায়াতে শুয়ে সেখানে হয়তো যাবে শোনা

হয়তো বা ছোঁয়া যাবে ঘুমন্ত ঘাসের কণ্ঠস্বরে
কোনো স্বপ্ন — সুদূরের তারার রহস্য দিয়ে বোনা।

হয়তো বা অনন্তের রূপস্পর্শ পাবো দু নয়নে
যার ছায়াতলে সারা জীবনের সংকোচ-স্ফুরণ,
আলোক-খচিত পল বেয়ে প্রভাতের উন্মীলনে
দ্যুতিময় দলে যার ঈশ্বরের পূজা নিবেদন।

Solitude : অনুবাদক শ্রীঅজিত দত্ত

মৃত স্বপ্ন

আবার ফিরিয়া এলে কি আমার অনুসন্ধান-তরে
লক্ষ বর্ষ পরে, হে স্বপ্ন মোর!
সমাধি তোমার দিয়াছিনু ভীম তলহীন গহ্বরে,
কে ভাঙিল তব গভীর সে ঘুমঘোর?
ছিলে নিদ্রিত অন্ধকারায় লক্ষ বর্ষ ধরি,
কার আহ্বানে জাগিলে আবার সুষুপ্তি পরিহরি,
কে পাঠাল তোরে সন্ধানে মম সমুদ্র উত্তরি',
কে ভাঙিল ঘুমঘোর?
আজি অসময়ে কেন ফিরে এলে, হে মৃত স্বপ্ন মোর?

তোরণদুয়ারে সাজানো আমার পত্রমাল্য শত
নির্মম করে ছিন্ন করিবি কি রে?
প্রাসাদশীর্ষে নির্ভয়সুখে প্রেমগুঞ্জনরত
ত্রস্ত করিবি কপোতদম্পতিরে?
অশুচি করিবে মৃত তব হিম-অঙ্গুলিপরশনে
মোর পূজারীর বিমল উত্তরীয়,
স্তব্ধ করিবে অকারণ তব শোকগাথা-আলাপনে
মোর আনন্দ-উৎসব রমণীয়?

লক্ষ বর্ষ হল অবসান যেদিন সঙ্গোপনে
ভগ্নহৃদয়ে রাখিনু তোমারে তুষারের আবরণে
অন্ধ সে কারা ত্যজি কেন এলে আজি মম অঙ্গনে?
কে ভাঙিল ঘুমঘোর?
অশুচি কোরো না এ দেবদেউলে, হে মৃত স্বপ্ন মোর!

My Dead Dream : অনুবাদক শ্রীআর্যকুমার সেন

ঘুমপাড়ানী গান

মশলা-বনের আমেজ নিয়ে
কত ধানের ক্ষেত পেরিয়ে
পদ্মদিঘির সুবাসটুকু মেখে,
শিশিরকণার ঝিক্‌মিকানি—
ছোট্ট মিঠে স্বপনখানি
এনেছি দূর পরীর দেশের থেকে।

খোকনমণি, ঘুমোও এবার,
দীপ জ্বেলেছে জোনাকি তার,
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচছে নিমের গাছে।
আফিমফুলের পেয়ালা ছেঁকে
চোরাই ক'রে আঁচল ঢেকে
এনেছি এই স্বপন তোমার কাছে!

ঘুমোও আমায় বিদায় দিয়ে,
লক্ষ তারা ঝল্‌মলিয়ে
তোমায় ঘিরে জ্বলছে দু চোখ মেলে।
আদর ক'রে শুইয়ে ঘুমে
সোনার জাদুর নয়ন চুমে
স্বপন-মধু দিলেম তাতে ঢেলে।

Cradle-Song : অনুবাদক শ্রীইন্দ্রাণী রায়
শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্রী

বাসন্তী ইন্দ্রজাল

গিরির গহন গুহায় মৃত্যু-শীতল শিলার তলে
সমাধি রচিয়া প্রাণের আমার কহিনু অশ্রুজলে,
'আশাহীন ওরে দীর্ণ হৃদয়, ঘুমায়ো অশেষ কাল—
মায়াবী ফাগুন চৈত্র যেদিন নূতন ইন্দ্রজাল
বনে উপবনে বিথারিবে, পিক কুহরিবে কুহুতান,
জাগিয়ো না আর, বক্ষে নিয়ো না নিশিত বেদনাবাণ।'

বসন্ত এল: কিংশুকে আর অশোকে রক্তশিখা
ঝলোমলি উঠে, উষাসন্ধ্যায় সোনার-লিখন-লিখা
লঘু মেঘমালা, মুহু মুহু পিক-কুহরিত বনবাস—
সমাধিশয়নে চমকিয়া জাগি প্রাণ কহে, 'মধুমাস
ঐ এল বুঝি, এল, গায়ে কার লাগে যে সুরভি শ্বাস!'

The Magic of Spring: অনুবাদক শ্রীকানাই সামন্ত

চারণ

উতলা বাতাস ডাকে আমাদের, দ্রুতপদে ছুটে যাই
বনে বনান্তে দূর পথে পথে মিলায় প্রতিধ্বনি
বাঁশরির সুরে গান গেয়ে চলি কণ্ঠে সুর মিলাই
সারা দুনিয়ায় ঘর আমাদের, সবারে আপন গণি।

গান গেয়ে চলি হারানো দিনের, হারা-নগরীর গান,
দূর অতীতের সুন্দরীদের রূপযৌবনস্মৃতি,
সুদূর যুগের অসিঝঞ্ঝনা, রাজমুকুটের মান,
সুখব্যথাভরা সরল জীবন— মধুর করুণ গীতি।

কোন্ আশা মোরা করি আহরণ, কোন্ সে স্বপন বুনি?
উতলা বাতাস যেথা ডাকে, মোরা দ্রুতপদে ছুটে যাই।
ধরা নাহি দিই, প্রেম-আরামের মন্ত্রণা নাহি শুনি
উতলা বাতাসে জীবনমন্ত্র— পথ চলি, গান গাই!

Wandering Singers: অনুবাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ের গান

মধুমুখী কন্যা আমার, কোথায় চলে যাও ?
কেন তোমার মণিমানিক বাতাসে ছড়াও ?
মা খাওয়াল সোনার ফসল, ছেড়ে যাবে তারে ?
ভাঙবে কি বুক, বর হয়ে যে আসছে ঘোড়সওয়ারে ?

মা গো আমার, আজকে আমি গহন বনে চলি,
চাঁপাগাছের ডালে যেথায় ফোটে চাঁপার কলি,
কোকিল-ডাকা নদীর চরে পদ্ম ঝল্‌মলায়,
শোন্ মা সেথা পরীরা সব ডাকে যে আমায়।

মধুমুখী কন্যা শোনো, ছুনিয়া সুখের পুর
বরণ দোলন গান আর আয়েশ চন্দনে ভুরভুর !
বিয়ের বস্ত্র বুন্‌ছে তোমার বাসন্তী রুপালি,
বিয়ের পিঠে বানাই, তুমি কোথায় যাবে চলি ?

বধূবরণ, খোকন-দোলন গানে ছুখের রেশ
আজ রোদ্দুর হাসে, হাওয়া কাল মরণে শেষ।
অনেক মিঠে বন-ঝরনার ধারে বনের গান,
পরীরা ওই ডাকছে মা গো, রইতে নারে প্রাণ !

Village-Song : অনুবাদক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমগাথা

মেয়ে : বাঁশির ডাকে নাগিনীসম বেঁকে
তোমার করপুটের মাঝে চলেছে হিয়া মম,
যেখানে নিশা-বায়ু রেখেছে ঢেকে দয়িত সম
যুথীর তার কানন-বেদী শিরীষ-ছাওয়া কত,
নানা রঙিন ফলের পাকা গুচ্ছ শাখা থেকে
সিঁতুর ফুলে ভিড় করেছে শুকসারীরা যত।

ছেলে: গোলাপদলে অন্তরীণ সৌরভে বুঝি বা
হৃদয় তব বক্ষে মম প্রেয়সী! সন্নত,
মালার মতো, মণির মতো, পারাবতের মতো
অশোকশাখে বাঁধে যে নীড় দিনান্তের পাটে।
শান্ত রহ প্রিয়া! এখনো পাতে নি দেখ দিবা
সোনালি তার উষাশিবির গজদন্ত মাঠে।

Indian Love-Song: শ্রীবিষ্ণু দে

হয়দ্রাবাদ-নগরে সন্ধ্যা

আকাশে ঐ ছাখো না ফুটফুট পায়রা-গলা,
এখানে মুক্তো-ছিটে, ওখানে আগুন-জ্বলা।

নগরের সিংহদ্বারের মুখে ঠিক হাতির দাঁতের
মতো ঐ নদীর বাঁকা ঝিকঝিক মিশলো রাতে।

মিনারেট ভাসলো ছায়ায়, আকাশে উঠলো আজান,
নগরের প্রাচীর-'পরে শান্তির শুভ্র নিশান।

জানালার জাফরি-ফাঁকে কত-যে রূপের রেখা
দেখা যায়, যায় কি না যায়, বিলাসের ঘোমটা-ঢাকা।

হাতিরা অলস পায়ে বেঁকে যায় গলির মোড়ে,
রুপোলি ঘণ্টা বাজে রুপোলি সন্ধ্যা ভ'রে।

শোনো ঐ চার মিনারে নামে রাত ঘোড়ার খুরে,
টংটং তাল দিয়ে যায় করতাল কোথায় দূরে।

নগরের পুলের উপর স্বপ্নের পাল্কি চ'ড়ে
আসে রাত রানীর মতো, প্রাসাদে, গরিব-ঘরে।

Nightfall in the City of Hyderabad: অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু

বৃন্দাবনের বাঁশরিয়া

কদম্বের তলে তুমি ও-বাঁশি বাজালে কেন
যে-বাঁশির নাই তুলনাও,
শাণিত মধুর সুরে তন্দ্রামগ্ন এ-হৃদয়ে
কেন ক্ষতচিহ্ন এঁকে যাও ?
হে মোহন বাঁশরিয়া, ও সুরের স্রোতে ভেসে
হয়ে যাব অসীমে উধাও ?

গৃহহীন যাযাবর মুক্ত বিহঙ্গের মত
ইচ্ছা করে নিরুদ্দেশে ধাই ;
মায়া মোহ মমতার ধারিব না কোনো ধার
মানিব না বাধার বালাই,
বাঁশির কুহক-ডাকে ইশারায় সাড়া দিয়ে
দিকে দিকে ছুটিব সদাই।

হোক না সে ইন্দ্রালয় পারিজাত-কুঞ্জে ভরা
সুরধুনীধারায় মুখর,
অন্ধকার যমপুরী হয় যদি হোক না সে
বিষাদের ছায়ায় নিথর,
যেখানে মধুর বাঁশি বাজিবে মোহন সুরে
ছুটে যাব সেখানে সত্বর।

সীমাহীন আকাশের সুগভীর পাতালের
কোনো ভয়ে নহি আমি ভীত ;
সময় নাগাল আজও পায় নি যে সুদূরের,
যে দুর্গম আলোকরহিত,
সে নীরব বিভীষিকা তুচ্ছ করি' প্রাণ চায়
পান করি সুরের অমৃত।

The Flute-Player of Brindaban : অনুবাদক শ্রীসুশীল রায়

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ -কৃত অনুবাদ পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ-সম্পর্কে 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য

'পথের দাবী' ও 'ষোড়শী'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে— কেননা লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হনীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানাদেশে ঘুরে এলেম— আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখ্‌লেম একমাত্র ইংরেজ গবর্মেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গবর্মেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র— তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর— অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি— ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে— শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চল্‌বে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে— রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকৃতে পারেনা এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে। তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত— কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চল্‌তেই থাকবে— দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই— অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আস্‌বে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার

প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে 'হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য— আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি ২৭ মাঘ ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরাধারানী দেবীকে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্র : "পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ এই হয় যে পৃথিবীর লোকে জান্‌তে পারে যে গভর্মেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না, ইংরাজ সে পাত্রই নয়, তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি।"—সেই অনুরোধের উত্তরে লিখিত।

২

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ষোড়শী পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকৃত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্রচিত্র খাঁটি হয়— আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চল্‌লে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড়ো সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়— কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিতকালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারেনা,— কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজপড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেণ্টিমেণ্ট্‌মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরলমনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোনো দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি

সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকৃতে পারো— কিন্তু সকলকালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি
৪ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

আমি জ্বরে পড়ে আছি তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি— সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্ত্তমানের ভোগ বর্ত্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়, রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্ত্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্তমনে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্ত্যলোকে এসেছে তাদের সংখ্যার সীমা নেই— তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে— মাসিকে সাপ্তাহিকে সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রয়েচে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাঁখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেচ "উপস্থিত কালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার।" সেইখানেই বস্তুত সে মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্ত্তমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের— মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর,— আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এই ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার কালে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্চে। সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্য উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়, তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল— কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা কাব্য লোক-সাহিত্য— আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি। তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না— ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে— এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্ত্তি দিয়েচ—

দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের মধ্যে নিজের দাগা দেগে দিতে পারেনি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে আমার ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করে থাকে। সে এত বড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে পার্সপেক্টিভের কথা বলেচি সে হচ্চে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লিগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বল্‌তে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হত। মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকৃত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো। আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে— যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই— যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি। যদি কোনোদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি

১১ মার্চ্চ, ১৯২৮

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি ও খসড়া হইতে

রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়ার প্রথম কিস্তি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে পরবর্তী কিস্তিগুলি প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

সরোজিনী নাইডু

সরোজিনী নাইডুর কবিপ্রতিভা

সরোজিনী নাইডুর কবিখ্যাতি এসেছিল আকস্মিকভাবে; কোনো দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রত্যুষ সেই খ্যাতির পূর্ণ উদয়কে সূচিত করে নি। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ *The Golden Threshold* লণ্ডনে হাইন্‌ম্যান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা লিখে দেন ইংলণ্ডের তখনকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ও সাহিত্যিক আর্থার সাইমন্‌স্। সরোজিনীর বয়স তখন ছাব্বিশ। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতে সরোজিনীর কবিখ্যাতি একেবারে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছয়। এর পরে তাঁর আরো দুখানি কবিতাসংকলন ঐ একই প্রকাশক কর্তৃক প্রচারিত হয়। বিখ্যাত সমালোচক সার এডমণ্ড গস্-এর ভূমিকা-সম্বলিত হয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Bird of Time* প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এবং তাঁর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ *The Broken Wing* প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই দুটি বইও যথেষ্ট প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছিল। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত *The Golden Threshold*-এর পাঁচটি সংস্করণ হয়। *The Bird of Time*-এরও ১৯২৬ পর্যন্ত পাঁচটি সংস্করণ হয়; এর মধ্যে দুটি সংস্করণের প্রকাশকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই বইখানি কাব্যামোদী জনসাধারণের কাছে কতটা সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু *The Broken Wing* ভারতে এবং ইংলণ্ডে সমালোচক-মহলে প্রশংসা অর্জন করলেও অন্য দুখানি বইয়ের মত জনপ্রিয়তা লাভ করে নি বলেই বোধ হয়। প্রথম প্রকাশের পর এর আর কোনো সংস্করণ হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। এর প্রধান কারণ নিশ্চয় লেখিকার জীবনে গান্ধীজী ও স্বদেশানুরাগের আবির্ভাব এবং এই বইয়ের কয়েকটি কবিতায় এই নূতন ভাবাবেগের অকুণ্ঠ প্রকাশ। শুধু কাব্যরচনার মধ্যেই সরোজিনীর স্বাদেশিকতার আবেগ নিঃশেষিত হয় নি। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী যখন আফ্রিকা থেকে তাঁর ফিনিক্স স্কুল নিয়ে ভারতে আসেন, তখন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সরোজিনীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়। ইম্পিরিয়্যালিস্ট ইংলণ্ডের পাঠকসমাজ সরোজিনীচরিত্রের এই নতুন উন্মেষকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে নি।

কিন্তু তা হলেও কবিহিসাবে সরোজিনীর সমাদর যে অন্তত ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কমে নি তার প্রমাণ ঐ বৎসর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। ১৯০৫ সাল থেকে এই একুশ বৎসর তাঁর কবিখ্যাতির উল্লেখযোগ্য হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায় না। বরং এই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে, কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা সত্ত্বেও এই যশ এতদিন অব্যাহত ছিল, বিশেষত ইংলণ্ডের মত দেশে, যেখানে প্রতি আট-দশ বছর অন্তর সাহিত্যিক আবহাওয়ার বদল হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গেসঙ্গে অনেক ইংরেজ কবিরই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বিচলিত হয়েছিল। তাছাড়া সাহিত্যিক জগতে দুটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে; যথা, ১৯১৩ সালে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র এবং ১৯১৭ সালে টি. এস. এলিয়টের প্রথম কবিতা *The Love Song of J Alfred Prufrock*এর প্রকাশ। তবু যে পাঠকচিত্ত থেকে সরোজিনী স্থানচ্যুত হন নি, সেটাই তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটা নিঃসংশয় প্রমাণ।

কিন্তু তারপর এল যুগ-বদলের পালা। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে টি. এস. এলিয়ট এবং নূতনপন্থী ইয়েট্‌স্‌এর প্রভাবে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের মোড় গেল ফিরে। শুধু ইংরেজি নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রধান সাহিত্যেই এল নতুন চিন্তা নতুন ব্যঞ্জনার তাগিদ। এরই মধ্যে কখন সরোজিনীর কবিখ্যাতি লোকচিত্তের জীবন্ত জগৎ থেকে নির্বাসিত হল ঐতিহাসিক স্মৃতির জগতে।

ভারতে সরোজিনীর কবিখ্যাতি যতটা ছিল, তাঁর কাব্যের প্রভাব ছিল তার তুলনায় অনেক কম। এর কারণ নিশ্চয় তাঁর নির্বাচিত ভাষা। এদেশে তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা ছিল অল্পই। ১৯১২ সালে (বা হয়তো তার কিছু পূর্বে) এডমণ্ড গস্‌ সরোজিনীকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি বলে সম্বর্ধিত করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু সরোজিনী জানতেন ভারত তার বহু পূর্ব থেকেই এক অদ্বিতীয় বিরাট প্রতিভার বশীভূত। সরোজিনীর কাছে এই প্রতিভার সুখ্যাতি শুনেই হয়তো গস্‌ কিছুটা সন্দেহের সুরে এইটুকু স্বীকার করেছিলেন— 'What lyric wonders the native languages of that country may be producing I am not competent to say'। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, এই ১৯১২ সালেই ইয়েট্‌স্‌এর মধ্যস্থতায় লণ্ডনে 'গীতাঞ্জলি' পঠিত হয় এবং তার ফলে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক-সমাজে অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সরোজিনী নিজেই রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে ভারতবাসীর চক্ষে বৈদেশিক খ্যাতির মূল্য ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই সেই খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও সরোজিনীর রবীন্দ্রভক্তিতে কোনো তারতম্য ঘটে নি। তাঁর তিনখানি বই-ই প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আশীর্বাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং একাধিকবার তাঁকে এই কথাই জানিয়েছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের এতটুকু প্রশংসার দাম তাঁর কাছে অনেক বেশি।[১] রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনীর প্রতিভার তুলনা বা উভয়ের সম্পর্কনির্ণয় এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিহিসাবে এদেশে সরোজিনী যতটুকু সম্মান পেয়েছিলেন এদেশের অন্তরের রসানুভূতির ক্ষেত্রে তার জন্ম নয়; তা শুধু বিদেশে-অর্জিত খ্যাতির প্রতিধ্বনি। ভারতের সমসাময়িক বা পরবর্তী কাব্যসাহিত্যে কোথাও সরোজিনীর কোনো প্রভাব আছে কি না আমার জানা নেই।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যদি সরোজিনীর কাব্য ভারতীয় কোনো ভাষায় রচিত হত, তবে তাঁর কীর্তিকে দেশবাসীরা এত সহজে লুপ্ত হতে দিত না, অনুরাগের রসে অভিষিক্ত করে তাকে সুচিরকাল বাঁচিয়ে রাখত। আজ সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুর পর এই প্রশ্নই মনে আসে— ভারতের একজন মহীয়সী নারী হিসাবে এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর বিশেষ কৃতিটুকুর জন্য ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে; কিন্তু শুধু ভাষার বৈষম্যের জন্য আমরা এই ভারতীয় কবির কাব্যপ্রেরণাকে কি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অস্বীকার করব?

আসল কথা, এদেশের শিক্ষিত কাব্যানুরাগীদের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সরোজিনীর কাব্যে যতটা আছে শব্দযোজনার পারিপাট্য ও ঝংকার, সে পরিমাণে প্রেরণার গভীরতা বা অন্তঃসার নেই। সরোজিনী নিজেই এই প্রতিকূল মত গঠনের সহায়তা করেছেন তাঁর বাগ্মিতার

১ বিশ্বভারতী নিউজ এপ্রিল ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সরোজিনী ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরকে লিখিত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য

দ্বারা। বক্তৃতায় তাঁর বাক্‌প্রবাহ ছিল এমন সহজ ও অবাধ যে, শ্রোতামাত্রেই তার বিস্ময়কর কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হত, কিন্তু সেই পরিমাণে বক্তার আন্তরিকতার আবেদন তাদের মনে পৌঁছত না। চমকপ্রদ আর্ট নিজের বহিরঙ্গের দিকে সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে অনেক পরিমাণে নিজের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। সরোজিনীর বক্তৃতায় এই সত্যের নিদর্শন মিলত। কিন্তু সরোজিনীজীবনে ভাগ্যের পরিহাস এইখানেই যে, তাঁর অতিরিক্ত-মসৃণ এলোকোয়েন্‌সের পিছনে স্পন্দিত হত একটি সত্য আবেগময় হৃদয়, আর তাঁর শব্দলালিত্যের পিছনে ছিল অবিসম্বাদিত কাব্যানুভূতির প্রেরণা।

অতিলালিত্যের অভিযোগ সরোজিনীর বক্তৃতার সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, কাব্যসম্বন্ধে ততটা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে, এই দোষ কিছু পরিমাণে তাঁর কাব্যে আছে। যদি একে দোষই বলা যায়, তবে এই দোষ জয়দেবের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, এমনকি কালিদাস-রবীন্দ্রনাথেও কিছু পরিমাণ ছিল। অলংকার বা শব্দের স্ফীতি যখন কাব্যবস্তুকে অতিক্রম ক'রে নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তখন তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়। সেই ধ্বনিবিলাসে প্রেরণার দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যে ধ্বনি ও অলংকার আসে ভাবাবেগের সমচ্ছন্দে, আধুনিক কাব্যবিচাররীতিতে তাকেও কাব্যমূল্যের হানিজনক বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। সবক্ষেত্রে এই একই নিয়মের প্রয়োগচেষ্টাও যে একরকম জন্‌সনের যুগের সমালোচনাপদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া— একথা অনেক কৃতী সমালোচকও ভুলে যান। এই নিয়মতান্ত্রিক চিন্তা ছায়াপাত করেছে এডওআর্ড টম্‌সনের রবীন্দ্র-সমালোচনায়। শেক্‌স্‌পীয়রও রেটরিক-বাহুল্যের দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিখ্যাত সমালোচক ওয়াল্‌টার পেটার শেক্‌স্‌পীয়রের লাভ্‌স্‌ লেবার্‌স্‌ লস্ট নামক নাটকের অতিরঞ্জনময় বাচনভঙ্গিকে যে ভাবে পূর্ণ সমর্থন করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সরোজিনীর অনেক কবিতা বাইরে উজ্জ্বল, অন্তরে দুর্বল। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর অনেক কবিতা আছে যার মধ্যে পাওয়া যায় ভাব ভাষা ও ঝংকারের সুন্দর সামঞ্জস্য।

ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজি কাব্যরূপ ও ছন্দের উপর সরোজিনীর অধিকার আশ্চর্যজনক। কিন্তু তাঁর কবিতার কৃতিত্বের এই বহিরাবরণটুকুই সব নয়। তাঁর এমন কবিতার সংখ্যা খুব অল্প নয় যার মধ্যে ভাবের জীবন্তরূপ আছে। সেই কবিতাগুলির সাহায্যে তাঁর কাব্যের মর্মোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাক।

বিচিত্র এই জীবনকে খুঁজে নেওয়া বুঝে নেওয়া, তার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুভূতির যে অদ্ভুত সমারোহ তার মধ্যে নিজের চিত্তকে মগ্ন করা— এই হল সরোজিনী কাব্যের মূল প্রেরণা। এর মধ্যে ছিল একটা দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের উদ্যম, একটা কোথাও-বাধা-না-মানা অভীপ্সার আবেগ। সরোজিনীর মন কিশোরবয়সেই গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ। তিনি বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি. হয়েও আল্‌কেমির সোনার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কবিতায় সরোজিনী তাঁর পিতাকে বর্ণনা করেছেন 'সোনালি-হৃদয় শিশু' বলে। তাঁকে বলেছেন splendid dreamer in a dreamless age— স্বপ্নহীন যুগে অপূর্ব স্বপ্নদ্রষ্টা। অভিনন্দিত করেছেন আশা থেকে আশায়, জীবনের স্তর থেকে স্তরে তাঁর অশ্রান্ত অভিযানকে। তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সত্যসন্ধান আর স্বপ্নপ্রয়াণের অদ্ভুত মিলন। সরোজিনীর কিশোরবয়সটি ছিল এমনি একটি মধুর উদ্‌গ্রীব স্বপ্নে রঙিন, অজানা অশেষ সম্ভাবনার আশায় তখন দ্রুত স্পন্দিত হত তাঁর তরুণ হৃদয়। তাঁর নিজের শিক্ষা ও বুদ্ধি, পারিবারিক

Sarojini Naidu

২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬ শান্তিনিকেতন ফোটোগ্রাফ শ্রীবামন ভাণ্ডারে

আবহাওয়া, সামাজিক আবেষ্টন সবই ছিল অনুকূল। আবিষ্কারের একটা বিশাল ক্ষেত্র, মুক্তির একটা চিত্তহারীরূপ তাঁর সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ ও অধিকার করেছিল। অবশেষে একদিন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত ঔৎসুক্যকে সংহত ক'রে সরোজিনীর কবিহৃদয় দাঁড়াল সেই বাঞ্ছিত লোকের সোনার চৌকাঠে। তরুণ কবির সেই প্রথম নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল স্থান পেয়েছে *The Golden Threshold* গ্রন্থে।

সরোজিনীর এই জগতে পাই গন্তব্যহীন মুক্তির আনন্দ, উদ্দেশ্যহীন ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুখ। বাউল্ নর্তকী চুড়িওয়ালা বেদের-মেয়ে জেলে তাঁতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার মধ্যে কখনো তিনি আবিষ্কার করেন জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানের বিভিন্ন স্বাদ— ইন্দ্রিয়ের চিত্তের নতুন নতুন সার্থকতা। কখনো বা বাইরের রূপরস থেকে চোখ ফেরান নিজের অন্তরের দিকে। সেখানে চলেছে কি একটা অসমাপ্ত কাহিনীর স্বপ্নলীলা; সেখানে শোনা যায় অচেনা সৌন্দর্যের আহ্বান আর তার উত্তরে কবি-আত্মার সাড়া— কখনো আগ্রহময় কখনো বা দ্বিধায় কম্পিত। সরোজিনীর ভাষায় এই দু রকম অভিযানের প্রথমটি সত্যসন্ধান এবং দ্বিতীয়টি স্বপ্নপ্রয়াণ।

মনে হতে পারে সরোজিনীর এই কাব্যের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রথমত অঘোরনাথের কাছে তিনি ঋণী, তাছাড়া তাঁর আগে তাঁর চেয়ে শক্তিমান একাধিক কবি এই একই ভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ গ্যেটের ফাউস্টের জীবনসন্ধান, টেনিসনের ইউলিসিসের জীবনপেয়ালা শেষ পর্যন্ত পানের সংকল্প, এমনকি বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, এই তিনজন কবিদ্বারাই সরোজিনী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁর নিজের। ফাউস্টের গাম্ভীর্য, জীবনের গভীরতর রহস্য সম্বন্ধে অনিবার্য প্রশ্ন, তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব সরোজিনীর মধ্যে নেই। তাঁর কৌতূহলের সুর অনেক স্বচ্ছ, অনেক হালকা, তাতে মিশেছে যেন একটা নবীন প্রত্যাশার আগ্রহ ও আনন্দ। তাঁর The Soul's Prayer কবিতাটিতে তিনি এই তরুণ আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন :

Give me to drink each joy and pain
Which Thine eternal hand can mete,
For my insatiate soul would drain
Earth's utmost bitter, utmost sweet.
Spare me no bliss, no pang or strife,
Withhold no gift or grief I crave,
The intricate lore of love and life
And mystic knowledge of the grave.

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিঙ্গনের যে প্রয়াস দেখি, কবি-আত্মার যে অকারণ অবারণ নিষ্ক্রান্তির আবেগ অনুভব করি, তার সঙ্গেও এর কোনো মিল নেই। বরং ইউলিসিসের জীবন-স্পৃহার সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে। কিন্তু ইউলিসিসের জীবনবোধ হিরোইক্, তার মুখ মানুষের বিরাট্ কীর্তির দিকে; সরোজিনীর জীবনবোধ লিরিক্যাল্, তার লক্ষ্য বিচিত্র অনুভূতির রসাস্বাদের দিকে। এই

অনুভূতিপরায়ণতার জন্যেই সরোজিনীর কাব্যসুরের সঙ্গে বাংলার বাউল আর কীর্তনের সুরের সাদৃশ্য দেখা যায়। Wandering Singersদের মুখ দিয়ে যখন তিনি বলান The voice of the wind is the voice of our fate, তখন বাউলদের আনন্দময় বৈরাগ্যের কথা মনে পড়ে। শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে তাঁর কবিতাগুলিতে বৈষ্ণবকাব্যের অন্তরের সুরটিকে যেন নতুনভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য দু ক্ষেত্রেই এই তফাত যে, সরোজিনীর এইসব কবিতায় রসাতিরিক্ত কোনো আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার চেষ্টা নেই।

আবার সভ্যতার জটিলতা ও সূক্ষ্ম ভাববিলাসকে অতিক্রম ক'রে প্রাথমিক জীবনের সহজ সৌন্দর্যে পৌঁছবার আগ্রহ দেখা যায় সরোজিনীর এইসব কবিতাতে। ভারতীয় নর্তকীদের জীবনকে তাঁর মনে হয় সমৃদ্ধ, কারণ নাচের সময় তাদের তিনি দেখেন 'celestially panting'। চুড়িওয়ালাকে তাঁর ভালো লাগে, কারণ তার চুড়ির পশরার বর্ণসমারোহে তিনি রামধনু, ঝরনা, পাহাড়ী কুয়াশা, বা রৌদ্ররঞ্জিত শস্যের রঙ দেখেন, এবং কোন্ বয়স ও কোন্ প্রকৃতির মেয়ের হাতে বিভিন্ন চুড়ি মানাবে তাও অনুমান করেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর বেদের মেয়ে সম্বন্ধে কবিতাটি। শিকারী পাখির মত মেয়েটির সতেজসৌন্দর্য, স্বল্প তার অভাব, মাঠে যেখানে তার অস্থায়ী বাসা সেখানে রাত্রি নামে কালো প্যান্থারের মত, পৃথিবীর আদিম রহস্যের সে সহজাত—

She is twin-born with primal mysteries,
And drinks of life at time's forgotten source.

সরোজিনীর স্বপ্ন-অভিসার যেসব কবিতায় বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এইগুলি শ্রেষ্ঠ : Village-Song, To My Fairy Fancies, In the Forest এবং The Flute-Player of Brindaban। এর মধ্যে দেখি কোনো গাঁয়ের মেয়ে বিবাহবাসর ছেড়ে বনে বেরিয়ে যেতে চায়, কারণ 'The bridal-songs and cradle-songs have cadences of sorrow' এবং সে পরীদের ডাক শুনেছে। দেখি নিজের মোহময় অদ্ভুত কল্পনাগুলিকে আদরের বাঁধনে বাঁধতে না পেরে কবি তাদের বিদায় দিচ্ছেন :

Nay, no longer I may hold you,
    In my spirit's soft caresses,
Nor like lotus-leaves enfold you
    In the tangles of my tresses.
Fairy fancies, fly away
    To the white cloud-wildernesses,
        Fly away !

In the Forestএ কতকগুলি স্বপ্নের দাহক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন ক্লান্ত কবি। কিন্তু তীব্র সৌন্দর্যপিপাসা আবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষের দিকের কাব্যে, The Flute-Player of Brindaban নামক কবিতায়, যার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের দেবতা তাঁকে ডাক দিয়েছেন বাঁশির সুরে, যে ডাকে জীবনের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। সাংগীতিক মাধুর্যে এই কবিতাগুলি অসাধারণ। ওয়াল্টার ডি লা মেয়রের কবিতার মত এতে এক অপরূপ জাদুস্পর্শ আছে, সৌন্দর্যচেতনার স্বাতন্ত্র্যে এরা সম্পূর্ণ বিশিষ্ট।

দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Bird of Time*এ সরোজিনীর কবিজীবনের একটি সুস্পষ্ট পরিণতি দেখা যায়। তাঁর সৌন্দর্যচেতনা এখন আশ্রয় পেতে চায় প্রকৃতির রূপ ও রসের মধ্যে, বিশেষ ক'রে প্রকৃতির যে দিকটা স্পষ্ট প্রফুল্ল বর্ণসমারোহে মনোহর সেই দিকটায়। তাই এই সময়ে তিনি বিশেষ অর্থে বসন্তের কবি। নিজের শারীরিক অক্ষমতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি যেন নিজেকে আহুতি দিতে চান প্রকৃতির আনন্দের অগ্নিতে। কিন্তু এরই সঙ্গে এসেছে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীবনের মধ্যে এতদিনে তিনি পেয়েছেন একটি অর্থ। সৌন্দর্যবোধ তাঁকে টানে নিরালা প্রকৃতির বুকে, কল্যাণবোধ তাঁকে বার বার নামিয়ে আনে কর্মের কোলাহলময় ক্ষেত্রে। তাঁর মন যে অবশেষে বেছে নিয়েছে কল্যাণের পথ তারই প্রমাণ মেলে Death and Life ও The Faery Isle of Janjira নামে দু'টি কবিতায়, যদিও দ্বিধাবিভক্ত আগ্রহের একটা সমাধান চেষ্টা দেখা যায় এইভাবে—

Where brave hearts carry the sword of battle,
'Tis mine to carry the banner of song...

Guerdon নামক কবিতাটিতেও তিনি একই সঙ্গে তাঁর তিনটি আনন্দের উৎসের উল্লেখ করেছেন— প্রেম, সংগীত ও সত্য। শেষ পর্যন্ত এই rapture of truthই তাঁর সমস্ত চিত্তকে অধিকার করল। এটা যে সম্পূর্ণ তাঁর স্বাধীন নির্বাচন তা হয়তো নয়। মনে হয় মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত প্রভাবই সরোজিনীর এই পরিবর্তনের কারণ। গান্ধীজীর মধ্যে তিনি দেখলেন সত্যের অপরূপ মূর্তি। The Lotus নামক কবিতায় তাঁকে বললেন Mystic Lotus, আবিষ্কার করলেন সেই লোকাতীত পদ্মের মধ্যে অক্ষয় শান্তি, সত্যের অনির্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু এই সত্যের প্রেরণা কাব্যসৃষ্টির অনুকূল ছিল না, এর একমাত্র মুক্তি ছিল কর্মের ক্ষেত্রে। প্রথম যুগে যে অভিজ্ঞতাকে সরোজিনী 'সত্য' বলে অভিহিত করেছিলেন, তা ধরা দিয়েছিল তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টায়। কিন্তু নতুন এবং মহত্তর যে সত্যের পরিচয় তিনি পেলেন তা রোধ করল তাঁর কাব্যের উৎস। এই মহত্তর সত্যকে যদি তিনি তাঁর কাব্যবোধের মধ্যে ধারণ করতে পারতেন, যদি এর সম্বন্ধে তিনি বলতে পারতেন truth is beauty, তবে নিশ্চয় তাঁর কাব্যে একটি গৌরবময় যুগের প্রবর্তন হত। তাঁর কবিতায় বর্ণিত কালের পাখির মত তাঁরও আশা ছিল জগতের সমস্ত সুখদুঃখ-দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে আহরণ করবেন তাঁর গানের সুর। কিন্তু পাখির ডানা ভাঙল, সুরও ফুরল। *The Broken Wing* যখন প্রকাশিত হয় তখন মহামতি গোখলে প্রশ্ন করেছিলেন, 'Why should a song-bird like you have a broken wing ?' এর উত্তর এই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকে মাধুর্যের রসে সিক্ত করা যায় যে অভিমানহীন নম্রতায়, যে নিঃশেষ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, সরোজিনীর তা ছিল না। তাঁর চরিত্রে কোথায় ছিল একটু কাঠিন্য, লুকোনো ছিল আত্মাভিমানের অনমনীয়তা। কবিমাত্রেরই জীবনে এমন এক সময় আসে যখন তাঁর কাব্যধারা খানিক পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে হঠাৎ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা বাইরের নয়, কবির ব্যক্তিত্বের মূলবিন্যাসেই এই বাধার ভিত্তি। কাব্যপ্রেরণার আবেগ যখন একে আঘাত করতে থাকে তখন কোনো-একটি চরমত্যাগের দ্বারা তার নিঃসরণপথ তৈরি করে দিতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কদের মত কবিকেও কেবলি অগ্রসর হতে হয় চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কবি যেমন কাব্যরচনা করে চলেন, কাব্যও তেমনি কবির অন্তরজীবনকে ভেঙে গড়বার চেষ্টা করে।

তখন আসে সংকটমুহূর্ত। হয় কবিকে এমন অনেক কিছু চরিতার্থতা বর্জন করতে হয় যা তাঁর কাব্যের প্রতিকূল, না হয় তাঁকে সহ্য করতে হয় কাব্যের মরাস্রোতের দৈন্য। কিন্তু সরোজিনী তাঁর পক্ষে নিশ্চিত এবং অনায়াসলভ্য কতকগুলি পরিতৃপ্তির প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে, বক্তৃতার মঞ্চে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিদ্যুৎশিখার মত ঝলসে তোলায় একটা সুখ আছে, একটা আশুসাফল্যের কৃতার্থতা আছে। খ্যাতির এই অপেক্ষাকৃত সহজ পথকে অস্বীকার করতে পারেন নি, এই সরোজিনীর দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি তাঁর কাব্যের দেবতাকে বলতে পারেন নি—

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবে না।

রবীন্দ্রনাথ সরোজিনীর মধ্যে এই আত্মপ্রেমের বিলাস লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়েছিলেন আত্মিক নম্রতার ইঙ্গিত। বহুদিনের সাধনায় এই নম্রতা এসেছিল তাঁর জীবনে, অন্তত তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছেন তাঁদের সেকথাই মনে হবে, কিন্তু তাঁর কাব্যের ঋতু তার বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে।

মোটামুটি এই হল সরোজিনী নাইডুর কবিজীবনের ইতিহাস। উল্লিখিত কাব্যধারার বাইরেও তাঁর অনেক চমৎকার কবিতা আছে: তাঁর পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে লেখা স্নিগ্ধ করুণ কবিতা, তাঁর বাসস্থান হায়দ্রাবাদের বর্ণনামূলক কবিতা, পৌরাণিক দেবদেবী ও দেশীয় ব্রতপার্বণ বিষয়ক কবিতা, ভারতমাতা সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ ও বেদনাময় কবিতা। এর মধ্যে পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক কবিতাগুলিকে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হয় নি। কিন্তু অপর কবিতাগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তাহলেও এই কবিতাগুলি সরোজিনীর কাব্যের কোনো পরিণতির নির্দেশ বহন করে না। এখানে তাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু *The Broken Wing*এ একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখা যায়। কবিচিত্ত যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত এবং কাব্যজগৎ থেকে চিরবিদায়ের মুহূর্ত যখন আসন্ন, তখনই হঠাৎ একটি তীব্র গভীর প্রেম-অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির আত্মসমর্পণ। কবির অন্তরসমস্যার এ যেন একটি সুন্দর সাময়িক সমাধান। অতিরঞ্জনের সম্বন্ধে আগেই যা বলেছি তা এই প্রেমের কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ অলংকার ভাবের দৈন্যজ্ঞাপক নয়, এ হল ভাবসমৃদ্ধির স্বাভাবিক স্ফূর্তি। তিনি তাঁর প্রেমের অপরাধের জন্যে কুণ্ঠিত নন, অনুতপ্ত নন। ঋষির মত পবিত্র, নিষ্পাপচক্ষু তাঁর প্রেমাস্পদ স্বর্গে ভগবানের অনুগ্রহলাভ করুন, তিনি তাঁর কামনার অপরাধে যুগের পর যুগ অগ্নিদগ্ধ হতে রাজি আছেন—

So you be safe in God's mystic garden,
Inclosed like a star in His ageless skies,
My outlawed spirit shall crave no pardon—
O my saint with the sinless eyes!

আর্থার সাইমন্স্ সরোজিনীর প্রথম যুগের কবিতায় 'bird-like quality,' পাখীর কাকলির মত সহজ সংগীতক্ষমতা, আবিষ্কার করেছিলেন। এই সুরের ইন্দ্রজাল তাঁর অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ To My Fairy Fancies, The Flute-Player of Brindaban, Ecstasy, Song of Radha the Milkmaid, Village Song প্রভৃতি। গস্ সাহেবের মতে সরোজিনীর ভাষা ও ছন্দ বিলাতি হলেও তাঁর কাব্য সম্পূর্ণভাবে ভারতের মাটির ফসল। কিন্তু সরোজিনীর কাব্যে গেটে টেনিসন, এবং তাঁর প্রকৃতির কবিতায় কীট্সের প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর কাব্যে আছে। কিন্তু তাঁর মূল প্রেরণা তাঁর নিজেরই। এমন কবি কেউ আছেন কি না সন্দেহ যাঁর স্বাধীন কাব্যসৃষ্টিতে অপর কোনো কবির কাব্যের ছায়াপাতমাত্র নেই। সরোজিনীর এই মৌলিকতা সাইমন্স্ ও গস্ দুজনেই স্বীকার করেন। সরোজিনীর কাব্য ভালো করে পড়লে সন্দেহ থাকে না এ একটি নতুন কণ্ঠ, এর ধ্বনি ও আবেদন স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কয়েকশত বৎসরের নিষ্ক্রিয়তার পর ভারতবর্ষ যখন আশানিরাশার দ্বন্দ্ব অতিক্রম ক'রে একটা বৃহৎ নিঃসংশয় জাগরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, সেই সময় সেই দুর্লভ ক্ষণটির একটি বিশিষ্ট উপভোগ ধরা পড়েছে এই কণ্ঠের সংগীতে। সমুদ্রের সামনে ঋষিকণ্ঠের উদাত্ত উচ্চারণের যে মহত্ত্ব তা এই কবির মধ্যে আশা করা অন্যায়, তার জন্যে আমাদের যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সমুদ্রদর্শনে যে স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বহীন আনন্দের অধৈর্য কিশোরকণ্ঠে প্রকাশ পায়, তারও একটি মাধুর্য আছে। সরোজিনী-কাব্যের সুর এই কৈশোরের সুর। কোনো গভীর উপলব্ধি, গম্ভীর সুর এতে নেই, কিন্তু এর একটি আবেগজীবন্ত প্রত্যাশারঙিন হৃদয় আছে। ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্যের ভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ নয় যে, আমরা এই কবির এই আনন্দের দানটুকুকে অস্বীকার করতে পারি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

সরোজিনী-স্মরণে

স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুকে দেশের জনসাধারণ দেশনেত্রী বাগ্মী কবি বলেই জানেন। কিন্তু তাঁর পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণা অনেকেরই নেই, বরং অনেক ভ্রান্ত ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা জানেন তিনি নিজেকে একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন। ঐ বহিরাবরণের অন্তরালে তাঁর যে একটা স্বতন্ত্র স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় ছিল তা দিয়ে তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করে রাখতেন। তিনি একাধারে সুকন্যা সুপত্নী ও সুমাতা ছিলেন। পিতামাতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ও আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর গর্বও কম ছিল না। অবসরসময়ে তিনি তাঁর পিতামাতার কথা, তাঁদের দুজনের সুদৃঢ় বন্ধনের কথা, নিজের শৈশবের নানারকম স্মৃতির কথা বলতেন। তখন তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে বোঝা যেত শৈশবে পিতামাতা ভাইবোনদের নিয়ে জীবন তাঁর কত সুখের ও কত মধুর ছিল।

তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। মেজর নাইডুকে তিনি স্বেচ্ছাবৃত হয়ে বিয়ে করেছিলেন। পত্নীর অসাধারণ প্রতিভা ও দেশসেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখে তাঁর স্বামী তাঁকে ঘরের কোণে বেঁধে রাখেন নি। সহস্র অসুবিধা সহ্য করেও পত্নীকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন দেশের ও দশের কাজে।

কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সম্প্রীতির অভাব তাঁদের কোনোদিন ছিল না। স্বামীর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁর ছিল খুব। অনেক সময়েই তাঁর মুখে শুনেছি 'My husband says this'। নিজ গৃহের জন্য তাঁর প্রাণের টান ছিল অসাধারণ। অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন দেহমন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন তিনি বাড়ি যাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠতেন।

মনে আছে একবার আগা খাঁ প্যালেস্ থেকে বাপুর মুক্তির পর পুনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। আমি তখন লেডী থ্যাকার্সের অতিথিরূপে পুনায় উপস্থিত ছিলাম। মিসেস নাইডু তাঁর কন্যাসহ সেখানে এসে উঠলেন। বিকেলে খানকয়েক চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের চিঠির সঙ্গে ডাকে দিও'। তার মধ্যে একখানা মেজর নাইডুর নামে আর একখানার উপর নাম Nicobar Esq.। আমি অবাক হয়ে দেখছি, তিনি হেসে বললেন, 'আমাদের কুকুর। আসবার সময় ওর অসুখ দেখে এসেছি কি না, তাই একখানা চিঠি লিখলাম। যদিও আমার স্বামীর সঙ্গে ওর ভাব বেশি, কিন্তু আমি বাড়ি থাকলে ও কিছুতে অন্য কোথাও যায় না।' তারপর চলল তিন-চার দিন তারের খেলা, এখান থেকে যায় ওখান থেকে আসে। আর পদ্মজার মুখে শুধু এক কথা, 'ও মরে গেলে বাবার কি হবে। ওকে যে বড় ভালোবাসেন।' তার পর একদিন খবর এল কুকুরের মৃত্যুর। ঘরে গিয়ে দেখি, যত কাঁদছেন মা তত কাঁদছে মেয়ে। আর যত কাঁদছেন কুকুরের জন্য তত কাঁদছেন কুকুরের প্রভুর জন্য। Poor father! তখনই condolenceএর তার চলে গেল মেজর নাইডুর কাছে।

কন্যা পদ্মজার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল বিচিত্র ও মধুর। দুজনে ছাড়াছাড়ি থাকলে পনরো-ষোলো পাতার চিঠির আদানপ্রদান হত রোজ; কর্মরত দিনের অবসানে কর্মক্লান্ত দেহমন নিয়েও শোবার আগে মেয়ের কাছে চিঠিটি লেখা চাইই।

পদ্মজার শরীর বহুদিন মেরুদণ্ডের অসুখে কাতর ছিল। সে সময়ে সে শীতের তিন মাস মার কাছে থাকত। মার সহস্র কাজের মধ্যেও একটি চোখ থাকত মেয়ের দিকে। তার গায়ে গরম কাপড় যথেষ্ট আছে কি না; তার পিঠের বালিস ঠিক আছে কি না; দুধ ফলের রস সব ঠিক সময় খাওয়া হয়েছে কি না— এইসব। আমি একদিন বলেছিলাম এত কাজের মধ্যে আপনার এ কাজও তো কম নয়। তাতে বললেন, 'ওরে বাবা। ওর বাপ ওকে বছরে তিন মাস আমার কাছে ছেড়ে দেন। ওর অসুখের বাড়াবাড়ি হলে কি আমার রক্ষা আছে!' এটা অবশ্য একটা অজুহাত— তিনি নিজের দায়েই এসব করতেন। ইদানীং পদ্মজার শরীর বেশ ভালো হয়ে গিয়েছিল, সে মার কাছেই সব সময়ে থাকত। মার শরীর তখন ভেঙে পড়েছে। মা-মেয়েতে খুনসুটি লেগেই থাকত। মেয়ে নিরামিষাশী, মা অতিরিক্ত আমিষাশী; মেয়ে পরিমিতাহারী, মা অতিরিক্ত ভোজনবিলাসী। এ নিয়ে অনেক মজাও হত মাঝে মাঝে। মা বলতেন 'তোমার খাদ্যের মধ্যে আছে কি?' মেয়ে বলত, 'Mother is a glutton'। এ নিয়ে দুজনে পরস্পরকে মুখভঙ্গী করতেন সমবয়সীর মত। কিন্তু দুজনের বন্ধন ছিল দৃঢ়, ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত।

মা গেলেন জেলে, মেয়ে হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে এক বছরের জন্য কায়েম হলেন। মাসে দুবার রেলপথে যাতায়াত তার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে। এখানেও মেট্রনের সহৃদয়তায় প্রতিদিন পত্র-বিনিময় অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়ে করেছিল বিদেশিনী মহিলা। এই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল গভীর। দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল ভুগে সে মারা যায়। তার শেষ সময় তিনি অক্লান্ত সেবা

করেছিলেন এই বধূর। ছোট মেয়ের একবার শক্ত অসুখ হয়। সে ভালো হতেই জরুরি কাজে মাকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। সেবার সঙ্গে ছিল এই কন্যা। বললেন, 'এখনো ভালো করে সারে নি, তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম। নইলে ভাবনা থাকত। ওর দিকে এখনও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।'

ছোট ভাইবোনদের জন্য স্নেহ ছিল তাঁর অশেষ। তিনি প্রত্যেকের সংসারের খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। তাদের সুখদুঃখের ভাগ নিতেন সর্বদা। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে— অনেকে আমরা বসে আছি, তাঁর কাছে একখানা তার এল। পড়ে খুব হেসে বললেন, 'আমার একটি ছোট ভাইএর ছেলে হয়েছে। ওরা আমার চেয়ে এত ছোট যে ওদের ছেলেপিলে হলে আমার মনে হয় আমার একটি নাতি-নাতনী হল।'

তিনি সুপাচিকা ছিলেন, যদিও সচরাচর রন্ধনচর্চার সুযোগ তাঁর হত না। তবে সুবিধা পেলে ছাড়তেনও না সুযোগ। তাঁর মায়ের খুব রন্ধনখ্যাতি ছিল। সেকথা খুব গর্ব করে বলতেন। জেলে রন্ধনচর্চার খুব সুযোগ মিলেছিল তাঁর।

একবার আমি ও আমার পুত্র শ্রীমান জিতেন য়েরোড়া জেলে পদ্মজাকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সাক্ষাতের সুযোগও মেট্রনের অনুকম্পায় ঘটেছিল। সামনের ইণ্টারভিউতে মেজর নাইডুর আসবার কথা। তাই সেটা নষ্ট করা হয় পদ্মজার ইচ্ছা নয়। তবে সে বললে, 'আমি দেখা করিয়ে দেব।' ঘরে ঢুকলেন একখানা প্লেটে কয়েকখানা বরফি নিয়ে, মুখে কিন্তু সেদিন তাঁর সেই সহজ সরল হাসিটি ছিল না। তিনজনের মুখে তিনখানা বরফি গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমি তৈরি করেছি।' তার পর পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার বাবার চিঠি পেয়েছ কি? খবরের কাগজে অসুখের খবর দেখলাম।' পদ্মজা বললে, 'ভালোই আছেন।' তখন প্রসন্নমুখে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

একবার আমি বলেছিলাম, 'আপনার স্বামীর কি বিপদ! খবরের কাগজে নাম বেরলেও আপনার স্বামী বলে পরিচয় দেয়, পুরুষমানুষের পক্ষে এ বিড়ম্বনা!' এক গাল হেসে তিনি বললেন, 'But he likes it. He is very proud of me, you know'।

কাপড় কাচা তাঁর আর-এক রোগ ছিল। রেলে স্টীমারে রাস্তায় ঘাটে সুবিধা পেলেই কাপড় কেচে জানালায় রেলিংএ যে-কোনো জায়গায় হোক টাঙিয়ে দিতেন। আমি একদিন বললাম, 'আপনি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট। ট্যুরে যাচ্ছেন, আপনাকে কাপড় কাচতে দেখলে লোকে বলবে কি?'

বললেন, 'কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট কাপড় কাচবে না, এ কথা কংগ্রেস-আইনে লেখে নাকি?'

একটু অবসর পেলেই তিনি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে বসে যেতেন। একবার একজন লোক আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, একথা সত্য কি না। আমি হ্যাঁ বলায় সে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। ভাবটা এমন যেন মিসেস নাইডু একটা খুব গর্হিত কাজ করে থাকেন। আমি সেকথা তাঁকে বলেছিলাম। চোখ পাকিয়ে তিনি বললেন, 'কেন, ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখতে কম বুদ্ধির দরকার হয় নাকি?' তিনি সুরসিকা ছিলেন। তাঁর রসিকতা এক-এক সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। একবার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে একঘর লোকের সামনে ঐ রকম একটা কথা বলে বসলেন। কেউ মাথা নীচু করে রইল, কেউ হো হো করে হেসে উঠল, আর জহরলাল একলাফে চেয়ার

ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'You don't say so'। আর তিনি চুপ করে বসে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন যেন মস্ত বড় একটা বাহাদুরী করে বসেছেন।

তিনি দেশনেত্রী ছিলেন, সবচেয়ে উঁচু পদও পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা কর্মীর মনোভাব ছিল যা সচরাচর নেতাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এজন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করায় একটা আনন্দ ছিল। ছোট ছোট কর্মীদের তিনি উৎসাহ দিতেন, স্নেহ-ভরা আদর যত্ন করতেন, আবার দরকার হলে ধমকও দিতেন কম নয়। হায়দ্রাবাদের নিজ গৃহের জন্য তাঁর প্রাণের টান ছিল অত্যন্ত। Home বলতে বড় গর্ব ছিল। কিছুদিন পর পর গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টরূপে যখন বাংলাদেশ সফর করতে এসেছিলেন তখন যেখানে যেতেন স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের শিল্পজাত বহু জিনিস উপহার পেতেন। ফিরে এসে সেগুলি নিজ হাতে প্যাক করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই কর্মকোলাহল থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ি যান তখন আপনার সময় কাটে কি করে?' তার জবাবে তিনি বলেন, 'কেন, সংসার করি, বাড়িঘর দেখাশুনা করি, চাকরদের পেছনে টিক্‌টিক্ করি, রান্নাঘরে খানিক সময় যায়।' স্নানের জন্য মাথায় তেল মাখছিলেন, কাছে এসে বললেন, 'এই দেখ, নিজের বাগানের নারকেল থেকে নিজ হাতে তেল তৈরি করেছি। কি সুন্দর গন্ধ, দেখ।'—বলে শিশিটা আমার নাকের কাছে ধরলেন। দীর্ঘ দিন আগের কথা মনে পড়ল। আমার মাও নারকেলের দুধ দিয়ে তেল তৈরি করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি শিখলেন কোথায়?' বললেন, 'আমার মার কাছে।' আমি ভাবলাম, সেকেলে মানুষরা অনেক জানতেন যা আমরা জানি না। তার পর নোয়াখালি গিয়ে দেখেছিলাম ঘরে ঘরে এভাবে তেল তৈরি হয়। এই তেল তারা ঘিয়ের মত ভাতে মেখে খায়।

মিসেস নাইডু বলতেন, 'আমার মা'র ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জীবন যেন বৃথা হয়ে গিয়েছিল। কেবল বলতেন, তোমার বাবার কাছে কবে যাব। আমি রোজই সন্ধ্যাবেলা মা'র কাছে যেতাম। একদিন ফেরবার সময় মা বললেন, সরোজিনী, কাল আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। আমি হেসে বললাম, যাওয়া বললেই যাওয়া নাকি, ডাক এলে তবে তো যাবে। মা বললেন, হাসছ? কাল এসময়ে আর হাসবে না। কাল তোমার বাবা আসবেন নিতে। সকাল নটায় একবার এস, বিদায় নেব। আমি ভাবলাম মা'র মাথা বোধ হয় একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বয়স তো হয়েছিল। সকালে কিন্তু আমার মন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। গেলাম মা'র কাছে। গিয়ে দেখি স্নান করে সেজেগুজে বিছানায় ফুল ছড়িয়ে মা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ খুলে হেসে বললেন, এসেছ? তোমারই অপেক্ষা করছি। এখানে আমার কাছে বোস, কথা বোলো না, আমি শ্রান্তি বোধ করছি। এই বলে তিনি চোখ বুজলেন। আমি মনে মনে ভাবছি, মা'র তো কিছুই হয় নি তবে এসব কি? হঠাৎ মা'র দিকে চেয়ে দেখি তাঁর নিঃশ্বাস আর পড়ছে না। মুখে একটি মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে। মা চলে গেছেন।' এগুলি সবই ছোটখাট কথা। কিন্তু আমার মনে হয় বড় কথার চেয়ে ছোট ছোট কথায় মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক বেশি।

স্বদেশী যুগেরও অনেক আগে থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিন্তু কতটুকুই বা তাঁকে চিনতাম। তাঁকে জানতে আরম্ভ করি যখন কংগ্রেস-সভানেত্রীরূপে তিনি বাংলাদেশ সফর করতে আসেন তখন

থেকে। আমি আগাগোড়া সঙ্গে ছিলাম। ময়মনসিংহ পৌছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জনের মৃত্যু-সংবাদ পাই। তিনি নিজেই এ সংবাদ আমায় দিলেন। কিন্তু তার পর থেকে কলকাতা পৌছন পর্যন্ত তিনি একবারও আমায় সান্ত্বনাবাক্য বলেন নি, বা ওঠ খাও ইত্যাদি অবান্তর কথা বলে বিরক্ত করেন নি। তাঁর এই ব্যবহার আমার মর্ম স্পর্শ করেছিল। শোকের গভীরতা ও পবিত্রতা অবান্তর কথায় নষ্ট হয়, যে শোকসন্তপ্ত কথা তার ভালোও লাগে না, সেটা তিনি বুঝতেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তিনি দুজনে মিলে ঠিক করেছিলেন সফর স্থগিত রেখে সকলেই সেইদিন রওনা হয়ে চলে আসবেন। তাই হল, আমায় একা আসতে দিলেন না তাঁরা।

আমি অনেক সময় ভাবতাম, পাশ্চাত্য প্রভাবে মানুষ হয়ে পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষা পেয়ে এত স্বদেশ-প্রীতি তাঁর প্রাণে কোথা থেকে এসেছিল? তাঁর খুব অল্পবয়সের লেখা একটা কবিতা মনে পড়ছে। কবিতাটি একটা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সে কবিতার কথা তাঁর নিজের মনেও ছিল না। আমার ছোট ভাইটি কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসত। তাকে বললেই সে উঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করত। বহুদিনের কথা, আমার নিজেরও সবটা মনে নেই— প্রথম ও শেষ দু ছত্র মনে আছে—

Your England is mighty
Your England is free,
The Temple of justice and sweet liberty.
The Sun never sets where your flag is unfurled,
And glorious England is Queen of the World.

তার পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ছিল, শেষ দু ছত্র মনে আছে—

Yet the dust of my beautiful country to me
Is dearer than England, the land of the free.

কবিতাহিসাবে এটা তেমন কিছু নয়, তাই বোধ হয় তাঁর বইয়ে স্থান পায় নি। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, স্বদেশপ্রেমের বীজ তাঁর অন্তরে ছোটবেলা থেকেই নিহিত ছিল— এই বীজই অঙ্কুরিত হয়েছিল পরিণতবয়সে।

বহুদিনের সাহচর্যে তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ভালোবেসেছিলাম, তিনিও আমায় খুব স্নেহ করতেন। লেডী থ্যাকার্সের সুন্দর ও লোভনীয় বাগানে পদ্মজার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অনেক গল্পই হত। তার মধ্যে দিয়ে তাঁর গৃহস্থালীর একটা সুন্দর ছবি পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে। কলকাতায় এসে গভর্নমেণ্ট হাউসএ সেবার ছিলেন, তখন তিনি যুক্তপ্রদেশের গভর্নর হয়েছেন। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিলেন বোধ হয় ৭ই পৌষ উপলক্ষ্যে। এসেই পদ্মজা টেলিফোন করে বলল, 'আমরা এসেছি। মা অসুস্থ, কোথাও বেরতে পারবেন না। দেখা করতে এস।'

তার পর মৃত্যুর অল্পদিন আগে আর-একবার এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি তখন আমার গঙ্গাতীরবর্তী গ্রাম্য গৃহে। তিনি আমার বাড়িতে আসতে চেয়েছিলেন। আমি কলকাতায় নেই শুনে বললেন, 'উর্মিলাকে বোলো, আমার কিন্তু দোষ নেই। আমি যেতে চেয়েছিলাম তার বাড়ি।'— আমার সঙ্গে আর দেখা হল না জীবনে।

শ্রীউর্মিলা দেবী

রক্তকরবী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রক্তকরবী নাটকের মর্মার্থ কি? স্পষ্টত ইহা দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি কৃষিনির্ভর সভ্যতার সহিত যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব একটি আধুনিক সমস্যা! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নিছক আধুনিক সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহেন। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, "আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।" এ চিরকালীন সমস্যা যে কত বেশি পুরাতন তাহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কবি রামায়ণের কাল পর্যন্ত গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, রামায়ণে কথিত রাম ও রাবণের দ্বন্দ্বে এই চিরকালীন সমস্যার একটি তৎকালীন রূপ পাওয়া যায়। প্রচলিত-সংস্করণ রক্তকরবীর প্রস্তাবনাতে তিনি এই সমস্যাটির সম্যক্ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রক্তকরবী নাটকটির সহিত রামায়ণের মূলগত ঐক্যের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামায়ণের সমস্যাই রক্তকরবীর সমস্যা। নাটকটির শিল্পসত্তা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আগে তাহার তত্ত্বসত্তা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক— তাই সমস্যাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যত আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইবে— কিন্তু সেই দীর্ঘতাই প্রমাণ করিবে, সমস্যাটি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে।

প্রথমে রক্তকরবীর প্রস্তাবনা[১] হইতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ-করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

"ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি

১ রক্তকরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৫-৫৪৬

ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদেরঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?

"আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।···রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এক কালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারিলাম যে, রামায়ণে ও রক্তকরবীতে তত্ত্বগত ঐক্য আছে; উভয় কার্যেরই তত্ত্বগত রূপ হইতেছে, দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার দ্বন্দ্ব; রত্নাকরের দস্যুবৃত্তিত্যাগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ একটা ইঙ্গিত দেখিয়াছেন; এমনকি রাম ও রাবণ নাম দুটিও তাঁহার নিকটে দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার রসে রঞ্জিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

রামায়ণের তত্ত্ববিশ্লেষণের জের রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাতেও আছে, এবং আরও স্পষ্ট আকারে আছে। 'সীতা' শব্দটিতে তিনি একটি বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রূপক দেখিতে পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়— রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, সীতার বিবাহ, অহল্যার শাপমুক্তি— সমস্তই একটি বৃহৎ রূপকের অংশ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনুভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।·· বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তিনি শৈবরাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে-ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে-ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।"[২]

২ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ড, পৃ ৪৩২-৪৩৩। পরিচয়-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯১৬ [illegible] প্রবন্ধটির রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, রক্তকরবীতে যে তত্ত্ব প্রকাশিত কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে তাহা বিরাজ করিতেছিল।

উপরের অংশ হইতে সীতা নামের ব্যাখ্যা জানা গেল। সীতা কি না মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা। তাহা হইলে নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাবিবাহের অর্থ দাঁড়ায়— আর্যসমাজ কর্তৃক কৃষিবিদ্যাকে স্বীকার। আর রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্তৃক রাবণকে পরাজিত করিয়া সীতার উদ্ধারের মর্ম এই যে, আকর্ষণজীবী সভ্যতা কৃষিবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে কর্ষণজীবী সভ্যতায় ও আকর্ষণজীবী সভ্যতায় একটা প্রবল লড়াই বাধিয়া ওঠে। সেই যুদ্ধে রাবণ কেবল পরাজিত হইল না, সামগ্রিকভাবে আকর্ষণজীবী সভ্যতার উপরে কর্ষণজীবী সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটিল। জাভাযাত্রীর পত্রে[৩] রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও পূর্বোদ্ধৃত অংশের এবং রক্তকরবী-তত্ত্বের পোষক। কিন্তু সেসব উদ্ধারের আর আবশ্যক আছে মনে করি না, যেহেতু এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতেই সমস্যার রূপটি বিশদ হইবার কথা।

রামায়ণের সহিত রক্তকরবীর তত্ত্বগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই, নাটকটিকে যতদূর সম্ভব রামায়ণের প্যাটার্নে বা ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সীতাহরণ এবং তাহার ফলে লঙ্কাধ্বংস রামায়ণের মূল বিষয়; নাটকটিরও মূল বিষয় অনুরূপ, নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে আনয়ন এবং যক্ষপুরী-ধ্বংস। লঙ্কাপুরীর রাবণ ও যক্ষপুরীর রাজার মধ্যেও সাদৃশ্য বর্তমান। রাক্ষসগণ আকর্ষণজীবী, তাহারা কর্ষণজীবিতার বিরোধী। যক্ষপুরীর খোদাইতন্ত্রও রূপান্তরে কি তাহাই নয়? এসব বিষয়ের বিচারে তুলনাকে বহুদূর পর্যন্ত টানিয়া লওয়া উচিত নয়, আভাস-ইঙ্গিতের চেয়ে অধিক প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না। কবিও আভাস-ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়াছেন, তবু বুঝিতে পারা যায়, রক্তকরবীকে ঢালাই করিবার সময়ে রামায়ণের ছাঁচটা তাঁহার মনে ছিল।

"আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ-বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

"আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।...

"স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাক-নাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে।"[৪]

---

৩ জাভাযাত্রীর পত্র, ৭, পৃ ৪৭১-৪৭৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড   ৪ রক্তকরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৪

উদ্ধৃত অংশের সাক্ষ্যে যুক্তির বলে রামায়ণের ছাঁচের সহিত রক্তকরবীর ছাঁচের ঐক্য প্রমাণ করা যায় কি না সন্দেহ— তবে অনুভূতির বলে নিশ্চয় যায়। শিল্পবিচারে অনুভূতির সাক্ষ্যকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

যদিচ অনুভূতিই আমাদের প্রধান সাক্ষী এবং সে বেচারা ইঙ্গিতের বেশি করিতে সমর্থ নয়, তবু তাহার ইঙ্গিতময় সাক্ষ্যের অনুকূলে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে রক্তকরবী যে রামায়ণ-কাব্যের ছাঁচে ঢালাই-করা তাহা প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রামায়ণ-কাব্যে রাম ও রাবণের দ্বন্দ্ব, তাহাদের দ্বন্দ্বের হেতু সীতাহরণ। এই ঘটনাটি রক্ত-করবীতে ভাবরূপে দেখা দিয়াছে। রক্তকরবীর দ্বন্দ্ব কর্ষণজীবিতা ও আকর্ষণজীবিতার মধ্যে, মাঝখানে রহিয়াছে নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথ সীতাকে মৌলিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, সীতা অর্থাৎ হলচালন-রেখা। সোজা কথায় এই যে, সীতা কৃষিবিদ্যা, আর তাহাকেই লইয়া দ্বন্দ্ব দুই ভিন্ন গোত্রের সভ্যতায়। রক্তকরবীতেও দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতায়, তাহাদের দ্বন্দ্বের কারণ নন্দিনী। তাহা হইলে এই নন্দিনী কে? নাটকখানি বুঝিবার পক্ষে নন্দিনীর মর্মগত পরিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক, এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার আশাতেই এখন ক্ষান্ত হইলাম। আবার রামায়ণ ও রক্তকরবী দুই ক্ষেত্রেই দেখি আসল দ্বন্দ্বটা মানুষের সহিত যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। রাক্ষস-সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মতে যান্ত্রিক সভ্যতা। রামায়ণ ও রক্তকরবীর শিবির-সন্নিবেশের একপক্ষে প্রাণের মাধুর্য, অপরপক্ষে আত্মঘাতী ঐশ্বর্য; একপক্ষে আনন্দ, রাম ও রঞ্জন; রাম যে আনন্দ দান করে, রঞ্জন যে মনকে রাঙাইয়া তোলে; অপরপক্ষে রাবণ ও যক্ষপুরীর অধীশ্বর। দুইখানি কাব্যেই দেখা যায়, প্রেমের সঙ্গে লুব্ধ প্রচেষ্টার সংঘাত; রাম সীতাকে প্রেমের দ্বারা আপন করিয়াছেন, রাবণের লুব্ধ প্রচেষ্টা তাহাকে হরণ করিয়াছে; রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যেকার অদৃশ্য প্রেমসূত্রকে লুব্ধ মুগ্ধ ঈর্ষাপরায়ণ যন্ত্ররাজ বারংবার আঘাত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। এসব তথ্য যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি ইঙ্গিতময়ের অধিকও নয়, তবে কাব্যদুইখানি এক ছাঁচে ঢালাই বলিয়া অনুভূতির সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইলে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সেই বিশ্বাসের বনিয়াদ দৃঢ়তর করিয়া দিবে বলিয়া মনে করা অন্যায় হইবে না।

২

নন্দিনী কে, আর রক্তকরবী বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? এ দুটি বিষয় পরিষ্কার হইলেই নাটকখানির মর্মগ্রহণ সহজ হইবে, কারণ নন্দিনী ও রক্তকরবীর গুচ্ছের মধ্যে একটা মর্মগত যোগ আছে। নন্দিনী যাহার মানবরূপ, রক্তকরবীপুষ্প তাহারই প্রতীকরূপ; রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক। কবি মানবকন্যা নন্দিনীর রূপে যে অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহাকেই আরও নৈর্ব্যক্তিক করিয়া, আরও পারিপার্শ্বিকশূন্য বিশুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত করিয়া, রক্তকরবীপুষ্পগুচ্ছরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আগে নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা কবির ভাষাতে শোনা যাক—

"রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে সেই আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে

পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"[৫]

কবির সতর্কবাণী সত্ত্বেও নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান না করিয়া উপায় নাই এবং রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে না হোক পাপড়ির সহিত মিলাইয়া লইয়াই নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান করিতে হইবে। নন্দিনী যদি অপর্ণা বা ইলা হইত তবে তাহার স্বরূপ সন্ধান করিবার কথা কাহারো মনে উঠিত না, তাহার রূপেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু নন্দিনী যে যক্ষপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে সকলেই কিছু-না-কিছু সন্ধান করিয়া মরিতেছে। সেখানকার অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ শব্দের অর্থ খুঁজিতেছে, সেখানকার খোদাইকরের দল মাটির তলায় সোনা খুঁজিয়া মরিতেছে, জালের আড়ালের রাজা নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে সন্ধান করিতেছে, স্বয়ং নন্দিনী রঞ্জনকে খুঁজিতে আসিয়াছে— এমন আবহাওয়ায় হতভাগ্য সমালোচক যদি নন্দিনীর স্বরূপসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাহার ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু কবি স্বয়ং অন্যত্র নন্দিনী রূপ ব্যাখ্যা করিয়া পথপ্রদর্শন করিয়াছেন—

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

"এই ভাবটা আমার রক্তকরবী-নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"[৬]

স্বভাবতই সংসারের একটা দিক যান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাষ্ট্রিক কাঠামো, সবই অল্পবিস্তর যান্ত্রিক, তাহাকে বাদ দিলে মানুষের চলে না, যেমন কঙ্কালের নীরস অথচ দৃঢ় কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবদেহের চলে না। কিন্তু কঙ্কালের কাঠামোটাই সব নয়, তার উপরে রক্তমাংস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে দেহের লাবণ্য ও মুখশ্রী। ঐখানেই মানুষের পরিচয়, কঙ্কালে কঙ্কালে ভেদ নাই। কবি বলিতে চান, যন্ত্র এবং প্রাণ, দার্ঢ্য ও প্রেম, কর্তব্য ও আনন্দ মিলাইয়াই জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যন্ত্রের দিকটাই প্রবল হইয়া

৫ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৬

৬ যাত্রী, পৃ ৩৮৪-৩৮৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড

ওঠে, তখন সে সমাজ মরিতে বসে। তখন সেই সমাজের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে নয় সেই সমাজ ধ্বংস হয়। যক্ষপুরী সেইরকম একটি সমাজ। যন্ত্র সেখানে সর্বশক্তিমান হইয়া মানুষকে পীড়িত ও মনুষ্যত্বচ্যুত করিতেছে। যক্ষপুরীর সৌভাগ্য যে, মহতী বিনষ্টির আগেই সেখানে নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নন্দিনী কি না আনন্দদায়িনী।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে, অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান অবতীর্ণ হন। তিনি মুক্তিদাতা-রূপে আসেন। নন্দিনী মুক্তিদাত্রীরূপে আসিয়াছে। যক্ষপুরীর সমাজে প্রাণের অভাব ঘটিয়াছে, ধর্মের অভাবও বলা যাইতে পারে, কেননা, অধর্ম প্রাণহরণ দিয়া শুরু করে, প্রেম হরণ ও সৌন্দর্যদৃষ্টি হরণ করিয়া তাহার কাজের সমাপ্তি ঘটে।

পুরুষ সন্ধানস্বভাবী, সন্ধানের প্রেরণায় সে কেবলি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কি বহির্বিশ্বে, কি অন্তর্লোকে, কোথাও তাহার সন্ধানের শেষ নাই। কেহ খুঁজিতেছে মাটির তলাকার সোনা, কেহ খুঁজিতেছে মনের তলাকার গূঢ়সত্তা ; তাহার এই অনন্ত সন্ধানদৌড়ের আর শেষ নাই, এমন সময়ে সমাপ্তির অবগুণ্ঠনবতী নারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্তব্যের খাতিরে পুরুষ কেবলি যন্ত্র গড়িয়া চলিয়াছে, যন্ত্রকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে। এমন সময়ে নারী সেখানে আনে প্রেম। পুরুষ টানিতেছে বাহিরের দিকে, নারী টানিতেছে ভিতরের দিকে— দুই টানাটানিতে সমন্বয় ঘটিলে পূর্ণতার শতদল বিকশিত হইয়া ওঠে, সেই শতদলের উপরেই তো বিষ্ণুসনাথা লক্ষ্মীর আসন। পুরুষী শক্তি ও নারীশক্তির যথার্থ সমন্বয়ে সংসারের পূর্ণতা। কিন্তু বাস্তব সংসারে এমন পূর্ণতা কখনো কদাচিত ঘটিয়াছে। যক্ষপুরীতে তো ঘটেই নাই— পুরুষী শক্তি সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়া দুর্ভেদ্য যন্ত্রে আপনাকে দুর্জয় করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তাই সেখানে নারীশক্তিরূপিণী, প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক রূপে নন্দিনী আবির্ভূত। এই নাটকের মধ্যে নন্দিনী কোথা হইতে আসিল কবি বলেন নাই, ইচ্ছা করিয়াই বলেন নাই, প্রয়োজন নাই বলিয়াই বলেন নাই। বিশ্ববিধানের ইঙ্গিতে যে আসিয়াছে, সে সংবাদ বিশেষ করিয়া দিবার সার্থকতা কি ?

নন্দিনীর স্বরূপ হয়তো কতকটা পরিষ্কার হইল। এবারে রক্তকরবীর পুষ্প বলিতে কবি কি বোঝেন দেখা যাক। আগেই বলিয়াছি যে, নন্দিনী ও রক্তকরবী অভিন্ন। দুয়ের স্বরূপ এক, কিংবা বলা চলে যে নন্দিনীর প্রতীক রক্তকরবীর পুষ্পগুচ্ছ।

এবিষয়ে একখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাইতেছে—"মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন— দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নাই। উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, ভয় ছিল জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যতসব মানুষের রচা কৃত্রিম অসত্য বস্তু। রক্তকরবীতে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে ? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়-জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবীগাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাই নি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ ক'রে একটি সুকুমার করবীশাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির

সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী' 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার মন তৃপ্ত হয় নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।"[৭]

পত্রখানির মর্ম অবগত হইবার পরে রক্তকরবীর স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। "চারদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার [নন্দিনীর] আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।" রক্তকরবীর চারাটিও কি তেমনি ভাবে ওঠে নাই; নন্দিনীকে যক্ষপুরীর জালে চাপা দিতে পারে নাই, রক্তকরবীর চারাটিও তো লোহার স্তূপের জালজঞ্জালে চাপা পড়ে নাই। নাটকে আছে যে, যক্ষপুরীর একান্তে অনাদরে অবহেলায় আবর্জনাস্তূপের নিকটে একটিমাত্র রক্তকরবীর গাছ আছে। যক্ষপুরীর যে ব্যবস্থা তাহাতে রক্তকরবীর গাছ অধিক থাকিবার কথা নয়। সে ফুলের সন্ধানও আবার রাখে কিশোর নামে একটি বালক। ভালোবাসার দৃষ্টিতে সে নন্দিনীকে দেখিয়াছে, তাই তাহার দৃষ্টিতে বুঝি রক্তকরবীর গাছটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পত্রোল্লিখিত রক্তকরবীর চারাটি একটি ফুল ফুটাইয়া বলিয়া গেল যে, তাহাকে মারিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। নাটকের শেষেও দেখি, যক্ষপুরীর কঠিন পাথরের উপরে বুকের রক্ত টানিয়া যেন এক গুচ্ছ রক্তকরবীর ফুল ফুটাইয়া দিয়া রঞ্জন বিদায় লইয়াছে। সে যেন পত্রখণ্ডে লিখিত রক্তকরবীর চারাটির মতোই বলিয়াছে—'মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই'। প্রাণের প্রতি, প্রেমের প্রতি, আনন্দের প্রতি অর্থাৎ নন্দিনীর প্রতি রঞ্জন তো অবিশ্বাস পোষণ করে নাই। তবে আর মরিল কই? ঐসবের প্রতি অবিশ্বাসেই তো মৃত্যু। নাটকের চূড়ান্তে নন্দিনী ও রক্তকরবী এক হইয়া গিয়াছে, গিরিশিখরের চূড়ান্তে অস্তমান সূর্য ও জলন্ত মেঘ যেমন করিয়া এক হইয়া যায়।

দুই-ই যদি এক, তবে পৃথক সত্তা বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? নন্দিনী মানবকন্যা, মানবগুণ বা পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়া তাহার মধ্যেকার বিশুদ্ধ প্রাণরূপ দেখানো সম্ভব নয়। প্রাণের ও প্রেমের, আনন্দের ও সৌন্দর্যের রূপটিকে বিশুদ্ধভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রক্তকরবীর অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং তাহার উপরে প্রতীকের আরোপ করিতে হইয়াছে। কোনো বস্তুর বিশুদ্ধ রূপটি একমাত্র প্রতীকের দ্বারাই প্রকাশ সম্ভব।

৩

নন্দিনী-চরিত্র নাটকখানির প্রাণ। তাহার প্রাণবেগে নাটকের ঘটনা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যে যক্ষপুরী এতকাল স্তিমিতবেগে আপনার অভ্যস্ত পথে চলিতেছিল নন্দিনীর প্রাণপ্রবাহ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনে নন্দিনী বেমানান, এখানে সে খাপ খায় নাই বলিয়া কেহ-বা তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, আবার কেহ-বা তাহাকে একটা দুর্যোগ মনে করিয়া যক্ষপুরী হইতে বাহির করিয়া দিবার

৭ বর্তমান লেখকের নিকটে লিখিত পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পত্র

চেষ্টা করিতেছে। যক্ষপুরীর জড়-সংস্থাতে নন্দিনীরূপ প্রাণকণা এক বিপর্যয় ঘটাইবার মুখে— এমন অবস্থায় নাটকের সূত্রপাত।

"জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী-নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।"[৮]

নাটকখানির অন্যান্য পাত্রপাত্রীকে বুঝিতে হইলে নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নন্দিনীর আবির্ভাবের পটভূমিকায় প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, নন্দিনীর আগমনে বিভিন্ন চরিত্রে যে অভাবিত প্রতিক্রিয়া জন্মিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই তাহাদের মনের গতিবিধি বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা অধ্যাপক পুরাণবাগীশ কিশোর গোঁসাই ফাগুলাল চন্দ্রা বিশু ও সর্দার প্রভৃতি নাটকখানির প্রধান পাত্রপাত্রী। অবশ্য রঞ্জনও আছে কিন্তু তাহাকে স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নন্দিনীর প্রতি রাজার মনে দুটি বিরুদ্ধ ভাব— একটা আকর্ষণের, একটা বিকর্ষণের ; একটা নন্দিনীর দিকে তাহাকে টানিতেছ, আর-একটা নন্দিনীকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে। রাজা যেখানে যক্ষপুরীর অধীশ্বর, অর্থাৎ যক্ষপুরীর যন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম যন্ত্র, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার বিকর্ষণ। রাজা অজ্ঞাতসারে বুঝিয়াছে যে, এই মেয়েটি তাহার যন্ত্রধর্মকে বিকল করিয়া দিবার জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু রাজা যেখানে মানুষ, যক্ষপুরীর জটিল জালের আড়ালে থাকিয়া যেখানে তাহার মানব-হৃদয় অপর হৃদয়ের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ। যন্ত্রস্বভাব ও মানব-স্বভাবের দ্বৈত উপকরণে যক্ষপুরীর রাজা গঠিত। তাহার দ্বৈত স্বভাবের পরিচয়দান-উপলক্ষ্যে কবি বলিতেছেন—

"আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

"আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে

নাট্যপরিচয়, রক্তকরবী, পৃ ৩৪২, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড

পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"[৯]

উপরের বর্ণনা হইতে মকররাজ্যের যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে জানা গেল যে, রাজা অমিত-শক্তি। তাহার সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তি যুক্ত হইয়া তাহাকে প্রবল ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছে। আর জানিলাম যে, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি, বিভীষণ ও রাবণ, তাহার এক দেহেই বিরাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় জানিতে পারিলাম, তাহার বিপুল সমৃদ্ধির মাঝখানে একটি মানবকন্যার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই মানবকন্যাটির স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় রাজার মধ্যেকার সহজাত মানববুদ্ধি ও চেষ্টায়ত্ত বৈজ্ঞানিক শক্তি, তাহার মধ্যেকার রাবণ ও বিভীষণ আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির, রাবণের উপরে বিভীষণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, রামায়ণের মতো ঘটনা-প্রবাহে ঘটে নাই, অর্বাচীন কালের শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া ভাবনাপ্রবাহে ঘটিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আজ দশানন ও সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিপদ এই যে, মানুষে এই শক্তিকে নিজের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিতে জানে না। বালকের হাতে অস্ত্র পড়িলে তাহা দিয়া সে যেমন যথেচ্ছ আঘাত করিয়া একপ্রকার গৌরব অনুভব করে, অবশেষে তাহার ক্লান্ত হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়ে, মানুষের আজ তেমনি দশা। মানুষ আজ ক্লান্ত। এই ক্লান্তির অবসান হইতে পারিত, বৈজ্ঞানিক শক্তির চরিতার্থতা হইতে পারিত— যদি সে আপনার প্রাণধর্মের সহিত যন্ত্রধর্মকে কোনোরকমে মিলাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহা তো আজও হইয়া উঠিল না, বরঞ্চ দেখিতেছি যে, যন্ত্রের চাপে প্রাণ আজ পীড়িত। সেই পীড়া মানবসমাজ আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। মকররাজও সেই পীড়ায় পীড়িত, ক্লান্ত। তাই নন্দিনীর প্রতি তাহার এমন আকর্ষণ, তাই তাহার প্রতি একরকম সূক্ষ্ম প্রণয়ের ভাব সে অনুভব করে, তাই রঞ্জনের প্রতি তাহার ঈর্ষার অন্ত নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ প্রাণরূপের প্রতি যন্ত্রপীড়িতের যে মনোভাব, নন্দিনীর প্রতি মকররাজ তাহাই অনুভব করিতেছে।

এ যেমন গেল তাহার একই দেহে প্রাণময় ও যন্ত্রময় সত্তার অস্তিত্ব, আবার দেখি সে একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। পাপের পালনের জন্য সে দায়ী বটে, কিন্তু তাহার প্রতি একটা প্রতিবাদও আছে তাহার মনে। নন্দিনী আসিবার আগেও ছিল, সুপ্ত ছিল; নন্দিনী আসিয়া সেই সুপ্ত প্রতিবাদকে জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনের যে জটিল জালকে সে সৃষ্টি করিয়াছে, অবশেষে নিজের রচা যে জটিল খানার আড়ালে সে অন্তরায়িত, একদিন নন্দিনীর প্রেরণায় ও প্ররোচনায় তাহাকেই দীর্ণ করিয়া সে মুক্ত হইয়াছে, আপনার রচিত প্রাণহীন নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

এ মুক্তি মানবের মুক্তি, জড়বাদের যন্ত্রবাদের অতিকায়িক নিষ্পেষ হইতে প্রাণের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, মানুষ যতই যন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া, জড়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ুক না কেন, তাহার মৌলিক প্রাণধর্ম একেবারে বিনষ্ট হয় না। গুহার ভিতরে জল জমিতে জমিতে এক সময়ে যেমন পাথর ভেদ করিয়া তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, জড়ে ও যন্ত্রে চাপা-পড়া প্রাণও তেমনি মুক্তির মুহূর্ত খুঁজিতেছে

৯ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৪৪, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড

—একদিন না একদিন স্বসমুখ বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিবেই। কিন্তু তাহার জন্যে চাই প্রাণের প্ররোচনা। নন্দিনী সেই প্ররোচনা বহিয়া যক্ষপুরীতে অবতীর্ণ।

উপরের উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাপ বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন? জড়ের কাছে আত্মসমর্পণকেই তিনি পাপ বলিতেছেন। নন্দিনীর প্রাণবেগ যক্ষপুরীর জড়ধর্মের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণের মুক্তির পন্থা সুগম করিয়া দিয়াছে।

এখানে রঞ্জনের ব্যাখ্যা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। রঞ্জন ও রাজা একই ধাতুতে গড়া—ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চান যে, উভয়ের মধ্যে ধাতুগত সাদৃশ্য আছে। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে, আবার রাজার প্রতিও একটা আকর্ষণ অনুভব করে; যদিচ তাহাকে ভালোবাসা বলা চলে না। দু'য়ের প্রভেদের কারণ, রঞ্জন হইতেছে মানুষের বিশুদ্ধ রূপ, জড় ও যন্ত্রের ঊর্ধ্বে সে প্রতিষ্ঠিত। আর রাজা যন্ত্র-চাপা-পড়া মানুষ—তাহার মধ্যে মানুষের বিশুদ্ধ রূপটা দেখিতে পাই না, জালের ফাঁকে ফাঁকে কিয়দংশমাত্র দেখি। তাই তাহার প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণটা প্রেমে গিয়া পৌছাইতে পারে নাই, রঞ্জনের মধ্যে যে নির্মুক্ত মানবরূপ প্রত্যক্ষ তাহারই প্রতি নন্দিনীর প্রেমের আকর্ষণ। কবি বলিতে চান, প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ, গভীরতম আকর্ষণ মানুষের প্রতি; যন্ত্রের প্রতি তাহার মোহের ভাব থাকিতে পারে, শক্তির প্রতি তাহার বিস্ময়ের ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসিতে সে মানুষকেই বাসিবে। তাহার হাতের রক্তকরবীর রাখী মানুষের হাতের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সমাজ ও সংস্কার পক্ষে নিয়মতন্ত্র অপরিহার্য, কিন্তু সেই নিয়মতন্ত্র প্রাণের বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিলে বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। তখন তাহাকে ভাঙিবার প্রয়োজন হয়। যক্ষপুরীর নিয়মতন্ত্র অদৃশ্য প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লাভ করিয়া যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। তাহাকে ভাঙিবার জন্যই নন্দিনীর আবির্ভাব। যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিতে হয়। তাহাকে ভাঙিবার অন্য উপায় নাই। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ ধারণা। তাঁহার অন্যান্য নাটকেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিৎ আপনার প্রাণ দিয়া মুক্তধারার বাঁধটাকে আঘাত করিয়াছে। অচলায়তন-নাটকের অন্তর্গত পঞ্চক আপনার দুর্বাধ প্রাণশক্তির প্রয়োগ করিয়াছে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে। অচলায়তনের আচার্য ও রক্তকরবীর রাজা—দুইয়েরই এক অবস্থা। তাহাদের খানিকটা নিয়মতন্ত্রের দ্বারা গ্রস্ত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ তাহাদের মধ্যে আছে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদেরই জয়লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু রক্তকরবী-নাটকের সকল পাত্রপাত্রী এমন সৌভাগ্যবান নয়, তাহাদের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রস্ত। সর্দার প্রভৃতির কথাই আগে ধরা যাক। সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার প্রভৃতি কেবল নিয়মতন্ত্রের অঙ্গীভূত নয়, তাহারা এই নিয়মতন্ত্রকে অটুট রাখিবার কাজে নিযুক্ত। নিয়মতন্ত্র তাহাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিয়াছে, আবার তাহারা নিয়মতন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে—এইভাবে একটি বিষচক্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

গোঁসাই ও চিকিৎসকও নিয়মতন্ত্রের ধারক ও বাহক। গোঁসাইয়ের কাজ ধর্মোপদেশ-দান। কিন্তু তাহার এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্মোপদেশকে সে নিয়মতন্ত্রের অনুগত করিয়াই দান করে। উপদেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে সর্দারকে জানায়—

"বাবা, দন্ত্য-ন-পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা বেশ মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা।"

এখানে 'ধর্মেই ধর্মের শেষ' নয়, ধর্ম এখানে সম্পদের হেতু, ধর্ম ও ফৌজ যমজ প্রহরী-যুগলের মতো এখানে নিয়মতন্ত্রের রক্ষক। ধর্ম যখন নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় তখন তাহার মতো বালাই আর নাই।

যক্ষপুরীর চিকিৎসক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষকে চিকিৎসা করে না। মানুষকে যন্ত্রের পায়ে বলি দিবার উদ্দেশ্যেই সে মানুষকে রক্ষা করে।

অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি। কিন্তু যক্ষপুরীর এমনি আবহাওয়া যে তাহার বুদ্ধিটা নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সর্দার প্রভৃতির মতো সে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয় নাই। কেননা, নন্দিনীকে দেখিয়া তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তি জন্মায়। নন্দিনীকে দেখিয়া সে বলে—

"ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।"

সে বলে—

"আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।"

যক্ষপুরীর সময় কাজের চাপে ভরাট, কোথাও ফাঁক নাই। নষ্ট করিবার মতো সময় যাহার আছে, বুঝিতে হইবে সর্বতোভাবে নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া সে পড়ে নাই।

বস্তুবাগীশ ও অধ্যাপকের তুলনায় পুরাণবাগীশ লোকটা এখানে নবাগন্তুক। সে এখানকার হালচাল ভালো বুঝিতে পারে না। অধ্যাপক তাহাকে বুঝাইয়া বলে—

"পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকের হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।"

অধ্যাপকের বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল এখানে থাকিলেই পুরাণবাগীশ যক্ষপুরীর জনতার মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া যাইবে।

ফাগুলাল ও চন্দ্রা স্বামীস্ত্রী। যক্ষপুরের জীবনে অভ্যস্ত হইলেও দেশের টানটা এখনো তাহাদের আছে। নবান্নের সময়ে দেশে ফিরিবার জন্য সর্দারের কাছে তাহারা ছুটি চাহিয়াছে। নন্দিনী যাহাদের মনে উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইয়াছে ফাগুলাল তাহাদের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত সে নন্দিনীর নেতৃত্বে চালিত বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়াছে। নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণকে চন্দ্রা ঈর্ষার চক্ষে দেখে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সে এখনো নারীস্বভাবভ্রষ্ট হয় নাই। যক্ষপুরের নরনারী সোনার রসে এমনি মশগুল যে, সামাজিক মানবের সাধারণ দোষটুকু হইতেও তাহারা বঞ্চিত।

কিশোর নবাগন্তুক খোদাইকর। যক্ষপুরী এখনো তাহাকে গ্রাস করে নাই, তাই সে নন্দিনীর প্রতি প্রীতির টান অনুভব করে। সেই প্রীতির টানে দুষ্প্রাপ্য রক্তকরবী ফুল জোগায় সে নন্দিনীকে, গান জোগায় যেমন বিশুপাগল।

বিশু পাগল। এক সময়ে সে নিয়মতন্ত্রের অধীন ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদৃষ্ট তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। যক্ষপুরীতে এখন সে বেমানান, সেখানকার লোকে বলে পাগল, বাহিরের লোকে বলিবে মুক্তপুরুষ। এইরকম এক-একটা মুক্তপুরুষ বা পাগল বা ঠাকুরদাদা বা বাউল রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই আছে। বিশুকে সেই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়া বিচার করা উচিত। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে সম্বন্ধ, আলোচ্য নাটকে নন্দিনীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ বিশুপাগলের। দু'জনেই মুক্তপুরুষ, মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া বেড়ানোই তাহাদের কাজ। তাহাদের মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া অভিজিৎ ও নন্দিনী ছুটিয়াছে, যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে।

৪

নাটকখানি যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য কবি আবহসংগীতরূপে ফসলকাটার গানটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যক্ষপুরীর কানে সে গান প্রবেশ করে না, যাহারা সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের কানে অন্তত প্রবেশ করে না। নাটকটির ঘটনার কাল পৌষ, ফসলকাটার সময়, নবান্নের পর্ব আসন্ন। শীতকাল যেমন ফসলকাটার সময়, তেমনি আবার খোদাইকার্যের পক্ষেও প্রশস্ত— কালের ধর্মের মধ্যেই দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত, কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

একদিকে যক্ষপুরীর খোদাইকরের দল পৃথিবীর অন্ত্র ভেদ করিয়া সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছে আর অন্যদিকে দূরে মাঠের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে— 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে'। কিন্তু পৌষের ডাক যক্ষপুরীর কাহার কানে ঢুকিতেছে? রাজার কানে ঢোকে না, নন্দিনী তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে শুনিতে পায় বটে, কিন্তু মাঠে গিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

আর শুনিতে পায় বিশু ফাগুলাল ও চন্দ্রা। কিন্তু ইহারা কেহই তো সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত নয়। সর্দার ও খোদাইকরের দল শুনিতে পায় না, কিংবা শুনিতে পাইলেও পৌষের ডাককে একটা আপদ মনে করে, মনে করে যে যক্ষপুরীর ব্যবস্থাকে পণ্ড করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় পৌষের আসর হইতে, চাষের ক্ষেত হইতে, কৃষিতন্ত্র হইতে তাহারা দেহে ও মনে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষবয়সের অনেকগুলি নাটকে আবহসংগীতের ইঙ্গিতের দ্বারা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর গীতিভূমিকা এবং মুক্তধারার ভৈরবপন্থী গান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। রক্তকরবী-নাটকের ফসলকাটার গান সেই পর্যায়ভুক্ত।

৫

রক্তকরবী-নাটকখানিকে বিশেষভাবে যন্ত্রবাদসমস্যার নাটক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। বড়োজোর যন্ত্রবাদকে একটা উপলক্ষ্য মনে করা চলিতে পারে। যন্ত্রবাদ বা Industrialism নাটকখানির ঘটনাংশ, কিন্তু ইহার ভাবনাংশ কি? যন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে নিয়মতন্ত্রের আতিশয্যে মানুষের হৃদয়

কিরূপ অসাড় হইয়া পড়ে, অসাড় হৃদয় কিরূপে শুভাশুভবোধকে লঙ্ঘন করিতে থাকে, শুভাশুভবোধ লোপ পাইলে শক্তিমানের নিকটে দুর্বল কিরূপে প্রয়োজনসাধনের উপকরণে পরিণত হয়— তাহারই চিত্ররূপপ্রদর্শন এই নাটকের মুখ্য লক্ষ্য। যন্ত্রবাদসমস্যা উপলক্ষ্যমাত্র। আরও সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের দ্বন্দ্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। নন্দিনী প্রাণের প্রতীক, যক্ষপুরীর সামগ্রিক জীবন মানবস্বভাব বর্জন করিয়া জড়ের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহে আরও আছে। জ্ঞানকৈবল্যের আতিশয্যে মানুষ কিরূপ মূঢ় হইয়া পড়ে অচলায়তন-নাটকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষমতাপিপাসায় মানুষের শুভবুদ্ধি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহাই প্রদর্শিত মুক্তধারা-নাটকে; আর যন্ত্রবাদের অতিবাদিতায় মানুষ কিরূপ প্রাণহীন হয়, নির্জীব সোনার তাল তুলিতে তুলিতে মানুষ কিরূপ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তাহারই প্রকাশ রক্তকরবীতে। তাই যন্ত্রবাদকে লক্ষ্য না মনে করিয়া উপলক্ষ্য মনে করাই উচিত, মানুষের মনের উপরে যন্ত্রবাদের আতিশয্যজাত প্রতিক্রিয়াটাই নাটকের লক্ষ্য। নাটক-তিনটির মধ্যে আরও একপ্রকার যোগ বর্তমান। জ্ঞানকৈবল্যে মানুষের চিত্ত কিরূপ অসাড় হয় তাহার দৃষ্টান্ত অচলায়তন, ক্ষমতালোভে মানুষের হৃদয় কিরূপ জড়ধর্মী হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত মুক্তধারা, আর যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের কর্মশক্তি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত রক্তকরবী। রক্তকরবী-নাটকের কর্মপ্রবাহ বেগবান হওয়া সত্ত্বেও কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্বরূপ রাজা স্বয়ং আপন সৃষ্ট জালের অন্তরালে আবদ্ধ। যে যন্ত্র মানুষের কর্মশক্তি বাড়াইয়া দেয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কবি বলিতে চান, সেই যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত মানুষের কর্মশক্তি হরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। জালান্তরিত রাজা তাহারই দৃষ্টান্ত। জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার পরেই সে পুনরায় আপন কর্মশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। অচলায়তনের প্রাচীর, মুক্তধারার বাঁধ, আর রক্তকবরীর জাল— তিনটিই প্রতীক; যথাক্রমে মানুষের বুদ্ধির জড়তার, ভালোবাসার নিরুদ্ধ স্রোতের এবং কর্মশক্তির বিকলতার প্রতীক। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া বুদ্ধি জড়তামুক্ত হইয়াছে, মুক্তধারাতে বাঁধ ভাঙিয়া অভিজিতের মৃত্যু ঘটায় আবদ্ধ স্রোতস্বিনী এবং রাজার হৃদয়ের ভালোবাসা পুনঃপ্রবাহিত হইয়াছে— আর রাজা আপন জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তবেই আপন কর্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

৬

নাটকখানির পাত্রপাত্রী কেহই ব্যক্তিবিশেষ নয়— সকলেই শ্রেণীবিশেষ, কেহই ব্যক্তিরূপ নয়— সকলেই শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানেই একপ্রকার প্রতীক। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের বৈশিষ্ট্য ক্রমেই লোপ পাইতেছে। কোনো বড়ো কলকারখানার সহরে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সহরটা একটা বিশাল দাবার ছক, তাহার বাড়িঘর পথঘাট সমস্তই নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা। মানুষগুলা অবধি ছাঁচে ঢালা। কারখানায় প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সংখ্যায় পরিণত হয়। মনুষ্যত্বের অর্থ যদি মানুষের বিশিষ্ট স্বভাব বা গুণ হয় তবে বলিতে হইবে যন্ত্রবাদের প্রসারের ফলে মনুষ্যত্বের নিশ্চয়ই লোপ হইতেছে, আর তাদের স্থলে সংখ্যারূপের উদ্ভব হইতেছে। সংখ্যারূপ শ্রেণীরূপের চেয়েও আরও নির্গুণ, আরও ফিকা। এই ভাবটি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কবি যক্ষপুরীর পাড়াগুলিকে দন্ত্য-ন-পাড়া, মূর্ধন্য-পাড়া প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মানুষের

ব্যক্তিগত নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই তাহারাও নামের দ্বারা পরিচিত নয়, ব্যবসায়ের দ্বারা পরিচিত, যেমন অধ্যাপক গোঁসাই চিকিৎসক ইত্যাদি। বিশু যখন খোদাইকর ছিল তখন ছিল ৬৯-ঙ, তার পরে সে ব্যাবসা পরিত্যাগ করিবার পরে আপন নামের দ্বারা পরিচিত, তবু সে ব্যক্তিবিশেষ নয়; সে বিশুপাগল অর্থাৎ যে-কোনো পাগল। ফাগুলাল চন্দ্রা কিশোর স্বনামের দ্বারা পরিচিত— তাহারা এখনো সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত হয় নাই, হইলে বিগতনাম হইয়া সংখ্যায় পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই। আনন্দমঠে যেমন সবাই সন্ন্যাসী এবং সবাই একই ছাঁচের সন্ন্যাসী— অর্থাৎ কাহারো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাই, যক্ষপুরীতেও অনেকটা সেইরকম আর কি। Regimented হইলে পর মানুষের বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব কর্মধারা সব একই ছাঁচে ঢালাই হইয়া যায়। প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আতিশয্য সত্ত্বেও স্বয়ং মকররাজও ছাঁচে-ঢালাই। কেবল নন্দিনীতে বিশিষ্ট গুণ বা ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণ আছে। কবি তাহাকে একেবারে সংখ্যায় পরিণত না করিলেও বিশিষ্ট গুণ ও ব্যক্তিত্ব যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ সে প্রাণের প্রতীক। কিন্তু মানুষ করিয়া গড়িতে গেলে কিছুপরিমাণ ব্যক্তিত্ব না দিয়া উপায় থাকে না, তাই নন্দিনীর গুণকে আরও নির্যাসিত করিয়া লইয়া রক্তকরবী প্রতীকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রাণময় মানুষের নির্যাস নন্দিনী, নন্দিনীর নির্যাস রক্তকরবী, রক্তকরবী বিশুদ্ধ প্রতীক। এই নাটকের অপর প্রতীক লোহার জাল। লোহার জাল ও রক্তকরবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া শেষ পর্যন্ত লোহার জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারে পূর্বে-উদ্ধৃত পত্রখানি স্মরণ করা যাক। লোহালক্কড়ের জঞ্জালের স্তূপে চাপা-পড়া রক্তকরবীর চারাটি মরে নাই, সুযোগ পাইবামাত্র ছোট্ট একটি লাল ফুল ফুটাইয়া সে বলিয়াছিল— জড় লোহার স্তূপ চাপা দিয়াও আমাকে মারিতে পারিলে কই; বলিয়াছিল, লোহার চাপে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতেছে বটে, তবু মরি নাই। আর যে কথাটি সে সঙ্কোচে বলিতে পারে নাই তাহা হইতেছে যে, প্রাণের কাছে ঐ জড় লোহার স্তূপেরই পরাজয় ঘটিল। সে অশ্রুত কণ্ঠে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত করিয়াছিল। রক্তকরবী-নাটকখানিতেও শেষ মুহূর্তে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত হইয়াছে।

"নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?"

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

গান ও গায়কি

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

উত্তরভারতে ধ্রুবপদ খেয়াল টপ্পা ঠুমরী এমন কি কজ্‌রী শাওন ঝুলন হোরি ও চৈতিয়া শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত মার্জিত গীতরূপগুলির সমালোচনার সময়ে ওস্তাদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়ই 'গায়কি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। গানের মজ্‌লিশে যখন কোনো তরুণ উদীয়মান শিল্পী স্থায়ী অন্তরা আলাপ-অওচার দিয়ে গীতটির বিশেষ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে বিভোর—তখন প্রধান ওস্তাদেরা পরস্পরে মৃদু শব্দে হয়ত বলাবলি করছেন, "হাঁ হাঁ ঈসকা আওয়াজ্‌ সুরিলা হ্যায়, রাগ-অওচারভি দুরুস্ত হ্যায় মগর গায়কি ঠিক নহি হ্যায়", অথবা "অরে ভাই ঠুমরিকা গায়কি এক হ্যায়, ফিন্‌ হোরিকা গায়কি অওর হ্যায়" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ওস্তাদেরা 'গায়কি' বলতে ঢং মনে করেন না। সম্প্রতি গীত-ও-স্বরলিপির যুগে এই ক্ষুদ্র শব্দটি তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ও ভাবসম্পদের মাহাত্ম্যে প্রণিধানযোগ্য হয়েছে মনে করে প্রবন্ধের অবতারণা করি।

গণ-শিক্ষার ধারা এপর্যন্ত গুরুমুখী শুশ্রূষা অনুকরণ ও অভ্যাস দিয়েই চলে এসেছে, এবং চিরকালই এরকমে চলতে থাকবে। বাস্তব গীতরূপ একটি শাব্দরূপ। এই শাব্দরূপের মধ্যে স র গ ম প্রভৃতি স্বরের স্বরূপগুলি পরম্পরায় আবির্ভূত ও তিরোভূত হতে থাকে; তারই সঙ্গে মিশিয়ে অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণস্বরূপগুলি বৈশিষ্ট্যপরম্পরা দিয়ে শব্দ বাক্য ও পদ সৃষ্টি করতে করতে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। স্বররূপ ও বর্ণাত্মক-রূপগুলির সমগ্র বা চূর্ণীকৃত অবস্থাকে কোনো প্রতীক বা প্রতিলিপি দিয়ে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায় না। সাক্ষাৎ গুরুর মুখ থেকে বা গীতশিল্পীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে যে শব্দরূপটি শিষ্য বা শ্রোতার সংবিদের মধ্যে বিশিষ্ট শব্দপ্রতীতি বা শব্দানুভূতির রূপ গ্রহণ করে, সেই প্রতীতির বা অনুভূতির প্রতিনিধি হয় না। অর্থাৎ, একমাত্র শব্দরূপই শব্দপ্রতীতি বা শব্দানুভূতিতে পরিণত হয়। এই পরিণতিকে সহজ বাস্তব অবস্থান্তর-পরিণতি মনে করা যায়। সহজ বলেই শ্রুত শব্দরূপকে অনুকরণ করাও সহজ অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্য। অন্য পক্ষে, কাগজের উপর ছককাটা স র গ ম অথবা ক খ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি আসলে দৃশ্যরূপ, শব্দরূপ নয়। এই দৃশ্যরূপ-গুলিকে চক্ষু দিয়ে সংবিদের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেই যে তারা সহজে বা স্বভাবে শব্দরূপে পরিণত হবে এরকম মনে করা যায় না। দৃশ্যরূপগুলিকে শব্দপ্রতীতি শব্দানুভব বা শব্দরূপে পরিণত করতে হলে, অর্থাৎ রূপান্তর-সাধন করতে হলে, অন্তঃকরণ-ব্যাপারের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিজাতীয় আলোড়ন ও পরিশ্রম হয়। এই আলোড়ন ও পরিশ্রম অভ্যস্ত হয়ে গেলে আমাদের কষ্ট হয় না— এইমাত্র। তবুও এই রূপান্তর-সাধনকে সহজ সরল বা স্বাভাবিক বলা যায় না। আরও এই যে, বাইরের শব্দরূপ শুনে সংবিদের মধ্যে সজাতীয় শব্দপরিণতির ব্যাপারে শব্দরূপের যৎসামান্য বিকৃতি সম্ভব হলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বারবার একই শব্দরূপ শোনার ফলে সেই বিকৃতিগুলি আপনা থেকেই অন্তর্ধান করে। কিন্তু স্বরলিপির দৃশ্যরূপগুলিকে অন্তঃকরণের মধ্যে বিজাতীয়, অর্থাৎ শব্দরূপে, শব্দপ্রতীতি

বা শব্দানুভূতিতে, রূপান্তরসাধন করবার ব্যাপারের মধ্যে বিকৃতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবং এই বিকারগুলির সময়মত সংস্কার না করলে, অর্থাৎ অন্য-এক রকমের পরিশ্রম না করলে, রূপান্তরিত প্রতীতি বা অনুভূতির মধ্যে বিকৃতিগুলি থেকে গিয়ে শব্দানুভবের সূক্ষ্ম মন্ত্র বা ব্যবস্থার মধ্যেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। ফলে, শব্দের অনুকরণ-ব্যাপারটিও দূষিত হয়ে পড়ে। গীত শুনে গান করার চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং গীত না শুনে স্বরলিপি দেখে গান করার চেষ্টা ও পরিশ্রম— এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য ও ফলগত প্রভেদ বুঝতে কষ্ট হবে না।

সাক্ষাৎ শুনে গীতের যে আংশিক বা সমগ্র রূপটি প্রতিভাত হয়, ছাত্র বা শিষ্য সেই শব্দরূপাবলীকে শ্রুতি দিয়ে গ্রহণ করে, শব্দস্মৃতি দিয়ে ধারণ করে, শব্দানুভূতি দিয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ করে, এবং অনুকরণবৃত্তি দিয়ে কণ্ঠে প্রকাশ করার চেষ্টা করে ও অভ্যাস করে। শ্রুতি বা শ্রবণ নামে সূক্ষ্ম ব্যাপার-ব্যবস্থা না স্বীকার করলে অন্তঃকরণে শব্দের সংস্কারবিষয়ে অন্য-কোনো 'উদ্বোধক কারণ' প্রমাণ করা যায় না। 'শব্দস্মৃতি' নামে একটি আশ্রয়-ব্যবস্থা অস্বীকার করলে স্বপ্নে শব্দ-প্রতীতির কারণ পাওয়া যায় না। শব্দানুভূতি নামে একটি বিশেষ বৃত্তি-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলে শব্দরূপের ভেদ অথবা 'এই সুরটি এই গানটি ভালো লাগল—ঐ সুরটি বা ঐ গানটি ভালো লাগে নি' এরকম উৎকর্ষাপকর্ষের ভেদ ও সুন্দরতা-বোধের কোনো কারণ সিদ্ধ হয় না। এবং অনুকরণবৃত্তি বা ব্যবস্থা অস্বীকার করলে সর্বজনপ্রত্যক্ষ শব্দানুকরণকার্যের মূলকেই অস্বীকার করা হয়। অতএব এই চার রকমের ব্যাপার-ব্যবস্থা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; যদিও ছুরি-কাঁচি দিয়ে জীবিত বা মৃতের ব্যবচ্ছেদ করে এগুলিকে দেখানো সম্ভব নয়। শিশু যেভাবে বাপ-মা-ভাই-বোনদের কথা শুনে কথা বলতে চেষ্টা করে এবং ক্রমশ অবিকল অনুকরণ করে, ঠিক সেইভাবেই ছাত্র গুরুর নিকটে উপস্থিত হয়ে গানশিক্ষা করে; এ দুয়ের মধ্যে কোনো যথার্থ বা মৌলিক ভেদ নেই। এবং গান-শিক্ষার ব্যাপারে এ থেকে সহজ সরল ও প্রশস্ত অন্য উপায় নেই।

সমগ্র শ্রুতরূপকেই 'গীত' বলা যাক। কাগজের উপর লেখা রূপকে 'গীত' না বলে 'গীতি' বললে কোনো ক্ষতি নেই, অথচ ভারতের কিছু-প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পরিভাষাকেও শ্রদ্ধা করা হয়। এবং গীতিকে গীতরূপে অভিব্যক্ত করার কার্যকে 'গান' বা 'গান করা' বললে যদি একটু ব্যাকরণের প্রতি পক্ষপাত করাই হয়, তাতেও ত্রস্ত বা শঙ্কিত হওয়ার কারণ দেখি নে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্ফুট অর্থবোধ হয় এবং গীতি, গীত ও গান শব্দগুলিকে অর্থত এটাকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যথেচ্ছাচার না করা হয়।

এখন ওস্তাদদের কথা ও ইঙ্গিতে 'গায়কি' বলতে যে অভিপ্রায় উদ্ধার করা যায় তা আলোচনা করে পরিষ্কৃত করা সম্ভব হবে।

স র গ ম প্রভৃতি শব্দরূপের বিশিষ্ট বিন্যাস এবং অক্ষরগুলির বিন্যাস বা বাঁধুনি অবিকল ও নিশ্চিত রেখেও গান করে একই গীতির কিছু বিভিন্ন গীতরূপ ফুটিয়ে তোলা যায়। এই ব্যাপার ভারতে বহুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে, এখনও হয় এবং পরেও হবে। কণ্ঠে দেখিয়ে দিলে এই ব্যাপারটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট সত্য বলে প্রত্যক্ষ হয়। লিখে আলোচনা করে এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করানো যায় না, কিন্তু বোঝানো যায়। অর্থাৎ এর মধ্যে কোনও mysticism বা হিং-টিং-ছট নেই, যার দরুন কথা দুর্গ্রহ হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক শিষ্য একই গুরুর নিকটে একই ধ্রুবপদগীতি শিক্ষা করলেন। সুরে তালে পদে সেই গীতি নিবদ্ধ, অর্থাৎ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বলা যায় যে, সকলে একই গীতি শিক্ষা করেছে। পরে, ছাত্রগুলি তার গীতরূপটি অভিব্যক্ত করার সময়ে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে গীতির অবিকল ও অবিকৃত অনুকরণ করলেও দেখা যায়, একজনের কৃতিত্বে গীতরূপটি প্রাণবান ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং অন্য একজনের যথোপযুক্ত চেষ্টা ও অবিকল অনুকৃতি সত্ত্বেও গীতরূপটি নির্জীব ও নিষ্প্রভ। কণ্ঠের মাধুর্যের তারতম্যই এরূপ হবার কারণ এ রকম সিদ্ধান্ত করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। হয়তো দেখা গেল, সমধিক মধুর কণ্ঠেই নির্জীব রূপটি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সাধারণ, এমন কি কিছু রুক্ষ কণ্ঠস্বরের, গায়কটিই প্রাণবান ও উজ্জ্বল রূপটি প্রতিভাত করেছে। কণ্ঠের মাধুর্য ও গীতরূপের অভিব্যক্তির বা ঔজ্জ্বল্যের এমন কোনো অব্যভিচারী সম্বন্ধ পাওয়া যায় না যা থেকে মনে হয় যে, মাত্র মধুর কণ্ঠেই উত্তম গীত হতে পারে অথবা অমধুর কণ্ঠে কখনোই গীতরূপ সার্থক হয় না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন, বিশ্বনাথ রাও ও মহিমবাবু। দুজনই অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন ছিলেন (ইংরেজি ১৯১২ থেকে ১৯১৪)। মহিমবাবুর কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর এবং বিশ্বনাথ রাওজির কণ্ঠ সত্যসত্যই রুক্ষ ছিল। এই দুজন গীতশিল্পীকে বহুবার ধ্রুবপদ-ধামার গান করতে শুনেছি; এবং বন্দেশের (composition) ধামার গান করতে শুনেছি। কিন্তু ধামারের গায়কিতে রাওজির কৃতিত্ব এতই বিশিষ্ট সুন্দর ও অতুলনীয় ছিল যে, তাঁর নাম হয়েছিল 'ধামারী বিশ্বনাথ'। হোরি-ধামার অনেকেই গান করেছেন এবং এখনো করছেন। কিন্তু ঐ বিশেষণটি আর কারও ভাগ্যে জোটে নি। পরে, ১৯১৯ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, মথুরার চন্দন চৌবেজির ধামারও অনেকবার শুনেছি। এঁর কণ্ঠ অদ্ভুত রকমের মধুর ও বলশালী ছিল। এ দুটি গুণ একত্রে পাওয়া বিরল। তাঁর ধামারের গায়কিও অনন্যসাধারণ ছিল। তবুও বেশ মনে পড়ে রাওজির গায়কিতে এমন-একটি দীপ্তি বা চমক ছিল যা চৌবেজির ধামারে পাই নি। রবীন্দ্রগীতি ও গীতশিল্পীদের সম্বন্ধেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যা থেকে মনে হয় যে, মাত্র কণ্ঠের সুমিষ্টতা থাকলেই গীতের উজ্জ্বল প্রাণবান্ সার্থক বা চরম রূপ অভিব্যক্ত হয় না, তার সঙ্গে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে।

নির্জীব হোক বা সজীবই হোক, যে-কোনো গীতরূপকে গীত মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। কিন্তু যথার্থ অনুভবী ওস্তাদ সমালোচক কেবল সেই গীতরূপকেই গায়কি-সম্পন্ন মনে করেন যেগুলি উজ্জ্বল রক্তিম প্রীতিকর ও কাম্য রূপে দেখা দেয়। গীতরূপের মধ্যে এই গুণগুলির আবির্ভাবকে এক কথায় 'বর্ণালংকারসমৃদ্ধি' বলা যায়। যত বড়ো রূপসীই হ'ন, যথাযোগ্য ভাব ও প্রসাধনের কৃতিত্ব ছাড়া তাঁর রূপের বিশিষ্ট ও চরম অভিব্যক্তি হয় না। ঠিক সেই রকম গীতি যত সুন্দরই হোক, গানের মধ্যে বর্ণালংকারসমৃদ্ধি না থাকলে গীতরূপের সৌন্দর্য বিকশিত হয় না— এরূপ কথা প্রাচীনতম গীতশাস্ত্রবিদ্ মহামুনি ভরত বলে গিয়েছেন।

যদিও গান ছাড়া গীত নিষ্পন্ন হয় না, তবু গানক্রিয়ার মধ্যে এমন-কিছু বিশেষ ব্যাপার ঘটে যার ফলে গীতরূপে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রূপটি প্রত্যগ্র কুসুমের মতো বিকশিত হতে থাকে। যেমন লতার মধ্যে অদৃশ্য আন্তরিক ভাবসম্পদ্ শাখাপ্রশাখাবৃন্তের মধ্যে প্রবাহিত হতে হতে উপযুক্ত মুহূর্তে ক্রমান্বয়ে ও সমঞ্জসভাবে কুসুমের রূপে পরিণতি লাভ করে এবং তার বর্ণগন্ধের সমাবেশ

ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মনিবেদন ক'রে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার চরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেইরকম গীতশিল্পীর অন্তরে ভাবী গীতেরও একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকে— যে আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষ তৃপ্তি বা পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করে। সেই গীতির গূঢ় ভাবসম্পদ্‌গুলি গানের ক্রমাভিব্যক্ত কার্যস্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হতে হতে শুভমুহূর্তে গীতরূপে রূপায়িত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ও সমঞ্জসভাবে স্বর-পদ-ছন্দের সমাবেশ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আত্মনিবেদন ক'রে চরম পরিতৃপ্তি ও সার্থকতায় পর্যবসিত হয়। গীতরূপের মধ্যে ভাবগুলি উজ্জ্বল ও প্রীতিকর হয়ে ফুটে উঠলে তারা শ্রোতার হৃদয়ে সমান বা সদৃশ ভাব ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই বিশিষ্ট ভাব ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারাই সেই গানের চরম ফল বা একমাত্র সার্থকতা। অন্যথা সুর-তাল-পদ দিয়ে গান করে গীতের একটি ভুকুড়ি-সাতের খেলা বজায় রাখা যায়। কিন্তু মাত্র খেলা বজায় রাখাই সেই গীতির পূর্ণ অভিব্যক্তি নয়, গীতশিল্পীরও চরম লক্ষ্য নয়।

গানক্রিয়ার মধ্যে যেসকল বিশেষ ব্যাপার ঘটলে গীতির যথার্থ স্বরূপ পূর্ণ বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, যার অভাব হলে গীতরূপ ম্লান ও অনর্থক বলে বোধ হয়, সেই ব্যাপারগুলি সমগ্রভাবে 'গায়কি' শব্দ দিয়ে সূচিত করা যায়। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে, গায়কি কতকগুলি 'কায়দা' বা technique— যার মধ্যে একান্ত ও বিশেষ ভাবে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার রহস্য নিহিত আছে। সুরে গান করা, শব্দ বা পদগুলি সুশ্রব উচ্চারণ করা এবং বিরাম দিয়ে গীতির ছন্দোময়ী রূপ প্রকাশ করা— এসকল ব্যাপার সাধারণ অঙ্গ, যাকে ওস্তাদরা 'খানাপুরি' বলেন। গায়কি এদেরও অতিরিক্ত এবং একটি বিশেষ ব্যাপার। এই বিশিষ্টতা তখনই বুঝতে পারি, যখন দেখি অল্প-স্বল্প স্বরবিচ্যুতি হয়েও, পদবাক্যের বিকৃতি বা অস্পষ্টতা হয়েও, এমন কি মাত্রালোপ বা ছন্দোভঙ্গ হয়েও গীতরূপের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সম্ভব হচ্ছে; অর্থাৎ, সুর-তাল-পদের দোষত্রুটিকে ঢেকে গীতরূপকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা গায়কির মধ্যেই আছে। এই শক্তির পরিচয় পেলে আমরা কল্পনা করতে পারি, সুমিষ্ট কণ্ঠে যথাযোগ্য সুর-তাল-পদ দিয়ে এবং বিশেষ গায়কির সাহায্যে গান করলে গীতরূপটি কত সুন্দর ও বিশিষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে। ভাগ্যবান শিল্পী তিনিই, যিনি জীবনের কোনো-কোনো মুহূর্তে এইকয়টি ব্যাপারের সহযোগে চারুনির্মিতির কৌশলজাল সৃষ্টি করবার ছলে অপূর্ব গীতমূর্তি রচনা করতে পারেন। মাত্র তখনই আমাদের, অর্থাৎ শ্রোতাদের, মনে উদয় হয় 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী'। গান কে না করে? কিন্তু গুণী, তোমার গানের মহিমা, তোমার কৌশল স্বতন্ত্র! কোনো রকমে গান করে যাহোক একটা গীত হয়। কিন্তু একমাত্র কৌশল দিয়েই যথার্থ গীত বা সার্থক গীত হতে পারে। মাত্র গান করা স্বাভাবিক হতে পারে, এবং পাগলেও গান করে। কিন্তু কৌশলজাল তৈরী করাটাই art বা কৃত্রিম চারুনির্মিতি— যাকে গায়কি বলে, যা না হলে গীতের অপূর্ব স্ফূর্তি হয় না।

গায়কির অধিকার খুবই ব্যাপক ও বিচিত্র। জগতে যেখানে গীতি ও গীতশিল্প আছে সেখানেই গায়কি আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা ও গানের যোগ্য পদ আছে। নিশ্চিত মার্জিত বা প্রসিদ্ধ রাগ বা melody ছাড়াও অসংখ্য ও উদ্ভট স্বর-সন্দর্ভ আছে। ছন্দ ও তালেরও শেষ নেই। একথা ভেবে দেখলে বোঝা যায়, গুণী বা শিল্পী কত বিচিত্র সংস্কার ও গায়কির কৌশল-জাল দিয়ে নিত্যনব সুচারুনির্মিতির প্রয়োগ করতে পারেন।

ভারতের কথাই ধরা যাক্। এখানে এমনও গীতচেষ্টা আছে, যাতে গীতির পদমর্যাদা একেবারে নেই বললেই হয়; এরূপ ক্ষেত্রে রাগের গায়কিই শিল্পীর কল্পনায় প্রধান হয়ে উদ্ভূত হয়। ফলে, রাগের গায়কি ও গীতির গায়কি সুস্পষ্টভাবে পৃথক শ্রেণীতে গড়ে উঠেছে। গীতি আছে অথচ তার প্রাপ্য পদমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পী যে রূপ অভিব্যক্ত করেন তাকে 'গীত' বলা সংগত কি না, এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করব না। এরকম গীতপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত ধ্রুবপদ খেয়াল ও টপ্পা; 'টপ্পা' অর্থাৎ পাঞ্জাবি ভাষার টপ্পা। এসকল ব্যাপারে গীতিগত পদ ও ভাবের মূল্য না দেওয়া হলেও গীতরূপের মধ্যে রাগের যে সমাহিত ও স্থির অথবা উদ্দাম ও চলমান মূর্তি বিকশিত হতে থাকে, শ্রোতাবিশেষের উপর তার ঐকান্তিক বিশিষ্ট ও অদ্ভুত প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অন্যদিকে, এমনও গীতপ্রচেষ্টা হয়েছে যাতে গীতির অন্তর্নিহিত অর্থ লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা, এক কথায় সুপ্রতীত ভাবসম্পদ্ই, প্রধান ও বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং শ্রোতার রসপিপাসু মনের মধ্যে অনুপ্রেরিত হয়। এরকম প্রচেষ্টারও বহু ভেদ দেখা যায়। উত্তরভারতের পাশ্চাত্যখণ্ডে ঠুমরি ও গজল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্যখণ্ডে, অর্থাৎ বাংলাদেশে, এরকম গীতপ্রচেষ্টার অপূর্ব ও অভিনব স্ফুরণ দেখা যায় পদকীর্তনগীতের মধ্যে এবং কাব্যবন্ধগীতের মধ্যে। পদকীর্তনে রসের অনুভূতি, উল্লাস ও পরিবেষণই কাম্য বলে মনে করা হয়। এই শিল্পপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার অনুরূপ গায়কিও শিল্পকলার লক্ষ্য হয়ে আছে। বাংলাদেশের কীর্তনগানের গায়কিকৌশলের তুলনা পাওয়া যায় না। এর নির্মিতি এতই সূক্ষ্ম মনোজ্ঞ ও শক্তিগর্ভ যে, গানের স্বরবিচ্যুতি ও মাত্রার তারতম্য অভিভূত ও অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং অভিব্যক্ত গীতরূপের মধ্যে তা কলঙ্কের ছলে গুণ হয়েই দেখা দেয়। যাঁদের রসবোধ বা রসদৃষ্টির অভাব অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সুপ্রখর, তাঁদের কানে কীর্তনগীতের বা গায়কির গুণগুলিই কলঙ্ক বলে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকের বস্তুগ্রাসী দৃষ্টিতে সুন্দরীর ঠোঁটের নীচে তিলটি রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তুলছে কি না ততটা গোচর হয় না; সেই তিল আঁচিলের পর্যায়ভুক্ত, না, অন্য চর্মরোগের শ্রেণীভুক্ত, এই চিন্তাটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কবি ও চিত্রশিল্পীর চোখে সেই তিলটির মূল্য একেবারেই অন্যরূপ; তার অস্তিত্ব ও অবস্থানের মর্যাদাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেরকম, সহৃদয় বা রসজ্ঞ শ্রোতার পক্ষে কীর্তনগায়কির দোষগুণের মূল্য নির্ধারিত হয় গীতরূপের রসাভিব্যক্তি ও ভাবোল্লাস দিয়ে। বলা বাহুল্য, কীর্তনের গায়কি গুরুশিষ্যানুক্রমে ও সানুভব সাধনার ধারায় একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ গায়কিশ্রেণীতে পর্যবসিত হয়ে আছে এবং এর পরিবর্তন করে কোনোরূপ উন্নতিসাধনের প্রয়োজনও নেই, অবকাশও নেই। মহাজনপদাবলীর রসভাবময়ী গীতির সঙ্গে কীর্তনগায়কির সম্বন্ধ এতই নিগূঢ় ও ঐকান্তিক যে, দেহ থেকে প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সেই দেহকে সাজিয়ে রাখা বা তেলে ডুবিয়ে রক্ষা করার চেষ্টায় যে উৎকট ও বীভৎস পরিণতি হয়, পদাবলীকে গায়কি থেকে বিচ্যুত করে ধ্রুবপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী-সিনেমা-গায়কির প্রসাধনে মণ্ডিত করে গান করলে সেইরকমের ফল-পরিণতি হয়।

কীর্তন বাদ দিয়ে এবং সারি-বাউল-ঝুমুর-ভাটিয়ালি-রামপ্রসাদী নামের ছক-কাটা গীতরূপগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলার যে অজস্র গীতরূপ পাওয়া যায়, সেসকলের মধ্যে ভাবুকতা বা ভাবসম্পদ্ই প্রধান ও বিশিষ্ট; কোনো রসের সূচনা বিরল অথবা অপ্রধান। এক-একটি গীতি যেন মধুচক্র, যার মধ্যে

বহুভাবের পাঁচমেশালি মধু পাওয়া যায়। এগুলিকে আমি 'কাব্যবন্ধ গীতি' নামে অভিহিত করেছি, কারণ কাব্যসুলভ মধুর ও বিচিত্র ভাবের সমাহারই এর বৈশিষ্ট ; এবং বিশিষ্ট রসের দ্যোতনাই অপ্রধান। এইজাতীয় গীতির সম্বন্ধে মহামুনি ভরত সুবিচার করেই 'কাব্যবন্ধ' নাম দিয়ে গিয়েছেন, সে কারণে আমি ঐ নামটি অবজ্ঞা করে অন্য কোনো আধুনিক নাম দিতে ইচ্ছা করি না। সম্প্রতি 'রাগপ্রধান' 'কাব্যপ্রধান' ও 'আধুনিক বাংলা' গান নামে যে পরিভাষা ও শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো সংগতি বা যুক্তি খুঁজে পাই নে। অসংগতি পাওয়া যায়, যেমন 'রাগপ্রধান' গানকে অনায়াসে ধ্রুবপদ-খেয়াল টপ-খেয়াল বা টপ্পার শ্রেণীতে রাখা যায়। নূতন করে 'রাগপ্রধান'শ্রেণীর প্রয়োজন কি? বাংলাভাষায় কি ধ্রুবপদগীতি খেয়াল বা টপ্পা গীতি হয় নি বা হতে পারে না? বেতারে যখন ঘোষণা করা হয় 'এখন রাগপ্রধান গান...' তখনই মনে হয় ইতিপূর্বে যে অমুকে ধ্রুবপদ বা খেয়াল গাইলেন সেগুলি কি 'অরাগপ্রধান'? 'কাব্যপ্রধান'-শব্দ ও 'কাব্যবন্ধ'-শব্দ একার্থক। এদের মধ্যে 'বন্ধ'-শব্দটি বিন্যাস ও বিশিষ্টরূপ সূচনা করে বলে 'কাব্যবন্ধ'-শব্দটিই উত্তম। 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটির মধ্যে মাত্র যুগেরই ইঙ্গিত আছে, কোনোরকম বাঁধুনি বা বিন্যাসবৈশিষ্টের লেশমাত্র সূচনা নেই। বলা বাহুল্য, কথিত 'আধুনিক' গানগুলির গীতি ও গীতরূপের আলোচনা করলেই দেখা যায়, গীতি-অংশটি নিছক 'কাব্যবন্ধ' এবং গীতরূপগুলি একাধিক রাগের মিশ্রণ, রাগবর্জিত ব্যাপার নয়।

অতএব কাব্যবন্ধ শ্রেণীটিই বজায় থাকে। কোনো বিশেষ রাগকে গায়কি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা আদৌ এর লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য হল স্বর-সমাবেশ দিয়ে গীতির বিচিত্র ভাবগুলিকে অভিব্যক্ত করা। এইরকম ভবিতব্যের কল্পনাই গীতিরচয়িতা ও গীতশিল্পীকে অদ্ভুত, এমন কি কিম্ভূত, পরীক্ষায় প্রবৃত্ত করে। ফলে, এ যুগের গীতবাদ্য-রাজ্যের free-lance কবি ও গীতশিল্পীদের, যে কারণেই হোক্ যাঁরা কবিতার নিয়ম বা গায়কি নিয়ম-ধর্ম পালন-পোষণ করতে অনিচ্ছুক, কাব্যবন্ধ গীতির রচনায় ভীড় করতে ব্যগ্র দেখা যায়। কাউকেই অন্যের নিয়ম মানতে হবে না, কোনো গায়কির নিয়ম পালন করতে হবে না; এতে অফুরন্ত স্বাধীনতা ও আনন্দ সন্দেহ নেই। প্রত্যেকেই নিজেকে হয় Schubert, নাহয় Wagner না হয় Schonberg মনে করতে রীতিমতো প্রস্তুত। পরীক্ষা করে দেখাই হল মূলমন্ত্র।

এই পরীক্ষা ও কল্পনাবিলাস কিছুমাত্র দোষের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির আন্তরিক নিয়মগুলি ভঙ্গ না হয়। কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টিই সুন্দরের পূর্বাস্বাদ পরিচয় ও স্মৃতির অপেক্ষা করে। এককথায়, একটা সৌন্দর্যানুভূতির সংস্কার আছে— যাকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করতে হয়। এই সংস্কারটি সুতীক্ষ্ণ ও সুমার্জিত থাকলে, পরে কল্পনা বা পরীক্ষা দিয়ে গীতরূপের নিত্য-নব ইন্দ্রজালরচনা সম্ভব হয়; নচেৎ মাকড়সার জাল রচনা হয়। মাকড়সার জালও কদাচিৎ রোদে বাতাসে ঝকমক করে। গীতরূপের বিকাশ দিয়ে বোঝা যায় কিরূপ ও কতখানি সৌন্দর্যের অনুভূতি ও প্রেরণা দিয়ে জালরচনা হয়েছে।

এ যুগে কাব্যবন্ধ গীতির বহু ইন্দ্রজালিক হয়ে গিয়েছেন। কাব্যবন্ধ গীতের পরীক্ষা ও প্রচলন হয়েছে। নাট্যে সিনেমায় ঘরোয়া-বৈঠকে বেতারে বিশিষ্ট-জলসায় কাব্যবন্ধের উদ্দাম পরীক্ষা চলেছে। এতদিনে এর গায়কি নিশ্চিত বা নির্ধারিত হওয়ারই কথা। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রগীতি ছাড়া গানকৌশল

বা গায়কির কিছুমাত্র নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রগীতির গীতরূপগুলি ধীরভাবে আলোচনা করলে তাদের ভিতরে বিশেষ গায়কি ও গূঢ় সৌন্দর্যশৃঙ্খল পাওয়া যায়। এগুলি এতই বিশেষ ও অবচ্ছিন্ন, এতই সবল অথচ সরস যে, অতি সামান্য পরিবর্তন করলেই এদের গীতরূপের মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি নিজে কিছু কিছু রবীন্দ্রগীতির গীতরূপ এবং অন্য অনেক কাব্যবন্ধ গীতরূপের পরীক্ষা করে দেখে এরূপ কথা বলতে সাহস করি। পরীক্ষা করেছি গীতির স্বর-পদ-তালবিন্যাসের রকম-ফের করে নয়, গায়কির অল্পস্বল্প বা আমূল পরিবর্তন করে। গীতরূপের সুষমা ও সৌকুমার্যই কিছু দোষ বা অবজ্ঞার বস্তু নয়। তা যদি হত তবে মাটি বা পাথরে গড়া ফুলেরই বেশি আদর হত।

গীতরূপের বা যে-কোনো রূপের লাবণ্য সৌন্দর্য বা সুকুমারতার বিশ্লেষণ হয় না। কিন্তু যেসকল ব্যাপার দিয়ে ঐ গুণগুলির প্রকাশ সম্ভব হয়, সেই ব্যাপারগুলি পরীক্ষার যোগ্য। পরীক্ষা হয়েছে বলেই জগতে কাব্য চিত্রশিল্প ভাস্কর্যশিল্প ও গীতশিল্পের সমৃদ্ধি হয়েছে। রবীন্দ্রগীতির গীতরূপগুলি যে অত্যন্ত সুকুমার, তাদের শ্রী ও সুষমা কোনো রকম বিজাতীয় গায়কির স্পর্শমাত্র সহ্য করতে পারে না— এ কথা শুধু সত্য নয়, যেসকল আধুনিক উন্মার্গগামী শিল্পী রবীন্দ্রগীতি নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বকপোলকল্পিত গায়কি দিয়ে রবীন্দ্রগীতির উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেইসকল free-lanceদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রিয় কাজ আর কিছু নেই। প্রশ্ন হতে পারে রবীন্দ্রগীতি এত স্পর্শাসহিষ্ণু কেন? প্রশ্নের যদি উত্তর নাও পাওয়া যায় তাহ'লেও ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রগীতি ও গীতরূপগুলি পরীক্ষা করে দেখে উক্ত প্রশ্নের একরকম উত্তর পেয়েছি। খুব সোজা করে বলতে গেলে স্বর্গের তিলোত্তমাকে দিয়েও ধান ভানিয়ে নেওয়া যায়; সেরূপ অবস্থায় নিশ্চয়ই তিলোত্তমার অন্য রকম শ্রী, বা হতশ্রী, ফুটে ওঠে। কিন্তু তিলোত্তমার রূপলাবণ্য ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানবার দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করবার জন্য হয় নি। ধানভানা-দৃশ্যরূপের সুন্দরতা বা চমৎকৃতি সৃষ্টি করবার জন্য অন্যরকমের শারীর-বিধান বা অবয়ব-সংস্থানের প্রয়োজন। আবার তিলোত্তমার হাতে খড়্গ ত্রিশূল দিয়ে রৌদ্রমূর্তি কল্পনা করা যায়। তবুও তিলোত্তমার মোহিনী রূপটিই সহজ ও অভিপ্রেত, রুদ্রাণী মূর্তিটি কল্পনাবিলাস বলতে হবে। উপমা ছেড়ে এবার বাস্তব গীতি ও গীতরূপে আসা যাক্।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নিশীথ রাতের বাদলধারা' গীতিটি আলোচনা করা যেতে পারে। গীতিটির গূঢ় সৌন্দর্য রয়েছে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার মধ্যে, আভিধানিক অর্থ বা যোগরূঢ়ী লক্ষণার বা indicationএর মধ্যে নয়। 'নিশীথ রাত' ও 'বাদলধারা' কথাগুলির আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হলেও কবি এই অর্থপ্রকাশমাত্র লক্ষ্য করে পদ রচনা করেন নি। এরূপ স্পষ্টার্থ থেকেও অন্য অভিনব ইঙ্গিত ব' লক্ষণা সংগ্রহ করা যায়, যথা অবিরাম অবিরল বর্ষণের রিম-ঝিম, ঘুমপাড়ানো গান, শব্দরূপ বা অনুভূতি। কবি এই লক্ষণার্থকেও লক্ষ্য করেন নি, অর্থাৎ লক্ষণাপ্রয়োগ করেও ক্ষান্ত হন নি, আরও একটি সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকে প্রকাশ করেছেন নিশীথ রাতের স্তব্ধ-গম্ভীর নিরুৎসাহভাব, ভয়ভীতি নির্বেদ-নিঃসঙ্গ পরিচয়, অন্ধকার ও বাদলপ্রপাতের কারাবেষ্টনী— এসকলকে ভেদ করে উত্তীর্ণ হয়ে অতিক্রম করে কবির আত্মা একটি অপ্রাকৃত ধ্বনির গোপন-অভিসার ও মিলনের অপূর্ব সূচনা করেছেন। বাইরের অন্ধকার যতই নিবিড় হোক, তার ক্ষমতা নেই এই অপ্রাকৃত ধ্বনি-রূপকে আবৃত করে বা চির-আকাঙ্ক্ষিত অভিসারকে স্তব্ধ করে; ধারাপ্রপাতের শক্তি নেই গোপন-অভিসারের ক্রমাগত সুর-মাধুরীকে অবলুপ্ত করে। সমগ্র গীতির মধ্যে বিপ্রলম্ভ ও আশার সূক্ষ্ম

ধ্বনিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও স্পষ্ট ভাবতরঙ্গের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অসামান্য কবিপ্রতিভা ভাবতরঙ্গের মধ্যে ডুব দিয়ে যে অবর্ণনীয় অনুভূতি ও ধ্বনিরূপ সাক্ষাৎ করেছেন সেই অনুভূতি ও ধ্বনিরূপের সূক্ষ্ম অনুরণন পাই ঐ শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে। 'নিশীথ রাতের বাদলধারা'— মাত্র এই একটি চরণের মধ্যেই সেই অনুরণনগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে: সুর-তাল-পদের বাঁধুনিতে, গান্ধারসুরে বিশ্রান্তির মধ্যে, গায়কি-প্রতিভার সহজ সুন্দর উন্মেষের মধ্যে। এই প্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভা। প্রতিভা সেই গুণ ও শক্তি, যা ইতিপূর্বেই সুন্দর ও সৌন্দর্যসৃষ্টির সংস্কার সঞ্চিত ও আয়ত্ত করে রেখেছে, যা পরীক্ষা ও কসরৎ করে সুন্দর-অসুন্দর উচিত-অনুচিতের বাছাই করে না। রূপাভিব্যক্তির সময়ে প্রতিভাই বিদ্যুতের ঝলকের মতো একনিমেষে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সৌন্দর্য উন্মেষিত করতে পারে।

কবি-মনের নিভৃত গুহা থেকে এই গীতি যে বিশেষ ধ্বনি বহন করে এনেছে, তার একমাত্র সার্থক রূপটি ফুটে উঠেছে তার গীতরূপের মধ্যে। এখন যে-কোনো কৌশলী বা খামখেয়ালী শিল্পী গায়কির পরিবর্তনসাধন করলেই বুঝতে পারবেন গীতরূপের কিরকম অনভিপ্রেত পরিবর্তন এসে পড়ে, গীতির ধ্বনিরূপটির কতখানি উচ্ছেদ ও অবলোপ হয়। কিন্তু ধ্বনিরূপটি নিজে অনুভব করাই আসল কথা। ধ্বনিরূপটির অনুভব না হলে ঐ গীতিকে রামপ্রসাদী সুরের ছকে ফেলে গান করা অথবা কোনো প্রচলিত ধ্রুপদ-খেয়াল-খেমটা-গজল বা যাহোক-একটা-কিছু দিয়ে সুরে তালে গান করা একই কথা। অর্থাৎ, মনে হবে, 'কেন, এও তো একরকম বেশ লাগল মন্দই বা কি? সুর-তাল-পদ তো বেশ ফুটে উঠেছে'। ধ্রুবপদ-খেয়ালের শিল্পী নিজের ইচ্ছা ও কল্পনামতো ঐ গীতটি গাইবার সময়ে 'ঢোঢ়ন্' 'মোঢ়ন্' 'বোঢ়ন্' 'গমক্' 'পুকার' 'সুত্' প্রভৃতি গায়কি কৌশল অথবা ডাগরবান্-গুবরহারবান্ প্রভৃতি বাণীর গায়কি ফুটিয়ে তুলতে পারেন সন্দেহ নেই। জগতে ফুটে ওঠার অন্ত নেই, লাবণ্যও ফুটে ওঠে হাম-বসন্তও ফুটে ওঠে। আসল কথা, গায়কের অনুভবটি কি রকম ফুটে ওঠা আশা করে সে সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এবং ফুটে ওঠার পর বা সঙ্গে সঙ্গে ঐ গীতির সূক্ষ্ম ধ্বনিটি বেঁচে থাকে কি নিস্পন্দ হয়ে যায়, এও অনুভব দিয়ে বিচার করতে হবে।

'নিশীথ রাতের বাদল ধারা'র গূঢ় ধ্বনিকে বাদ দিয়ে তার অভিধা ও লক্ষণার ধ্যান করেও সুর ও গায়কি দেওয়া যায়। যথা নিশীথ রাতে বাদল ধারার ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ ও দর্দুরকুলের বিচিত্র উল্লাসস্ফোট (পল্লীগ্রামের কুটির ও পুষ্করিণীর দৃশ্যপটে) অথবা তার সঙ্গে করোগেট ছাউনির উপর ধারাপাতের দুর্দার অসহনীয় শব্দ এবং ঘরের পাশেই বড় বড় মানপাতার উপর বৃষ্টিপাতের তুমুল-কোলাহল (সহরপ্রান্তে শ্রমিকনিবাসের পারিপার্শ্বিকে) ইত্যাদি লক্ষণাও বেছে নেওয়া যেতে পারে। এবং পাশ্চাত্যের harmony-discord বা tonic-counterpointএর বিচিত্র সমাবেশ ও গায়কি দিয়ে ঐসকল লক্ষণার অন্তর্গত ধ্বনি-বিকার বৈসাদৃশ্য বা cacophonyর অদ্ভুত চিত্র ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। কোনো উদীয়মান শিল্পী যদি এরূপ cacophonyর প্রাকৃত আদর্শ খোঁজেন, তাহলে তাঁকে বেশি দূরে নয় গুপ্তিপাড়ায় বর্ষার একটিমাত্র নিশীথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বলি। সেখানে তিনি একসঙ্গে সমস্ত লক্ষণাগুলির প্রাকৃত স্বরূপ পাবেন। ইচ্ছামতো একটি programme বা symphony বেছে নিয়ে 'নিশীথ রাতের' গীতের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবেন, এও কল্পনা করি। তিনি শিল্পচাতুরী প্রয়োগ করে এই অদ্ভুত কাকু-বিলাস যতই ফুটিয়ে তুলবেন, ততই যে কবি-রবীন্দ্রনাথের গীতি বা শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের গীতিরূপটির নির্মম ধ্বংসসাধন হবে, এ বিষয়ে

কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, গীতির ধ্বনি ও গীতের গায়কির যে অপূর্ব মিলনবন্ধন রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনা করে গিয়েছেন, সেই রক্ষা-সূত্রটিই যথার্থ অনুভূতির অভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। যে শিল্পী ও শ্রোতা এই রক্ষা-সূত্রের মহিমা অনুভব করতে পারে না, তার পক্ষে এই গীতি গান করা অথবা উপভোগ করা অসম্ভব, এবং চেষ্টা করা বৃথা।

সংক্ষেপে বলা যায়, কাব্যবন্ধ গীতির মধ্যে যেগুলিতে সূক্ষ্ম ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই বাণী হয়ে, প্রধান বা লক্ষ্য হয়ে সুন্দররূপে দেখা দেয়, সেগুলির পক্ষে যথাযোগ্য ললিত সুকুমার ও সরল গায়কিই প্রয়োগের যোগ্য। মাত্র এই উপায় অবলম্বন করলে ধ্বনি ও গীতরূপ সার্থক হয়ে প্রতিভাত হয়। জেনে শুনে এই স্বাভাবিক নিয়মকে অবহেলা করলে জ্ঞানকৃত পাপই হয়। সেই পাপের নাম গীতি-হত্যা।

মাত্র একটি গীতি বা গীতরূপের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় প্রত্যেক গীতির একটি নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা গীতরূপ আছে। প্রত্যেক গীতের যোগ্য গায়কির এমন-একটি নিশ্চিত নির্বাচিত রূপ গড়ে ওঠে, যার সামান্য পরিবর্তনসাধন করলেই গীতরূপে ম্লানিমা ও খর্বতা দেখা দেয়। ধ্বনিগর্ভ কাব্যবন্ধ গীত যে স্পর্শাসহিষ্ণু হবে তাতে আশ্চর্য কি? এবং অধিকাংশ গীতই ধ্বনিগর্ভ বলে সমান ধর্মের প্রেরণায় রবীন্দ্রগীতির গায়কিও অবচ্ছিন্ন বিশিষ্ট ও সুকুমার গুণের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি, তিলোত্তমাকে ধান ভানতে দিলে তার লাবণ্যের অভিব্যক্তি হবে না।

রবীন্দ্রগীতি ছাড়াও অনেক কাব্যবন্ধ গীতি আছে। কিন্তু মোটের উপর লক্ষণার প্রাধান্য এবং অর্থের বৈচিত্র্যই এই গীতিগুলিকে অল্পবিস্তর মুখরিত করে রেখেছে। লক্ষণা ও অর্থের সংযোগ বা প্রাধান্য থাকলে একদিকে সুবিধা এই যে, শ্রোতার অনুভবের কাছে সূক্ষ্ম হিসাব দিতে হয় না; তার জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ-অধিকার ও স্থানলাভ করতে পারলেই কাব্যবন্ধের কিছু সফলতা হল। ফলে এই ধরনের গীতির একাধিক অভিব্যক্তি বা interpretation হতে পারে। এস্থলে interpretation শব্দটি 'গীতরূপ' অর্থেই ব্যবহার করেছি, ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। বহু রূপের সম্ভাবনা থাকে বলেই স্বাভাবিক অথবা পরীক্ষামূলক গায়কিরও নানারকমের সমাবেশ এসে পড়ে। প্রত্যেকটি এসে বলে 'দেখ ত আমি কত সুন্দর, চমৎকার'। শুনে বলতে হয়, 'হ্যাঁ তুমি সুন্দর, চমৎকার; এমন কি অদ্ভুতও বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?' মনে হয় শতকরা নিরানব্বইটি নাট্যগীত এই শ্রেণীতে পড়ে। এদের মধ্যে এমনও দু'চারটি গীতি আছে, যার মধ্যে হয়তো ধ্বনিই প্রধান, লক্ষণা ও অর্থ অপ্রধান। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় বা box-officeএর তাগাদায় এদের রূপ অভিব্যক্ত করা হয়েছে অনাবশ্যক রকমের চটুল বা উজ্জ্বল গায়কি দিয়ে অর্থাৎ রাস্তায় ঢাক-ঢোল-কাঁসির সঙ্গে বর-কনের সাজের মতো।

পদকীর্তনে ও কাব্যবন্ধে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি রসবন্ধ এবং রসসৃষ্টির কামনায় যথাস্বরূপ বিশদ বিস্তারিত ও বিচিত্র গায়কিসমুচ্চয়কে অপেক্ষা করে। সুতরাং গান করে গীতরূপটি সম্যক্ ফুটিয়ে তুলতে বেশ-কিছু সময় লাগে। কাব্যবন্ধের সাধনা একটি ধ্বনিরূপকে অভিব্যক্ত ক'রে ও কোনো অনাগত রসাস্বাদের সূচনামাত্র ক'রে অন্তর্হিত হওয়া। অতএব একটি কাব্যবন্ধ গান করতে ন্যূনপক্ষে তিন মিনিট এবং ঊর্ধ্বপক্ষে সাত-আট মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। কদাচিৎ দু'একজন পাল্লাদার গীতশিল্পীকে (duration-singer বলা যায় কি?) কাব্যবন্ধের মামুলি রচনাকে গানের দড়ি দিয়ে

এদিক ওদিক বিস্তর টানাটানি করে তার জান পরেশান করতেও শুনেছি। শ্রোতাকে হয়রানি করা ছাড়া এর ভবিষ্যৎ দেখি নে।

রবীন্দ্রগীতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলেই গান ও গায়কির মধ্যে বিশিষ্টতা এসে পড়েছে। অন্যপক্ষে এমনও লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি যে, শিল্পী গীতির স্বরলিপি অর্থাৎ official recordএর মাছিমারা নকল করে গান করে যেতে থাকলেও গীতটি বৈশিষ্ট্যহীন সমনজারির মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথচ সেই একই গীতি ও স্বরলিপির নির্দোষ অনুসরণ করে অন্য-একজন শিল্পী এমন রূপটি প্রকাশিত করছেন যাতে শ্রোতারা সকলেই নিস্তব্ধ ও বিহ্বল হয়ে একমনে গীতসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আছে। এবং গানের শেষেও হৃদয়ের মধ্যে সেই রূপটি শব্দের মধুর অনাড়ম্বর অনুকরণের মতো কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছে। যদি শ্রোতার মনে একটি বিশিষ্ট চিত্র ও সুন্দর প্রভাব সৃষ্টি করাই কাব্যবন্ধের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে, সুর-তাল-পদের অবিকল অনুবর্তন করেও প্রথমোক্ত গানচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবং সুর-তাল-পদের অনুবর্তন করে অধিকন্তু যথোপযুক্ত গায়কির সাহায্যেই শেষোক্ত গান সার্থক হয়েছে। এই অধিকন্তুই রবীন্দ্রগীতির গায়কি বা বিশেষ গায়কি। এই বিশেষ গায়কি এতই বাস্তব ও প্রত্যক্ষযোগ্য এবং প্রয়োগযোগ্য যে, গায়কিবর্জিত ও গায়কিযুক্ত একই গীত দু রকমে দেখিয়ে শিখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এখন একটি প্রশ্ন, গুরুর মুখ থেকে সাক্ষাৎ গীতরূপ শুনে অনুকরণ করে গান করার অভ্যাস করলে অনুকরণের প্রবাহই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গায়কি বয়ে নিয়ে আসবে। তাহলেই তো গীত-রূপটি আপনা থেকে গায়কিযুক্ত হবে। অতএব গীতরূপটি উত্তম ও সার্থক হবে। যদি অনুকরণমাত্র সম্বল করে গানের চরম সাধনা ও গীতরূপের ইষ্টসিদ্ধি হয়, তবে গায়কি নামে একটি অভিনব তত্ত্ব উপস্থাপিত করে পরিশ্রম বাড়িয়ে লাভ কি।

সংক্ষেপে ও উদাহরণ দিয়ে এর উত্তর দেওয়া যায়। গায়কির অধিকারে এত বিচিত্র ও বিভিন্ন ব্যাপার আছে এবং গীতরূপও এত রকমের যে, প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব হবে না। মাত্র সাধারণভাবে মন্তব্য করা যাবে।

স্বীকার করা যাক, ছাত্র যথার্থ অনুকরণ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গুরু প্রত্যেকটি চরণ পৃথকভাবে ও বারবার গান করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। গুরু মাত্র একবার ও সমগ্র গীতরূপটি গান করে দেখিয়ে দিলেন এবং ছাত্র সেই গানক্রিয়া আয়ত্ত করেই গীতরূপটি প্রকাশিত করল; এমন শ্রুতিধর আমি অবশ্য দেখি নি। যাই হোক, একই চরণ বারবার গান করে দেখিয়ে দেওয়া এমন একটি পাখি-পড়ানোর মতো যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে যায়, যার জন্য সেই চরণটির যথার্থ রূপ অভিব্যক্ত না হয়ে গায়কি-বর্জিত সুর-তাল-পদবিন্যাসরূপ একটি সাধারণ ন্যূনতম রূপ অভিব্যক্ত হয়; অর্থাৎ শিক্ষাদানের সময়ে গুরুর গুরুত্বই প্রকট হয়, শিল্পীত্ব চাপা পড়ে যায়। সেই গীতরূপটি মজলিসে অভিব্যক্ত করার সময়ে গুরু শিল্পী হয়ে যখন গায়কির রং ফলাতে থাকেন, মাত্র তখনই গীতের চরণটি সমগ্র পরিকল্পনার দৃশ্যপটে সমঞ্জস ও অঙ্গীভূত হয়ে তার নিজস্ব একান্ত কাম্যরূপে আবির্ভূত হয়। শিক্ষাগৃহের পরিবেশের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের নৈতিক বা ব্যবহারিক পরিশ্রমের মধ্যে যখন মাত্র শিক্ষাদান ও বস্তুলাভই গুরু ও শিষ্যের লক্ষ্য থাকে, তখন গুরুর পক্ষে এক-একটি বিচ্ছিন্ন গীতচরণের বারবার আবৃত্তি করে দেখিয়ে

দেওয়ার সময়ে সেই চরণটির যথার্থ স্বরূপের বিকাশ হয়তো সম্ভব হয় না। কুড়ি-পঁচিশ বার আবৃত্তির মধ্যে যদিই বা দু'একবার গায়কিগুলি ফুটে ওঠে, ঠিক সেই মুহূর্তগুলিতে ছাত্র হয়তো সুর-তাল-পদের সমাবেশবৈশিষ্ট্যের প্রতি ধ্যাননিবদ্ধ হয়েছে এবং জ্ঞান দিয়ে বস্তুলাভের আগ্রহে অন্তরাত্মার অনুভূতি সঞ্চয় করার ব্যাপারে নিরুদ্ধ হয়ে আছে; অর্থাৎ গুরুর নিকট শিক্ষা করার সময়ে গীতির নীরস ন্যূনতম ও সাধারণ রূপটিই ছাত্রের মনে সংক্রামিত ও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। এই নীরস অধ্যবসায় ও অভ্যাসের শক্তি মিলিত হয়ে ছাত্রের সংবিদ্ ও স্মৃতির মধ্যে গীতের যে সমগ্র রূপটি প্রতিফলিত করে সেই রূপটিই ভবিষ্য গীতসংকল্পের বীজরূপে থেকে যায়। অভ্যাস ও পরিশ্রম করে যাকে অর্জন করা হয় তার সংস্কার বা প্রবণতাকে গান করার সময়ে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন, স্বীকার করতে হবে। এর কুখ্যাত উদাহরণ, গুরুর মুদ্রাদোষগুলি ছাত্রে বর্তায় এবং অবশ্যম্ভাবী হয়েই দেখা দেয়— যদি গুরু বা ছাত্র এ বিষয়ে অনবহিত থাকেন। যাই হোক, ছাত্র যখন তার অভ্যস্ত গীত-রূপটি গান করে তখন একটি নীরস গায়কিবর্জিত রূপই ফুটে ওঠে। তার নিজের পক্ষে সম্ভবত সেই রূপটি অসুন্দর বা অপ্রিয় লাগে না। কারণ, অভ্যাসের এমনই মহিমা যে, আফিংএর মতো দুর্গন্ধ ও তিক্তস্বাদ বস্তুটিও নেশাখোরের রসনায় অতীব স্বাদু এবং নাসিকায় সুঘ্রাণ বলে মনে হয়। গায়কিবর্জিত গীতরূপের সৌভাগ্য এই যে, শ্রোতার মধ্যেও নেশাখোর শ্রোতা থাকে।

এরকম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে লাভ নেই, কারণ আধুনিক গীত-বিদ্যালয়গুলিতে পাইকারি হারে গীতশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে স্বাদগন্ধবর্জিত গানচেষ্টা ও গীতরূপের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের পিতামাতা এসকল ব্যাপারের সন্ধান রাখেন না, বোধ হয় তাঁরা অশক্ত— 'তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন' ন্যায়; অথবা তাঁরা প্রয়োজনের দিকটা দেখেন না।

এ পর্যন্ত মনে করা হয়েছে যে, গুরু মাঝেমাঝে শিল্পীরূপেও দেখা দেন। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও আছে। বয়োবৈগুণ্য বা অন্য কারণে গুরুর পক্ষে শিল্পকৃতিত্ব অসম্ভবও হতে পারে; অথবা কৃতিত্ব কষ্টসাধ্যও হতে পারে। কষ্টসাধ্য কৃতিত্বের অনুকরণ থেকে গান শিক্ষা করার সময়ে কষ্টসাধনসূচক বিকৃতি বা দোষগুলিরও অজ্ঞাতসারে অনুকরণ হয়ে পড়ে।

এর উপরেও মনে করা যাক, শেষোক্ত গুরুটি অত্যন্ত কড়াপাকের isolationist, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, একমাত্র তাঁর জ্ঞান ও প্রয়োগই ঠিক, অন্য সবই বিকৃত ও ভ্রান্ত; অথবা তাঁর সম্প্রদায় বা ঘরবানার শিল্পপ্রয়োগ প্রভৃতিই ভারতের একমাত্র আদর্শ, অন্য সমস্ত ঘরবানা অনাদর্শ বা ভুঁইফোড়। এরকম গুরু মনে করেন, ছাত্ররা তাঁর কৃতিত্ব বা ঘরবানার অচলায়তনের মধ্যে বদ্ধ থাকবে; অন্য গুরু সম্প্রদায় বা শিল্পের ছোঁয়াচ তাদের পক্ষে হাম-বসন্তেরই মতো মারাত্মক ও বর্জনীয়। অতএব শিষ্যকে বাইরের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই শ্রেণীর গুরু অবিরল নয়। এরকম দু'চারজন মঠধারীর সঙ্গে আলাপ করে গায়কি সম্বন্ধে তাঁদের সরল মত উদ্ধার করেছি। মতটি এই— "আমি যা গাইব করব বা দেখব তাই-ই গায়কি। গায়কি বলে শেখাবার মতো স্বতন্ত্র বস্তু নেই। অন্য ওস্তাদ বা ঘরবানা যে পৃথক গায়কির কথা বলে সে-সবই বুজরুকি"। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী তাঁরাই ঘরবানা বজায় রাখেন বা নূতন করে ঘরবানা তৈরী করেন। যেরকমই হোন, ছাত্রগুলি

ভয়ে ভক্তিতে নিজেদের অচলায়তনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তাদের মনে অস্বাভাবিক সংকোচ ও পরশ্রীকাতরতার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এবং পূর্বোক্তভাবে গীতের নীরস মূর্তিটি অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যৎজীবনে কখনোই সরস প্রাণবান গীতাভিব্যক্তি সম্ভব হয় না; এবং সংকোচের কারণে অন্য শিল্পী বা ঘরবানার যথার্থ গায়কিও তার পাষাণ-মনে রেখাপাত করতে পারে না। এরকম শিক্ষাপদ্ধতির দুই কি তিন পুটপাকের পর যে শিষ্যশাবক গড়ে ওঠে, সেগুলি এক-একটি পাথরের নুড়ি বিশেষ। মাইফেল বা মজলিসে দলবদ্ধ হয়ে দঙ্গল সৃষ্টি করা ছাড়া এই নুড়িগুলির অমূল্য জীবনে আর কোনো সার্থকতার উদয় হয় না। এই দঙ্গলী শিল্পী বা গাইয়ে এখনো প্রচুর আছে এবং যথানিয়মে প্রস্তুতও হচ্ছে। এখনো যে জলসায় দলগত বা ব্যক্তিগত কলহের উদ্ভব হয়, সেগুলি পাথরের নুড়িদের ঠোকাঠুকি মাত্র। ভুক্তভোগীরা এবিষয়ে অবগত আছেন।

মোটের উপর অবস্থা এই। এখন এরূপ আশা করা যায় না যে, প্রত্যেক গুরুই এক-একজন বিশিষ্ট শিল্পী। শিল্পী হলেও পাখি-পড়ানো শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে। পাইকারি বন্দোবস্ত দিয়ে গানশিক্ষার সাধারণ ফল অনুমান করা কঠিন হয় না। এরকম অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার মধ্যে দীক্ষা-শিক্ষা পেয়েও দু একজন শিষ্য যে পরে উঁচুদরের শিল্পী হয়ে দেখা দেন, সে কেবল অদৃষ্টলব্ধ বুদ্ধি অনুভবশক্তি ও কর্মক্ষমতার মাহাত্ম্যে, শিক্ষার গুণে নয়। এদের মহোদয়ের কারণে গুরু বা ঘরবানা বা বিদ্যায়তনের মাহাত্ম্য বাড়ে তো মঙ্গল, কিন্তু পণ্ডশ্রমের উদাহরণ দেখে নিরাশ 'হতে হয়।

এর একমাত্র প্রতীকার আছে 'গায়কি' প্রস্তাবের মধ্যে। প্রস্তাবটি সংক্ষেপেই বলা যাক।

সার্থকনামা গীতিমাত্রেরই একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তির উপযুক্ত রূপ আছে। গান করে এই অভিব্যক্তি-সাধন হয়। গানকার্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারই 'গায়কি'। সমগ্র গীতির সাধারণ্যকে মনে করলে গায়কিরও সাধারণ্য মনে করা যায়। এই সাধারণ্য বাংলাদেশে বা ভারতে বা ইউরোপে বা সারা জগতেই গীতরূপের সাধারণ অপরিহার্য অলঙ্ঘনীয় হয়ে আছে। এই সাধারণ্যের জ্ঞান ও প্রয়োগ চর্চা করা উচিত, ঠিক যে কারণে বালক-বালিকাকে নাকানিচোবানি না দিয়ে ডুবে যাবার ভয় না হতে দিয়ে এবং জল না খাইয়েও বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামপদ্ধতি অনুসারে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে দু'হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার কোনো অতিপ্রাচীন সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের যুগে গীতবিষয়ে গায়কির এই সাধারণ্য-প্রয়োগ পরীক্ষা বিচার ও সিদ্ধান্তের অধিকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যাপক বিশদ ও বাস্তব কোনো সিদ্ধান্ত আর পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় তথাকথিত classical ও romantic গীতিশ্রেণীর পক্ষে যে গায়কি উদ্ভূত হয়েছে, সেও এই সাধারণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ্যের অতিরিক্ত বিশেষ বা বিশিষ্ট গায়কিও আছে। কিন্তু এগুলি সমস্তই সাধারণ্যের তত্ত্ব বা categoryর মধ্যেই আছে। কালেকালে দেশেদেশে যে গীতভেদ দেখা যায়, তাদের মধ্যে এই গায়কির বিশেষ ও বিশিষ্ট ভেদগুলি পাওয়া যায়। বিশেষ আর কিছুই নয়, সমাবেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এগুলিও আলোচনা ও প্রয়োগযোগ্য, কারণ শিল্পী দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যেই উদিত হন।

গীতির, অর্থাৎ প্রত্যেক গীতির, ব্যক্তিগত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সে কারণে ব্যক্তিগতভাবেও বিশিষ্ট গায়কির সমাবেশ আছে।

এই গায়কি বা গায়কিভেদ কল্পনা বা abstraction নয়, এর মধ্যে কোনো অতি-প্রাকৃত

রহস্য বা mysticism নেই, তার স্থান নেই অবকাশও নেই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভবের যোগ্য ও বাস্তব।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গায়কির বিচিত্র চিত্রাঙ্কন ছাড়া গীতরূপের সুন্দর বা কাম্য অভিব্যক্তি হতে পারে না; সাধারণ বা বিশেষ গায়কি আয়ত্ত না করে শিল্পী হওয়া অসম্ভব; একমাত্র অসাধারণ প্রতিভাই গায়কি আয়ত্ত করার পরিশ্রম না করেও যথানুরূপ গায়কি দিয়ে গীতরূপ সৃষ্টি করতে পারেন। গায়কি না জেনে বা আয়ত্ত না করে নিজ ইচ্ছা ও কল্পনাপ্রসূত গায়কি দিয়ে গীতরূপকে খাড়া করা যায়, কিন্তু সেই রূপটির পক্ষে যথার্থ গীতরূপ হওয়া বা না-হওয়া শিল্পীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে chance and law of probabilityর উপর, অর্থাৎ সুর-তাল-পদের সমাবেশ ভেদ এবং গায়কি-সাধারণ্যের নির্দিষ্ট ছেচল্লিশটি ভেদ এদের যতরকম ইচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় যোগাযোগ হতে পারে তাদের মধ্যে মাত্র একটি সমাযোগই যথার্থ গীতরূপের মধ্যে থাকে। উপমাস্বরূপে, হাত পা নাড়তে পারে ও বল আছে এমন একটি সাঁতার-না-জানা বালককে পুকুরে ফেলে দিলে তার পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টায় বেঁচে পারে ওঠার সম্ভাবনা বা যোগাযোগ যেমন, পূর্বোদ্ধৃত সম্ভাবনা বা যোগাযোগও সেই রকমের। গায়কিবর্জিত কসরৎমাত্রসম্বল গান অভ্যাস করিয়ে তরুণ মনের সহজ অনুভবশক্তির ও সৌন্দর্যলোলুপতার উত্তমরূপে অবলোপসাধন হতে পারে, যদি অচলায়তন ও ছুৎমার্গপদ্ধতির বেড়া দিয়ে ছাত্রদের ঘিরে রাখা যায়। কোনো কিছু শিক্ষা না করে, মাত্র স্বভাবের বশে বালক-বালিকারা সেই সেই গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেগুলি গায়কির গুণে সজীব ও রক্তিদায়ক; কিশোরবয়স্কদের গান শিক্ষা দেওয়ার ভার যিনি গ্রহণ করেন বিশেষ করে সেই গুরু ও শিক্ষকের গায়কিবিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনিই সম্ভবত তরুণ মনের উপর প্রাথমিক রেখাঙ্কন করতে ব্রতী হয়েছেন।

সাক্ষাৎগুরুর কাছে গান শিখতে গিয়ে যদি এত রকমের ব্যাঘাত ও অভাবের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে নির্জীব ছাপার কাগজের উপর লেখা স্বরলিপিকে সামনে রেখে গান শিক্ষা করবার চেষ্টা অথবা যথার্থ গীতরূপকে অভিব্যক্ত করার শ্রম কতটুকুই-বা সার্থক হতে পারে, এরূপ সমীচীন প্রশ্ন বা তর্ক আপনা থেকেই জেগে ওঠে। বারান্তরে এই প্রশ্ন ও তর্কের মীমাংসা করার ইচ্ছা রইল।

গ্রন্থপরিচয়

দেশে বিদেশে: সৈয়দ মুজতবা আলী। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ডাক্তার সৈয়দ মুজতবা আলীর "দেশে বিদেশে" বইখানির প্রকাশনকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমি একটী লক্ষণীয় ঘটনা ব'লে মনে করি। এই বই সপ্তাহে সপ্তাহে "দেশ" পত্রিকায় এক এক অধ্যায় ক'রে যখন প্রথম প্রকাশিত হ'চ্ছিল, তখন আমি অধীর আগ্রহে যখনই "দেশ" বেরিয়েছে এই বই প'ড়ে আস্‌ছিলুম। সম্পূর্ণ বইখানি এখন বেরিয়ে যাওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত। কারণ এই বই বাঙলা ভাষায় দেশভ্রমণকে অবলম্বন ক'রে রচিত আর গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যতম রসসৃষ্টি রূপে চিরকাল বিরাজ ক'রবে। প্রথম পড়বার সময়ে লেখকের রসবোধ, গভীর জ্ঞান আর সমীক্ষা, মাতৃভাষার প্রতি দরদ, আর সহজ সাবলীল রসপূর্ণ ভঙ্গীতে তাঁর নিজের চোখে দেখা জিনিস আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলবার শক্তি, এই সমস্ত, আর এ ছাড়া আরও অন্যান্য অনেক গুণ, আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ ক'রেছিল। মনে প্রাণে তাঁর প্রশস্তি ক'রেছি, পাঁচজনকে ডেকে তাঁর এই লেখার তারিফ ক'রেছি আর প'ড়ে শুনিয়েছি। আর তাঁর সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পত্রযোগে পাঠক-হিসাবে আমার সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার মতন আরও অনেক পাঠক তাঁর এই বই প'ড়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়েছেন দেখে আমি বিশেষ খুশী হ'য়েছি।

বিভিন্ন ধর্ম (অর্থাৎ শেষ কথায়, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস) পোষণ করায় মানুষ যে তার সমজাতি আর সমভাষী, ভাষায় আর রক্তে যার সঙ্গে সে এক, তার কাছ থেকে একেবারে আলাদা হ'য়ে যায়— এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ফলে যখন ভারতে Two Nation Theory, অর্থাৎ ভারতের হিন্দু আর মুসলমান হচ্ছে দুইটী পৃথক্ জাতি এই ধারণা, নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটী প্রবল দল দেখা দিলে, আর যখন দেশব্যাপী রক্তারক্তি, খুনোখুনি, নরহত্যা, জাতিহত্যা, দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের বহিষ্করণ প্রভৃতি অনর্থ ও অনাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারত দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেল, তখন, আর কতকগুলি উদার মনোভাবের মুসলমান সজ্জনের সঙ্গে একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষায় এই অপূর্ব বইখানি লিখে, নীরবে উপর্যুক্ত দলের মতবাদের আর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ জানালেন, আর প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, ধর্ম আলাদা হ'লেও বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান একই মানসিক সংস্কৃতির মানুষ, একই জাতির মানুষ। বৃহত্তর ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বাঙালী জাতির মধ্যে যে ধর্ম এসে অনপনেয় পার্থক্য ঘটাতে পারে না, ভারত আর পাকিস্তান রাজনীতির দিক থেকে পৃথক্ হ'লেও ভাব ও চিন্তায় দুটী রাজ্য বা রাষ্ট্র নয় আর দুটী রাষ্ট্র হওয়াও যে কঠিন, একথা তাঁর বইয়ের মারফৎ ডাক্তার মুজতবা আলী দেখিয়ে দিলেন।

ডাক্তার মুজতবা আলী দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ পণ্ডিত, আর তা ছাড়া তিনি ইংরেজি ফরাসী আর জরমান এই কটা ইউরোপীয় ভাষায়ও পণ্ডিত। ফারসীর কাজ-চালানো জ্ঞান তাঁর ছিল, মিসরে

অল্-কাহিরা বা কাইরোর আল্-আজ-হার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাঠ করার দরুন তিনি প্রাচীন সাহিত্যিক আরবী আর আধুনিক আরবী এই দুইয়ের সঙ্গেও পরিচিত। এখনকার পাকিস্তানের অধীন শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর বাড়ী, নবী মোহম্মদের বংশের মুসলমান ধর্ম-গুরু সৈয়দ ঘরের ছেলে তিনি; কিন্তু কৈশোর ও প্রথম যৌবনে শান্তিনিকেতনের আব-হাওয়ায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চরণতলে তাঁর মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'য়েছিল। প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সত্যকার হাস্যরসোজ্জ্বল, লঘুশৈলীর অথচ ভাবগম্ভীর চল্‌তি বাঙলা ভাষায় তিনি যে অসাধারণ দখল তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন, সেটা তাঁর মনের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রসাদ উভয়ের গঙ্গাযমুনা-মিলনের ফল।

বইখানি প'ড়তে আরম্ভ ক'রলে, বাঙলা ভাষার সত্যকার প্রেমী লেখকের এই ভাষার প্রয়োগ দেখে কেউ সাধুবাদ না ক'রে পারবেন না। বাঙলা চলতি ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য্য, তার বাচংযমতা আর ভাবপ্রাচুর্য, আবার তার অজস্রতা আর বৈচিত্র্য— এক কথায়, চল্‌তি বাঙলা যে কত জোরদার ভাষা, তা ইনি নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বা ঢঙে নোতুন ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। এই রকম ভাষা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চ'ল্‌তে পারে, তাতে আর সন্দেহ নেই। অন্তর্নিহিত শক্তিকে টেনে বা'র করাতেই মুন্‌শিয়ানা— ডাক্তার মুজতবা আলী সে মুন্‌শিয়ানার অধিকারী। সহজাত কবচের মত সুন্দর শক্তিশালী ভাষার বর্ম তাঁর লেখার ভাবদেহকে ঘাতসহ ক'রে রেখেছে।

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লাহ নিজের দেশে রাতারাতি miracle বা কেরামৎ জাহির করবার দুরাশা ক'রেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন আফগানিস্থানের ঈরানী আর পষ্‌তানা বা পখ্‌তানা অর্থাৎ পাঠান জাতির মানুষকে মধ্যযুগের ইস্লামী আব-হাওয়া থেকে এক হেঁচকা টানে দুদিনে অতি-আধুনিক ক'রে তুলবেন, এমন কি বোরকা-ঢাকা বিবিসাহেবাদের কয়েক মাসের মধ্যে আলোক-প্রাপ্তা ক'রে Parisienne-এ পরিণত ক'রবেন। শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি পশ্চিমের দুনিয়ার নোতুন হাওয়া পূবের পুরাতন দেশে বহাতে চেয়েছিলেন। নানা দেশ থেকে বিভিন্ন বিদ্যার পণ্ডিত এনে পাঠান ছেলেমেয়েদের মানসিক উন্নতি তিনি ক'রতে চেষ্টিত হন— কাবুলের সরকারী কলেজে বা ইস্কুলে ফরাসী রুষ জরমান আর ভারতীয় শিক্ষকের মেলা ব'সে গিয়েছিল। এই আফগান-জাগৃতির শুভ দিনে জ্ঞান-যজ্ঞে অন্যতম পুরোহিত হবার জন্য ডাক প'ড়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে এই মুসলমান বঙ্গ-সন্তান ডাক্তার সৈয়দ মুজতবা আলীরও— মুখ্যতঃ বিদেশীয় নানা ভাষা আর তাদের সাহিত্য পাঠান আর ঈরানী ছেলেদের পড়াবার জন্য, আর তাও আফগানিস্থানের শিক্ষার ভাষা, ভদ্রসমাজের ভাষা ফারসীর মাধ্যমে। শিক্ষক রূপে তাঁর কলকাতা থেকে রেলে আর বাসে কাবুল পর্য্যন্ত যাত্রা, কাবুলে তাঁর থাকবার কথা, সেখানে তাঁর নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা (এঁরা বেশীর ভাগই ছিলেন তাঁর সহকর্মী, আর তা ছাড়া তাঁর ভৃত্য, আর রুষ দূতাবাসের বন্ধুরা)— এই-সব কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। তার পরে, কাবুলে থাকতে-থাকতে দেখা দিলে আমীর আমানুল্লাহের অতি উৎসাহের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া— ধর্মবিষয়ে রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামী মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল— ক্ষমতালোলুপ লুঠেরা আর ধর্মধ্বজী মোল্লা এই দুইয়ের ত্বরিত গতি এক দিকে, আর সংস্কার-বিলাসী, আদর্শবাদী, মানুষের উদার প্রকৃতিতে আস্থাশীল রাজার অলস মন্থর গতি অন্য দিকে। আমানুল্লাহ বিতাড়িত হ'লেন, নানা গোপন ষড়যন্ত্রের পরে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আর রাজার অক্ষমতা একসঙ্গে

দেখা দিলে, শেষে ঘ'ট্‌ল দেশের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব, বাচ্চা-ই-সক্কার সিংহাসন অধিকার, আমানুল্লাহের পলায়ন। ঘটনাবলী অতি দ্রুত ঘ'টে গেল; কিন্তু তার মধ্যে নিরীহ বিদেশী ভারতীয় অধিবাসীদের সমস্যা, বিশেষ কষ্ট আর উদ্বেগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। ডাক্তার মুজতবা আলী আর তাঁর সহকর্মী আর শান্তিনিকেতনের সুহৃৎ আর সতীর্থ মৌলানা জিয়াউদ্দীনকে-ও এই অনপেক্ষিত রাষ্ট্রবিপ্লবে যথেষ্ট ভুগ্‌তে হ'ল। এই-সব কথা, চমৎকার রসপূর্ণ ভঙ্গীতে বাঙালী পাঠকদের জন্য গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে, আফগানিস্থানে ভারতবাসীর প্রদত্ত বেতনে পুষ্ট ইংরেজ-জাতীয় ভারতের রাজদূতের ভারতীয়দের সম্বন্ধে নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনতা ও দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার কথা-ও এসে গিয়েছে।

ডাক্তার আলী কত দিন বা কত মাস বা কয় বৎসর কাবুলে ছিলেন, তা স্পষ্ট ক'রে কোথাও জানিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। একটীও তারিখ নেই তাঁর এই অপূর্ব বিদেশ-দর্শনের কথায়। আফগানিস্থানে বাচ্চা-ই-সক্কার বিদ্রোহ আর আমানুল্লাহের পতন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা হ'চ্ছে তাঁর কাবুল-বাসের শেষের দিকের অন্যতম পটভূমিকা। সে-সব ঘটনার তারিখ, পেশাদারী সন-তারিখ-দেওয়া ইতিহাসের কেতাবে পাওয়া যাবে। সন-তারিখ না দেওয়াটা-ই যেন ডাক্তার আলীর বইয়ের পক্ষে একটী symbolic বা প্রতীক-স্থানীয় অথবা deliberate বা সচেতন উদ্দেশ্য-মূলক ব্যাপার। কারণ, বিষয়ের দরুন বিশেষ-দেশ-নিবদ্ধ থাকতে বাধ্য হ'লেও, যথার্থ রসসৃষ্টির ফলে তাঁর বই কাল-নিরপেক্ষ হ'য়ে নির্দিষ্ট কালের ঊর্ধ্বে গিয়ে পৌঁচেছে।

লেখকের সজীব মন, তাঁর সঙ্গে আর তাঁর চার পাশে যে-সব মানুষ র'য়েছে, চ'লছে-ফিরছে, শুয়ে ব'সে আছে তাদের সম্বন্ধে তাঁর দরদপূর্ণ কৌতূহল, তাঁকে কতটা না ফুর্তিযুক্ত ক'রে রেখেছে! যত লোকের তিনি সংস্পর্শে এসেছেন, তা তাঁর রেলগাড়ীর ক'লকাতার তালতলার ফিরিঙ্গী রেলের-গার্ড সহযাত্রীটী থেকে আরম্ভ ক'রে পেশাওর কাবুল-পথের বাসের শিখ মোটরচালক পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিটী, তা সে পথ-চলতি সঙ্গীই হোক, তাঁর কাবুলের ভৃত্য অদ্ভুত চরিত্রের আবদুর-রহমানই হোক, নানা মনোভাবের তাঁর সহকর্মী আফগান শিক্ষকেরাই হোক, সকলের মধ্যে তিনি দেখেছেন তাদের সহজ মানবিকতা, তাদের প্রাণ। আর তিনি যা দেখেছেন তা জীয়ন্ত ক'রে তুলেছেন তাঁর বর্ণনার নৈপুণ্যে। এটী একটী কম গুণ নয়।

ডাক্তার মুজতবা আলীর হাস্য বা ব্যঙ্গরস অতি স্নিগ্ধ বস্তু। সেটী একসংস্কৃতি-পূত মানবপ্রেমীরই পরিচায়ক, তাহার মধ্যে রুক্ষতা বা কর্কশতা অথবা নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র নেই। সব কথা, গুরু গম্ভীর কথাও তিনি সরস ক'রে হাসিয়ে-হাসিয়ে শোনাতে পারেন, এটী বড় অপূর্ব জিনিস। বই খুলে প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেই চোখে পড়ে—"চাঁদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম।" এই রকম হাল্কা ভাবে শুরু হ'ল যে কেতাবের, তা প'ড়ে যেতে কোথাও বাধে না, গ্রন্থকারের পরিহাস-রসিকতা সদা বিদ্যমান থেকে, জটিল সমস্যা, বড় বড় গুরুপাক আন্তর্জাতিক কথা, সাংস্কৃতিক বিচার, সমস্তই লঘুপাক ক'রে দেয়। তাঁর হাস্যরসের ভাণ্ড তিনি একেবারে উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন; তাঁর এই দানশৌণ্ডতা কিন্তু অনেককে একটু বিব্রত ক'রে তুলবে।

যে মানুষগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন তারা প্রত্যেকেই জীয়ন্ত, প্রত্যেকেই বিশিষ্টতা-যুক্ত। ডাক্তার আলীর চোখে দেখে তাদের সঙ্গে আমাদেরও দোস্তী হ'য়ে যায়— মনে হয়, তারাও আমাদের

চেনা, আমাদের পরিচিত। যাত্রাপথে বা কাবুলে অবস্থানকালে, চলচ্চিত্রের মত তাঁর কথার যন্ত্রে যাদের ছবি তিনি নিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই প্রাণ পেয়েছে— সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে পাঠকের হৃদয়ে তারা অমর হ'য়ে থাকবে। ক'লকাতার ট্রেনের সেই তালতলার মেটে ফিরিঙ্গী সহযাত্রী, পাঞ্জাবে পেশাওরের পথে শিখ সরদারজী আর পাঠান সহযাত্রী, পেশাওরে তাঁর পাঠান বন্ধু আহমদ আলী যার ঘরে তিনি অতিথি হ'য়েছিলেন, বুড়ো শিখ বাস-চালক যে ছিল একটী যাকে বলে character, আফগান রেডিও কর্ম্মচারী যিনি একই বাসের যাত্রী ছিলেন; কাবুলে তাঁর চাকর আবদুর-রহমান, বরফের দেশ পান্‌শির থেকে তার বিরাট্‌ বপু আর তার কুসুম-কোমল হৃদয় নিয়ে লেখকের সেবা ক'রে তাঁর হৃদয় জয় ক'রে নেয় যে, আমাদেরও হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছে সে —লেখকের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বইয়ের শেষ কথা আমরাও প্রতিধ্বনিত করি—"মনে হ'ল, চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর-রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর-রহমানের হৃদয়"; রসিক-প্রবর মীর আসলম, যিনি লেখককে তাঁর অজ্ঞাতসারে তালীম দিয়ে ফারসীতে পোক্ত ক'রে দেবার জন্য ছাপার হরফের ভাষায় শক্ত শক্ত আরবী কথায় ভরা ফারসী প্রথমটায় ব'লতেন, পরে সহজ চল্‌তি ফারসীতে তাঁর লঘু স্বরূপ প্রকাশ করেন; অধ্যাপক সাইফুল আলম, অধ্যাপক দোস্ত মোহম্মদ; ফরাসী অধ্যাপক আমাদের পূর্ব-পরিচিত শান্তিনিকেতনের বেনোআ সাহেব, আর রুষ অধ্যাপক বগ্‌দানফ; রুষ রাষ্ট্রদূতাবাসের বন্ধুগণ—দেমিদফ, বলশফ, আরও অন্য অন্য ভদ্রসন্তান ও মহিলা; লেখকের ছাত্র, বাচ্চা-ই-সক্কার আত্মীয় যে উনিশ বছর বয়সেই সক্কার ফৌজে "কর্ণাইল" হ'য়ে, বিপ্লবের মধ্যে দুঃখের দিনে deus ex machina অর্থাৎ ভাগ্যবিধাতার মত আচমকা উদিত হ'য়ে লেখক আর তাঁহার সহকর্মী, সতীর্থ ও সুহৃৎ জিয়াউদ্দীন সাহেবের জীবন-ধারণ সমস্যার সুসার ক'রে দেয়; অজাতশত্রু সর্বজনপ্রিয় জিয়াউদ্দীন সাহেব, শান্তিনিকেতনে যাঁর বন্ধুত্ব লাভের সুযোগ আমারও হ'য়েছিল, আর যাঁর অকালমৃত্যু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ব্যথিত ক'রেছিল ও যাঁর স্মৃতিতে কবি তাঁর এক অমর কবিতায় নিজের স্নেহ নিবেদন ক'রেছিলেন;—কত নাম করা যায়? এর উপর, তাঁর অননুকরণীয় রসপূর্ণ ভাষায় ও ঢঙে তিনি আফগানিস্থানের রাজান্তঃপুরের পলিটিক্স-এর এমন সুন্দর ইতিহাস জীয়ন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে তার তুলনা হয় না। আমরা আমানুল্লাহের মাতার নামও শুনিনি, কিন্তু তাঁর কীর্তিকাহিনী, তাঁর "কারনামা" এমন রসসিক্ত ক'রে কে লিখতে পেরেছে? আমানুল্লাহের বড় ভাই মুইনু-স্-সুলতানে যিনি একটী মেয়ের ভালবাসায় প'ড়ে, হেলায়, লোকে ব'লবে নির্বোধের মত, সিংহাসন ত্যাগ ক'রলেন, সেই মেয়েটীর মহীয়সী প্রকৃতি, পরবর্তী কালে তাঁর নারী-সুলভ স্নেহশীল হৃদয়, আমরা লেখকের সঙ্গেও অনুভব ক'রেছি;—বিদেশী, সুন্দর চেহারার তরুণ অধ্যাপকটীকে একা-একা দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় তার সম্বন্ধে সহানুভূতিতে ভ'রে যায়—তিনি স্বামীকে যে ব'লেছিলেন—"বাচ্চা গম মীখুরদ্‌—ছেলেটার মনে সুখ নেই"—একথা প'ড়ে আমরাও তাঁর উদ্দেশে নীচু হ'য়ে লেখকের মতন আদাব তস্‌লিমাত জানাচ্ছি।

বইখানির documentary value বেশ আছে—প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, কি ভাবে কোন্‌ ঘটনা-পরম্পরার ফলে আমানুল্লাহ বিতাড়িত হ'লেন, বাচ্চা-ই-সক্কাকে আশ্রয় ক'রে গোঁড়ার দল বিজয়ী হ'ল। বইখানিতে ঘটনার আলোচনা আছে; কিন্তু এর মুখ্য মূল্য হ'চ্ছে যে এতে কতকগুলি মানুষের মনের পর্দা খুলে আসল মানুষগুলিকে চিরকালের জন্য ধ'রে দেওয়া হ'য়েছে। বই প'ড়ে বিস্ময়ে আর খুশীতে মন ভ'রে

যায় —মীর আসলম, সাইফুল আলম, দোস্ত মোহম্মদের মত এমন সংস্কৃতিপূর্ণ মানুষ আফগানিস্থানে আবার দেখা দিচ্ছে—এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছা হয়; মনে এক-একবার প্রশ্নও জাগে, সত্যই কে এঁরা এত বিদগ্ধ, এত সুসংস্কৃত ব্যক্তি? না এখানে লেখকের মুন্‌শিয়ানা আছে—চোখে রঙীন চশমা প'রে তিনি সব দেখেছেন, তদনুসারে তাঁর বর্ণনাতেও গোলাপী রঙ এসে গিয়েছে? কিন্তু সমস্ত বইখানা প'ড়লে, তাঁর sincerity বা ভাবশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হ'চ্ছে সংস্কৃতিপূত উদার মনের দৃষ্টিভঙ্গী, যাতে লোহা-ও সোনা হ'য়ে যায়।

একটী কথা ব'লবো। লেখকের পাঠ আর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে তিনি অবলীলাক্রমে স্বদেশী বিদেশী পাঁচটা ভাষা আর সাহিত্য থেকে নানা কথা নানা সাহিত্যিক প্রসঙ্গ এনেছেন, তার সমস্তের সঙ্গে পরিচয় রাখেন এমন বাঙালী খুব কমই আছেন। কিন্তু সে-সবে বইয়ের বক্তব্যের বাধা হয় না—পার্বত্য নদীর গতিবেগের মধ্যে পাথরের চাবড়ার মত হয়তো মনে হবে তা বাধা সৃষ্টি ক'রছে; কিন্তু কার্য্যতঃ তা করে না—বইয়ের স্বচ্ছন্দ নৃত্যময় গতিবেগকে আরও সুন্দর আর বিচিত্রতাযুক্ত ক'রে তোলে। তবে ছাপাখানার কারসাজিতে এই-সব বিদেশী ভাষার নামের আর বাক্যের বাঙলা প্রতিবর্ণে একটু-আধটু ভুল-চুক মাঝে মাঝে এসে গিয়েছে।

লেখকের ব্যক্তিত্ব যা তাঁর বইয়ে ধরা যাচ্ছে তার মধ্যে আর দুটী জিনিস লক্ষণীয়। তিনি একদিকে যেমন international, বিশ্বের একজন, বিশ্ব-মানবিকতায় ভরপূর উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি ইউরোপীয়, ভারতীয় আর ইস্লামীয় তিনটী সভ্যতার বাহ্য ইতিহাস আর স্বরূপ আর তার ভিতরের কথা সব নখ-দর্পণে রাখেন,—তিনি ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজি, ফরাসী, জরমান, বাঙলা (প্রাচীন আর আধুনিক), সংস্কৃত, ফারসী, আরবী আর তা ছাড়া অন্য কতকগুলি সাহিত্যের হাওয়া আর তার মহাবাক্য আর বচন তাঁর মনের ফুলবাগানে সৌরভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে—তাঁর কাছে গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই;—আর অন্যদিকে তিনি হ'চ্ছেন তেমনি খাঁটী বাঙালী—কেবল খাঁটী বাঙালী নন, খাঁটী মুসলমান বাঙালী; তিনি নিজে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের গৌরবে, "স্বে মহিম্নি", নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁর আন্তর্জাতিকতা, বাঙালী মুসলমান জাতীয়তার ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য তাঁর আন্তর্জাতিকতা এত পাকা: কারণ এই কথাটা অতি সত্য কথা—he alone is truly international who is most intensely national. মাঝে মাঝে যখন তিনি দুই-চার বার তাঁর মনের গভীরতম প্রদেশের বাতায়নপথ একটু-আধটু উন্মুক্ত ক'রে দেখিয়েছেন, তখন মুসলমানী রঙে রঙানো অনুভূতির বা রসোপলব্ধির ঝলক চোখে লেগেছে;— আমি বাঙালী হিন্দু ঘরের ছেলে, এতে খুশীই হ'য়েছি; কারণ আমি এককে তো চাই-ই, বহু আর বিচিত্র সেই একেরই প্রকাশ ব'লে পৃথক্-পৃথক্ ভাবে এই বহু ও বিচিত্রকেও আমি চাই।

বইখানি থেকে বহু বহু অংশ প'ড়ে শোনাবার বা উদ্ধার ক'রে দেবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা ক'রবো না। "দেশে বিদেশে"-তে অপূর্ব ভোজ্যসম্ভার সংস্কৃতিকামী বাঙলা-পড়িয়ে' মানুষের জন্য পরিবেশিত হ'য়ে র'য়েছে; আমি সকলকে তাতে ব'সে যেতে আহ্বান করি॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রুদ্ধকারার দিনগুলি : শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। সিগনেট প্রেস, ১০৷২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ছায়ামিছিল : শ্রীকৃষ্ণা হাতিসিং। সিগনেট প্রেস, ১০৷২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

শৃঙ্খলঝংকার : শ্রীবীণা দাস। সিগনেট প্রেস, ১০৷২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

জেনানা ফাটক : শ্রীরানী চন্দ। মডার্ন বুক্‌স্ লিমিটেড, ১৬০৷১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

কারাসাহিত্যে পুরুষদের দান ইতিমধ্যেই সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশেষ করিয়া বাংলায়। বাংলার বহু বিপ্লবী তাঁহাদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক বাংলাসাহিত্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' নিঃসংশয়ে প্রথম ও প্রধান পুস্তক। শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর'কে আমরা আপাতত সর্বশেষ ও প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। একমাত্র বাংলাদেশেই লক্ষাধিক নরনারীর জেল-জীবনের কমবেশি অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু লেখক এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে স্থায়ী রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এতদিন পুরুষদের একক দানেই কারাসাহিত্য পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অধুনা কয়েকজন মহিলা নিজেদের রচনায় সাহিত্যের এই দিকটির সমৃদ্ধি ও পুষ্টি বিশেষভাবে সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা জেল-জীবনের যে-দিকটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এতকাল অনাবিষ্কৃতই ছিল। এক্ষেত্রে নারীপ্রতিভা ও মহিলা লেখকেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন আশাতিরিক্তভাবে তাঁহারা সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নেহরু-পরিবারের বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা এবং বাংলার বীণা দাস ও রানী চন্দ— এই চারজন লেখিকার দান এই প্রসঙ্গে স্থায়ী কীর্তির মর্যাদা লাভ করিবে।

বিজয়লক্ষ্মীর 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' (Prison Days) কারাজীবনের রোজনামচা। এই কারণেই ইহার পরিধি ও বিস্তৃতি স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। ভূমিকাতে লেখিকা বলিয়াছেন, "জেল-খানার প্রাচীরের অন্তরালে যা ঘটে, তা জানতে যাঁরা উৎসুক, তাঁদের কাছে এই বইখানি আমি নিবেদন করছি।" কিন্তু বইখানির প্রকৃত আবেদন অন্যত্র। এই ডায়ারির আড়ালে নেহরু-পরিবারের অশরীরী উপস্থিতিই পুস্তকখানির মূল আকর্ষণ। অন্যভাবে বলা চলে যে, পুস্তকখানির আকর্ষণ ব্যক্তিগত। বিজয়লক্ষ্মীর মধ্যে যিনি মাতা, তাঁহার মনটি এই পুস্তকের আদ্যন্ত একটি করুণ ও স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। লেখিকার মাতৃপরিচয়ই এই রোজনামচার অমূল্য সম্পদ। পুরুষের বিশেষ কোনো পরিচয় নাই, পিতা-পুত্র-ভাই ইত্যাদি কোনো পরিচয়েই পুরুষের সার্থকতা বা চরিতার্থতা বহন করিতে পারে না। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে মাতৃপরিচয়ে তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বের চরিতার্থতা ও পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয়। 'রুদ্ধ-কারার দিনগুলি' কারাসাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, তাহা এই মাতৃপরিচয়ের জন্যই। শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রতিভাতেও ইহা সম্ভবপর ছিল না।

'ছায়ামিছিল' (Shadows on the Wall) সাহিত্যের বিচারে 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' হইতে শ্রেষ্ঠতর। কৃষ্ণা যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা অকপট সাহিত্য। বিষয়-নির্বাচনে কৃষ্ণা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যিক মন ও শক্তি দুইয়েরই পরিচায়ক। 'ছায়ামিছিল' কারাজীবনের রোজনামচা নহে, ইহা কারাকাহিনী এবং তাহার চেয়েও অধিক কিছু। কারাবাসের অভিজ্ঞতা-অবলম্বনে লেখা বারোটি সত্যমূলক কাহিনীর সমষ্টি এই 'ছায়ামিছিল'। ইহা একাধারে সত্য ঘটনা ও সাহিত্য, এইখানেই পুস্তকখানির সার্থকতা ও মৌলিকত্ব। 'ছায়ামিছিল' চরিত্র-চিত্রশালা।

'ছায়ামিছিল'এর গল্প কয়টি উদ্দেশ্যমূলক, পুস্তকের ভূমিকাতে লেখিকা নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "স্বাধীনতাসংগ্রামের সেই অসংখ্য অজ্ঞাত যোদ্ধার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কয়েকটি জীবনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নিবেদন করলাম।" এই উদ্দেশ্য আশাতিরিক্তভাবে সিদ্ধ করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। 'চিত্রা' নামক গল্পটিতে একটি অল্পবয়স্কা স্বদেশী মেয়ের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মর্মস্পর্শী ও মর্মান্তিক। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েটির জেল হয়। স্বামী কংগ্রেসকর্মী ও গান্ধীপন্থী হইয়াও বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন্। স্ত্রীর নিকট হইতে খবরসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যই এই ব্যবস্থা। আগ্রহ ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা লইয়া মেয়েটি অবশেষে এক জেলের নির্জন সেল-এ আসিয়া আবদ্ধ হয়। তথাকার মেট্রনের হাতে চিত্রাকে শায়েস্তা করিবার ভার দেওয়া হয়। তারপর নির্জন সেল-এর নৈশ অন্ধকারে যে বীভৎস ও অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা লেখিকা দিয়াছেন, তাহা নরকেরই মর্ত্য-বর্ণনা।— "পরদিন যখন সেল-এর দরজা খোলা হল, তখন তীব্র জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে, প্রলাপ বকছে অবিরত, মৃত সন্তানের দেহটাকে তখনো অচেতন হাতে আঁকড়ে রয়েছে।" এই গল্পটি যিনিই পাঠ করিবেন, তাঁহারই স্মৃতি চিরকালের জন্য একটা মর্মান্তিক বেদনা ও অসহনীয় ক্রোধ একসঙ্গে বহন করিতে বাধ্য হইবে।

জেল-জীবনের কি গভীর দুঃখ ও কি নির্যাতনের মধ্য দিয়া কয়েকটি মহিলাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, স্বদেশী গল্প কয়টিতে তাহা বর্ণিত ও ব্যক্ত হইয়াছে। কাহিনী কয়টিই এমন যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের বক্তব্যপ্রকাশে সক্ষম, শিল্পীর তুলির কোনো অপেক্ষা করে না। একটি গল্পে ('লক্ষ্মী') কিন্তু কৃষ্ণা অসামান্য শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই একটিমাত্র গল্পের জন্যই কৃষ্ণা সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা দাবি করিতে পারেন।

'ছায়ামিছিলে' সাধারণ মেয়ে-কয়েদীদের লইয়া যে কয়টি গল্প রচিত হইয়াছে, তাহাও উদ্দেশ্য-মূলক। সমাজব্যবস্থার মধ্যে কত বড় অবিচার ও নির্যাতন গূঢ় ও সক্রিয় রহিয়াছে, এই গল্প কয়টিতে দেশের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই গল্পকয়টিও নিজস্ব কাহিনীতে সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য সাহিত্যিকের লেখনীর বিশেষ আবশ্যক করে না। কৃষ্ণা এই কাহিনীগুলিকে বেদনা ও দরদের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ফলে, ইহার আবেদন আরও মর্মস্পর্শী ও স্থায়ী হইয়াছে। 'ছায়ামিছিল' সত্যকার কারাকাহিনী। 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' হইতে 'ছায়ামিছিল' সাহিত্যিক মানদণ্ডে যেমন শ্রেষ্ঠতর, সমাজসংস্কারকের দৃষ্টিতেও ইহার মূল্য সমধিক। কৃষ্ণার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, আনন্দের চেয়ে বেদনাই তার লেখনীমুখে অধিকতর ব্যক্ত।

চারজন লেখিকার মধ্যে দুজন নেহরু-পরিবারের ও দুজন বাংলার— এই আকস্মিক বিভাগের আড়ালে একটি বাস্তব বিভাগও পরিদৃষ্ট হয়। বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা উভয়েরই রচনা বিদেশী ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু বীণা দাস ও রানী চন্দ উভয়েই মাতৃভাষা বাংলাতে তাঁহাদের কারাকাহিনী রচনা করিয়াছেন। নেহেরু-ভগ্নিদ্বয় এই বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রাতা জহরলালেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। গান্ধীজী পর্যন্ত তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আত্মজীবনী 'সত্যের পরীক্ষা' মাতৃভাষা গুজরাটিতে লিখিয়াছিলেন, ইহা মনে রাখিলে বাধ্য হইয়াই মন্তব্য করিতে হয় যে, বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা উভয়েরই দৃষ্টি প্রকাশের চেয়ে প্রচারের দিকেই অধিকতর নিবদ্ধ। নেহরু-ভগ্নিদ্বয়ের হয়তো সত্যকার মাতৃভাষা কিছু নাই, থাকিলেও তাহাকে উভয়ের কেহই শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করিতে পারেন নাই, এই অভিযোগ যুক্তিযুক্তভাবেই উত্থাপিত হইতে পারে। বাংলাভাষাতে যিনি নেহরু-ভগ্নিদ্বয়ের পুস্তক দু'খানি অনুবাদ করিয়াছেন, মূল রচনার লেখিকাদের চেয়ে এই দিক দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব কম নয়।

বীণা দাসের 'শৃঙ্খলঝংকার' নিঃসন্দেহে 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' ও 'ছায়ামিছিল' হইতে বহুগুণে এবং সর্বদিক দিয়াই শ্রেষ্ঠতর পুস্তক। কিন্তু 'শৃঙ্খলঝংকার' নিছক কারাসাহিত্য নহে। পুস্তকের মাত্র এক-চতুর্থাংশ জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্যয়িত হইয়াছে। 'শৃঙ্খল-ঝংকার' আসলে বাংলার একটি বিপ্লবী মেয়ের আত্মজীবনী। ইহাও আবার মূলে রাজনৈতিক আত্মজীবনী। শৃঙ্খল-ঝংকারে'র প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠকের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ আদ্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। পুস্তকখানির কোথাও ছন্দপতন নাই। ভাব ও ভাষার এই বৈশিষ্ট্য পুস্তকখানির দ্বিতীয় কৃতিত্ব। স্টাইলেই নাকি সাহিত্যিকের পরিচয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, বীণা দাসের স্টাইলটি বেগবান ও প্রাণবান একটি পার্বত্য নদীর সঙ্গে তুলনীয়। বীণা দাসের ভাষা ঐশ্বর্যবহুল।

বীণা দাস আত্ম-সচেতন লেখিকা। আত্মজীবনীর যে বৈশিষ্ট্য অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহা বীণা দাসকে অন্তর্মুখী করিয়াছে। নেহরু-ভগ্নিদ্বয় হইতে বীণা দাস সমধিক অন্তর্মুখী এবং সমধিক গভীর। কৃষ্ণার 'ছায়া-মিছিল' উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বীণা দাসের 'শৃঙ্খলঝংকার' আদর্শপ্রণোদিত। বিশেষ একটি আদর্শের বেগ অথবা তাগাদা তাঁহার রচনাতে ব্যক্ত। বিদ্রোহী ও বিপ্লবী মনেরই সেই আদর্শ। এই কারণেই ইহা আত্মজীবনী হইয়াও অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী— জীবনের বৃহত্তর অংশ পুস্তকের সীমানার বহির্ভূতই রহিয়া গিয়াছে, এবং সাহিত্যরচনা হইয়াও ইহা সম্পূর্ণ সাহিত্য নহে, কেবল রাজনৈতিক সাহিত্য। 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'তে বিজয়লক্ষ্মীর মাতৃপরিচয় ব্যক্ত, 'শৃঙ্খলঝংকারে' বীণা দাসের বিপ্লবী ও সমাজসেবিকা পরিচয়টি অভিব্যক্ত। যেখানে বীণা দাস তাঁহার পিতৃ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, সংসারের সেই ব্যক্তিগত আবেষ্টনীতে তাঁহার কন্যাপরিচয় প্রস্ফুট এবং 'শৃঙ্খলঝংকার' সেখানে প্রকৃত রসসাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

জেল জীবনের দুঃখ ও নির্যাতনের বর্ণনা চারজন লেখিকাই কমবেশি দিয়াছেন। সাধারণ কয়েদীদের কাহিনীও চারখানি পুস্তকেই অল্পবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জেল-জীবনে জেল-কর্তৃপক্ষের অসহ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রতিবাদ ও দুঃখবরণ একমাত্র 'শৃঙ্খলঝংকারে' পাই। বীণার মানসিক গঠন বিপ্লবীর, এই কারণেই তাঁহার রচনাতে জ্বালা তীব্রতা এবং তিক্ততাও প্রখরভাবে প্রকট। সাহিত্যের মানদণ্ডে ইহা হয়তো ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু পাঠকের মনে একটি বলিষ্ঠতার

অগ্নি-রস 'শৃঙ্খলঝংকার' হইতে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়, ইহাও তুচ্ছ করিবার মত ব্যাপার নহে। 'শৃঙ্খলঝংকারে'র উপসংহারে আসিয়া দেখা যায় যে, শেষ হইয়াও তাহা শেষ হয় নাই। যে বীণা দাস জেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর যে বীণা দাস মুক্ত হইয়া আসিলেন, এ দুজন এক হইয়াও এক নহেন। অধিকতর গভীরতা, অধিকতর সংহত প্রাণবেগ এবং অধিকতর মানসিক সমৃদ্ধি লইয়া এক অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব কারার অর্গল ভাঙিয়া নির্গত হইয়াছে। 'শৃঙ্খলঝংকারে' গতি এখনও অব্যাহত কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্তি এখনও দূরে।

রানী চন্দের 'জেনানা ফাটক' কারাসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা নেহরু-পরিবারের দান এবং বীণা দাসকে বলা চলে বাংলার বিপ্লবের দান, আর রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের যুক্ত দান ; কবির কাছে তিনি লইয়াছেন ভাবের দীক্ষা, আর শিল্পীর কাছে লইয়াছেন রূপের দীক্ষা। তাঁহার এক চোখে রসের দৃষ্টি, অপর চোখে রূপের দৃষ্টি। এমন মিলন ও সমন্বয় বাংলাসাহিত্যেও খুব বিরল। 'রুদ্ধকারার দিনগুলি' ও 'ছায়ামিছিলে'র পিছনে উদ্দেশ্যের সাক্ষাৎ মিলে, আর 'শৃঙ্খলঝংকারে' পাওয়া যায় একটি আদর্শ ; কিন্তু 'জেনানা ফাটকে'র পিছনে কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শ নাই। 'জেনানা ফাটক' সত্যকারের কারাকাহিনী। 'শৃঙ্খলঝংকারে'র ন্যায় কোনো রাজনীতি বা কোনো মতবাদ 'জেনানা ফাটকে' নাই। 'শৃঙ্খলঝংকারে' এবং কতকাংশে 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'তে জ্বালা, শাসনকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও তিক্ততা পরিদৃষ্ট হয়— 'জেনানা ফাটকে' তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নাই। দীর্ঘ পুস্তকের কোথাও জেল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অথচ 'জেনানা ফাটকে' জেল-জীবনের দুঃখ ও কষ্টের বিবরণের কিন্তু কোনো অভাব নাই। সাধারণ মেয়ে-কয়েদী, মেট্রন, জমাদারনী ইত্যাদি লইয়া 'জেনানা ফাটক' আপনাতে স্বয়ংপূর্ণ একটি উপনিবেশ। 'ছায়ামিছিল'কে বলা হইয়াছে চরিত্র-চিত্র। তুলনায় 'জেনানা ফাটক' একটি চিত্র-প্রদর্শনী। 'ছায়ামিছিলে' কৃষ্ণা মোট বারোটি মেয়ে-কয়েদীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, 'জেনানা ফাটকে' অগণিত কয়েদীর ও আরও অনেকের জীবন-চিত্র অঙ্কিত। রঙে, রেখায়, অঙ্কনে রানী চন্দের চিত্রগুলি এত জীবন্ত যে, কৃষ্ণার 'লক্ষ্মী' চিত্রটি ব্যতীত আর সবগুলিই ইহার তুলনায় ম্লান ও নিষ্প্রভ। 'জেনানা ফাটকে' বহু বৃহৎ উপন্যাসের মালমসলা ও উপকরণ রহিয়াছে। 'শৃঙ্খলঝংকারে' দেখি গতি ও বেগ, কিন্তু এই গতির মধ্যে একটা তীব্রতা ও তাপ পরিদৃষ্ট হয়। আর 'জেনানা ফাটকে' পাই একটি চরম প্রশান্তি।

বীণা দাস, কৃষ্ণা, বিজয়লক্ষ্মী তিনজনেই সমস্যাপীড়িত, কিন্তু রানী চন্দের মন সমস্যামুক্ত। 'শৃঙ্খল-ঝংকার' ও 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'— দুয়েরই লেখিকাদ্বয় আত্মসচেতন এবং আত্মকেন্দ্রিক। রানী চন্দের মন সংবেদনশীল এবং তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি তীক্ষ্ণ। এই শক্তিটুকু তাঁহার রূপসাধনের অর্থাৎ তুলির সিদ্ধি। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ। এই দুই শক্তির পরিচয় 'জেনানা ফাটকে'র প্রায় পাতায়ই পাওয়া যায়। 'ছায়ামিছিলে' কৃষ্ণার রচনায় আনন্দের চেয়ে বেদনার প্রকাশ অধিকতর— 'জেনানা ফাটকে' রানী চন্দের রচনায় শান্তি ও আনন্দশক্তি অধিকতর অভিব্যক্ত— সুখ, দুঃখ, বেদনা ইত্যাদি সেই আনন্দ ও শান্তির আকাশে অগণিত তারকার মত প্রস্ফুট। বীণা দাস, কৃষ্ণা ও বিজয়লক্ষ্মী— তিনজনেরই রচনাতে রস-বোধ (humour) অল্পবিস্তর প্রকাশিত। কিন্তু এদিক দিয়া 'জেনানা ফাটক' রসের ভাণ্ডার। রসসাহিত্য হিসাবেও তাই 'জেনানা ফাটক' বাংলাসাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর আসন দাবী করিতে পারে।

সর্বশেষে 'জেনানা ফাটকে'র একটি বিশেষ ত্রুটির উল্লেখ আবশ্যক। ইহাতে সাধারণ কয়েদীদের কাহিনী লইয়া মাঝে মাঝে ঘটনা ও অবস্থার পুনরাবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি বর্জিত হইবে, ইহাই আশা করি।

শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্ত

দেশ কাল পাত্র। জীয়নকাঠি: শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকটি পাঁচ সিকা।

জনান্তিকে: শ্রীঅজিত দত্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ব্যক্তিগত: শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলাদেশে প্রবন্ধপুস্তক সংখ্যায় অল্প কিন্তু ওজনে ভারি। প্রবন্ধ বলতেই আমরা বুঝি তথ্যবহুল তত্ত্বগভীর এক ধরনের সামগ্রী। সেকেলে গয়নার মতো নিখাদ সোনার তাল— যেমনি মোটা তেমনি ভারি। যিনি পরেন তাঁর ওজন বাড়ে, রূপ বাড়ে কি না সন্দেহ। মনে রাখতে হবে যে, সোনা এক জিনিস, গহনা আরেক; একটির মূল্য ওজনে, আরেটির মূল্য কারুশিল্পে। সোনামাত্রই যেমন গহনা নয়, প্রবন্ধমাত্রই তেমনি সাহিত্য নয়।

আমাদের দেশে প্রবন্ধ ছিল পাণ্ডিত্যের বাহন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকে পাণ্ডিত্যের বোঝা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আর বীরবল প্রাকৃতভাষার মারফতে তার প্রকৃতি দিয়েছিলেন বদলে। এঁদের প্রবন্ধের মধ্যে কোনো তত্ত্বকথা থাকত না বললে ভুল বলা হবে। তত্ত্বকথা তাঁরাও বলেছেন, তবে তাকে রসে ডুবিয়ে পরিবেশন করেছেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে লিরিকের আমেজ আছে। আর বীরবল witএর চুমকি বসিয়ে বসিয়ে প্রবন্ধকে জলজলে ঝলমলে করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। গভীর সুরে গভীর কথা বলাকেই আমরা প্রবন্ধরচনার আর্ট বলে জানতুম, কিন্তু হাল্কা সুরেও যে গভীর কথা বলা চলে সেকথা আমাদের জানতে বাকি ছিল।

আজকাল যে প্রবন্ধকে আমরা রসসাহিত্যের আসরে স্থান দিই সে প্রবন্ধ ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালি চিত্তের ক্ষণকালীন বহিঃস্ফুরণ: ইংরেজিতে যাকে বলেছে a loose sally of the mind। এ জাতীয় প্রবন্ধকার আগে কথক, পরে লেখক। তাঁর মন মজলিশি মন; বন্ধু-মজলিশে যেকথা রসিয়ে জাঁকিয়ে বলতে ভালোবাসেন সেকথাই বৃহত্তর মজলিশ অর্থাৎ বিস্তৃততর পাঠকসমজকে উদ্দেশ করে লিখে থাকেন। এ ধরনের লেখার আসল রূপটি হচ্ছে মজলিশি রূপ। আর মজলিশি মানুষের প্রধান গুণ— তিনি শ্রোতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। এজন্য ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধকে নাম দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। লেখার অন্তরালে লেখকের অনতিপ্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বটিই এর প্রধান আকর্ষণ। বাক্য এবং অর্থে যেমন সংপৃক্তি, এখানে ব্যক্তি এবং বক্তব্যে তেমনি সম্প্রীতি।

পাণ্ডিত্য দিয়ে এই অন্তরঙ্গ সুরটি ফোটানো সম্ভব নয়। কারণ, পাণ্ডিত্য লেখক এবং পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। তাছাড়া এজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অবকাশ তেমন প্রশস্তও নয়। কেননা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হচ্ছে এক ধরনের সাহিত্যিক বিশ্রম্ভালাপ— কেবলমাত্র কথার নেশায় কথা বলে যাওয়া : বলাটাই মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। দমকা হাওয়ায় মাথার টুপি উড়ে গেছে, টুপির মালিক তার পেছন পেছন ছুটছেন। এই দৃশ্য নিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনবদ্য রচনার সৃষ্টি হয়েছে। যৎসামান্য ব্যাপারও যে কত অসামান্য হতে পারে এসব লেখা তার প্রমাণ। ল্যাম্, স্টিভেন্‌সন্ এ জাতীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ ; চেস্টার্‌টন্, বেলক, লিণ্ড, গার্ডিনার এঁদের উত্তরাধিকারী। আমরা যাকে trifles বলি সে যে কতখানি "tremendous trifles" হতে পারে এঁরা তাই আমাদের শিখিয়েছেন। এঁরা যা-তা নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু কস্মিন্‌কালেও যা-তা লেখেন নি। বরং রসে লালিত্যে কৌতুকে এসব রচনা সাহিত্যের দরবারে প্রথমশ্রেণীর আসন পাবার যোগ্য। একটি কথা এঁরা খুব ভালো করে জানেন যে এজাতীয় লেখার মধ্যে লজিকের চেয়ে ম্যাজিকের প্রয়োজন বেশি। বলা বাহুল্য, এখানে ম্যাজিক মানে রস।

এর ব্যক্তিগত স্বরূপের কথা পূর্বেই বলেছি। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এজাতীয় গ্রন্থকারেরা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় আত্মসচেতন ; অর্থাৎ কি না, এঁদের লেখার মধ্যে উত্তমপুরুষেরই প্রাধান্য। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্রষ্টা ফরাসি সাহিত্যিক মন্‌টেন ; তিনি গোড়াতেই বলে নিয়েছেন "It is myself that I protray"। ইংরেজ প্রবন্ধকার জে. বি. প্রিস্টলির মতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে এটিই প্রথম এবং শেষ কথা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রবন্ধকার স্বয়ংই হচ্ছেন হিরো, তাঁকেই কেন্দ্র করে সমস্ত তুনিয়া চলছে। প্রত্যেকটি রচনা তাঁরই আত্মচরিতের টুকরো অংশ। ল্যাম্‌এর প্রবন্ধাবলী তাঁর আত্মচরিত ছাড়া আর কী? প্রত্যেকটি পাতা স্মৃতিবিজড়নে স্নিগ্ধ। কোথাও হাল্কা কৌতুকে উজ্জ্বল, কোথাও অশ্রুবাষ্পে সজল। নিজস্ব ভালো লাগা না-লাগা দিয়ে সবকিছুর বিচার। তার ফলে এঁদের মতামত অল্পবিস্তর একপেশে হতে বাধ্য। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ইনি যা বলছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য কি না সেকথা অবান্তর, সবটা মিলিয়ে জিনিসটা রসগ্রাহ্য কি না সেটাই বিবেচ্য।

উপরে যেসব মন্তব্য করেছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'দেশ কাল পাত্র' এবং 'জীয়নকাঠি' ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থের অন্তবর্তী নয়। তাঁর বিষয়বস্তু আর-তুখানা বইএর মতো আটপৌরে নয়, কতকাংশে একটু বরং গুরুগম্ভীর। কিন্তু আলোচনার সুরটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এমন কি অন্তরঙ্গ বলেই সব কখানা গ্রন্থকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। 'দেশ কাল পাত্র'র প্রথম প্রবন্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত 'পথে প্রবাসে'র সুরে লেখা। অবশ্য এক্ষেত্রে দেশ বলতে স্বদেশ, কালও অপেক্ষাকৃত হাল আমলের, এবং পাত্ররা সকলেই লেখকের মিত্র— অনতিদীর্ঘ বোম্বাই-প্রবাসের অতিশয় সুখপাঠ্য বিবরণ। অন্যান্য প্রবন্ধে লেখক একালের সাহিত্যরীতি কিংবা রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন, কিন্তু নীতিবাগীশতা করেন নি। হিতকথা যদি বা বলেছেন বাচনভঙ্গির গুণে আলোচনা যথার্থই মনোহারী হয়েছে। ভাষার অলংকরণের দিক থেকে অন্নদাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী। তুঃখের বিষয়, 'দেশ কাল পাত্র' এবং 'জীয়নকাঠি'র অধিকাংশ রচনা অতিশয় ক্ষীণকায়া। প্রবন্ধের কায়া পরিস্ফুট হবার আগেই ছায়ায় মিলিয়েছে।

বক্তব্যকে তিনি সবিস্তারে ব্যক্ত করে বলেন নি। মনে হয়, কথার নেশায় কথা বলে যাওয়ার ধাত তাঁর নয়। যতটুকুর আভাস দেন ততটুকু প্রকাশ করেন না। অবশ্য তা সত্ত্বেও অন্নদাশঙ্করের লেখার মধ্যে তাঁর স্বভাবধর্মটি পরিস্ফুট। আজকালের অধিকাংশ লেখক ষোলো-আনা বুদ্ধিজীবী, হৃদয়বত্তাকে তাঁরা অবজ্ঞা করে থাকেন। অন্নদাশঙ্করের লেখার মধ্যে একদিকে হৃদ্‌গত অভিজ্ঞতা অপরদিকে বুদ্ধিমত্তার বাঞ্ছিত মিলন ঘটেছে। মননশক্তির প্রখরতায় এবং হৃদয়বৃত্তির অনুরণনে প্রত্যেকটি রচনা প্রাণরসে উদ্বেলিত। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রলাঁর আলোচনায় লেখক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এই তিন মহাপুরুষের মধ্য দিয়ে এ যুগের মানুষ বিশ্বরূপ দর্শন করেছে— সে কথাটি লেখক অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

শ্রীযুত অজিত দত্তর 'জনান্তিকে' সাতটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সমষ্টি। এখানে ব্যক্তিগত সুরটি সর্বব্যাপী। গ্রন্থের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত একটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং মৃদুস্বভাব ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। দুএকটি প্রবন্ধ নিতান্তই আটপৌরে বিষয় নিয়ে লেখা— দেশলাই এবং ঘড়ি; কিন্তু প্রকাশভঙ্গির গুণে তা যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে রসিক পাঠকমাত্রই তা স্বীকার করবেন। অন্য প্রবন্ধ ক'টি একটু গুরুগম্ভীর বিষয়ক হলেও আলোচনাকে অযথা গাম্ভীর্যভারাক্রান্ত করা হয় নি। অজিতবাবু কবিপ্রকৃতির মানুষ; কাজেই তাঁর প্রবন্ধে, এমন কি যেখানে তর্ক এবং তার্কিকের কথা বলেছেনও সেখানে, কোমর বেঁধে তর্ক করতে বসেন নি। এসব লেখায় যুক্তিতর্কের কোনো প্রয়োজন থাকে না, মন এবং লেখনীকে মুক্তি দিতে পারলেই হল। যুক্তির কশাঘাতে রসালোচনা কখনো এগোয় না, বরং বাধা পায়। এই কথাটি অজিতবাবুর জানা আছে। কবিধর্মী মানুষ বলে তাঁর লেখায় লিরিকের স্বাদটাই বেশি। ঝাঁজের একটু অভাব আছে। সামান্য একটু ঝাললঙ্কা মেশাতে পারলে জিনিসটা বোধ করি আরেকটু মুখরোচক হত।

উপরোক্ত গ্রন্থ কখানার মধ্যে শ্রীযুত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যক্তিগত' অগ্রজ। আশা করি, এই গ্রন্থ ইতিপূর্বেই রসিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গ্রন্থের প্রকৃতি নামের মধ্যেই সূচিত। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আখ্যানবস্তু আটপৌরে, কিন্তু ব্যাখ্যানপ্রণালী আভিজাত্যপূর্ণ, বিদগ্ধ মনের পরিচয় প্রতিছত্রে। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন— "অনেকদিন ধরে যা দেখেছি তারই কিছুটা মুক্ত মনে বলবার চেষ্টা করেছি।" সে চেষ্টা যে সার্থক হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। লেখক চোখ দিয়ে যা দেখেছেন মন দিয়ে তা চেখে নিয়েছেন। সজাগ দৃষ্টি আর সজীব মনের মিলনে সত্যিকারের রসসৃষ্টি হয়েছে অম্লে মধুরে ঝাঁঝে মিলিয়ে রসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ইনি যথার্থই কথক মানুষ, কথা বলার আর্ট লেখনীমুখে ধরা দিয়েছে। জিবের ডগায় যেকথা অনায়াসে আসে কলমের ডগায় সেকথা অনায়াসে এলে তবেই লেখা প্রাণ পাবে। বিমলাপ্রসাদ সেই দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করেছেন। এই জন্যই গ্রন্থের প্রত্যেকটি লেখা সার্থক রচনা। বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আসরে 'গোলদীঘি' বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। এককালে আমরা যে গোলদীঘিকে জানতুম সেই গোলদীঘি ক্ষণকালের জন্য আমাদের চোখে প্রত্যক্ষরূপ লাভ করেছে। গোলদীঘির রূপ বদলায় নি, কিন্তু স্বরূপ বদলেছে।

বিষয়বস্তুনির্বিশেষে রসসৃষ্টি সম্ভব কি সম্ভব নয় তারই মধ্যে ভাষার আসল শক্তিপরীক্ষা। সুখের বিষয়, বাংলাভাষা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যাঁরা এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের ভাষাকে প্রখরতর এবং মুখরতর করে তুলেছেন তাঁরা সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন। স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী বিদূষক বীরবলের ছদ্মনাম গ্রহণ করে আমাদের সাহিত্যে 'বিদূষণ' বা মনোরঞ্জন -শিল্পের আমদানি করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে 'গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামো'র বড় অভাব। উঁচুদরের সাহিত্যেও যে ছ্যাবলামোর স্থান আছে এই মহা সত্যটি তিনি স্বীকার করেছিলেন। বীরবলের হালখাতা রচনা করে তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে, ছ্যাবলামো যখন গুণপনাযুক্ত হয় অর্থাৎ সাহিত্যের প্রসাদ লাভ করে তখন সেটা আর নিছক ছ্যাবলামো থাকে না। এই গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামো থেকেই belles-lettres নামক সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। বীরবলের পূর্বে এ জাতীয় জিনিস আমাদের সাহিত্যে ছিল না। ফলে ছ্যাবলামো জিনিসটাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি নি। সেটা যদি গুণপনাযুক্ত হয় তাহলেও তাকে স্বীকার করে নিতে আমাদের পণ্ডিতি রুচিতে বাধে। ইদানীং অনেকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এটা সুলক্ষণ। যে ছ্যাবলামো রসকষহীন কথার ছিবড়ে মাত্র সামান্য পরিমাণে গুণসন্নিপাত হলে তা যে সাহিত্যিক মর্যাদালাভ করতে পারে এসব লেখকরা তা প্রমাণ করেছেন। সাধারণকে অসাধারণ করতে গেলে ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট কারুকার্য প্রয়োজন। বাংলাসাহিত্যে belles-lettresএর প্রচলন যত বাড়বে, আমাদের ভাষাগত কারুশিল্পের ততই উন্নতি হবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

গান ॥ মহা সিংহাসনে বসি

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ॥ শ্রীইন্দিরা দেবী

II	মা	মা	।	মপা	-দণা	দপা	।	মা	জ্ঞা	।	রা	[ম]জ্ঞা	-া	I
	ম	হা		সিং	০ং	হাং		স	নে		ব	সি	০	
I	ঋা	সা	।	সঋা	-জ্ঞমা	মা	।	জ্ঞা	ঋা	।	ঋা	সা	-া	‖ I
	শু	নি		ছ	০ ০	হে		বি	শ্ব		পি	তঃ	০	
I	ণ্‌া	সা	।	জ্ঞা	-া	মা	।	পা	দা	।	ণা	-দণর্সা	র্সা	I
	তো	মা		রি	০	র		চি	ত		ছ	০০০	ন্দে	
I	পা	পদা	।	-ণা	-া	দপা	।	মপমা	-জ্ঞা	।	জ্ঞা	-ঋসা	ঋা	II
	ম	হাং		০	ন্	বিং		শ্বে০০	র্		গী	০ ০	ত	
II	{দা	মা	।	দা	-ণদা	ণা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	-া	র্সা	I
	ম	র্ত্যে		র	০ ০	মৃ		ত্তি	কা		হ	০	য়ে	
I	[ণ]র্ঋা	র্ঋা	।	র্ঋা	-র্সর্ঋর্জ্ঞা	-র্ঋা	।	র্সা	র্সা	।	'দা	-া	পা}	I
	ক্ষু	দ্র		এ	০ ০ ০	ই		ক	ণ্ঠ		ল	০	য়ে	
I	পা	দা	।	পদা	-পণা	দা	।	পা	পা	।	[ম]জ্ঞা	-মজ্ঞা	মা	I
	আ	মি		ও০	০০	দু		য়া	রে		ত	০০	ব	
I	মা	ণা	।	[ণ]দা	-া	পা	।	মপমা	জ্ঞা	।	জ্ঞা	-ঋসা	ঋা	II
	হ	য়ে		ছি	০	হে		উ০০	প		নী	০ ০	ত	
II	{সা	সা	।	সা	-ঋসা	রা	।	জ্ঞা	জ্ঞা	।	মা	-া	মা	I
	কি	ছু		না	০ ০	হি		চা	হি		দে	০	ব	
I	জ্ঞা	রা	।	জ্ঞা	-া	রজ্ঞমা	।	জ্ঞা	জ্ঞা	।	ঋা	-সা	সা}	I
	কে	ব		ল	০	দ০০		র্শ	ন		মা	০	গি	
I	সা	দা	।	দাঃ	-পঃ	মা	।	পা	পা	।	[ম]জ্ঞা	-া	জ্ঞা	I
	তো	মা		রে	০	শু		না	ব		গী	০	ত	

I ঋা সা । সঋা -জ্ঞমা মা । জ্ঞা ঋা । সা -া সা I
এ সে ছি॰ ০ ০ তা হা রি লা ০ গি

II { [ম]দা মা । দা -ণদা ণা । র্সা র্সা । র্সা -া র্সা I
গা হে যে ০ ০ থা র বি শ • শী

I [র্স]ঋা -া । ঋা -র্সঋা ণা । র্সা র্সা । [ণ]দা -া পা } I
সে ই স ০ ০ ভা মা ঝে ব ০ সি

I পা দা । পদা -পণা দা । পা পা । [ম]জ্ঞা -মজ্ঞা মা I
এ কা ন্তে॰ ০০ গা হি তে চা ০০ হে

I মা ণা । দা -া পা । মপমা জ্ঞা । জ্ঞা -ঋসা ঋা II II
এ ই ভ ০ ক তে০০ র চি ০ ০ ত

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

‘পালকি-বেহারার গান’

[সরোজিনী নাইডুর Palanquin-Bearers কবিতার অনুবাদ ‘পালকি-বেহারার গান’ এই সংখ্যার অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদটি বঙ্গদর্শনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয় নাই। তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক ছিলেন, স্বাক্ষরহীন রচনা সম্পাদক-কৃত বলিয়া অনুমেয়। কিন্তু বঙ্গদর্শনেই ইহার প্রতিকূল দৃষ্টান্ত আছে, যথা রবীন্দ্রনাথের লেখন গ্রন্থে অনুরূপ যুক্তিতে পুনর্মুদ্রিত প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা। সুতরাং বিষয়টি অনুসন্ধান-সাপেক্ষ ছিল। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্র-তথ্যানুসন্ধানের পথিকৃৎ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও ‘রবীন্দ্রজীবনী’-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা]

১

‘বঙ্গদর্শন’ চৈত্র ১৩১২ সালে প্রকাশিত ‘পালকি-বেহারার গান’ সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

অনেকদিন আগে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটা তালিকা তৈরি করে সেই তালিকা রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ঠিক করে নিয়েছিলুম। সেই পুরানো তালিকা এতদিন গিরিডিতে ছিল। সম্প্রতি সেখান থেকে কলকাতায় আনিয়ে দেখছি যে ‘পালকি-বেহারার গান’ কবির নিজের অনুবাদ বলে এই তালিকায় লেখা আছে। আমার নিজেরও এই ভাবই স্মরণ আছে। কবি এই গানটি নিজে তর্জমা করেছিলেন— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বৈশাখ ১৩৫৬ **শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ**

২

তুমি জানতে চেয়েছ বঙ্গদর্শনে (১৩১২ চৈত্র) প্রকাশিত কবিতা ‘পালকি-বেহারার গান’ কার রচিত। বঙ্গদর্শনে কবির যেসব রচনা তাঁহার নিজের লেখা তা’তে তিনি দাগ দিয়ে গিয়েছেন, সেসব গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে। এ কবিতায়ও তাঁর দাগ দেওয়া।

তাছাড়া কবির কাছ হতেও আমি জেনে নিই যে ওটি তাঁর কৃত তর্জমা।

গত অক্টোবর মাসে আমি যখন লখনৌ যাই, সরোজিনী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করি এবং নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ঐ পালকি-বেহারার গানের কথা প্রসঙ্গত ওঠে; তিনি জানতেন যে ওটি কবি অনুবাদ করেছিলেন।

১৫. ৩. ৪৯.

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার। লণ্ডন অভিমুখে চল্লুম। Charing Crossএ পৌঁছে দেখি Mrs. Palit ও লিল্ অপেক্ষা করচেন। জিনিষপত্র Custom Houseএর মধ্য দিয়ে নিয়ে আস্‌তে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। হোটেলে জায়গা নেই। Mrs. Mullএর ওখানে Mrs. Palit থাকেন সেইখানে এসে আড্ডা করা গেল। সুবিধেমত জায়গা নয়। Miss Mullকে দেখা গেল। এই সেই বিখ্যাত Miss Mull! সন্ধের সময় লোকেন তার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। বিপদ!

বৃহস্পতিবার। সকালে বেরোনো গেল— এক Hansomএ চড়ে প্রথমে সতুকে খুঁজ্‌তে বেরোলুম। তাদের বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে— বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। কেউ তাদের ঠিকানা জানেনা। তার পরে Miss Sharpeএর ওখানে গিয়ে শোনা গেল— তিনি Engaged, visitors receive করবেন না। আমরা ম্লানমুখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম— তার পরে সৌভাগ্যক্রমে আবার ডাক পড়ল। ঢুকে দেখি Miss Sharpe নিতান্ত বৃদ্ধা হয়ে গেছে। Engagement কিছুই বিশেষ নেই— একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবা করচেন। জল বায়ু, স্বাস্থ্য, কালের পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি সম্বন্ধে দু চারটে কথা কয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আমার প্রাচীন বন্ধু Scottএর বাড়ি গিয়ে শুনলুম তারা সেখানে নেই তারা New Maldinএ গেছে। সেখেনে Gower Street Stationএ এক পাতাল-বাষ্পযান নিয়ে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল— কিন্তু যা চেষ্টা করা যায় তা সব সময়ে সফল হয় না। Hammersmith ষ্টেশনে পৌঁছে চৈতন্য হল যে ক্রমেই গম্যস্থান থেকে দূরে যাচ্চি। একজনকে জিজ্ঞাসা করা গেল— সে বল্লে, ভুল গাড়িতে উঠেছ আবার ফিরে যেতে হবে। আবার ফিরলুম। অনেক হাঙ্গাম করে সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছলুম। তখন এখানকার আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদের জন্যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটু আধটু এনে দিলে। খেয়ে দেয়ে আর এক চোট রাস্তায় বেড়িয়ে আসা গেল। ডিনারের পর Miss Mullএর সহযোগে খানিকটা গান বাজনা হল। Miss Mull মন্দ গায় না।

শুক্রবার। চিঠি লেখবার দিন। চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম। লোকেন ভারি উৎপাত বাধিয়ে দিলে। জোর করে চিঠি সংক্ষেপ করে দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। 'Busএ চড়ে প্রথমে Grindlay আফিসে যাওয়া গেল। সেখান থেকে মেজদাদা এক Dentistএর দোকানে দাঁত বাঁধাবার বন্দোবস্ত

করতে গেলেন। সেখান থেকে এক প্রকাণ্ড জাঁকালো আহারস্থলে গিয়ে খাওয়া গেল। তার পরে National Galleryতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। অনেক ছবি— অল্প সময় দেখে মনে বসে না। এক একটা খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু সেগুলো হয়ত কোন যথার্থ চিত্রসমজদারের ভাল লাগেনা— বোধ হয় অনেক বিখ্যাত ভাল ছবি আমার কিছুই ভাল লাগেনি। 'Busএ চড়ে বাড়ি ফেরা গেল। Miss Mull আমার উপর কতকটা অভিমান প্রকাশ করলে। বল্লে— Mr. T কেন তুমি সমস্ত দিন বাইরে কাটালে, ঘরে থাকলে আমরা বেশ গান বাজনা নিয়ে থাকতে পারতুম।— আমি বল্লুম বেশ, আজ সন্ধের সময় কোথাও বেরোব না। সে বল্লে সন্ধের সময় বেশি সময় হাতে থাকেনা।— যা হোক সন্ধের সময় আর একবার গান বাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mullএ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। সে আমাকে নাচাবার চেষ্টায় ছিল— সেটা' আমার পোষাল না। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করচে। Mull বল্‌ছিল আমি যদি গলার চর্চ্চা করি তা হলে St. James Hall Concertএ গাইতে পারি— আমার রীতিমত উচ্চ শ্রেণীর গলা আছে। তা আছে বোধ হয়।

শনিবার। আজ জ্যোৎস্না আস্‌বে। কিন্তু কখন জাহাজ আস্‌বে তার স্থিরতা নেই তাই Docksএ যাওয়া হলনা। তাকে সমস্ত directions দিয়ে এক মস্ত চিঠি লিখে দেওয়া গেছে।

বল্‌তে বল্‌তে জ্যোৎস্না উপস্থিত। খুব শক্ত সমর্থ সপ্রতিভ। নির্ভয় নির্লজ্জ নিরাপদ। যেখানে যা করা উচিত তা ঠিক করেছে। King Companyর উপর লাগেজের ভার দিয়ে Special Train নিয়ে Liverpool Street Stationএ পৌঁছে Underground রেলপথে ঠিক গাড়ি নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে এক Hansom ভাড়া করে আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে হাজির। এ ছেলের কোথাও হারাবার আশঙ্কা নেই। চুরি যাবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরে এর ভার দেওয়া নিতান্ত উপহাসের মত দেখায়। Coppe পড়া গেল। একটা ভুলেছি— জ্যোৎস্না আসবার আগে আমরা সকলে মিলে গ প বেঁধে এক ছবি নিয়েছি— Mr. রাজনারায়ণ ছবি নিলেন। বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়া গেল। Holborn Restaurantএ গিয়ে আহার। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত শ্বেত প্রস্তরের— চার তলা— মস্ত প্রাঙ্গণ— ব্যাণ্ড্ বাজ্‌চে— নিদেন হাজার লোক খেতে বসে গেছে। সেখেন থেকে Oswaldদের ওখানে যাওয়া গেল— আমাদের ইংরিজি accentএর অনেক তারিফ হল। সেখেন থেকে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি তখনো Miss Mull জেগে। তার সঙ্গে একটু আধটু গল্প হল। কথায় কথায় উঠ্‌ল তার বোন নেই— সে বল্লে I am glad of it. I hate having sisters— Brothers are ever so much nicer। এ দেশে বোনে বোনে competition কিনা, উভয়ের মধ্যে বোধ হয় খিটিমিটি চলে। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যদি ভাইবোনদের বেশি দিন একসঙ্গে থাকবার সম্ভাবনা থাক্‌ত তা হলে দুই বোনের চেয়ে ভাই বোনের মধ্যে বেশি ভাব হত।

রবিবার। গান বাজনা— Miss M. একটুখানি flirt করেছিল— Don't you think of me Mr. T. when you sing Riez riez &c. ? I *did* laugh when I had my photo taken, didn't I ?

তার Shelleyর কবিতা খুব ভাল লাগে ইত্যাদি অনেক কবিতার কথা পাড়বার উদ্যোগ করেছিল আমি তাতে বড় গা লাগালুম না। আমাকে পীড়াপীড়ি করচে তার Confession Bookএ লিখ্‌তে। তার মধ্যে দেখ্‌লুম একজন বাঙ্গালী Favourite Poetsএর মধ্যে আমার নাম লিখেচে। আমার Autograph বাঙ্গলা ও ইংরিজিতে লিখে নিয়েচে। সমস্ত দিন প্রায় গান বাজনায় কেটেচে।

সোম। সল্লির জন্যে বেহালা কেনা গেল। ভয় হচ্চে পাছে কাল আমার নামে বাড়ির চিঠি না আসে— তা হলে আমি এদেশে টিঁকতে পারবনা। আজ Savoy Theatreএ Gondoliers দেখবার জন্য টিকিট কেনা গেল। সে চমৎকার কাণ্ড। স্বপ্নের মত বোধ হল— এমন সুন্দর। এমন সুন্দর নাচ। মনে হল যেন আমার চারদিকে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। Miss Oswald প্রভৃতি আর একদল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। Supper খেয়ে রাত্তির একটার সময় ফেরা গেল।

মঙ্গল। আজ সকালে উঠে যখন কেবল একখানি ছোটবৌয়ের চিঠি পাওয়া গেল তখন মনটা নিতান্ত দমে গেল। আর একদণ্ড এখানে টিঁক্‌তে ইচ্ছে করছিল না। তার পরে যখন Breakfast খেতে গেলুম তখন মেজদাদা বাবির একখানি খোলা চিঠি দিলেন। খোলা চিঠির চেয়ে লেফাফাবদ্ধ চিঠি অনেক ভাল লাগে। Miss Mullএর সঙ্গে আমাদের বেশ চল্‌চে যা হোক। সে আমাকে Robin Adair বলে। কাল রাত্তিরে যখন আমি তাকে good night বল্লুম সে আপনার মনে মনে একটু আস্তে২ বল্লে good night, good night beloved। সে বলে রবিবারে Churchএ যাওয়া সে sinful মনে করে— তার চেয়ে বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করা ঢের উচিত— অধিকাংশ মেয়ে কেবল নতুন কাপড় দেখাতে যায় এবং যন্ত্রের মত মন্ত্র আউড়ে আসে এবং মনে করে পরিত্রাণের পথ খোলসা হয়ে এল। জ্যোৎস্না এস্‌রাজ বাজিয়েছিল। অনেকগুলো Chopinর বাজনা হল— আমার বাবির বাজনা মনে পড়ে। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে— কে জানে জীবনটা কেন ভারি শূন্য এবং নিষ্ফল মনে হচ্চে। আস্‌চে বৎসরে বাবিরা বিলেতে আস্‌বে এই প্রস্তাবটা উত্তরোত্তর পাকা হয়ে আস্‌চে—

বুধবার। দরজির দোকানে গিয়ে দু সুট কাপড় হুকুম করে এলুম। ভয়ানক দাম। ফোটোগ্রাফের দোকানে গেলুম— বাবির একটা ছবি Porcelainএর উপর আঁকাবার ব্যবস্থা করা গেল— ৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং লাগ্‌বে। আমার একটা ছবি নেওয়া গেল। আজ মেঘ করে রয়েচে — সূর্য্যালোক নেই। কোথাও বেরোতে ইচ্ছে নেই— মেজদা বেরোবার প্রস্তাব করচেন। কি সুখে লণ্ডনে আছি কে জানে। খুব খরচ হচ্চে— বাড়ির জন্যে Present কেনবার টাকা আর রইল না। মনে করচি কেবল সুরিবাবির জন্যে কিছু নিয়ে যাব— ধার করতে হবে দেখ্‌চি।— Niagara falls দেখ্‌তে গিয়েছিলুম— চমৎকার কাণ্ড। রাত্তিরে গান বাজনা জমাচ্ছিলুম এমন সময় এক প্রচণ্ড জ্যাটা ছেলে এসে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত বকাবকি করে গেল।

বৃহস্পতি। আজ সতুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। অনেক রাস্তা ভুলে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে২ Eastbourne সতুর ওখানে পৌছলুম। বেচারা একলা পড়েচে দেখে দুঃখু হল। সেখানে ডিনার খেয়ে রাত্তির সাড়ে দুপুরের সময় বাড়ি ফিরলুম— বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেক ঘুরতে হয়েছিল।

শুক্রবার। সুরিকে চিঠি লিখে দিলুম। Confession Albumএ লিখ্‌লুম। দরজির দোকানে গেলুম। আজ Scottএর ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল— লোকেন গেল না, তার অন্য স্ত্রীবন্ধুর সঙ্গে Engagement আছে। Miss Mull গান শেখালে। তার সঙ্গে Kensington Parkএ বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল না— তাই কিঞ্চিৎ অভিমান করেচে। একটুখানি একলা হবার জন্যে ভারি ইচ্ছে করচে।— (এদের কাজকর্ম এদের আমোদপ্রমোদের মধ্যে যখন ভাল করে চেয়ে দেখি তখন মানুষের ক্ষমতার অন্ত দেখা যায়না। এরাই রাজা বটে! এরা অল্পে সন্তুষ্ট হবার নয়— এদের সুবিধে করবার এবং এদের আমোদ দেবার জন্যে মানুষের চরম শক্তি অবিশ্রাম খেটে মরচে। এরা গান শুন্‌বে তাই সহস্র যন্ত্রের সহস্র তাল আশ্চর্য্য সঙ্গতি রক্ষা করে ধ্বনিত হচ্চে। কোথাও তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নেই— অসীম যত্ন অসীম অভ্যাস। নাট্যশালায় কি অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার— কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের মরীচিকা— কোনখানে সামান্য ত্রুটি বা অশোভনতা নেই। দোকানে জিনিষপত্র কেবল 'সাজাতে ও সুন্দর'[১] করে রাখ্‌তে কত দুরূহ পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়েচে। জাহাজে যখন ছিলুম তখন ভাব্‌তুম যে এই জাহাজ চালানো কি বিপুল ব্যাপার। আমরা ত ডেকের উপর বসে হাওয়া খাচ্চি, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত দেখ্‌চি— কিন্তু কতশত লোক দিনরাত্রি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কি অসহ্য পরিশ্রম করচে— এক ত অবিশ্রাম যন্ত্র চালনা করে দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করা সেই যথেষ্ট, তার উপরে আরাম এবং সুখের জন্যে কি তীব্র চেষ্টা! জাহাজ-যাত্রীর সেবার জন্যে শত২ ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত— খাবার ঘর, Music Saloon শাদা পাথর দিয়ে মোড়া সুন্দর করে সাজানো, শত২ বিদ্যুদ্দীপ জ্বলচে। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত! জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে শোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্যে কত দৃষ্টি! আমাদের দেশের লোকের ধ্যানের অতীত— এরকম বিপুল চেষ্টাচালিত যন্ত্রকে আমাদের দেশের লোক failure মনে করত। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে এর একটা অন্ধকার দিক আছে— Song of Shirt পড়লে তা টের পাওয়া যায়— এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কি অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করচে— সেটা আমাদের চোখে পড়েনা— কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্চে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায় তাহলে ক্রমে সেই অনাদৃত পয়সা বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে বিনাশ করে। আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্ব্বল অজ্ঞান বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেচে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় ত প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল— যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ— স্বার্থ এবং পরার্থ— আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি— নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে— বর্ব্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার ত সেইজন্যে মনে হয়— আশ্চর্য্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা ইয়ুরোপ জয় করবে— কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে— আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে

১ পাঠান্তর: গোছাতে ও নেত্রতৃপ্তিকর

[illegible]
শ্রী নন্দলাল বসু

চলচ্চিত্রমালা
শ্রীনন্দলাল বসু

গোপালপুর
১৯৪৭

এ কি পেরিক্লীসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে— কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্চে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করচে— সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।)—

সন্ধের সময় মেজদাদা হঠাৎ নাচের প্রস্তাব করলেন। Miss Mull তাঁর সঙ্গে খানিকটা নেচে আমাকে নাচবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌ল, আমি কাটাবার অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু ক্রমে দেখ্‌লুম অভদ্র হয়ে পড়চে। দু'চার পা নেচে থেমে গেলুম— এমন দু তিনবার নাচিয়েচে— আমি বাজনার মাঝখানে থেমে যাই— এরকম জড়াজড়ি নৃত্য আমার ভারি বর্ব্বর মনে হয়।

শনিবার। সকালে দোকানে বেরোনো গেল। অনেক জিনিষপত্র কেনা এবং সুন্দর মুখ দেখা গেল। আজ আবার রাত্তিরে Drury Laneএ Million of Money দেখ্‌তে যেতে হবে। Theatre দেখে আসা গেল। Scenery খুব আশ্চয্যি। Race Course সত্যিকার ঘোড়দৌড়— চৌঘুড়ী। সমুদ্রের মধ্যে পর্ব্বত।

রবিবার। Oswaldদের বাড়ি গিয়েছিলুম— এক ফরাসি মেয়ে দেখ্‌লুম— অদ্ভুত। সে আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলে। বল্লে Indianদের বড় ভালবাসে। মেজদাদারা Kew Gardens দেখ্‌তে গেছেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে Miss Mull অনেক পীড়াপীড়ি করলে। রাজনারায়ণ আমাদের নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি রকম ঠাট্টাঠুট্টি আরম্ভ করেচে— সে কথঞ্চিৎ Jealous হয়েচে।

সোমবার। ছোটবৌ সল্লি আর বাবির চিঠি পেলুম। মনটা একান্ত অস্থির হয়ে আছে— বেঁচে থাকৃতে ভাল লাগ্‌চেনা। বাবিকে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করা গেল। Richmondএ ইন্দুর মেয়েদের দেখ্‌তে যাবার জন্যে মেজদা টানাটানি করচেন। চিঠি কাল শেষ করা যাবে। নোয়েল বেশ মোটাসোটা শক্ত হয়ে উঠেচে। লীলাকে তেমন ভাল দেখ্‌তে নেই। রাণী আমার সঙ্গে ভাব করে নিয়ে Zoological Gardensএর গল্প জুড়ে দিলে। ভারি মজা করে মিষ্টি করে ইংরিজি কথা কয়। ফিরে এসে ভাবে বোধ হল Miss M আর রাজনারাণে একটু ঝগড়া হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে এই পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে একটু খিটিমিটি বেধে গেছে। রাজনারায়ণ এমন স্পষ্ট করে তার Jealousy প্রকাশ করে যে আমাকে ভারি অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। রাত্তিরে অনেকগুলো বাঙ্গলা গান গাইলুম। "অলি বারবার"টা Miss Mএর ভয়ানক ভাল লেগেচে— It is so sweetly pretty, so quaintly beautiful and it sounds so pathetic with its minor tones! ওর নীচেই দে লো সখী দে— তার পরে "কি হল তোমার"।

মঙ্গল। আজ সকাল থেকে shopping। সল্লি আর ছোটবৌয়ের জন্যে দুটো আয়না কিনেচি। সুবির জন্যে একটা ইলেক্‌ট্রীক আলো-জ্বালা ঘড়ি কেনা গেল। কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিষপত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্ধের সময় 'Bus-এর মাথার উপরে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে বাড়ি আসা গেল। একযোড়া Eye glasses কেনা গেল। আজকাল এখানে পথেঘাটে অগণ্য চষমাপরা মেয়ে দেখতে পাই। আমার বিশ্বাস তাদের ভাল দেখ্‌তে হবে বলে তারা চষমা পরে। Miss M একযোড়া চষমা কিনে রেখেচে— কিন্তু তার চোখ খুব ভাল। কতকগুলো নতুন গান কিনে এনেচি— সেগুলো গেয়ে দেখা গেল। Miss M আবার

"অলি বারবার"টা গাওয়ালে। সেটা তার অত্যন্ত ভাল লেগেচে। লোকেন Maryর সঙ্গে দেখা করতে গেচে— রাত দুপুর বাজে— এখনো সে ফেরেনি— আমার বিশ্বাস Maryকে লোকেন একটু বিশেষ ভালবাসে।— মনটা এমন শূন্য উদাস হয়ে আছে— ইচ্ছে করচে এই ঘুমোতে গিয়ে আর যদি ঘুম না ভাঙ্গে ত বেশ হয়— ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে। আজ বাবির ছবির যতটা এঁকেচে দেখে এলুম— বোধ হয় রং দিলে বেশ হবে— শুক্রবারে দেবে— এখানে রাত দুপুর— কলকাতায় ছটা—

বুধবার। সকালে আবার দোকানে বেরোলুম। বাবির জন্যে একটি বেশ ভাল lamp পছন্দ করবামাত্র লোকেন সেটার জন্যে পীড়াপীড়ী করে দাবি করতে লাগ্‌ল। তাকে ছেড়ে দিলুম কিন্তু মনটা ভারি খারাপ হয়ে রৈল— তখনি মনে মনে স্থির করলুম কতকগুলো জিনিষপত্র কিনেই একেবারে পরের ষ্টীমার নিয়ে লণ্ডন থেকে P & O. জাহাজে চড়ে বস্‌ব— কিছু ভাল লাগচে না। Maple এবং Spriggsএর দোকানে গিয়ে বাবির জন্যে কতকগুলো জিনিষ কিনে নিলুম— আমার যা কিছু সম্বল ছিল সমস্ত ফুরিয়ে গেল। Oswaldsএর ওখানে গেলুম— তারা আমাদের একটা Tennis Clubএর মত জায়গায় নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে Miss O বল্‌ছিল— "একজনের পক্ষে এক sisterই ঢের কিন্তু আমার ইচ্ছে করে আমার আরও ভাই থাক্‌ত।" Tennis খেলে Oswaldএর ওখানে গান গেয়ে এবং গান বাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গান বাজনা করে শোবার ঘরে এসেচি।

বৃহস্পতি। আবার আমার সমস্ত Plan ভেঙ্গে গেল। মেজদার কিছুতে ইচ্ছে নয় যে আমি যাই— কাজেই থাক্‌তে হচ্চে। মাঝে মাঝে এরকম আত্মসম্বরণ করা আবশ্যক। অনেকবার ত দায়ে পড়ে করতে হয়েচে— কিন্তু অভ্যেস হল কৈ ? Miss Mকে নিয়ে Oswaldsদের ওখানে গিয়ে তাদের কুড়িয়ে নিয়ে French Exhibition দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। পথে আস্‌তে২ Miss M আমাকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেল। কথায়২ বল্‌ছিল I am quick at everything। আমি ঈষৎ সহাস্যে বল্লুম Quick to forget ? সে সেই উপলক্ষে অনেক কথা বল্লে। কিন্তু বলেই তৎক্ষণাৎ আমার মনে মনে এমন ধিক্কার উপস্থিত হল— কথাটা এম্‌নি আমার-মতন-নয় বলে মনে হল। মনে হল আমি অজ্ঞাতসারে লোকেনকে নকল করচি— সে যে রকম মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টার সঙ্গে Flirt করে আমিও সেই চাল অবলম্বন করচি— কিন্তু তার সেটা বেশ স্বভাবত আসে— তাকে বেশ মানায়— কিন্তু আমার মুখ থেকে আমার নিজের কানে ওটা এমন বিশ্রী শোনাল— তার একটা কারণ বোধ হয় Miss M আমার প্রতি কতকটা Serious ভাব ধারণ করেচে। সে আমাকে আরো কিছুদিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল— এবং ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে এলে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করছিল। একটু বিষণ্ণ নম্র বিগলিত ভাব। তাই আমার আরো তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হল।

French Exhibtionএ যাওয়া গেল। অনেক ক্রেতব্য জিনিষ দেখলুম। ডিনারে আমাদের পাশের টেবিলে একটা পার্টি আমাদের দিকে ভারি Rudely Stare করছিল— আমার সহ্য হলনা— যখন ভেঙ্গে গেল আমি তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে deliberately তাদের Out-stare করলুম। British stareএর মত insolent জিনিষ পৃথিবীতে অল্পই আছে।

আমার ধারণা ছিল ইংরেজ মেয়েদের ভ্রূ এবং চোখের পাতা বিরল— কিন্তু সেটা ভয়ানক ভুল— বরঞ্চ বিপরীত।

শুক্রবার। সকালে মেজদাদার সঙ্গে Regents Streetএ বেরিয়েছিলুম। বাবির ছবি চমৎকার হয়েচে। ফিরে এসে সল্লিকে চিঠি লিখ্‌লুম। Brandএর বোনের ওখেনে সন্ধেবেলায় নিমন্ত্রণ ছিল। গেলুম। তাকে বেশ লাগ্‌ল— বেশ Refined। চমৎকার Harp এবং পিয়ানো বাজায়। "অলি বারবার" গানটা খুব তার ভাল লেগেছে। বলছিল যদি আমাদের ঐরকম কতকগুলো দিশি গান Sullivanকে শোনাই তা হলে সে একটা Oriental Opera লিখ্‌তে পারে। আমার Composition শুনে আশ্চর্য্য। আমি musicএর grammar কিছু না জেনে Compose করতে পারি এতে সে অবাক।

শনিবার। সকালে আবার Regents Streetএ যাওয়া গেল। সমস্ত দিন ঘুরে ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে গাড়ি করে আমি ফিরে এলুম। আমার বাঁ পায়ের শিরায় বড্ড ব্যথা হয়েচে। লোকেন আমাকে সন্ধের সময় বল্লে আমার বাঙ্গলা গান শুন্‌তে আজকাল বড় ভাল লাগ্‌চে তুমি কতকগুলো বাঙ্গলা গান গাও। জ্যোৎস্নার কাছে একটা মায়ার খেলা ছিল সেইটে নিয়ে প্রথম থেকে একটা একটা করে অনেকগুলো গাওয়া গেল। আমার বেশ লাগ্‌ছিল— লোকেনেরও ভাল লাগ্‌ল। Lycium Theatreএ যাওয়া গেল। Bride of Lammermoor অভিনয় হল। চমৎকার লাগ্‌ল— কি সুন্দর scene। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভাল অভিনয় করেছিল, Irvingএর অভিনয়ও খুব ভাল— কিন্তু এমন mannerism— এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কিন্তু তবুও ভাল অভিনয়— সেই আশ্চর্য্য। একটি Boxএ দুটি মেয়ে বসেছিল— তার মধ্যে একটিকে চমৎকার দেখ্‌তে। একেবারে নিখুঁৎ ছোট সুন্দর মুখখানি— অল্প বয়স— দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুল্‌চে— বেশভূষায় আড়ম্বর নেই— কিন্তু সবসুদ্ধ যাকে dainty বলে তাই। অভিনয়ের সময় রঙ্গভূমির সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজে আলো জ্বলে— সে ষ্টেজের উপরকার বক্‌সে বসেছিল তার মুখের উপর ষ্টেজের আলো পড়ছিল— কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! সমস্ত backgroundটা অন্ধকার— কেবল তার আর্দ্ধেক মুখ আলোকিত—কি সুকুমার সুন্দর মুখের রেখা। কি চমৎকার গ্রীবাভঙ্গী। আমি অভিনয়ের সময় প্রায় তার মুখের বিচিত্র ভাবের খেলা দেখ্‌ছিলুম। সেও দূরবীন দিয়ে আমাদের অনেকক্ষণ দেখেচে কিন্তু নিঃসন্দেহ ততটা আনন্দ লাভ করেনি। কিন্তু নাট্যশালায় একান্ত নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সঙ্গে পরস্পরের প্রতি দূরবীন কষা আমার নিতান্ত খারাপ লাগে। আমি ত কিছুতেই পারলুম না— ভারি অভদ্র মনে হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলো প্রথা আছে যা প্রকৃতপক্ষে অভদ্র— সে আমাদের কিছুতেই অভ্যেস হয়ে যাওয়া উচিত না— যেমন নাচ— দূরবীন কষা— গান বাজনার সময়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

সেদিন French Exhibitionএ একজন বিখ্যাত artistরচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখ্‌লুম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে কিছু নেই— কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখী দেখি আর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সৌন্দর্য্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্ত্ত্যের চরম সৌন্দর্য্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েচে। কিন্তু

সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জা বোধ হয় আমি তাকে সহস্র ধিক্কার দিই। আমি ত সুতীব্র সৌন্দর্য্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম— আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেলি যদি বড় হত, তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখ্‌তে পারতুম। এ রকম উলঙ্গতা কি সুন্দর! এই ছবি দেখ্‌লে সহসা চৈতন্য হয়— ঈশ্বরের নিজহস্তরচিত এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পশু-মানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেচে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই দেহখানির শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম ভঙ্গিমার উপর বিশ্বকর্ম্মার— সেই অসীমসুন্দরের অঙ্গুলীর স্পর্শ দেখা যায় যেন— এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ সুকোমল নারী-হৃদয়— একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এরি মধ্যে বাস করে; তারি ভালবাসা তারি লাবণ্য এর সর্ব্বত্রে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে।— এই উলঙ্গ চিত্রে রমণীর সেই হৃদয়ের কোমলতা এবং আত্মার শুভ্র জ্যোতি ব্যক্ত করচে— মানব-অন্তঃকরণের চিরপ্রচ্ছন্ন রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্চে।

রবিবার। আজ সতুর সঙ্গে Churchএ যাবার কথা ছিল। খোঁড়া পা নিয়ে সমস্ত দিন পড়ে আছি। বাবির Porcelainএর ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছে— সুন্দর লাগ্‌চে। কিন্তু মেজদাদা সেটা দখল করে রেখেচেন— আমার ভয় হচ্চে পাছে আমাকে না দেন। রাত্তিরে গান হল। Miss Oswald সতুর হাত দিয়ে আমাকে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েচেন।

সোমবার। পা অনেকটা ভাল বোধ হচ্চে। বিকেলের দিকে লোকেনের সঙ্গে Walleryর ওখানে গিয়ে একটা Cabinet ছবি নেওয়া গেল— তারা অনেক যত্ন করে নানা Positionএ নিলে— বল্লে Splendid head— বোধ হয় আমার মুখশ্রী প্রসন্ন করবার জন্যে। Miss Oswaldএর ওখানে যাওয়া গেল— সে আমার একটা ছবি চাইলে— দিলুম। কতকগুলো বাঙ্গলা গান গাওয়ালে— বিশেষ রকম ভাল লাগ্‌ল— বিশেষতঃ "অলি বারবার"টা। ভরসা করি এর মধ্যে চালাকি কিছু নেই— চাণক্য বলেচেন বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রিষু রাজকুলেষু চ। এরা একে স্ত্রী তাতে রাজকুল। একজন musical পুরুষ বসেছিল সেও অনেক তারিফ করলে। Birthday Book এবং Autograph Bookএ নাম লিখে দিয়ে National Liberal Clubএ সিন্ধি বন্ধু আধ্বানির নিমন্ত্রণ উপলক্ষে Dinner খেতে গেলুম। সেখানে Voyseyর সঙ্গে দেখা। তাকে বেশ লাগ্‌ল— সে বাবামশায়ের প্রতি খুব ভক্তি প্রকাশ করলে। তার নিজের ইতিহাস অনেক শোনা গেল। Christianity ত্যাগ করার দরুণ ঘরে বাইরে তাকে অনেক উপদ্রব সইতে হয়েচে— বল্লে, সব চেয়ে কষ্ট যখন নিজের ঘরের মধ্যে sympathyর অভাব দেখা যায়। আমাকে দেখে দেখে বল্লে— তোমার বোধ হয় কথাটা খুব নতুন বোধ হবে—কিন্তু তোমাকে দেখ্‌বামাত্র আমার মনে হয়েছিল যিশুখৃষ্টকে যে রকম আঁকে তোমাকে ঠিক সেই রকম দেখ্‌তে। আমি বল্লুম এ কথা আমার পক্ষে নতুন নয়। Clubটা একটা রাজপ্রাসাদ বল্লেই হয়— চমৎকার পাথরের সিঁড়ি— খুব জম্‌কালো, এবং যত রকম আরাম কল্পনা করা যেতে পারে তার বন্দোবস্ত আছে।

মঙ্গলবার। চিঠি পাওয়া গেল। বাবি লিখেচে আর চিঠি লিখ্‌বে না। মেজদাদার কাছে আমার একলার বাড়ি পালাবার প্রস্তাব করা গেল— কিছু ফল হল না। বাবিকে চিঠি লিখ্‌তে বসা গেল।

শ্রীনন্দলাল বসু

গোপালপুর
১৯৪৭

গোয়ালপাড়া
১৯৪৯

শ্রীনন্দলাল বসু

বুধবার। কাল সন্ধে থেকে লোকেন Margateএ তার বন্ধুসন্দর্শনে। আমি বসে২ চিঠি লিখ্‌চি। Miss Mullএর কাছে একটু গান শিখ্‌লুম। "যদি আসে" গানটা তার ভাল লাগ্‌ল। লোকেন ফিরে এসেচে। আজ পয়লা অক্‌টোবর— এ মাসটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। কাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বচ্চে —মেঘ করে রয়েচে— শীতও বেড়েচে। বোধ হয় রীতিমত বিলিতী weather আরম্ভ হল। মেজদার কেন এদেশ ভাল লাগে আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনে— তিনি ত এখানকার হুড়োমুড়িতে তেমন যোগ দেন না। ইচ্ছে করলেই একটা কিছু করা যেতে পারে— নিদেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দোকানগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে এইটে মনে করেই মন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকে বোধ হয়।

বৃহস্পতি। নারায়ণ হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা— আশ্চর্য্য অধ্যবসায়। বেচারার কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখে আমি তাকে আমার এক স্থট গরম কাপড় দিলুম। India Officeএ হয়ে দোকান হয়ে শ্রান্তভাবে বাড়ি প্রত্যাগমন। মেজদা কাল আমাকে Birminghamএ নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই এখনি বসে বসে সল্লিকে তাড়াতাড়ি এক চিঠি লিখে দেওয়া গেল। আদবে ভাল লাগ্‌চে না।

শুক্র। Birmingham যাত্রা। ইংলণ্ড দেখতে বড় স্থন্দর। Lee Stationএ উপস্থিত ছিল। সহর দেখ্‌তে আমার আদবে ভাল লাগে না। Electric Tramএ চড়া গেল। Electric Tramএর কলকারখানার মধ্যে নিয়ে গেল— নির্ব্বোধের [মতো] ঘুরে২ বেড়িয়ে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। কিছুই বুঝলুম না— কেবল একান্ত শ্রান্ত হয়ে Mrs Leeর ওখানে ডিনার খেয়ে হোটেলে এসে নিদ্রা। শনিবার সকালে আবার বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের সন্ধানে বেরোনো গেল। এটা পোষ্ট আপিস ওটা ম্যুনিসিপাল আপিষ সেটা আদালত এই করতে২ একটা ছাপাখানায় যাওয়া গেল— সেখানে রঙিন ছবি ছাপা দেখা গেল— এটা দেখবার জিনিষ বটে। সন্ধের সময় লণ্ডনে ফিরে এসে Walleryদের ওখেন থেকে আমার ছবির প্রুফ পাওয়া গেল।

রবিবার— Voyseyর Churchএ গিয়েছিলুম। বেশ লাগ্‌ল। মনটা অনেকটা ভাল বোধ হল। ফিরে এসে লোকেনের ঘরে বসে গল্প করচি— খানিক বাদে Mrs Palit এসে বল্লেন Drawing roomএ রাজনারাণ আর Miss Mullএ খুব Scene হয়ে গেছে। Miss Mull বসে বাজাচ্ছিল— তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল তার বাজনা শুনে আমি drawing roomএ যাই— অনেকক্ষণ গেলুম না দেখে সে রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করছিল Is Mr Tagore out I wonder? রাজনারাণ বল্লে No. Evidently your signal has not attracted him. Mrs Palit তাকে বল্লেন "Is that your signal Miss Mull?" সে রাগ করে Piano বন্ধ করে বল্লে I don't understand what you say! বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমাকে নিয়ে রাজনারাণের সঙ্গে তার ক্রমিক খিটিমিটি চলচে। Oswaldদের ওখেনে বিকেলে গিয়েছিলুম— বাঙ্গলা গান হল। Mrs Oswaldএর ভাল লাগল। এখেনে ফিরে এসে সন্ধের সময় গান। Miss Mull "অলি বারবার"টা আবার গাইতে বল্লে সেটা তার ভারি ভাল লাগে— সে বল্লে I don't know what is in it— it is so very pathetic. আজ বিকেলে লোকেনে আমাতে দুজনেই পাগড়ি পরে বেরিয়েছিলুম। রাস্তার লোকের খুব মজা লেগেছিল। আমরা কালো মানুষ ঠিক যদি ইংরেজের ছদ্মবেশ ধারণ করি তাতে এদেশের লোকের

অদ্ভুত মনে হয় না। যখন রাস্তার মেয়েরা আমাকে দেখে হাসে তখন আমার চেহারার গর্ব্ব অনেকটা চলে যায়। আজ ৫ই। এখনো পাঁচ সপ্তাহ।

সোমবার। কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেচি— ঠিক এইরকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেচি তার ঠিক নেই— মনে হয় কোন্‌দিন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে— এই এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেক অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্চে।— আজ চিঠি আসবার দিন। বাবির চিঠি পাওয়া যাবেনা। আমি ঠিক করেচি বাড়ি ফিরব— আর নয়।

মঙ্গলবার। Savoy Hotelএ মনোমোহনের ওখানে lunch খেয়ে P & O আফিসে Thames Steamerএ Passage engage করে নিশ্চিন্ত। বৃহস্পতিবারে ছাড়বে। কাল রাত্তিরে Carlyle Societyতে গিয়েছিলুম। চুরোটের ধোঁয়ার মধ্যে John Stirbingএর Life সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। মেজদাদা Newman সম্বন্ধে একটুখানি বল্লেন— সকলের খুবই ভাল লেগেচে। রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত আমার দেশে ফেরা সম্বন্ধে সমালোচনা করা গেচে।— মঙ্গলবার রাত্তিরে লোকেন আমাকে Oswaldদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল—

বুধবার। সমস্ত দিন হিসেব করতে এবং জিনিষ কিন্‌তে গেল। মেজদাদার কাছে অনেক ধার হয়ে গেছে— তিনি আমাকে অমনি দিতে চেয়েছিলেন— কিন্তু সে আমার ইচ্ছে হলনা— মেজদাদার টাকাতেই যদি বাবিদের জন্যে জিনিষ কিন্‌লুম তাহলে আমার আর দেওয়া হল কই? অল্পে অল্পে শুধে ফেল্‌ব। কেন মরতে বিলেতে এসেছিলুম কে জানে। বাড়িতে চিঠি লিখ্‌লুম। Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। Remember me বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বল্লে Mr T, I shall remember you। আমি অপ্রতিভ হয়ে নিরুত্তর বসে রইলুম।

বৃহস্পতি। আজ ত Thames জাহাজে উঠ্‌লুম। আমার Cabinএ একজন Civilianএর জিনিষপত্র দেখে মন বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। তার পরে দেখলুম সে নেহাৎ কাঁচা-- এই প্রথম ভারতবর্ষে যাচ্চে। আমাকে দেখে ভারি খুসি। জাহাজে কখন কি করতে হয়, কোথায় কি, আমাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নিলে— আমি তার মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছি। মল্লিক এবং বাঁড়ুয্যের ভারি প্রশংসা করলে। Lord Riponএর দলের লোক। সেখেনে গেলে কি হয় কে জানে। বোধ হচ্চে Irishman। জাহাজে ভয়ানক ভিড়। Dinner Table-এ আমার ঠিক সাম্‌নেই রাঙা টুক্‌টুকে ঠোঁট— জল্‌জলে চোখ— এবং মিষ্টি হাসিওয়ালা একটি মুখ পাওয়া গেছে। আমাকে সকলেই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করচে।

শুক্রবার। চমৎকার সকাল হয়েচে। সমুদ্র স্থির— আকাশ পরিষ্কার— সূর্য্য উঠেচে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমাদের দক্ষিণে ভোরের বেলা অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কোয়াশার আবরণ উঠে গেল— Isle of Wightএর পার্ব্বত্য তীর এবং Ventnor সহর ক্রমেং প্রকাশ হয়ে পড়ল। পর্ব্বতের ঢালুর উপরে সমুদ্রের তীরে শাদা শাদা বাড়ি বিজ্‌বিজ্ করচে— লিলিপট্ সহরের মত। এ জাহাজে বিষম ভীড়— এককোণে নিরিবিলি চৌকি নিয়ে বসে লেখবার যো নেই এবং যায়গাও নেই। Brindisi থেকে আরো অনেক লোক উঠ্‌বে— ভরসা করি আমাদের Cabinএ আর কেউ আস্‌বে না। আমাদের Massilia জাহাজের Purserকে এ জাহাজে দেখ্‌লুন। সে আমাকে বল্লে তোমার যখন যা আবশ্যক হবে আমাকে জানিয়ো। ডিনার টেবিলে আমার পাশেই সে আসন গ্রহণ করেচে— ডেকের

উপর আমাকে পাশে নিয়ে হট্‌হট্‌ করে বেড়াতে চায় এবং বিস্তর গল্প বলে— লোক খুব ভাল সন্দেহ নেই— নইলে আমাকে বেচে নিলে কেন— সমজ্‌দার বটে। কিন্তু সর্ব্বদা আমার প্রতি মনোযোগ দিলে আমার লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। Wallaceএর Darwinism পড়চি— বেশ লাগচে— ইচ্ছে করচে বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করতে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে উঠবেনা।

আজ "ডেকে" বেড়াতে২ একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল সে কর্ত্তাদাদামশায়কে জান্‌ত। একটা বড় সেনাপতি গোছের লোক— Egyptএ যাচ্চে। অনেক কথা হল। English Governmentটের কথা হতেই আমি ইংরেজের ব্যবহার সম্বন্ধে দুএকটা কথা বল্লুম। সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল— সে বল্লে আমাদের সময়ে ঐরকম ছিল বটে কিন্তু এখনো আছে না কি? শুনে স্বজাতির উপর ভারি চোট প্রকাশ করলে। বল্লে— লোকে বলে ভারতবর্ষের বাজারে ভারি ঠকায়— কিন্তু Bond Streetএর চেয়ে ঢের ভাল। নিম্নশ্রেণীয় ভারতবর্ষীয়েরা নিম্ন-শ্রেণীয় ইংরেজদের চেয়ে যে কত ভাল তা বল্‌তে পারিনে। বল্লে হিন্দুরাই যথার্থ Christian তাদের ক্ষমাপরায়ণ সহিষ্ণু নম্রতা তাদের আন্তরিক সহৃদয়তা খৃষ্টানদের অনুকরণীয়। লোকটা খুব ধার্ম্মিক— আমাকে খৃষ্টধর্ম্মে লওয়াবার কতকটা চেষ্টা করলে। আমার ইংরিজি ভাষা শুনে খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে। জিজ্ঞাসা করলে আমি Oxfordএ পড়েছি কি না— আমি বল্লুম— না— কোন দেশের কোন কলেজে পড়েচি কি না — না— শুনে অবাক্।— সে বল্লে আমি India Officeএ থাকি— অনেকটা জান্‌তে পারি আমাদের সময়ের চেয়ে এখনকার ভারতবর্ষীয় ইংরেজরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়। আমি বল্লুম আমার উল্টো বিশ্বাস— দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্ত্তাদাদামশায়ের সঙ্গে ইংরেজের মেশামিশির কথা বল্লুম— সে বল্লে His was the only solitary instance। আমাকে বল্লে যদি কখনো পুনশ্চ ইংলণ্ডে আসি তা হলে India Officeএ তাকে সন্ধান করে যেন look up করি।— সমুদ্র আশ্চর্য্য শান্ত এবং সমস্ত দিন রৌদ্রোজ্জ্বল পরিষ্কার। একটা নিরিবিলি কোণ পেলে কবিতা লিখতুম। জাহাজে ক্রমে আমার বন্ধুবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখ্‌চি।

ইংরেজ মেয়েদের চোখ আমার ক্রমে ভাল লাগচে— মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত এমন পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল— প্রায়ই ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন। আমাদের দেশের মেয়েদের চোখে একরকম আবেশের ভাব আছে— এদের তা মোটে নেই।

শনিবার। Bay of Biscayতে পড়া গেছে। সমুদ্র কিঞ্চিৎ অশান্ত। সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর একজন সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল— তাকে Archerএর Studioতে দেখেছিলুম— টেরা। Turbull— ভূতপূর্ব্ব ম্যুনিসিপাল সেক্রেটারি। সে বল্‌ছিল আমাকে যদি কেউ দশ হাজার টাকা দেয় তাহলেও আমি কলকাতা ছেড়ে ইংলণ্ডে বসতি করিনে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম— কেন? সে বল্লে ইংরাজ জাত বড় উদ্ধত স্বার্থপর গর্ব্বিত ইত্যাদি। ফরাসীরা ওদের চেয়ে ঢের ভাল।— আজ কখনো রোদ্দুর কখনো মেঘ করচে— খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে। কাল চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গিয়েছিল— আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে এমন সুন্দর রং হয়েছিল। আজ মেঘের মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল। সমুদ্র মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠচে।

রবি। কাল রাত্তিরে আবার সেই রকমের স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্নে বোধ হচ্ছিল মনের কষ্টে

আমি যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করে কোথায় ছুটে চলেচি। ঠিক এই ধরনের স্বপ্ন কতবার দেখেচি তার ঠিক নেই। সকালে আমার সহযাত্রী Connollyর সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সে বল্লে আমি ভারতবর্ষে কখনো Anglo Indian দলে ভিড়বনা— আমি সেখানকার দেশের লোকের সহায় এবং বন্ধু হব। আসবার আগে Lord Ripon এবং তার Private Secretaryর সঙ্গে এ বিষয়ে তার অনেক কথা হয়ে গেছে। আজ সকালবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন। কুয়াশা কেটে গিয়ে বেশ রোদ্দুর উঠেছে— ছাতের চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েচে— তাই আজ অনেকটা snug বোধ হচ্চে— আজ তেমন ঠাণ্ডা নেই। এ জাহাজে একটি মেয়ের সুন্দর নীল চোখ এবং চমৎকার ঠোঁট— হাসলে বেড়ে দেখায়। আমার ডিনার টেবিলের সঙ্গিনীর চেয়ে একে অনেক ভাল দেখ্‌তে। এর মুখের ভাবে বেশ একটু কোমল নম্রতা আছে— উগ্রতা কিছুমাত্র নেই। আজ আর এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করে নিলে— You belong to the great Tagore family of Calcutta? আমি গান গাইতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্লুম হাঁ। সে বল্লে Colonel Chatterton বলে এক মস্ত Musician Brindisi থেকে আমাদের জাহাজে উঠ্‌বে— সে এলে আমাদের অনেকরকম আমোদ প্রমোদ হবে— আমাকেও গাওয়াবে।— Darwinism শেষ করা গেল। খুব ভাল লাগ্‌ল—বিশেষতঃ শেষ Chapter। Spiritual Manএর মধ্যেও Survival of the fittest নিয়ম বোধ হয় চল্‌চে— তবে তার জীবন মৃত্যু অন্য রকমের। যখন ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন মৃত্যোর্মামৃতংগময় তখন এই Spiritual survival প্রার্থনা করেছিলেন। আমরা যে আত্মা পেয়েছি তারি সফলতা চেয়েছিলেন।— চমৎকার সূর্য্যাস্ত। সন্ধ্যার রংয়ে জল এবং আকাশে একরকম শারীরিক লাবণ্য প্রকাশ পায়— মনে হয় যেন তার মধ্যে জীবনের এবং যৌবনের পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে।— Wallace পড়ে আমার মনে এই একটা চিন্তার উদয় হয়েচে যে, আমাদের যে অংশ জন্তু সেই অংশই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক— এবং Natural Selectionএর নিয়ম অনুসারে সেই অংশ ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়েচে— কিন্তু আমাদের অনেকগুলি মানবচিত্তবৃত্তি আছে যা আমাদের জীবনরক্ষার পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক নয়— সুতরাং জীবনসংগ্রামের নিয়মানুসারে সেগুলো কি করে উদ্ভাবিত হল কিছু বোঝবার যো নেই। আমাদের ধর্ম্মভাব জীবনরক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক এমন কি অনেক স্থলে বাধাজনক। উদ্ভিদ এবং জন্তুদের যা কিছু আছে সমস্তই তাদের আবশ্যক অথবা অতীত আবশ্যকের অবশেষ, কিন্তু আমাদের প্রধান চিত্তবৃত্তিসকল আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত। এ পর্য্যন্ত প্রমাণ হয়নি সৌন্দর্য্য আমাদের জীবনের পক্ষে আবশ্যক— যে জাতির মধ্যে শিল্পচর্চ্চা অধিক তারা অন্য জাতির চেয়ে বলিষ্ঠ বা তাদের জীবনীশক্তি অধিক। গ্রীকরা রোমের কাছে পরাভূত হয়েছিল। যারা সঙ্গীতচর্চ্চা করে জীবনসংগ্রামে তাদের বিশেষ কি সুবিধে বোঝা যায় না। অতএব এসকল মনোবৃত্তি আবশ্যকের নিয়মানুসারে আবির্ভূত হয়নি— সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মানবের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। এইসকল আপাততঃ অনাবশ্যক চিত্তবৃত্তি আমাদিগকে কোন্‌ উচ্চতর আবশ্যকতার দিকে নিয়ে যাচ্চে কে বল্‌তে পারে।

সোমবার। আজ চৌকিতে আরামে বসে Modern Thoughts & Modern Science পড়ছিলুম— একদল লোক এসে আমাকে Quoits খেল্‌তে নিয়ে গেল। Stupid খেলা। আজ

রাত্তিরে বোধ হয় নৃত্য হবে। ইংরেজ সমাজের একটা আমার চোখে খুব ঠেকে— এখানে মেয়েরা পুরুষদের প্রতি অনায়াসে Rude হতে পারে— Public Opinion তাতে কোন বাধা দেয় না। ভদ্রতার নিয়ম যে স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিশেষ তফাৎ হবে তার কারণ আমি বুঝ্‌তে পারিনে। হয়ত হতে পারে গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক— যেখানে স্ত্রীপুরুষে বেশি মেশামিশি সেখানে স্ত্রীলোকের সেই কারণে কতকটা প্রখরতা থাকা আবশ্যক। যাই হোক্ তার চেয়ে আমাদের মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীণ কোমলতা এবং মমতার ভাব আমার ঢের বেশি ভাল লাগে।— এরা সবাই মিলে আমার কোণ থেকে আমাকে উপ্‌ড়ে বের করবার চেষ্টায় আছে।

Concertএ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল। অনেক মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে— পরিচিতসংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠ্‌চে। গানের পর খুব একচোট নাচ হয়ে গেল— আমি নাচি কিনা অনেকে সন্ধান নিলে আমি বল্লুম— I used to dance— but I am out of it now— I am sure to come to grief if I attempt it.— মিস্ ঠিক নামটা মনে পড়চেনা বল্লে Do try আমি বল্লুম Excuse me। I belong to the obscure genus of wall flowers। নাচ দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়ে ছিল। Gounodর Serenade এবং If গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্ব্বক গলা ছেড়ে গান গাই— বাবি শুনলে বোধ হয় অনেক উৎসাহ দিত।

আজ তুপুর বেলা Protugalএর একটুখানি রেখা দেখা গিয়েছিল।

ক্রমশ

লিল্	=	তারকনাথ পালিতের কন্যা
Mrs Palit	=	তারকনাথ পালিতের পত্নী
সুরি	=	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইন্দু [ইন্দুমতী দেবী]	=	মহর্ষির জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠ কন্যা
নোয়েল	=	ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র
রাণী	=	ইন্দুমতী দেবীর মধ্যম কন্যা
লীলা	=	ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা। মন্মথনাথ চৌধুরীর পত্নী
কর্ত্তাদাদামশায়	=	দ্বারকানাথ ঠাকুর
নারায়ণ হেমচন্দ্র	=	গুজরাটি ভদ্রলোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকাদি গুজরাটিতে তর্জমা করেন

গান্ধীজি

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে গান্ধীজির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি। মহাত্মার চরিত্রের উত্তুঙ্গ মহত্ত্ব, তাঁর অলৌকিক বীর্য ও মৈত্রীর কাছে অন্য সকলের মত বাঙালি মাথা নুইয়েছে। মানুষের ও তার সামাজিক জীবনের যে আদর্শ মহাত্মার জীবনে কর্মে ও কথায় পরিস্ফুট তার ডাকে বাঙালি অনেকবার বড় রকম সাড়া দিয়েছে। কিন্তু সে আদর্শের কল্পনা তার মনকে কানায় কানায় ভরে দেয় নি। বিচিত্র জীবনের পরিপূর্ণতার যে আনন্দ সে আদর্শে বাঙালি তার স্বাদ পায় নি। ও আদর্শের আহ্বান উপেক্ষা করা যে কাপুরুষতা বাঙালি মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু সে আহ্বান কর্তব্যের আহ্বান, বহুমুখী জীবনের বর্ণগন্ধময় অহৈতুক আনন্দের আকর্ষণ নয়।

যাঁরা বলবেন গান্ধীজি কাজের লোক, কর্মমহাযোগী, প্রকৃত কর্মীর মত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের যা উপায় তাতে তাঁর একাগ্র মন নিবদ্ধ, তার যা অবান্তর সে চিন্তায় তিনি চিত্তের বিক্ষেপ ঘটান নি, তাঁরা মহাত্মার কাজকে দেখেছেন অত্যন্ত বাইরে থেকে, তার মর্মকথা উপলব্ধি করেন নি। সন্দেহ নেই গান্ধীজি মহাকর্মযোগী; তাঁর জীবনব্যাপী বহু বিচিত্র কর্মের অপ্রমত্ত অনুষ্ঠানের তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সকল কর্মের এক লক্ষ্য মানুষ, ব্যক্তিগত মানুষ। মহাত্মার রাষ্ট্রনীতি সমাজচিন্তা ধনতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্ব সব-কিছুতে এক মাপকাঠি; মানুষের, ব্যক্তিগত মানুষের, চরিত্রের উপর কোন্ ব্যবস্থার কি ফল ফলবে তাই দিয়ে সকল ব্যবস্থার বিচার। যে ব্যবস্থা চরিত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবে মনে হয়েছে তাকে তিনি নির্মম হয়ে বর্জন করেছেন, যতই আশুফলপ্রদ সে ব্যবস্থা হোক-না কেন। মানুষের প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক প্রয়োগের যে তিনি বিরোধী ছিলেন তার মূল এইখানে। সে প্রয়োগে মানুষের দারিদ্র্য কিছু কমবে, যে মানুষকে তিনি অসীম ভালোবাসতেন তার দুঃখকষ্টের কিছু লাঘব হবে সে কথা তিনি অবশ্য জানতেন। কিন্তু চরিত্রের অমৃতকে যা আবিল করে তা থেকে বঞ্চিত করাই যে প্রিয়জনকে বাঁচানো সে সম্বন্ধে তাঁর চিত্ত দৃঢ় ছিল। বৃহৎ রাষ্ট্র-আন্দোলন আরম্ভ করে তিনি মধ্যপথে থামিয়ে দিয়েছেন, যখনই দেখেছেন তাঁর ডাকে যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তাদের চরিত্রের উপর ফল হচ্ছে অমনুষ্যোচিত। বলেছেন, তাঁর ভুল হয়েছিল, পর্বতপ্রমাণ ভুল। ভুল আর কিছু নয়; মানুষের চরিত্রের উপর যে ভরসা তিনি রেখেছিলেন মানুষ তার উপযুক্ত হতে পারে নি। তাদের সকল ত্রুটি তিনি নিজের ত্রুটি বলে স্বীকার করেছেন। ফললোভী কোন্ কর্মী-মাত্রের এমন সাধ্য ও সাহস হবে?

যে রাষ্ট্রনায়কদের বলে 'পলিটিশ্যান', তাঁদের সঙ্গে মহাত্মার রাষ্ট্রনেতৃত্বের প্রভেদ এইজন্য একেবারে মূলগত। তাঁদের কথা বলছি না— রাষ্ট্রের কাজ আর হিত যাঁদের উপায় ও উপলক্ষ্য, আসলে নিজের উন্নতি ও প্রতিপত্তিই প্রধান লক্ষ্য, ইংরেজিতে যাদের নাম 'কেরিয়ারিস্ট'; সেই পলিটিশ্যানদের কথাই বলছি— নিজের কাজ দিয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল করতে পারবেন বিশ্বাসেই যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব কামনা ও অনুসরণ

করেন। অবশ্য মানুষের জটিল মনোবৃত্তিতে রাষ্ট্রের হিত ও নিজের প্রতিপত্তি অনেক সময় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অভেদে মিশে যায়। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত পলিটিশ্যান তাঁদের কাছে নিজের প্রতিপত্তি মোটের উপর গৌণ, সকল রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যমের উপায়মাত্র। যেসব বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলকর মনে করেন সেসকল বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্রে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন পলিটিশ্যানেরা। এ চেষ্টার তাঁরা ধরে নেন যে, সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের, চরিত্রের যা মৌলিক গড়ন তা ঐ রকমই থাকবে, অন্তত বর্তমানে ও নিকট ভবিষ্যতে। অত্যন্ত মিশ্র গড়ন; ভালো-মন্দ, ঔদার্য-নীচতা, দয়া-নিষ্ঠুরতা, সাহস-ভীরুতা, বুদ্ধি-নির্বুদ্ধির বর্ণসংকর। বিশেষ বিপন্মুক্তি কি ভাবের উত্তেজনায় এ চরিত্রের সাময়িক পরিবর্তন ঘটে। যা বড় তা প্রকট ও ক্রিয়াশীল হয়, যা ছোট তা চাপা থাকে। অবস্থার যোগাযোগে দেশের মানুষের মন যখন এর অনুকূল হয় তখন পলিটিশ্যানেরা এর সুযোগ নেন প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে, এ আনুকূল্যকে প্রসার ও তীক্ষ্ণতা দেন বাগ্‌বিভূতির মহা অস্ত্রে। তাঁরা জানেন চোখের জল আর বুকের রক্ত দাবি করলে ভয় না পেয়ে লোকে তখন উৎসাহ পাবে; দেশের জন্য নিজেকে বলি দেওয়া মনে হবে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা এ-ও জানেন এ পরিবর্তন সাময়িক। উৎকট প্রয়োজনের টানে এর আকস্মিক আবির্ভাব। সে টান শিথিল হলেই মূল প্রকৃতি নেমে যাবে তার বিমিশ্র সাম্যাবস্থায়। বরং উত্তেজনার অবসাদে সাধারণ স্তর থেকেও কিছুকালের জন্য নেমে যাবে একটু বেশি নীচে। নীচতা নির্বুদ্ধি ভীরুতা স্বার্থাল্পতা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়েও প্রবল থাকবে। মানুষের এই প্রকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করা পলিটিশ্যানদের কাজ নয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা যথার্থ বড় তাঁরা সম্ভবত ভরসা করেন যে, তাঁদের প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের ফলে তাঁদের কালে দেশের বেশির ভাগ লোকের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি বিকাশের যা সব বাধা আছে, আর্থিক রাষ্ট্রিক সামাজিক বাধা, তা কতকটা দূর হবে। বোধ্য ও দুর্বোধ্য কারণে যেসব মানুষের চরিত্রে স্থায়ী কাম্য পরিবর্তন আসে তারা শক্তি প্রয়োগের পথ পাবে। এমনধারা গৌণ উপায়েই পলিটিশ্যানেরা চরিত্রের স্থায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। সোজাসুজি সে চেষ্টা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। একসঙ্গে পলিটিশ্যান ও চরিত্র-সংস্কারকের কাজ কেবল দুঃসাধ্য নয়, তার ফল যে ভালো হয় না ইতিহাসে তার নজির আছে।

পলিটিশ্যানের এই পলিটিক্‌স আর গান্ধীজির পলিটিক্‌স দুয়ের প্রস্থানভূমি ভিন্ন। গান্ধীজির পলিটিক্‌সে চারপাশের আগাছা-জঙ্গল কেটে গাছকে বাড়বার সুযোগ দেওয়া, গাছকে বড় করার উপায় নয়। গাছের গোড়ায় এমন সার দিতে হবে, শিকড়কে রস টানার জন্য এমন শক্তিমান করতে হবে, যাতে গাছ আপনি বেড়ে উঠবে, আর তার ঘন ডালপাতার আওতায় আগাছার ঝাড় শুকিয়ে মরবে। মানুষের চরিত্রবিকাশের চেষ্টায় অনুকূল পারিপার্শ্বিকে সামাজিক ও মানসিক কারণের জটিল কার্যকারিতার ধীর গতিতে ভরসা রাখা গান্ধীজির কর্মনীতি নয়। গান্ধীজি চেয়েছেন, মানুষকে এমন প্রভাবের মধ্যে আনতে যার শক্তিতেই তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়ে উঠবে, পারিপার্শ্বিককে প্রায় উপেক্ষা ক'রে। আর এ পরিবর্তন আসবে দ্রুত। কোনো কোনো মানুষের জীবনে ও চরিত্রে যেমন হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যায়, পাপী হয় সাধু, সাংসারিক হয় উদাসীন ভক্ত। তবে এ পরিবর্তন হবে ব্যাপক; দু-একটি অসাধারণ মানুষের জীবনে ঘটবে না, বহু সাধারণ মানুষের জীবনে ও চরিত্রে দেখা দেবে। পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু এ ফল ফলাতে তার যে পরিবর্তন প্রয়োজন তার পরিমাণ

সামান্য। এবং বিকশিতচরিত্র মানুষ নিজের চেষ্টাতেই পারিপার্শ্বিকে এমন পরিবর্তন আনবে যা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের অনুকূল, শ্রেষ্ঠত্বকে স্থায়ী রাখার উপযোগী। পলিটিশ্যানেরা যে ব্যাপক ও আকস্মিক পরিবর্তনকে কাজে লাগান এ পরিবর্তন সেরকমের নয়। কারণ এ পরিবর্তন হবে স্থায়ী, কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির সুযোগ ও উপায় নয়, সকল কাজের লক্ষ্য ও ফল।

২

নানা দেশের বহু ধর্মপ্রবর্তক মানুষের চরিত্রে এমনধারা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, তাঁদের ধর্মোপদেশে, ধর্মজীবনের আদর্শে লোককে আকৃষ্ট ক'রে। সে উপদেশ ও আকর্ষণে লোকে সাড়া দিয়েছে। চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে; কোথাও স্থায়ী ও গভীর, কোথাও চঞ্চল ও বাহ্যিক। কিন্তু এ-উপদেশ ও আদর্শের লক্ষ্য মানুষের সমগ্র জীবন নয়, জীবনের একটা দিক, যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা 'স্পিরিচুয়াল'। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তাদের ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে স্বীকার করে তার মধ্যেই মহত্তর ও বিশুদ্ধ জীবনের দিকে এ আদর্শের আহ্বান। এর কোনো আদর্শ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক, লৌকিক ও লোকাতীতের মধ্যে গভীর ভেদরেখা টেনেছে। যা রাষ্ট্রের তার দাবি রাষ্ট্রকে মিটিয়ে দাও, যা ভগবানের তা দাও ভগবানকে। যিশুর চরিতলেখকেরা তাঁর মুখের এই উপদেশে ঐ প্রভেদের বাণীই প্রচার করেছেন। কোনো আদর্শ অনুসরণ বা সাংসারিক জীবন যাপন করেও মনকে তা থেকে মুক্ত রেখে অসাংসারিক আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা দিয়েছে। পরমহংসদেবের পাঁকাল মাছের দৃষ্টান্ত, কাদায় বাস করেও গায়ে কাদা না লাগা, আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। এসব আদর্শ মানুষের সামাজিক জীবনকে চরম মূল্য দেয় না। সে জীবনকে হয় এড়িয়ে নয় মাড়িয়ে চলতে হবে, তাকে পাশ কেটে প্রকৃত জীবনে পৌঁছতে হবে, অথবা তার আকর্ষণকে জয়ের চেষ্টায় আধ্যাত্মিক জীবনের মেরুদণ্ডকে সবল করাই হবে তার সার্থকতা। সেইজন্য ধর্মোপদেষ্টারা সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে গড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। সে ব্যবস্থা যেরকম হোক সংসারের পাঁক তাতে থাকবেই। তাকে নির্মল করার বিফল চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জীবনের সমগ্রতায় প্রসার নেই বলে যদি এ-আদর্শকে বলতে হয় অসম্যক্‌দর্শী, তবে এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, এক লক্ষ্যে এর একান্ত নিবদ্ধ-দৃষ্টি, এর পথের ঋজু সংকীর্ণতাই একে প্রচণ্ড শক্তি ও নিত্যতা দিয়েছে। রাষ্ট্রিক সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে এ আদর্শ স্থির নিষ্কম্প থাকে, ভাঙাগড়ার প্রলয় ও সৃষ্টির আবর্তনে মানুষকে টেনে রাখে। অনেক লোক আছে এই আদর্শের ডাকেই যারা বড় সাড়া দেয়। সমাজ-শরীরের তারাই লবণ, পচন থেকে রক্ষা করাই তাদের কাজ।

৩

এর ব্যতিক্রম আছে। এমন ধর্ম ও ধর্মমত আছে যা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনকেই জাগাতে ও গড়তে চায় না, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়; রাষ্ট্র ও সমাজকে করতে চায় নিজের কুক্ষিগত, বিশেষ ধর্মমতের আদর্শের অনুকূল বিধিনিষেধে এদের বেঁধে দিয়ে। রোমান চার্চের অনুসৃত খৃষ্টধর্ম এর পরিচিত উদাহরণ। এ ধর্মসংঘে এমন বহু সাধক জন্মেছেন, আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া কোনো-

কিছুতে যাঁরা দৃষ্টি দেন নি। কিন্তু এ সংঘের যাঁরা গুরু তাঁরা বলেছেন, ধর্ম যখন সকলের উপরে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ হবে তার অধীন ; ধর্মের অনুশাসনে এদের চলতে হবে। রাজা হবে সংঘের আজ্ঞাবহ, আর ধর্ম হবে রাজ্যশাসনে রাজার সহায়। ঐহিক রাজদণ্ডের ভয় পারত্রিক যমদণ্ডের ভয়ে দুর্বার হবে। ধর্মের এই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাথলিক সংঘের ধর্মগুরুরা ইউরোপের রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই লড়েছেন। কখনো প্রকাণ্ড জিত হয়েছে, কখনো প্রকাণ্ড হার। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের দেশে-দেশে জাতীয়-রাজ্যের অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিতে, আর ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘনে পারলৌকিক দণ্ডের বিশ্বাসহ্রাসে এ চেষ্টার চরম পরাজয় ঘটেছে। ইতিহাস সাক্ষি দেয় ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সমন্বয়চেষ্টায় ধার্মিকদের মনে আধ্যাত্মিক জীবনের আকর্ষণের চেয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের কূটনৈতিক উৎসাহ শতগুণ প্রবল ছিল। আধ্যাত্মিকতা বেঁচে ছিল তাঁদের অবলম্বন করে যাঁরা সংঘচক্র এড়িয়ে সাধকের একনিষ্ঠ জীবন যাপন করতেন। ইউরোপে জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষের নিদারুণতায় সে-মহাদেশের অনেক ভাবুক আজ ধর্মের অভিভাবকতায় এক ধর্মরাষ্ট্রের প্রাচীন আদর্শের দিকে লুব্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। যিশুর উপদেশ যা-ই হোক, রোমান সংঘ চেয়েছিল রাষ্ট্রকে ধর্মের কাজে লাগাতে ; এরা চাচ্ছেন ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে। ফল ভিন্ন হবার কারণ নেই।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার আদর্শ ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিল হজরত মহম্মদের প্রবর্তিত ইসলামধর্মে। রোমান পদ্ধতি ছিল রাজাকে ধর্মসংঘ ও ধর্মগুরুর শাসনে আনা। আরব পদ্ধতিতে রাজা ও ধর্মগুরু এক লোক। পদ্ধতির ভিন্নতার কারণ ঐতিহাসিক। ক্যাথলিক ধর্মগুরু ও নেতারা তাঁদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন অখৃষ্টান রাজাদের অখৃষ্টান রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে। তত্ত্ব হিসাবে তাঁদের বলতে হয়েছে তাঁদের ধর্মরাজ্য এ পৃথিবীর নয়, লোকাতীত স্বর্গলোকের, সেইজন্যই পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের উপর তার আধিপত্য। ইসলামরাষ্ট্র আরম্ভ হয়েছিল ইসলামধর্মের দিগ্‌বিজয়ে। সত্যধর্ম প্রচারের জন্যই রাজ্যজয়। পুরাতন রাজব্যবস্থা লোপ করে ইসলামরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ একাধারে ছিলেন ইসলামের ধর্মগুরু, ইসলামসেনার সেনাপতি, ইসলাম-রাষ্ট্রের রাজা। ধর্ম-অভিযানের উত্তেজনার পিছনে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক প্রেরণা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সত্যধর্ম প্রচারের আবেগও ছিল প্রকট ও প্রবল। মহম্মদের মৃত্যুর পরও এই প্রথম বেগ যতদিন অব্যাহত ছিল নেতার ত্রিনেতৃত্বও ততদিন ছিল বাস্তব সত্য। কালক্রমে যখন ভাটা এল তখন স্বভাবতই এই একনেতৃত্ব হয়েছিল প্রাণহীন অবাস্তব ; তবুও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তির অনস্বীকার্য তত্ত্বরূপে টিকে থাকলো। ফলে মুসলমান জনসাধারণের রাষ্ট্র যে মুসলিম ধর্মসমাজের সঙ্গে একাঙ্গ মুসলমান রাষ্ট্রের রাজবিধি চলবে মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও আচারের পথ ধরে, এ ধারণার মূল বিচলিত হয় নি। মুসলমান রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসে দেখা যায় যে-যুগে ওর কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ সর্বমানবীয় সভ্যতার ধারায় স্মরণীয় কিছু করেছে সে-যুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের একাঙ্গতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল শিথিল। যে যুগে বিশুদ্ধ সনাতনত্বের নামে ওদের সম্বন্ধকে অচ্ছেদ্য করার চেষ্টা হয়েছে সে-যুগে রাষ্ট্র নিজেকে ও অন্যকে শুধু পীড়ন করেছে ; সভ্যতার ভাণ্ডারে শূন্য অঙ্কের বেশি কিছু দান করতে পারে নি।

৪

বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হতে পারে গান্ধীজি যে রামরাজ্যের কথা বলেছেন তা এই ক্যাথলিক ও মুসলিম আদর্শের সগোত্র। একটু সাবধানে দেখলেই সে দৃষ্টিবিভ্রম দূর হয়, ভুল ধরা পড়ে। ধর্মের অনুশাসনে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের খৃষ্টান কি মুসলমান আদর্শে ধর্ম কতকগুলি বিশেষ বিশ্বাস ও তার অনুবর্তী আচারের সঙ্গে প্রকাশ্য ও নিগূঢ় যোগে যুক্ত। সে বিশ্বাস ও আচারে যাদের আস্থা নেই রাষ্ট্রের ভিতরে থেকেও তারা থাকবে বাইরের লোক। ধর্মের নির্দেশ তাদের অন্তরের বাণী না হয়ে হবে বাহ্যিক বাধানিষেধের কাঁটাবেড়া। এ কাঠামোর মধ্যে উদার মুক্ত মানবতাকে দাঁড় করানো যায় না; দার্শনিক তত্ত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ঠেকা দিয়েও নয়। বেশি টানাটানিতে কাঠামোই ভেঙে যাবে, যা থাকবে তাতে খৃষ্টত্ব ও মুসলিমত্বের অবশেষ পাওয়া যাবে না। গান্ধীজি রাষ্ট্রব্যাপারে যে ধর্মের কথা বলেছেন সে হচ্ছে বিশেষ ধর্মবিশ্বাসনিরপেক্ষ চারিত্রিক আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলেছেন, সকল ধর্মবিশ্বাসকে সমান ভক্তি করতে। তার এক অর্থ প্রতি ধর্মমতের যা একান্তিক বিশেষ তাকে অবান্তর জ্ঞানে তাদের মধ্যে যে সর্বধর্মসাধারণ আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা নিহিত আছে তাকেই ধর্ম মনে করা। এতে ধর্মবিশেষের কোনো বিশেষত্ব থাকে না। সেইজন্য গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনাসভায় যখন কোরাণ থেকে বচন পড়িয়েছেন তখন অনেক মুসলমান তাতে খুশি হন নি এবং অনেক হিন্দু আপত্তি তুলেছেন। ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক বস্তু নয়। যাঁরা ধর্মবিশেষের নিষ্ঠাবান ধার্মিক তাঁরা আধ্যাত্মিকতাকে নমস্কার করেন, কিন্তু ধর্মের আচার-বিশ্বাসময় দেহকেই ধর্ম বলে মানেন।

যে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমাজের আদর্শকে গান্ধীজি রামরাজ্য বলেছেন সে আধ্যাত্মিকতা সাধকের আত্মোপলব্ধির আধ্যাত্মিকতা নয়। ঊর্ধ্ব থেকে দৈবশক্তির অবতারণে অতি-মানুষের আধ্যাত্মিক সমাজের যে কল্পনা, সে আধ্যাত্মিকতাও নয়। পরিচিত সমাজের সাধারণ মানুষকে নিয়ে গান্ধীজির চেষ্টা ও চিন্তা। এই মানুষের জীবন ও চরিত্রের এক আদর্শ গান্ধীজির মনে ছিল। তাঁর সকল কাজের চরম লক্ষ্য মানুষকে এই আদর্শে পৌঁছে দেওয়া। রাষ্ট্রের বিধি, সমাজের গড়ন, ধন উৎপাদন ও বণ্টনের কৌশল এই লক্ষ্যের পথকে সুগম করার ও চারিত্রিক আদর্শকে স্থায়ী করার উপায়। শিক্ষার লক্ষ্য এই চরিত্র গড়া। সেইজন্য উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রভেদকল্পনা গান্ধীজি করেন নি। যে কাজের ধারা চরিত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ন করে, শীঘ্র ও সহজে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগ্রহে সে উপায়ের উপদেশ তিনি কখনো করতেন না। এ ছিল তাঁর কাছে বিষের মতন পরিত্যাজ্য। সিদ্ধির মহত্ত্ব সাধনের উপায়কে শোধন করবে তাঁর কাছে এ কথার অর্থ ছিল না। কারণ, সিদ্ধি বাইরের কোনো কিছুর লাভ নয়। মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলাই সকল সাধনার সিদ্ধি। যা উপায় তার চেষ্টাই এ চরিত্র গড়ে। উপায়ের প্রত্যেক পদক্ষেপ কেবল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নেয় না, উপায়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যকে লাভ করে।

গান্ধীজি মানুষের যে আদর্শচরিত্রের কল্পনা করেছেন তার মধ্যে জটিলতা নেই। মানুষের মনে থাকবে মৈত্রী সকল মানুষের উপর। সেইজন্য সে হবে অহিংস ও অক্রোধ। তার জীবনযাত্রা

হবে সরল, উপকরণবাহুল্যশূন্য; অন্যের শ্রমের উপর যত সম্ভব কম যাতে নির্ভর করতে হয়। নিজের শরীরযাত্রার অনেক উপাদান সে নিজেই তৈরি করবে, কারণ প্রতিদান না দিয়ে পরের শ্রমের ফল সে আত্মসাৎ করবে না। যে জন্য সে হবে নিরলস। সমাজ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জটিলতায় এই দান-প্রতিদানের পরিমাণের তুলনা করা দুরূহ। সেজন্য ও ব্যবস্থাকে সরল করার প্রয়োজন, নিজের অল্পের বিনিময়ে অপরের অনেক যাতে আত্মসাৎ না করতে হয়। মানুষ হবে সত্যাগ্রহী; অসত্য ও অন্যায় সে আশ্রয় করবে না, নিজের স্বার্থে কি দশের স্বার্থে। অন্যের অসত্য ও অন্যায় আচারও সহ্য করবে না, ভয়ে কি উপেক্ষায়; নির্ভীক বীর্যে তার প্রতিরোধ করবে। সমাজের শত্রুজ্ঞানে ক্রোধে আঘাত দিয়ে নয়; সে আচারের সঙ্গে অসহযোগ করে, মৈত্রীতে ক্রুদ্ধের ক্রোধকে জয় করে, অলোভে লোভীর লোভকে লজ্জা দিয়ে; প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণকে বিসর্জন ক'রে। এমন চরিত্রের মানুষের সমাজেই সাম্য আসতে পারে; যে সমাজে হিংসা ক্রোধ অসূয়া নেই। কেবল ধনের উৎপাদন ও বাটোয়ারার কৌশলে সে সাম্য লভ্য নয়।

মৃদুনি কুসুমাদপি তবুও বজ্রাদপি কঠোর এ মনকে কবি কল্পনা করেছেন লোকোত্তর মহাপুরুষদের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র বলে। গান্ধীজি একে কল্পনা করেছেন সাধারণ মানুষের চরিত্রের আদর্শরূপে। সাধারণ মানুষের জীবনে এ আদর্শ বাস্তব হবে কোন্ উপায়ে? মানবসমাজের ক্রমবিকাশে ভরসা রেখে সুদূর ভবিষ্যবংশীয়দের জীবনে এর বাস্তবতা-কল্পনা নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর চিন্তাভঙ্গি, কর্মীর মনোভাব নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে এই চরিত্র বিকাশের জন্য তাকে আবাল্য বিশেষ শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে রাখার উপদেশও গান্ধীজি করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে গান্ধীজি লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে উপযুক্ত ডাকেও তা সাড়া দেবে না। মানুষের এই মৌলিক মহত্ত্ব স্বার্থের তুচ্ছতায়, ঈর্ষাদ্বেষের জড়তায় আচ্ছন্ন থাকে। ডাকের মত ডাক শুনলেই সমস্ত হীনতা কাটিয়ে সে জেগে ওঠে, মানুষের মহৎ চরিত্র অম্লান ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ হয়। সাধারণ মানুষকে আদর্শ-চরিত্রে প্রতিষ্ঠার গান্ধীজির এই পন্থা। কর্মের যাত্রাপথে এ ডাক গান্ধীজি অনেকবার দিয়েছেন। যাদের ডেকেছেন কখনো তারা অদ্ভুত সাড়া দিয়েছে; লোকে বলেছে অলৌকিক ঘটনা ঘটল। কখনো তারা সাড়া দেয় নি। যখন সাড়া পেয়েছেন তখন বলেছেন, মানুষের মনুষ্যত্বের গুণ; যখন সাড়া আসে নি মহাত্মা বলেছেন তাঁর নিজের দোষ; যে মনে তিনি ডেকেছেন তার বিশুদ্ধিতে খাদ ছিল। মানুষের উপর মহাপুরুষের এই মহাবিশ্বাস হল সেই শক্তি যে শক্তি পর্বতের স্থাণুত্বকে বিচলিত করে। মনুষ্যত্বের যেখানে জয় হয়েছে ইতিহাসের গভীরে ছিল এই শক্তির ব্যঞ্জনা।

৫

মানুষের প্রকৃতিতে বড়-ছোট ভালো-মন্দের দ্বৈত এমন প্রকট যে প্রাচীন কাল থেকে তত্ত্বজ্ঞেরা নানা রূপকে এ তথ্যকে বর্ণনা করেছেন— দেবাসুরের সংগ্রাম, আলো-অন্ধকারের বিরোধ, নিত্যানিত্যের দ্বন্দ্ব। নিজের প্রবৃত্তির অন্তরের উপর শুভকে জয়ী করার নানা কৌশল ও পথ জ্ঞানীরা উপদেশ করেছেন। একজন জ্ঞানী বলেছেন, বুদ্ধির বিশ্লেষণে শুভ ও অশুভের স্বরূপের জ্ঞান হলেই মানুষ অশুভকে দমন ক'রে চিন্তায় ও চরিত্রে শুভকে প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং শুভের সাধনা এই বিবেক-জ্ঞানের সাধনা। অন্য

জ্ঞানীরা বলেছেন, এ উপদেশের ভিত্তি মানুষের মূল প্রকৃতির এক ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম কি তা জানলেই মানুষের তাতে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম কি তা জানে তবুও তা থেকে নিবৃত্তি নেই। তার হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যে পথে চালান সে সেই পথে চলে। প্রাচীনেরা বলেছেন সে হচ্ছে ভগবৎকৃপা, যা না হলে স্বভাব-শুচিতা কিছুতে আসে না। সে কৃপার জন্য একাগ্র ভক্তিতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। নবীনেরা বলেন, মনের অতিগহনে চেতনার অবচেতনে রাগ-বিতৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা-প্রবৃত্তির যে আলোড়ন চলছে সেই হৃদিস্থিত হৃষিকেশ মানুষের প্রকৃতিকে যে আকার দেয় সে সেই আকার নেয়। জন্ম থেকে শৈশবের, জন্মপূর্ব থেকে বংশের পূর্বতনদের অনুভূতি চুইয়ে এই অতলে জমা হয়েছে। বাষ্পের মত এদের পরিচ্ছিন্ন আকার নেই, রুদ্ধ বাষ্পের মতই এদের শক্তি। যেদিকে মানুষকে টানে, সচেতন চেষ্টায় তার ভিন্নমুখে চলা দুরূহ, হয়ত অসম্ভব। বাইরের চাপ, সমাজ ও রাজার ভয়, পরলোকে দুর্গতির আশঙ্কা বাহ্যিক কার্যকলাপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত রাখে, কিন্তু মূল প্রকৃতি অশোধিত থেকে যায়। চাপ ও বিশ্বাস শিথিল হলেই সেই প্রকৃতি চরিত্রে প্রকাশ হয়। অন্যেরা বলেন, মানুষের প্রকৃতির বলবৎ দৃঢ় হীনতার উপর তার মহত্ত্বের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন এই হীনপ্রকৃতিকে নিগ্রহের, যা-কিছু প্রবৃত্তিকে সেই নীচু দিকে টানে তার উপর বৈরাগ্যের অভ্যাস। কিন্তু কেন মানুষ এই নিগ্রহ-বৈরাগ্য-অভ্যাসের কৃচ্ছ্র সাধনায় রত হবে? কষ্টলভ্য শ্রেয়ের আকাঙ্ক্ষায় সহজ রাগপ্রাপ্ত প্রেয়কে ছাড়বে কিসের আকর্ষণে? জ্ঞানীরা বলেছেন, ঐ শ্রেয়ের আকর্ষণে, আর কিছুর নয়। মোট লাভক্ষতি হিসাবের পাটোয়ারিবুদ্ধি মানুষের প্রকৃতিতে বদলায় না, এ লোকের লাভক্ষতিও নয়, পরলোকের লাভক্ষতিও নয়। চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ যখন মানুষকে আকর্ষণ করে ফললাভের লোভে নয়, স্বে মহিম্নি, তখনই মূল প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়; মানুষের প্রকৃতি নবজন্ম লাভ করে দ্বিজত্বে উপনীত হয়। হীনতার আকর্ষণকে জয় করার কৃচ্ছ্রকে আর কৃচ্ছ্র মনে হয় না।

যে উপযুক্ত ডাকে মানুষের অন্তরতর মনুষ্যত্ব সাড়া দেবেই, গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, তা এই চরিত্রের আদর্শের আহ্বান। এ আদর্শ কোন্ পথে মনে পৌঁছলে মনকে নাড়া দেয়, মূল প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে? গান্ধীজি চরিত্রের যে আদর্শ কল্পনা করেছেন তা অচিন্তিতপূর্ব নূতন নয়। কিন্তু এ আদর্শ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে তার চরিত্র পরিবর্তনের যে উপায় তিনি অনুসরণ করেছিলেন তা নূতন। সে উপায় হচ্ছে নিজের জীবনে সে আদর্শচরিত্রকে মূর্ত করা। স্বভাবতই বেশির ভাগ লোক বলবে এর মধ্যে নূতন কিছুই নেই। সকল ধর্ম ও নীতি প্রবর্তক মহাপুরুষেরা এই উপায়ই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের জীবন ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই লোক আকৃষ্ট হয়েছে; তাঁদের ঘিরে শিষ্য-সেবক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়,' 'Imitation of Christ'—এসব এই তথ্যেরই প্রকাশ। তাঁদের উপদেশের যে প্রভাব তার উৎস তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের আকর্ষণী শক্তি। কিন্তু এই মহাপুরুষদের সঙ্গে গান্ধীজির একটা পার্থক্য আছে। যেসব মহাপুরুষ মানুষের জীবনের অন্তঃস্থলে পরিবর্তন এনে তাকে নবজীবন দিতে চেয়েছেন তাঁরা সমাজে, বিশেষ করে রাষ্ট্রে, সে জীবনের প্রকাশকে কখনো বড় মূল্য দেন নি। হয় এদের উপেক্ষা করেছেন, না হয় অপরিহার্য পরিবেশ বলে অল্প কিছুটা স্বীকার করেছেন। অন্তরটাই মূলতত্ত্ব, বাহিরটা অবশ্য আছে কিন্তু তার সঙ্গে যোগ যত কম ততই ভালো। গান্ধীজি তাঁর জীবনে কর্মে ও বাক্যে এ দ্বৈত স্বীকার করেন নি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একক ধ্যানের আসনে মানুষের জীবনাদর্শ তাঁর কল্পিত আদর্শ নয়। এরকম ধ্যানের আসনে তিনি অনেক বসেছেন, হয়ত প্রতিদিন বসতেন। কিন্তু সে উপবেশন মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নেমে এসে দৃঢ়পায়ে দাঁড়াবার প্রস্থানভূমি। মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন তার সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র ও চেহারার বদল ঘটাবে না এমন পরিবর্তনকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। অথচ মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের উপায়মাত্র, এ কথা তিনি নিশ্চয়ই মানতেন না। যেসব মহাপুরুষ মানুষের অন্তরের মহত্ত্বকে তার বাহ্যিক কর্মের চেয়ে অনেক বড় দেখেছেন গান্ধীজি যে তাদের অগোত্র তাতে সন্দেহের অবসর নেই। ধর্মরাজ্যস্থাপয়িতা মহম্মদের সঙ্গে নয়, যে খৃষ্ট বলেছিলেন তাঁর রাজ্য পৃথিবীর নয় তাঁর সঙ্গেই যে গান্ধীজির সাজাত্য অতিক্ষীণদৃষ্টি লোকেরও তা চোখ এড়ায় নি। গান্ধীজি যে মন নিয়ে জন্মেছিলেন সে মন মানুষের ভবদুঃখত্রাতা পরমকারুণিক মহাপুরুষের মন। কিন্তু তাকে তিনি প্রয়োগ ও প্রকাশ করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের ছোটবড় শতকর্মে। তাঁর কল্পিত আদর্শচরিত্রের মানুষ নিজের চরিত্রকে এমনি করেই প্রকাশ ও প্রমাণ করবে সেই আদর্শই গান্ধীজি তাঁর জীবনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সমাজের, বিশেষ রাষ্ট্রের, কর্মীর যে কাজ তা বহু লোকের মধ্যে কাজ ও বহু লোককে নিয়ে কাজ। এই জনসংঘের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ মনের পঙ্কিলতা মেনে নিয়ে তার সঙ্গে আপস করে কাজের সফলতার চেষ্টা অনেক কর্মীর কর্মপন্থা। সেই হচ্ছে তাদের মতে বাস্তব পথ, সফলতার সদুপায়। এ পথের কাদা যে কর্মীদের গায়ে কিছু লাগবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য বেশি ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। গন্তব্য স্থির থাকলেই হল। পথ যেমন হোক, লক্ষ্যে পৌঁছনো নিয়ে কথা। কিছু গুণ ও অনেক দোষে সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়া। তাদের নিয়ে কাজে শুচিবাই পথের বাধা। যে অল্প কর্মী এ আপসে রাজী নন, সাধারণ মানুষের চরিত্রকেই যাঁরা বদলাতে চান, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ মানুষের কল্যাণে তাঁদের কাজের ক্ষেত্র কি না তাতে অনেকের সংশয় আছে। মানুষ তার নিজের স্তরে এঁদের টেনে নামাতে চেষ্টা করবে, যদি না পারে একদিন তাঁদের ছেঁটে ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। গান্ধীজির হত্যার পর ইংরেজ লেখক আলডুস হাক্সলি এ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বার্নার্ড শ রহস্যের আবরণে এই কথাই বলেছেন, 'দেখ, বেশি ভালো হওয়ার কি বিপদ।' গান্ধীজি অবশ্য বলতেন, মর্তকে যা অমর্ত না করে সে অমৃত দিয়ে তিনি কি করবেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে যখন গান্ধীজির পথ ও মতের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, রাষ্ট্রকর্মে মহাত্মার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন 'মেজরিটি'র। রাষ্ট্রনীতিবেত্তার কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংকটের মহাসন্ধিক্ষণে এক মহাত্মাকেই রাষ্ট্রসংগ্রামের নেতা স্বীকার করেছিল। ফল সে পেয়েছে। অন্য ফল যদি থাকে ভোগ করতে হবে। কবি বলেছেন, সৃষ্টির প্রবৃত্তি কেবল শুভকেই জন্ম দেবে, দোষ কিছু মিশে থাকবে না এমন প্রায় দেখা যায় না।

৬

এইজন্য গান্ধীজির চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মের বহুধা বৈচিত্র্যের মধ্যে। তাঁর চরিত্রের ভাব ও শক্তির যা কেন্দ্র— সকল মানুষের উপর বাক্য-কায়-মনে অহিংসা ও মৈত্রী,

বিন্দুমাত্র অসত্য ও অন্যায়কে বৃহৎ কাম্যফললাভের প্রয়োজনেও অস্বীকার— তাঁর বড়-ছোট সকল কাজেই প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম কোন্ পথ নেবে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও পূর্ব থেকে তা প্রায় অনুমান করতে পারতেন না। এর দুই কারণ। তাঁর মনের গভীরে অহিংসা ও সত্যের যে পরশমণি ছিল তার পরীক্ষায় কোন্‌টা সোনা আর কোন্‌টা লোহা প্রমাণ হবে তাঁর শিষ্যেরা তা জানতেন না। কারণ সে পরশমণি তাঁদের মনে ছিল না, থাকার কথা নয়। তাঁরা মহাত্মা গান্ধী নন, অনুসরণকারী মাত্র। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজির কোনো কর্মচেষ্টা কেবল হৃদয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত স্রোতের মত নিজের বেগে নিজের পথ কেটে চলত না, অনন্যসাধারণ এক কর্মকুশলী বুদ্ধি তাঁর উদ্দেশ্যের উপায় উদ্ভাবন করত। বহু কর্মের আরম্ভে তাঁর উপদিষ্ট উপায় বহুজনের সংশয় জাগিয়েছে ; কর্মশেষে তার সফলতা সকলকে বিস্মিত করেছে। ভুল হয় নি তা নয়, কিন্তু অভ্রান্তির তুলনায় তার পরিমাণ সামান্য। আর সে ভুল সর্বপ্রথমে ও অকপটে গান্ধীজিই স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রীয় কর্মে এই বুদ্ধির নৈপুণ্যে অনেকে, বিশেষ ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের ভূতপূর্ব রাজার জাতির অনেক বুদ্ধিমান লোকে, বলেছেন যে গান্ধীজি মূলত ক্ষুরবুদ্ধি পলিটিশ্যান, তার মহাত্মতা বা 'সেণ্টলিনেস্' বহিরঙ্গ— পূর্বদেশের জনসাধারণকে নিজের পলিটিকাল কর্মপন্থায় আকর্ষণের উপায়। যেসকল মহাপুরুষ মানুষের সাংসারিক ব্যাপারে উপদেশ করেন নি তাঁহাদের অনেকের গভীর বাস্তববুদ্ধি প্রসিদ্ধ। বাস্তবে অসম্যক্‌দৃষ্টি শুদ্ধচিত মহাত্মারা ভক্ত ও ধার্মিক হন, মহাপুরুষ হন না। গান্ধীজি একাধারেই সেণ্ট ও পলিটিশ্যান ছিলেন। ওর কোনোটাই বহিরঙ্গ নয়। কেবল তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি মানুষের এমন-সব প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছিলেন সেণ্টরা সচরাচর যা করেন না। আর সে বুদ্ধির অনন্যসাধারণতার মূলে ঐ সেণ্টলিনেস্। যাতে মনের অতিগহনের রাগদ্বেষ সে বুদ্ধিকে বিকৃত কি ম্লান করে না। কোনো মমত্বের টান তার সরল পথকে বেঁকে দেয় না, কোনো মোহের কুয়াশা দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায় না।

৭

সেইজন্য মনে বিস্ময় লাগে আজ যখন গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-সহচরেরা দেশের লোককে ক্রমাগত বলেন, এই কাজের এই পথ, কারণ গান্ধীজির অভিপ্রেত পথ। তিনি বেঁচে থাকলে এই পথের উপদেশই তোমাদের দিতেন। গান্ধীজির কর্মপথের যেগুলি মূলসূত্র তা তাঁর নিকটশিষ্যেরা যেমন জানেন, বাইরের লোকেও তেমনি জানে। তার মধ্যে গুহ্য ও গুরুগম্য কিছু নেই। কিন্তু সেই মূলসূত্রের প্রয়োগে কোনো ব্যাপক ও জটিল রাষ্ট্রকর্মের পথ গান্ধীজির অলৌকিক মৈত্রী ও অনাবিল বুদ্ধিবিশুদ্ধ মনে যা উদয় হয়েছে তাঁর শিষ্যদেরও ঠিক তাই হয়েছে গান্ধীজির জীবনকালে এমন ঘটনা ঘটে নি। পথ তিনিই আবিষ্কার করতেন, নির্দেশ তিনিই দিতেন। শিষ্য-সেবকরা তা শিরোধার্য করতেন, প্রচার করতেন, অনুসরণ করতেন ; অনেকে বুঝে, অনেকে না বুঝে। তাঁর মতামতকে যে তাঁর শিষ্যেরা বিনাবিচারে মেনে নিচ্ছেন সেসম্বন্ধে গান্ধীজি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এর বিরুদ্ধে তিনি উপদেশ অনেক দিয়েছেন। বিশেষ ফল হয় নি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে সাধারণ ঐতিহাসিক-মানে যাঁরা বড় পলিটিকাল কর্মী ও নেতা তাঁরাও অসম্ভব খাটো হয়ে যেতেন, অন্যের চোখে ও নিজের মনে। কারণ গান্ধীজি ঐতিহাসিক-মানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পলিটিকাল নেতা ছিলেন না। জন-গণ-মনের উপর তাঁর যে অধিকার তার মূল হিমালয়ের

মত তার চারিত্রিক মহত্ত্ব, আকাশের মত তাঁর উদার মন। যাতে দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলেই মর্মে জেনেছে এরকম মানুষ মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা দেয়; এবং রাষ্ট্রিক ইতিহাসে কখনও দেখা দেয় নি। গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর সেই চরিত্র ও মন তাঁর শিষ্যেরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন এ কল্পনায় মনে ভরসা আসে, কিন্তু তার কারণ ও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। গান্ধীজির যেসব শিষ্য নিজের মত ও পথকে গান্ধীজির মত ও পথ ভাবছেন খুব সম্ভব নিজের মনকে তাঁরা গান্ধীজির মনের উপর আরোপ করছেন— সেই অধ্যাস, মায়া ও মিথ্যাজ্ঞানের যা বীজ।

গান্ধীজির অনেক শিষ্যের এ ভুলের বিশেষ কারণও আছে। যাঁরা মহাপুরুষের জীবনকালে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিষ্য হন ও সান্নিধ্য পান তাঁদের অনেকে গুরুর বাহ্য আচার ও রীতির অনুসরণ করেন দেখা যায়। এর কতকটা ভক্তির বাহ্য অভিব্যক্তির আবেগ, কতকটা বাহ্যিক অনুকরণে অন্তরটাও গুরুর অন্তঃকরণের কতক গড়ন পাবে এই বিশ্বাস। গান্ধীজির খদ্দরের খাটো বহির্বাস, তাঁর আহারের সংযম ও আহার্যের অনন্যসাধারণতা, চরকায় নিয়মিত সুতো কাটা, নিরলস সরল দৈনন্দিন জীবনযাপন, নানা উদ্দেশ্যে ও উপলক্ষে উপবাস, নিজের গৃহ ব'লে কিছু না রেখে আশ্রমিক জীবন গ্রহণ, বস্তুর উপর ব্যক্তিস্বত্ব ও স্বামিত্ব যেখানে আসে লোপের সীমারেখায়—এসব বৈশিষ্ট্য অতিসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর দুটো-একটার অনুকরণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকে বাহ্যজীবনে অসাধারণ হয়। আর গান্ধীজির এসব আচরণ বাহ্যিক নয়। তাঁর অন্তরের যা সব গভীর অনুভূতি ও প্রিয়তম আদর্শ তাদেরই স্বাভাবিক বহিপ্রর্কাশ। গান্ধীজির অনুকারী শিষ্যেরা যদি মনে করেন যে এই অনুকরণে তাঁরা গান্ধীজির চরিত্রের মহত্ত্ব অনেকটা আয়ত্ত করেছেন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষ যে অহিংসা ও মৈত্রীর কথা গান্ধীজি সকল সময়ে বলতেন তার বাচনিক পুনরুক্তি, এমন কি কায়িক পালন, বিশেষ কঠিন নয়। এতে কুশলী যেসব শিষ্য মনে করেন গান্ধীজির মনের অহিংসা ও মৈত্রী তাঁরা নিজের মনে পেয়েছেন তাঁরা হয়ত মায়াগ্রস্ত, সজ্ঞানে মিথ্যাচারী নন। যদিও প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে পৌছনোর পথ খাড়া নীচু ও পিচ্ছিল। কারণ ভুল ভাঙলেও ভোল ছাড়া অনেক সাধুর পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়।

৮

বিদেশীর অধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি হতে না হতেই গান্ধীজির মৃত্যুতে দেশে যে হতাশা ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বড় কারণ রয়েছে গান্ধীজি ও তাঁর নিকট শিষ্যদের মন ও চরিত্রের বিরাট পার্থক্যের মধ্যে। ইংরেজের হাতে থেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসন সহজেই এসেছে সেই প্রতিষ্ঠানের হাতে যেখানে গান্ধীজির প্রধান শিষ্যদের অবাধ কর্তৃত্ব। সে কর্তৃত্বের মূলে গান্ধীজির উপর দেশের লোকের সীমাহীন আস্থা। সেই আস্থা সঞ্চারিত হয়েছে ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর, যা ছিল গান্ধীজির নানা কাজের শক্তিসঞ্চয়ের আধার ও শক্তিপ্রবাহের প্রণালী। শতাব্দীর চতুর্থাংশ সে যন্ত্রের তিনি ছিলেন প্রধান যন্ত্রী। দেশের লোকে আশা করেছিল যে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনে ও গড়নে গান্ধীজির মনের ও কাজের ছাপ থাকবে যাতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নিদারুণতা ও ভারতবিভাগের বিভীষিকার মধ্যেও লোকে অন্তরে আশ্বাস ও কর্মে উৎসাহ পাবে। তাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। কি আশা? এবং কেন তা পূরণ হয় নি?

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আজ যাঁরা নেতৃস্থানীয়, আধুনিক কি প্রাচীন রাষ্ট্রনেতৃত্বের মাপকাঠির মাপে তাঁরা খাটো নন। পৃথিবীর এক অতি দুঃসময়ে দেশ যখন বহু সমস্যায় পীড়িত ও নানা উৎপাতে বিব্রত তখন অল্পকালের মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রসমস্যার সমাধানে তাঁরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা নিপুণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টেটস্‌ম্যানশিপ্'। কিন্তু দেশ নিঃসংশয়ে ভরসা পায় নি, মন উৎসাহে জ্বলে ওঠে নি— অনেক কালের পরাধীনতার অবসানে যা স্বাভাবিক। সত্য কথা, জ্বলে উঠে স্তিমিত হয়ে এসেছে তেলের অভাবে। লোকে অনুভব করেছে এর মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক আছে। যন্ত্র ঠিক স্বরে বাজছে না। এর প্রধান কারণ নয় যে বহু সমস্যার তাঁরা সমাধান করতে পারেন নি— অন্নবস্ত্র আবাস স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্যা— যা লোকের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর অশিক্ষিত, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নয়। সেজন্য গান্ধীজির শিষ্যদের ভাষণে রামরাজ্যের মনোহারী বর্ণনা শুনেও কেউ মনে করে নি যে, ইংরেজের হাতে থেকে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে দেশের শাসন আসামাত্রই সকল দুঃখকষ্টের অবসান হবে, ধন-ধান্যে-স্বাস্থ্যে দেশ ভরে উঠবে। জনসাধারণের দুর্দশা এদেশে সুপ্রাচীন। স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শ লাগলেই সকল লোহা নিমেষে সোনা হয়ে উঠবে এমন স্বপ্ন কেউ দেখলেও, আশা কেউ করে নি। সুতরাং সে আশাভঙ্গের মনোস্তাপেও দেশ ভুগছে না। দেশের মনকে যা পীড়া দিচ্ছে, তার কর্মোদ্যমের মুখে বিফলতার সেতুবন্ধ বেঁধে সে শক্তিকে যা উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে সে হচ্ছে গান্ধীজির দেশ-শাসক শিষ্যদের দেশের লোকের সঙ্গে অসহযোগ। তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও কর্মনীতির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ নেই। যেমন ছিল না সদ্যঅপগত বিদেশী শাসনের আমলে। দেশের লোকের জন্যই তাঁরা কাজ করছেন, কিন্তু সে কাজের জন্য তাঁদের প্রয়োজন কেবল সৈন্য, পুলিশ, সরকারী আমলা— জনসাধারণের উৎসাহ ও কর্মোদ্যম নয়। তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে 'কো-অপারেশন' করতে তাঁরা অবশ্য দেশের লোককে প্রতিনিয়ত বলছেন। কিন্তু তাঁদের কোন্ 'অপারেশনে' কেমন করে কোথায় কাঁধ লাগাতে হবে দেশের লোক তার হদিস পাচ্ছে না। সুতরাং তাঁদের মনে যা-ই থাক, মুখে তাঁরা যা-ই বলুন, এ 'কো-অপারেশন' দাবির কার্যত অর্থ দাঁড়িয়েছে তাঁদের সকল ব্যবস্থাকে বিনা হাঙ্গামায় পরমহিতকারী বলে মেনে নেওয়া। আর সভায় মিছিলে নেতাদের নামে জয়ধ্বনি তোলা। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকর্মী ভূতপূর্ব ইংরেজ রাজপুরুষদের অভ্যর্থনায় কলাগাছ ও শালুর রাজসংস্করণ।

৯

সবেমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকর্মে ভারতবাসীকে স্বদেশী শাসকদের সঙ্গে 'কো-অপারেশনে' ডাকার মনোভাবের তলায় যে প্রকাণ্ড ফাঁক রয়েছে, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদসৃষ্টিতে তার মারাত্মক গভীরতাই দেশের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। এর অর্থ স্বাধীনতার যে দায় তা সমগ্র দেশবাসীর নয়, শাসকসম্প্রদায়ের। ঊর্ধ্ব থেকে তাঁরা যন্ত্র ঘোরাবেন, ফলভোগ অবশ্য করবে দেশের লোক, সুফল ও কুফল। কিন্তু তারা ভোক্তামাত্র, কর্তা নয়। ঠিক ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থা। কেবল যন্ত্রী ও কর্তার রঙ বদল হয়েছে। গান্ধীজি যখন 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' দাবিকে সফল করার জন্য দেশবাসীকে ডেকেছিলেন তখন বলেন নি, আমার সঙ্গে কি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা—'কো-অপারেট' করো। সে ডাকে

সবাই বুঝেছিল এ কাজ তাদের নিজেদের কাজ, নিজেদের করতে হবে। গান্ধীজি ও কংগ্রেস পথদর্শয়িতা ও যন্ত্র। গান্ধীজির সকল ডাক ছিল এই রকম ডাক। সহযোগিতা করতে ডাকার মধ্যে যে ডাকে ও যাদের ডাকা হয় তাদের মধ্যে যে ভেদরেখা থাকে সে ভেদরেখা গান্ধীজি কখনো টানেন নি। অভিনব সব পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন ও তাতে যাত্রা করেছেন দেশবাসীকে সেই পথে চলার পথ দেখিয়ে। এ কথা ঠিক যে বিদেশীর হাতে থেকে স্বাধীনতা কাড়তে দেশের জনসাধারণের যে কাজ ও তার যা উপায় স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের শাসনে ও গড়নে জনসাধারণের কাজ ও রীতি তার সঙ্গে এক হতে পারে না। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, ভারতবর্ষের মত পিছিয়ে-পড়া দেশ, অপুষ্টি-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা-পীড়িত জনসাধারণের দেশ ও স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণে দেশাত্ম-অনুভূতিশূন্য জনগণের দেশ— এ দেশের রাষ্ট্রশাসন পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে এক হতে পারে না। শতাব্দীর পথ আমাদের চলতে হবে বছরে। শাসনকলের মসৃণ চাকা যত নির্ভুল ও যত জোরে ঘুরুক সে গতির শক্তি জন্মায় না। সে শক্তির একমাত্র উৎস জনসাধারণের আশা ও উৎসাহ। ইংলণ্ডের মত দেশকে নকলের চেষ্টায় লাভ নেই। সেখানে বহুদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমবিকাশে দেশের কর্মশক্তির বড় অংশের প্রবাহ চলে রাজ-শাসনের প্রণালী দিয়ে। দেশের লোক তাতেই অভ্যস্ত। আর সকলেই জানে সে শক্তির সাফল্যের পথে কোনো বাধা দাঁড়াতে পারবে না; বিরুদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থের বাধা, সরকারী আমলাদের শৈথিল্য অক্ষমতা দুর্লোভের বাধা। রাষ্ট্রশাসন কঠোর নির্মম হাতে সকল বাধা চূর্ণ করবে। এমন বাধার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি যেমন প্রখর, তার মতামতের প্রতাপ তেমনি প্রবল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনোভাব গড়ে উঠেছে সেই পরিবেশে। অত্যন্ত প্রলোভনেও সে শক্তিকে বাধা দেওয়া কি এড়িয়ে যাবার কথা সচরাচর কারও মনে হয় না। বহুদিনের সাধনায় এ সিদ্ধি। সুতরাং শাসনযন্ত্রের বোতাম টিপলে ইংলণ্ডে যে কাজ হবে, ও কলের চাবি ঘুরিয়ে আজকের ভারতবর্ষেও সমান ফললাভ হবে, এটা অক্ষমতার আত্মপ্রতারণা, দাম না দিয়ে বস্তু লাভের দিবাস্বপ্ন। তা যে হয় না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিমধ্যেই দেশের লোক ও দেশের শাসকেরা পেয়েছেন। ইংলণ্ডের মত দেশে দেশের শাসন ও দেশের গড়নের মধ্যে প্রায় অনন্যভাব। সেজন্য আকস্মিক বিপৎপাত কি অসাধারণ প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া ওদেশে আধুনিক সভ্যসমাজের বিপুলায়তন নিত্যনৈমিত্তিক শাসন ও গড়নের সুষ্ঠু সমাধার জন্য জনসাধারণের কর্মোৎসাহকে রাষ্ট্রের শাসকদের চেষ্টা করে জাগিয়ে তুলতে ও জাগিয়ে রাখতে হয় না। সে শক্তির সঞ্চয় ও সক্রিয়তা স্বভাবতই দেশের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যে দেশের সে অবস্থা নয় সে অনগ্রসর দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শাসনের চেয়ে গড়নের কাজ অনেক বড় ও অনেক বেশি। তার জন্য জনগণের উৎসাহ ও শক্তির উদ্বোধন করতে হয় সজীব আশার মন্ত্রে। যে আশাকে কর্ম দিয়ে বাস্তবে গড়া যায়; অলস কল্পনার আত্মতুষ্ট বাচনের ফুলঝুরি নয়। উদ্বোধিত শক্তিকে সংহত করতে হয় বিশেষ কর্মে তাকে প্রয়োগের ব্যবস্থায়। উৎসাহকে জাগিয়ে রাখতে হয় সে কর্মের ক্রম-সফলতার চাক্ষুষ প্রমাণে। শাসনের কারখানায় আমলাতন্ত্রের মজুরিতে এ কাজ সম্ভব নয়।

১০

এর আধুনিক দৃষ্টান্ত রয়েছে বলশেভিক বিপ্লবোত্তর রুশীয় রাষ্ট্রে। বলশেভিক রাষ্ট্রনেতারা হাতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড জনসংঘ, আর ঠিক ভারতবর্ষের মতই অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন শিক্ষাহীন রাষ্ট্রবুদ্ধিশূন্য সে জনসমাজ। এ দেশকে যখন তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন নিজেদের আদর্শমত উন্নত দেশে এবং অল্পকালের মধ্যে, তখন তাঁরা শাসনের চাকার সাধারণ গতিতে সন্তুষ্ট থাকেন নি, আর সরকারী আমলাদের কর্মকুশলতার উপর ভরসা রাখেন নি। তাঁরা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দলের উৎসাহী সভ্যদের যারা দেশের লোককে দুর্দশামুক্তির আশা দিয়েছে, মনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে, সঙ্গে কাজ করে কাজের পথ দেখিয়েছে। প্রপাগাণ্ডা-প্রভাবে যাদের মনে ধারণা হয়েছে এসব ভুয়ো, বলশেভিক দলের লোকেরা রুশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আনে নি, এনেছে ত্রাস, চাবুক উঁচিয়ে রুজিবন্ধের বিভীষিকায় কাজ আদায় করেছে, ক্রীতদাসের কাজ যেমন করে আদায় করে, কার্য-কারণের কাণ্ডজ্ঞান তাদের কম। আর সব ছেড়ে দিলেও যে জার্মানির শক্তির সম্মুখে আধুনিক সভ্যতায় সুপ্রাচীন, জ্ঞানবিজ্ঞানে ধনেবলে সমৃদ্ধ পশ্চিম-ইউরোপ এক বছরও খাড়া থাকতে পারে নি সে দেশকে আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে পরাস্ত করতে যে আয়োজন ও মনোবলের প্রয়োজন ক্রীতদাসের শ্রমে তা গড়ে তোলা যায় না। কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণের দেশে আধুনিক সভ্যজগতের বিদ্যার প্রথম পাঠকে ভয় দেখিয়ে সর্বজনীন করা যায় না। এই বলশেভিক দলের লোকেরা দেশের নানাশ্রেণীকে পীড়ন করেছে সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেক শ্রেণীর, অনেক মনোভাবের লোকদের উচ্ছেদ করেছে, বলশেভিক নেতাদের আদেশে ও শাসনশক্তির সাহায্যে। রাষ্ট্রনেতারা এই উচ্ছেদ-পর্বকে মনে করেছিলেন তাঁদের কল্পিত আদর্শসমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার অলঙ্ঘ্য উপায়, ধর্মরাজ্যের শান্তিপর্বে পৌঁছবার সোজা পথ। মার্কিন দেশের আদি উপনিবেশীরা যে-প্রয়োজনবোধে সে দেশের আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ করেছিল। দেশের বেশির ভাগ লোকের মন এ অত্যাচারের বিরুদ্ধ ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। এ অত্যাচার সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে রাষ্ট্রের অত্যাচার। এ নিষ্ঠুরতার চরম ফল কি হবে, দেশের লোকের ও নেতাদের মনে সর্বনাশের বীজ এতে রোপণ হল কি না, আর ব্যবহারিক চোখে কোনো কুফল যদি প্রকট না-ও হয় এ নিষ্ঠুরতা নিজেই নিজেকে ধিক্কৃত করেছে কি না— এসব প্রশ্ন অবান্তর। বলশেভিক নেতারা দেশের সামনে সমাজ ও রাষ্ট্রের যে আদর্শ ও উপায় উপস্থিত করেছেন তাতে রুশিয়ার লোকচরিত্র কি গড়ন নেবে, শোভন না কুৎসিত, সে তর্কও অপ্রাসঙ্গিক। অনগ্রসর দেশকে যে-কোনো আদর্শের দিকে এগিয়ে নিতে সে দেশের শিথিল-শক্তিমন জনসাধারণকে যে উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, আর তার যা অপরিহার্য উপায় আধুনিক রুশিয়া তার দৃষ্টান্ত। যে দেশের রাষ্ট্রনেতারা এ চেষ্টায় ব্রতী হতে চান ও সে চেষ্টাকে সফল করতে চান সে দৃষ্টান্ত তাদের অনুসরণ করতে হবে।

ইংরেজের হাতে থেকে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছিল তখন বলশেভিক দলের অনুরূপ একটি দল তাঁদের পাশে ছিল, তাঁদেরই সহচর-অনুচর কংগ্রেসের কর্মীর দল। গান্ধীজি প্রস্তাব করেছিলেন দেশের শাসন থেকে তার গড়নের কাজ যতটা সম্ভব তফাত করা

হোক। যে কাজ দেশের জনসাধারণের হাত না লাগলে অচল, এবং যে কাজে হাত না লাগালে জনসাধারণের শরীরমনে মানুষ হয়ে ওঠার পথ অচল, সে কাজকে রাখা হোক বহু পরিমাণে শাসনযন্ত্রের শক্তিচক্রের বাইরে। আর সে কাজের ভার নিক কংগ্রেসের কর্মীর দল। দেশময় তারা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের লোককে আশা দিতে, তাদের মনে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা আনতে, কাজের সাথী হয়ে কাজের পথ দেখাতে ও উৎসাহ জাগাতে। কিন্তু তাদের পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি থাকবে না, যেমন ছিল রুশিয়ায়। দেশবাসীকে তাদের কাজে টানতে হবে নিজেদের সেবা দিয়ে। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আস্থার মধ্যেই সঞ্চিত হবে তাদের বল। এ প্রস্তাব গান্ধীজি করেছিলেন সম্ভব দুই কারণে। দেশের কর্মীর হাতে যদি থাকে রাষ্ট্রের বল তবে দেশের লোকের মন অনুকূল করার ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সেই বলে তার হাত দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া অনেক সহজ, আর অনেক তাগিদ তাতে কাজ হয়, যেমন রুশিয়াতে বহু সময় নিশ্চয় হয়েছে। এ প্রলোভন দুর্দম্য। কিন্তু গান্ধীজির কাছে কাজের ফল কাজের প্রধান ফল নয়। সে কাজের ফল মানুষের চরিত্রের উপর কেমন ফলবে সেই বিচার চরম। আর সে বিচারে জবরদস্তির ফল যে ভালো নয়, যে করে আর যে সয় দুজনার উপরেই নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল ব্যবহারিক পক্ষই যদি বিচার করা যায় তবে গান্ধীজির প্রণালীতে কাজের ফল বিলম্বিত কিন্তু তার ভিত্তি যে হয় দৃঢ় ও স্থায়ী তাতেও সন্দেহ করা চলে না। কারণ কাজের শেষেই তা শেষ হয় না। এ প্রণালীর কাজে কর্মীর মনের গড়ন বদল হয়, বহু ভারী কাজের শক্তি ও উৎসাহ যা সঞ্চয় করে রাখতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজি তাঁর শিষ্যদের চিনতেন শিষ্যদের নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর মনে সংশয় ছিল না তাঁর যে-শিষ্যদের হাতে যাবে রাষ্ট্রশাসন, যদি তাদের হাতেই থাকে দেশকে গড়ার ভার, যে গড়ার কাজে উৎসাহ দিয়ে ও পথ দেখিয়ে জনসাধারণের নিজেদেরই প্রবৃত্ত করাতে হবে, তবে শাসনের নীচে গড়ন চাপা পড়বে। শাসনকলের নৈর্ব্যক্তিক চাকা চালাতে তাঁরা এত তদ্গত হবেন যে, জনসাধারণের ব্যক্তিরূপ, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের ছোট সব কথা তাঁদের মনে ঝাপসা হয়ে আসবে। দেশের কর্মী বলতে মনে হবে ঐ কলের মজুর আমলা সম্প্রদায়, যাদের কাছেই প্রকৃত কাজ কিছু আশা করা যায়। ফলে দেশের জনসাধারণের মনেও তাদের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা ফিকে হতে থাকবে। যেসব বৃহৎ গঠনের কাজ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ চেষ্টাতেই সম্ভব তার দিকে এঁরা অবশ্য দৃষ্টি দেবেন। মহাকরণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ কর্মচারী প্রথম মধ্য ও চরম রিপোর্ট রচনা করবে, জমা-খরচের বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ তৈরি হবে, কিন্তু তার বেশির ভাগ রাজদপ্তরের নথির ভার বাড়ানো ছাড়া আর কোনো ফল ফলবে না, যেমন ব্রিটিশ আমলে ফলত না। কারণ কল্পনাকে কাজে ফলিয়ে তোলা কর্মচারীদের দায় নয়; আর বিশেষজ্ঞ হতে হাতেকলমে কাজ করতে জানা, সুতরাং অন্যকে সে কাজ করিয়ে নিতে জানা, দরকার হয় না। রিপোর্ট লেখার কৌশল জানলেই হল। তাতেই তারা অভ্যস্ত। এ আমলা-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে গঠনের কাজ আদায়ে শাসক-শিষ্যদের সামর্থ্য হবে না; কারণ তাঁরাই হবেন এদের করায়ত্ত; অভিজ্ঞতার অভাবে, এবং যে একাগ্র নিষ্ঠা সমস্ত অনভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে এ ব্যাপারে তার অভাবে। কংগ্রেসের যেসকল কর্মী, দেশের স্বাধীনতালাভে দেশের লোককে পথ দেখিয়েছে নিজেদের জীবনে কাজে ও আদর্শে, তাদের উপর কংগ্রেসের নেতাদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের এই রূপ কি ফল

ফলাবে সে সম্বন্ধে গান্ধীজির মনের আশঙ্কা তাঁর জীবনকালেই ফলতে আরম্ভ করেছিল। নেতাদের প্রধান কাজ দেশের শাসন। সে কাজে এই কর্মীদের কোনো প্রকৃত স্থান, সুতরাং ডাক, নেই। কিন্তু নেতাদের হাতেই যখন শাসন তখন সে যন্ত্রে এবং শাসনের আনুষঙ্গিক যে গঠনের কাজে তাঁদের কর্তৃত্ব তার মধ্যে একটু স্থান পাওয়ার লোভ ও চেষ্টা অনেক কংগ্রেসকর্মীকেই আকৃষ্ট করবে। কারণ ও দেশের কাজ পূর্বেকার শুষ্ক দেশসেবা নয়, সরকারী শাসনের রসাল মর্যাদার কাজ। নেতাদের পূর্বাবস্থার অনুচর হওয়াতে সুবিধাও একটু বেশি। এ প্রলোভন হাজারে ক্বচিৎ একজন দমন করতে পারে। বানপ্রস্থের পর এই গার্হস্থ্যে কংগ্রেসকর্মীরা যে পূর্বজীবনের দেশসেবায় ত্যাগের লোকসান নূতন জীবনে উঁচু হারে সুদসমেত পুষিয়ে নেবার কাড়াকাড়িতে দেশের চরিত্র ও দুর্দশাকে ঘনকৃষ্ণ করে তুলছেন ছোট-বড় কংগ্রেস নেতারা সরবে ও সাড়ম্বরে সেজন্য বিলাপ করেছেন। যে অল্পসংখ্যা কংগ্রেসকর্মীদের এই প্রলোভন প্রলুব্ধ করতে পারে নি, তাঁরা আছেন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দিকচক্রবালের বাইরে। নেতারা তাঁদের চেনেন না, এবং তাঁদের সঙ্গে নেতাদের যোগ নেই, কারণ নেতাদের কর্মপথে তাঁরা নিষ্প্রয়োজন। দেশের যে কাজ কেবল তাঁরাই করতে পারতেন নেতৃত্ব ও উৎসাহের অভাবে সে কাজ তাঁদের সম্ভব হচ্ছে না। কর্মীর দারুণ অভাবের দিনে যাঁরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হতে পারতেন তাঁরা বেকার। যে নিশ্চিত কঠিন সমস্যার দিন ছিল অত্যন্ত সহজেই অনুমেয় সে দিনে রাষ্ট্রনেতারা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মীসংঘের কর্মশক্তি থেকে দেশকে ও নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, কাজ দিয়ে ও কাজ করতে না দিয়ে। গান্ধীজি যখন কংগ্রেসের কাঠামো বদ্‌লে সে প্রতিষ্ঠানের শাসন ও সেবাকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন সেটা সাংসারিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে মহান আত্মার আদর্শপ্রীতির খেয়াল নয়। সে প্রস্তাব ছিল মানুষের চরিত্রের ও দেশের বাস্তব অবস্থার অন্তর্দর্শী প্রতিভাবান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের পরিকল্পনা। নূতন অবস্থার নূতন উপায় আবিষ্কার যে প্রতিভার কাজ। অচিন্তিত অভিনবকে গতানুগতিক প্রাচীন কৌশলে আয়ত্তের নিরুদ্বেগ মোহান্ধতা ও মানসিক জড়তা যাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

১১

গান্ধীজির রাষ্ট্রনায়ক শিষ্যেরা এ পথে চলতে ভরসা করেন নি; নিজের হাতে পুরাতনকে ভেঙে নূতনকে গড়তে যে সাহসের প্রয়োজন সে সাহস তাঁদের হয় নি। কারণ বোঝা কঠিন নয়। গান্ধীজির নব মন-কলেবর কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের যে আস্থা ও শ্রদ্ধা তার মূলে ঐ কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কষ্টবরণ, এবং দেশের লোকের প্রতি মৈত্রী ও তাদের সেবায় স্বার্থত্যাগ। রাষ্ট্রশাসন-পরিচালক কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় নেই সেজন্য স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন অধীনতামোচনের জন্য দুঃখবরণ অপ্রয়োজন তখন যদি কংগ্রেসের এক দলের কাজ হয় পূর্বের মত সাক্ষাৎ মৈত্রী ও সেবা, এবং অন্য দলের হাতে থাকে রাষ্ট্রশাসন তবে স্বভাবতই দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা যাবে প্রথম দলের উপর, এবং শাসকদলের উপর সশ্রদ্ধ ও অকুণ্ঠ আনুগত্যের দৈন্যে রাষ্ট্রশাসনের বিরাট ও জটিল গতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর তুলনায় শাসকশ্রেণীর প্রভাব দেশের লোকের মনে ক্রমে কমার আশঙ্কা থাকে, যদি না শাসনের কুশলতায় ও জনসাধারণের

হিতে তার সুস্পষ্ট আন্তরিকতায় অচিরকালেই সেই শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করা যায়। সেইজন্য গান্ধীজির রাষ্ট্রশাসক শিষ্যদের প্রয়োজন তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের অনুকূলে কংগ্রেসের উপর দেশের শ্রদ্ধা ও আস্থা, যে শ্রদ্ধা ও আস্থা কংগ্রেস অর্জন করেছে রাষ্ট্রশাসন কুশলতার ফলে নয়। সেইজন্যই স্বাধীন ভারতবর্ষেও কংগ্রেস দেশের সকল লোকের প্রতিনিধি, আবার রাষ্ট্রক্ষমতালাভে গণতান্ত্রিক ভোটের সময় কংগ্রেস পলিটিকাল দলের একটি দল। এবং এ অসংগতিকে নিজের মনে ও পরের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয় হঠাৎ-উপস্থিত পরিস্থিতি ও তার বিপদসংকুলতার অজুহাত দিয়ে।

গান্ধীজির প্রধান শিষ্যদের নূতন অবস্থার নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কারে এই অক্ষমতা ও প্রয়োগে অসাহসিকতা নির্ভুল প্রমাণ যে গান্ধীজির জীবন ও কর্ম এই শিষ্যদের মনে নবজীবন সঞ্চার করে নি। তাঁদের জীবনে গান্ধীজির জীবনের প্রভাব বাহ্য। কারও মনের গড়ন গান্ধীজির মনের গড়নের প্রায় বিপরীত। তাঁর জীবনকালে তাঁর দেশব্যাপী প্রায় অলৌকিক প্রভাবের কাছে অবশ্য নতিস্বীকার করতে হয়েছে। কোনো বড় ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ অমান্যের সাহস হয় নি। তাঁর প্রতি দেশের বেশির ভাগ লোকের দ্বিধাহীন আনুগত্যের সুযোগও অনেক নিতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর কাজে প্রকাশ হচ্ছে অশোধিত মূল চরিত্রের, তার দোষে তার গুণে। কারও মন অনেকটা গান্ধীজির মনের সধর্মী। কিন্তু চরিত্রে গান্ধীজির দৃঢ়তা ও বুদ্ধিতে তাঁর প্রতিভার অংশের অভাবে সে মনের উপর গান্ধীজির মনের প্রভাব পরিণতি পেয়েছে ভাবাবিষ্ট কল্পনাবিলাসে, মনোমোহন উদার বাক্যে যা নিজেকে চরিতার্থ করে। কাজ চলে গতানুগতিক সংকীর্ণ পথে, যে পথে রাষ্ট্রনেতাদের কাজ চিরকাল চলেছে; যার মধ্যে গান্ধীজির শিষ্যত্বের পরিচয় নেই। কারও মন ও চরিত্র গান্ধীজির মন ও চরিত্রের প্রভাবে উৎসন্নপ্রায় হয়েছে। চোখে পড়ার মত নিজের বৈশিষ্ট্য কিছু অবশেষ নেই। তাঁদের চরম সাফল্যবোধ গান্ধীজির কথা ও কাজের অনুকরণে। উপস্থিত প্রসঙ্গে ও অবস্থায় সে কথা ও কাজ প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক তাঁদের মনে সে বিচারের দুয়ার বন্ধ। গান্ধীজির জীবন ও কর্মের বিশাল বেগবান প্রবাহকে তাঁরা নিজের মনে পরিণত করেছেন কঠিন বরফের জমাট পঙ্‌ক্তিতে; যার পরিচ্ছিন্ন অচল জ্যামিতিক রূপের নকল সম্ভব। গান্ধীজি তাঁর কর্মের গতিপথ কতবার পরিবর্তন করেছেন সেদিকে তাঁরা চোখ দিতে চান না। আর সকল পরিবর্তনের মধ্যে আদর্শের যে ধ্রুবত্ব তার দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে কর্মবিশেষে তাকে প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত হয় না। যদি হত তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা ও মহাপুরুষদের চরিত্র-লেখকেরা হতেন পৃথিবীর বড় সব কর্মী। গান্ধীজির এই শিষ্যেরা গান্ধীসংঘে থেরবাদী। নূতন অবস্থাকে তাঁরা স্বীকার করেন না, নূতন উপায়কে গ্রহণ করেন না।

সংসারে গুরু পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু শিষ্য মেলে অল্প— এ প্রবাদের মৌলিক তথ্য হচ্ছে যে-শিষ্যেরা গুরুর বাক্য ও আচারের অনুকরণে তৃপ্ত তারা উপযুক্ত শিষ্য নয়। শিষ্যত্বের সাধনা গুরুর জীবনের ধারাকে নিজের জীবনে আনার 'পাইপ-লেয়িং'-এর সাধনা নয়। গুরুর জীবনের প্রভাবে শিষ্যের মন ও চরিত্রের শক্তি অর্গলমুক্ত হয়, হয়ত নূতন পথে চলে, যে পথ গুরুর জীবনের পথ নয়— যেমন রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ শিষ্য। কিন্তু সে শক্তি শিষ্যের নিজস্ব শক্তি, গুরুর কাছে ধার করা নয়। তার বেগ ও পরিমাণ নির্ভর করে শিষ্যের জীবনে সে শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডারের আয়তনের উপর। কবি বলেছেন, সূর্যের কিরণে মণি থেকে আলো ঠিকরে পড়ে, মাটির ঢেলা থেকে নয়। প্রদীপের স্পর্শে দীপ

জ্বলে, কিন্তু তেল-সলতে দীপের নিজের। তাদের উপরে নির্ভর করে তার আলোর ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বের কাল।

গান্ধীজির সাক্ষাৎ-শিষ্যদের জীবনে গান্ধীজির চরিত্রের প্রভাবে শক্তির কোনো বিশাল ও বিচিত্র স্ফূর্তি দেখা যায় নি। নূতন ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক সমস্যার সমাধানের তাঁরা এমন নূতন পথ আবিষ্কার করেন নি যার নূতনত্ব ও কুশলতা মনে বিস্ময় ও আনন্দ আনে; সে নূতন পথে গান্ধীজি কখনো না হাঁটলেও তাঁর পায়ের চিহ্ন যেখানে চোখ এড়ায় না। গান্ধীজির স্পর্শে তাঁর শিষ্যদের মন ও চরিত্রে শক্তির পথমুক্তি হয় নি। যদি হয়ে থাকে তবে গান্ধীজির মাপে সে শক্তির পরিমাণ ছিল অতি অল্প।

১২

সেইজন্য গান্ধীজির রাষ্ট্রনেতা-শিষ্যদের রাষ্ট্রীয় কাজ সেখানেই সফল হয়েছে যে কাজে নূতন কল্পনার প্রয়োজন হয় নি। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বহু বিচ্ছিন্ন শিথিল অংশকে কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে তাঁরা কাঠামোর আভ্যন্তরিক গড়নকে সুদৃঢ় করেছেন। সে মিলনের জন্য যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির জনসমষ্টি প্রস্তুত ও উন্মুখ ছিল তাতে এ কাজের সার্থকতা ও কৌশলের মূল্য কিছুমাত্র কমে না। কিন্তু একরাষ্ট্র ভারতবর্ষের দৃঢ়সম্বদ্ধ কাঠামোর কল্পনা পুরাতন। ইংরেজ রাজশাসন সে কল্পনা করেছিল এবং কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে আরম্ভ ক'রে রাজনৈতিক মতপরিবর্তনেই তা থেকে বিরত হয়েছিল। এই দৃঢ় কাঠামোয় রাষ্ট্রের সবল, সুঠাম, কল্যাণমূর্তির প্রতিষ্ঠায় নূতন কল্পনার প্রয়োজন। সে মূর্তি যে রাষ্ট্রনেতাদের ধ্যানেও আছে এ পর্যন্ত তার প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রের কাঠামো রাষ্ট্রের কঙ্কাল। কঙ্কালের মতই দেহের আশ্রয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কঙ্কালকেই রাষ্ট্রের দেহ বলে ভুল করা মারাত্মক। অস্থিবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা এক বিদ্যা নয়।

গান্ধীজির শিষ্যদের পররাষ্ট্রনীতি বাচনিক প্রতিজ্ঞায় মহীয়ান। ভারতবর্ষ এশিয়ার অশ্বেত-জাতির লোকের রাষ্ট্র। শ্বেতজাতির পরাধীনতার দুঃখ সে জানে। তার পররাষ্ট্রনীতি পরপীড়ক শ্বেতরাষ্ট্রগুলির 'ডিপ্লমেসি' হবে না। উদার মানবতার উপর তার প্রতিষ্ঠা। সকল রাষ্ট্রের প্রতি তার মৈত্রী, সকল উৎপীড়িতের সে বন্ধু। এই নীতিকে বাস্তবে যখন মূর্ত করতে হয় তখন দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্রনেতারা হালে, চালে, মৌখিক সৌজন্যে, অপ্রিয় সত্যের অকথনে, প্রিয় অসত্যের ব্যঞ্জনায়, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় রাষ্ট্রের নেতাদের 'ডিপ্লমেসি'র অনুকরণে ব্যস্ত। সে নেতারা বড় কথার ফেনরাশির তলায় ও অশ্বেত চামড়ার নীচে নিজেদের শিষ্য সহাধ্যায়ীর মূর্তি সহজেই দেখতে পান। সুতরাং নিরুদ্বেগ প্রশংসায় তাঁরা অকৃপণ। গান্ধীজির নিজের ও পরের সম্বন্ধে যে অপক্ষপাত সত্যনিষ্ঠা ও সত্যভাষণ তাঁর অনুচরদের লজ্জিত করত, পরের মনে জাগাত অসন্তুষ্ট বিস্ময়— এ নীতিতে তার প্রাণস্পর্শ নেই। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতিতে ইউরামেরিকার রাজনীতিজ্ঞেরা অর্ধনগ্ন ফকিরের ছায়া না দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

গান্ধীজির যেসকল শিষ্যেরা রাষ্ট্রশাসনে স্থান নেন নি, যাকে গান্ধীজির 'গঠনমূলক কাজ' বলে তাতে রত আছেন, তাঁরা গান্ধীজির মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত গান্ধীজি তাঁর জীবনকালে যে পথের

যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে রেখামাত্র প্রসারের কল্পনা করেন নি। অথচ এ কথা স্পষ্ট যে গান্ধীজি অনেক কাজের প্রকার ও পরিমাণের উপদেশ করেছেন, উপায়ের অনেক কৌশলের নির্দেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষের অধীনতার পটভূমিতে। যে কাজ ও উপায়ের সফলতা সে অবস্থায় সম্ভব মনে করেন নি তার উপদেশও করেন নি। অনেক কাজের কোনো উপদেশ দেন নি, সে কাজের প্রয়োজন নেই বলে নয়, তার গুরুত্ব কম বলে নয়, কিন্তু তখন অন্য অনেক কাজে তার উপদেশ ও নির্দেশের প্রয়োজন বেশি মনে করে। কারণ স্বভাবতই তাঁর অনেক কাজ ছিল ভারতবর্ষের অধীনতামুক্তির উপায়ের প্রস্তুতি; যদিও তাঁর কোনো উপায়ের উপদেশ এমন ছিল না লক্ষ্যে পৌছনো ছাড়া যার অন্য ফল নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর গান্ধীজি অল্প দিন বেঁচে ছিলেন। এবং সে অল্প কয়েকদিনও কেটেছে মানুষের আকস্মিক নির্দয় পশুত্বকে তাঁর নিজের উপায়ে প্রতিরোধের চেষ্টায়। এই অস্বাভাবিক আকস্মিকতার প্রশমনের পর গান্ধীজি কিছুকাল বেঁচে থাকলে যে অনেক নূতন কাজ ও পথের সন্ধান দিতেন, পুরাতন কাজ ও পথের সম্প্রসার করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ গান্ধীজির গান্ধীবাদে আস্থা ছিল না, গান্ধীদর্শনে তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। গান্ধীজির মত ও পথের এক অংশ ভারতবর্ষের লোকদের ভারতবর্ষের এক বিশেষ অবস্থায় উপদেশ; অন্য অংশ সকল দেশের ও সর্বকালের। কিন্তু এ সনাতন আত্মাতেও জড়ত্ব আসে যদি না নূতন অবস্থার নূতন দেহে পুনঃপুনঃ তার নবজন্ম হয়। গান্ধীজির শিষ্যদের মধ্যে এ নবজাতকের ধাত্রী কাকেও দেখা যায় না। তাঁরা গান্ধীজির কথা মন্ত্রের মত আবৃত্তি করেন, তাঁর আচার অচল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গান্ধীজির জীবনের আগুনে তাঁদের জীবনে বহুবর্ণের শিখা জ্বলে ওঠে নি। তার মালমশলা ছিল না। যে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি গান্ধীজির একনিষ্ঠ কর্মে বৈচিত্র্যের বিস্ময় আনত শিষ্যদের জীবনে তার স্ফূর্তি নেই। কারণ, এর উত্তরাধিকারিত্ব নেই, কি সন্তানের কি শিষ্যের।

গান্ধীজির জীবনকালের শিষ্যদের কথা যা হোক, এমন আশা দুরাশা নয় যে, গান্ধীজির চরিত-কথা যখন ভবিষ্যবংশীয়দের বিস্মিত কল্পনার বস্তু হবে, যখন তাঁর জীবন সমসাময়িক পরিবেশের স্বল্পতা থেকে মুক্ত হয়ে মহাকালের পটে অঙ্কিত হবে তখন গান্ধীজির উপযুক্ত শিষ্যের আবির্ভাব হবে। যে শিষ্য গান্ধীজির জীবন ও কর্মের বাহ্যিক অনুকরণ করবে না। যার শক্তির প্রাচুর্য ও প্রতিভার সঞ্চয় গান্ধীজির জীবনস্মৃতির স্পর্শে প্রাণের গতিতে বেগবান হবে। মানুষের চরিত্রে মহত্ত্বের নূতন সম্ভাবনা দেখাবে; মানুষের সমাজবন্ধনে মৈত্রীর নূতন ভিত্তি স্থাপন করবে। সে শিষ্যের জীবনে গান্ধীজির জীবনের আশীর্বাদ বর্ষণ হবে। এমন শিষ্যত্বের দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়।

১৩

মানুষের ব্যক্তিত্ব গান্ধীজির চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্য। সমাজনিরপেক্ষ বুনো মানুষের নয়, যোগের আসনে একক তপস্বী মানুষেরও নয়। সমাজের মধ্যে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্বের জন্ম ও বিকাশ হয় সমাজের অন্যসব ব্যক্তির সঙ্গে আদানপ্রদান প্রীতিমমতার সম্পর্কের বন্ধনে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষের বাক্তিত্ব, সমাজের জনসমষ্টির নয়। যে মানুষ সবার উপর সত্য সে মানুষ ব্যক্তিগত মানুষ, মানুষের সমাজ নয়। মহত্ত্ব বক্তির মহত্ত্ব, হীনতা ব্যক্তির হীনতা। ব্যক্তির

মহত্ত্ব হীনতার চিন্তা না করে মহৎ সমাজ গড়ার সম্ভাবনার কল্পনা, কাজকে সহজ করার কল্পনা। তাতে কাজ সহজ হয়, কিন্তু কাজ হয় না। সেইজন্য বহুব্যাপী রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যেও গান্ধীজির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত কেবল চেষ্টার ফলের উপরে নয়, ব্যক্তির মহত্ত্ব-হীনতা বল-দুর্বলতার উপর। এটি একশ্রেণীর মার্ক্সপন্থীর বহুনিন্দিত সমাজসচেতনতার অভাব নয়। সমাজের চরম মঙ্গল ও তার অপরিহার্য উপায়ের সচেতনতা।

ব্যক্তিত্বের উপর গান্ধীজির এই চরম মূল্যের আরোপ বাঙালির কৃষ্টির আদর্শের অন্তরঙ্গ। ঠিক সেই কারণেই গান্ধীজি মানুষের কাম্য চরিত্রের যে কল্পনা করেছেন তার শুষ্ক অসম্পূর্ণতা বাঙালির মনকে পীড়া দিয়েছে। নিকট-আত্মীয়ার তেজোদ্দীপ্ত তপঃশীর্ণা বিধবার মূর্তি মনকে যেমন পীড়া দেয়, কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত— এদের রসজ্ঞতা, জ্ঞানের নিঃস্বার্থ আকর্ষণে উন্মুখতা, জীবনে যে বিচিত্রের আস্বাদ আনে, জীবনকে জৈবিকচক্র থেকে মুক্তির যে আনন্দ দেয়— সে স্বাদ ও আনন্দ গান্ধীজির আদর্শ মানুষের জীবনে নেই। তার চরিত্রের ঋজু দৃঢ়তা, উদার মৈত্রী, সর্বহিতে কর্মের অক্লান্তি— মনকে শ্রদ্ধায় নত করে, প্রীতিতে পূর্ণ করে না। গান্ধীজি যে সাম্য ও মৈত্রীর সমাজ কল্পনা করেছেন তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বে সামাজিক মানুষের এই চরিত্র হল ভিত্তি ও আশ্রয়। কিন্তু সে সমাজে মানুষের এ রূপ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। এ হচ্ছে সৈনিকের বাহুল্যবর্জিত জীবন। যুদ্ধের উন্মাদনায়, আদর্শে পৌঁছবার আকূতিতে এ জীবনে লোকে সাময়িক তুষ্ট থাকে; আর কোনো আকর্ষণ, অন্য কিছুর অভাব সে বোধ করে না। সে উন্মাদনা ও আকূতি শিথিল হলেই এ জীবন আর লোককে তুষ্টি দেয় না। তার শীর্ণতার নিরানন্দ জীবনকে বিরস করে। মানুষের সভ্যতার অহৈতুক আনন্দের যা সব বড় সৃষ্টি জীবনে তার জোগান না থাকলে হালকা আমোদের মত্ততা মানুষের মনকে ছোট ও উচ্ছৃঙ্খল করে। সমাজের ভিত্তি চঞ্চল হয়, গড়নে ফাটল ধরে। এমন মানুষ অবশ্য আছে আদর্শের জন্য সংগ্রামের আকূতি যাদের মনের স্থায়ীভাব। তাদের সংখ্যা কম। সম্ভব মানুষের আদিম সামরিকতা তাদের মনে এই মঙ্গলময় রূপান্তর নিয়েছে।

যে ব্যক্তিত্বকে গান্ধীজি চরম মূল্য দিয়েছেন তার কল্পনা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের কল্পনা। ব্যক্তির মনের ও চরিত্রের বহুমুখিত্ব ও বহুভিন্নমুখিত্বের তাতে স্থান নেই। মূর্তির সুঠাম গড়ন, কিন্তু সকল মূর্তির এক গড়ন। গান্ধীজির চরিত্রকল্পনার মূলে ছিল তাঁর নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা, আর মানুষের মর্যাদার জন্য যে সংগ্রামের পর সংগ্রামে তিনি যৌবন থেকে বার্ধক্যের শেষসীমা পর্যন্ত রত ছিলেন তার অভিনব সংগ্রামরীতির উপযুক্ত সৈনিকের চরিত্রকল্পনা। সে চরিত্র যত শ্রেষ্ঠ হোক, বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল উপকরণের ঐকান্তিকতায় সে প্রয়োজন যতই বড় হোক, এ চরিত্রে যে রিক্ততার দৈন্য আসে, গান্ধীজি কি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না? এমন কল্পনা কি বাস্তব ভিত্তিহীন যে গান্ধীজির জীবনকাল যদি আরও দীর্ঘ হত, আর তাঁর জীবনকালে এ সংগ্রামের তীব্রতা কিছু কমত, তবে গান্ধীজি তাঁর মানুষের আদর্শে আরও উপাদান আনতেন? যে ব্যক্তিত্ব মানুষের জীবনের তাঁর চরম মাপকাঠি সে ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দিতেন? গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে বলতেন গুরুদেব। তাঁর মুখের ডাকেও মৌলিক সম্মান ও সৌজন্য ছাড়া আর কিছু সত্য নেই, এ কথা মনে করার সাহস হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির কিসে গুরুদেব? তাঁদের দু জনার সকল মানুষের উপর মৈত্রী, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসবীর্য তাঁদের মনে গভীর সাজাত্যবোধ

এনেছিল। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির গুরুদেব ছিলেন না। বরং গান্ধীজির চরিত্রে এদের অচল প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজির উপর পরম শ্রদ্ধাশীল করেছিল। এ কল্পনা কি অসংগত যে গান্ধীজি তাঁর আদর্শ-চরিত্রের কল্পনায় যে অসম্পূর্ণতা বোধ করতেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার পূর্ণতা দেখেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল মহাকবি হতেন, কেবল অসাধারণ সাহিত্যিক অসাধারণ কলাস্রষ্টা ও কলারসজ্ঞ হতেন, গান্ধীজি কখনই তাঁকে গুরুদেব বলতেন না। তাঁর চরিত্রের আদর্শে অসীম অনুরাগী, কিন্তু তার রিক্ততা যাঁর জীবনের ও আদর্শের পরিপূর্ণতায় পূর্ণ সেই রবীন্দ্রনাথকেই সম্ভব গান্ধীজি বলেছেন গুরুদেব। এ কল্পনা সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এ দুয়ের সমন্বয়েই সুস্থ ও সবল, সাম্য ও মৈত্রীর আনন্দময় সমাজ গড়তে পারে। এ সমন্বয় কঠিন। মানুষের ও তার সমাজের সকল সমস্যাই কঠিন। কোনো সমাজে এর কথঞ্চিৎপূর্ণ রূপ যখন কখনো দেখা যায় মানুষের স্বভাব-চঞ্চলতা তার নানা শক্তির দুর্ঘট সাম্যকে অচিরকালেই বিপর্যস্ত করে। তবুও যতকাল থাকে মানুষের তা পরম সম্পদ। এর স্থায়িত্বের দৈর্ঘ্যে এর মূল্য নয়। এর স্বপ্নও 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—কাপুরুষের হীনতা ও কঙ্কালের রিক্ততার ভয় থেকে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে।

কার্তিক ১৩৫৬

টাচের কাজ

শ্রীনন্দলাল বসু

টাচের কাজ[১] করা তখনই সম্ভব হয় যখন চিত্রকর করণ-কৌশলে ওস্তাদ হয়েও সব কৌশলের কথা ভুলে যান ; যখন তুলি-চালনার কায়দা যেন তাঁর সহজাত ক্ষমতার মতো, second nature-এর মতো হয়ে যায়। এমন কি, বস্তুর বাহ্যিক রূপের ও গুণের কথাও তিনি ভুলে যান। অর্থাৎ, আঁকবার সময় রূপের গড়নের বা গতির সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে না। তাঁর পক্ষে রূপ করা নয়, রূপ হওয়া। হৃদয়পটে আঁকবার বিষয়টির ধারণা পূর্ণমাত্রায় থাকলে, আঁকবার পটেও ছবিটি নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠবে ; এমন মনে হবে যেন পূর্বাবধি আঁকাই ছিল, একটা কোনো যবনিকা স'রে গিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপের ধারণা দৃঢ় ও সুস্থির হয় কিরূপে ? যেমন একটি গোল বল বা গোল হাঁসুলি, অথবা একটি চৌকো কাগজ বা চৌকো বাক্স— মনের মধ্যে চিন্তা করবার কালে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে না ভেবে একেবারেই, এক মুহূর্তে, পুরোটা ভাবা যায়। নিয়মিত অভ্যাস ও অভিনিবেশের ফলে রূপকল্পনার এরূপ সংহতি, সম্পূর্ণতা ও তড়িৎগতি অন্যান্য বিষয় নিয়েও সম্ভব। আগে থেকে খড়িতে ছ'কে না নিয়ে আল্পনা দেওয়া অভ্যাস করলে, স্বাভাবিক রূপের অথবা মূর্তির বা ছবির কেবলমাত্র তুলি দিয়ে নকল করলে, কখনো বা শুধু রেখা দিয়ে কখনো বা ধূপছায়ার সমাবেশে গড়ন ফুটিয়ে তুলে স্বভাবের মূর্তির বা ছবির প্রতিকৃতি রচনা করলে, অর্থাৎ নানারূপ কাজ ক'রে পেন্সিলে ও বিশেষ ক'রে তুলিতে ভালোরূপ দখল হলে, অতঃপর ভালো টাচের কাজ দেখা উচিত, নকল করা উচিত। তা হলে টাচের কাজে অধিকার জন্মে।

বস্তুর গড়নের ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় না হলে 'টাচের কাজ করব' ব'লে টাচের কাজ করা যায় না। আবার, টাচের কাজের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম অথবা তুলি-চালনার কতকগুলি চিরাচরিত রীতি 'মুখস্থ' ক'রে টাচের কাজে অগ্রসর হলে, সে কাজও বড়ো পাকাটে দেখায়, দর্শকের পীড়াদায়ক হয় এবং রসের দিক থেকে হয় কাঁচা।

অনেকে মনে করতে পারেন, টাচের কাজ করতে গেলে কালী রঙ তুলি নিয়ে নানা কায়দায় শুধু হাত চালাতে শেখা দরকার। তুলির টান-টোনের বিষয়ে অনেক বই'ই আছে; তবু সে দেখে শেখা কখনোই ঠিক নয়, ফল বড়ো ভালো হয় না। ঐভাবে শিখলে, আঁকিয়ের কাজে কায়দাটাই বেশি ক'রে প্রকাশ পায় ; বস্তুর যথাযথ চারিত্র বা গুণ প্রকাশ পায় না। যেমন হয়তো পাহাড়ের ছবি হাল্কা দেখায় স্তূপাকার তুলোর মতো, পালখটা ভারী দেখায় একটুক্‌রা পাথরের মতো, তালগাছের গুঁড়িকে মনে হয় পদ্মের মৃণাল। আসল বস্তুর ভার, স্পর্শ (texture) ও ভাবের অভাব হয়ে পড়ে। ফলে কাজটা অস্বাভাবিক ও কাঁচা হয় ; উপলব্ধির সম্পর্ক না থাকায় কেবল আঁকার কায়দাই দেখা যায়।

---

১ touch ইংরেজি কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করা কঠিন।

টাচের কাজেও ক্যালিগ্রাফি বা লেখাঙ্কনের ধরন আছে ; কিন্তু ভাবযুক্ত হওয়া চাই। যেমন চাকার পিছন-পিছন রেখা পড়ে, চলন্ত জীব বা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া চলে, তেমনি মনের সঙ্গে সঙ্গে তুলি চলা চাই।

শিশুর চলবার ইচ্ছা হলে, বার বার উঠে পড়ে তার কায়দা আপনিই শেখে। চলার দোষ হলেও, পরে তার সংশোধন চলতে পারে।

স্বর মনে না বসলে, বাজিয়ের পক্ষে হাত সাধা বৃথা।

ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা ভাবের পরিচয় হওয়ার পর, স্টাডি বা অনুশীলন করার পর, ভালো টাচের ছবি দেখলে টাচের কাজের কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিতে দেরি হয় না। তখন প্রাচীন বা আধুনিক সেরা কাজের নকল ক'রে হাত মক্স করাও চলতে পারে, তাতে দোষ হয় না।

মোট কথা, টাচের কাজে গোড়াতেই কায়দা দেখানোর লোভ সামলাতে হবে ; ধীরেসুস্থে বস্তুর গড়ন ও গুণ রঙ-তুলিতে আয়ত্ত করতে হবে ; এই ভাবে বস্তুর গড়ন ও গুণের ধারণা দৃঢ় হলে এবং সেই সঙ্গে উপায়-উপকরণের কত দূর সম্ভাবনা ও কোথায় সীমা সেটাও জানা হয়ে গেলে, কখন যে ঠিক-ঠিক টাচের কাজ শুরু হয়ে যাবে তা বোঝাই যাবে না।

মাঝে মাঝে মনঃস্থির ক'রে ব'সে, বেশি বিচার না ক'রে, দ্বিধা না ক'রে, বস্তুর যে রূপ-গুণ শিল্পীর বোধে সহজে প্রতিভাত হচ্ছে তাতেই অভিনিবেশ রেখে, ধৈর্য ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করা চাই। তার ফলে কাজ তাজা ও সহজ হতে থাকবে। টাচের ছবি খারাপ হতে থাকলে আর কাজ করা উচিত নয় ; বুঝতে হবে, তখন মন চঞ্চল রয়েছে। এক কালে বেশি ছবি করার লোভ দমন করতে হবে। সকাল-বেলা, মন যখন শান্ত থাকে, তখনই টাচের কাজ করার উপযুক্ত সময়। কাজে বসবার আগে মনকে কোনো-ক্রমে চঞ্চল হতে দিতে নেই। যদি মন চঞ্চল হয় সে সময় কিছুতেই কাজ আরম্ভ করা উচিত নয়।

কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে বস্তুর রূপগুণের চিন্তা ও ধ্যান ক'রে নিয়ে, ব্যস্ততাশূন্য হয়ে, দ্বিধাশূন্য হয়ে, কাজ করা চাই। তা হলেই আঁকবার বস্তুর গড়ন ও ভাব যতটা প্রয়োজন কাজে আপনিই ফুটে উঠবে।

লক্ষ্যভেদকালে অর্জুনের মতো, লক্ষ্যে স্থির তদ্‌গত হওয়া চাই। এখানে লক্ষ্য বলতে ছবির মূলপ্রেরণা বা রসবস্তু।

টাচের কাজও ভালো, আর ধ'রে ধ'রে গড়নের কাজও ভালো। দেশি বা চীনা বা বিলাতি ছবিতে দু রকমেরই কাজ দেখতে পাওয়া যায়। সকল প্রকার অঙ্কনপদ্ধতিতেই অনেক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রথমে ধীরভাবে বস্তুর গড়নের ও গুণের দিকে দৃষ্টি রেখে, পর্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে, এগোনোই ভালো। এলোপাথাড়ি কায়দা দেখাবার জন্য ব্যস্ত হলে, শিল্পীর কাজ অপরিষ্কার ও দুর্বোধ হয়। ফলে শিল্পীর নিজের দিক থেকেও, কাজে প্রীতি না বেড়ে কমতেই থাকে। মনও বড়ো উচ্ছৃঙ্খল ও বিরক্ত হয়ে পড়ে। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে কাজ বার বার অদল-বদল করতে বা ছেড়ে দিতে হয়, সময়ও অনেক বেশি লাগে। অন্যমনস্ক ভাবে, লোভে প'ড়ে, বিরক্তমনে, কাজ না করাই ভালো। প্রসন্নমনে, আত্মসমাহিত হয়ে, স্থিরাসনে ব'সে, ধীরভাবে আঁকাই সংগত।

প্রথমে শিল্পীর মনে প্রেরণা, তার পরে বিষয়বস্তুর গড়ন গুণ ও বাস্তবতার বোধ, বস্তুর সহিত

একাত্মতা, আঁকার করণ-কৌশলে বা তুলির ব্যবহারে সম্যক্ দক্ষতা-অর্জন— এইগুলি হলে পরে তবেই শিল্পীর রসের প্রেরণা শিল্পে রূপায়িত হবে। টাচে হোক আর ধ'রে ধ'রেই হোক, আঁকার কাজ সহজ (spontaneous) হবে।

ভালো টাচের কাজ হল শিল্পীর উপলব্ধির এক-একটি অখণ্ডসুন্দর মুহূর্ত, সদ্যোপ্রস্ফুটিত ফুলের মতো। ফুল শুকোবার পূর্বেই, তাজা থাকতে থাকতেই, শিল্পলক্ষ্মীর অর্ঘ্যথালায় শিল্পীকে সাজিয়ে দিতে হবে। রসিকের মনে, প্রকৃতির উদ্যান থেকে চয়ন করা জীবন্ত ফুলের স্পর্শের মতো, অমৃতের এক-একটি কণার মতো তার প্রতীতি; বিচার-বিশ্লেষণ-করা কৃত্রিম কল্পনাজল্পনার মতো নয়।

টাচের কাজ হওয়া চাই নিঃশঙ্ক, অব্যর্থ, দ্বিধাহীন ও অভিজাত[২]। শত্রুকে এ যেন অসিহস্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। মরণবাঁচন-খেলা। বীরের সাধনা। ছেলেখেলা বা অলস খেয়াল নয়।

টাচের ছবি আঁকবার সময় শিল্পীর ভাব হবে বাদশাহের মতো; কোনো তাড়া নেই, কারও কাছে কোনো জবাবদিহি নেই। সকলের প্রতি দাক্ষিণ্যের ভাব, মনে কিছু দৈন্য নেই। মন রসে ভরপুর হওয়াতে, টাচের ছবি হবে যেন প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ইশারা; বেশি বলার সময় নেই, প্রবৃত্তি নেই, প্রয়োজনও নেই। একটু ইশারাতেই তো প্রেমাস্পদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় ও মনের কথা নিঃশেষে বলা হয়ে যায়।

২ আভিজাত্যপূর্ণ, অর্থাৎ, যাতে হঠকারিতা নেই, দোষ ঢাকবার চেষ্টা নেই, দক্ষতার ভাণ নেই, দর্শকের মন ভোলাবার প্রয়াস নেই, ঐশ্বর্যের পূর্ণতা-হেতু যা সহজ ও সরল।

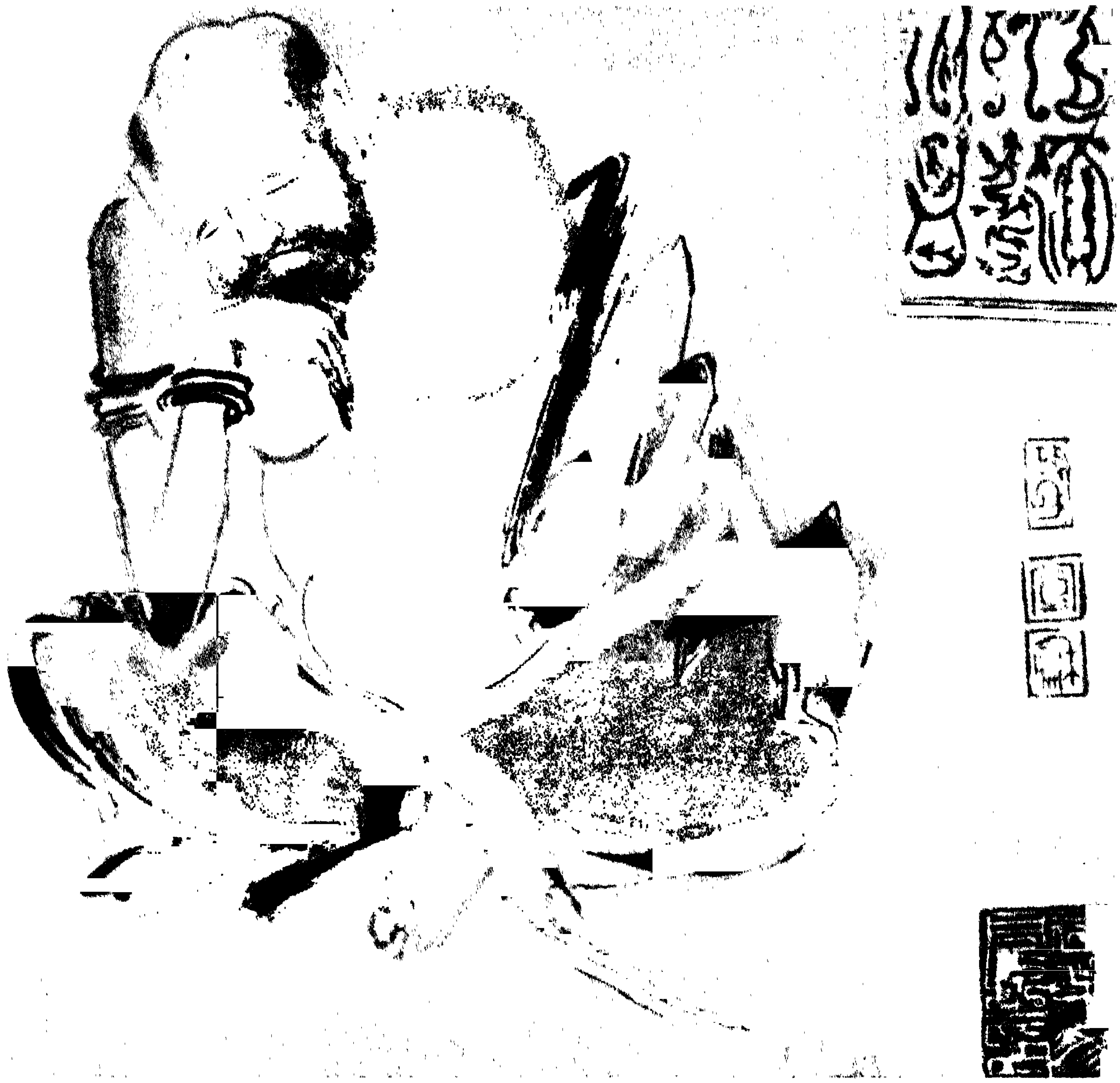

ধ্যানী ভিক্ষু

চীনা চিত্রের ছবি । খ্রীষ্টীয় দশম শতক

চীনের ছবি
৮ ৩

গীত ও স্বরলিপির প্রয়োজনবোধ

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ গদ্য-পদ্য-কথোপকথনের শব্দরূপকে লেখরূপে পরিণত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল সন্দেহ নেই। জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নভাবে মানবসংস্কৃতির উন্মেষ হয়েছে; এবং প্রয়োজনের বশেই তার উৎকর্ষ হয়েছে। মানব-আত্মার কতকগুলি সংস্কার নিত্য বা শাশ্বত। কিন্তু প্রয়োজনের বশেও অনেককিছু অভিনব সংস্কার নির্মাণ ও পোষণ করা সম্ভব হয়েছে। শব্দরূপকে লেখরূপে পরিণত করার ও ধরে রাখার সংস্কার এই দ্বিতীয় কৃত্রিম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গীতও শব্দরূপ। যে কারণে বা যেরূপ কারণে গদ্যপদ্য শব্দরূপকে অক্ষর-চিত্রে পরিণত ও নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়েছে, সেই বা সেরূপ কারণেই গীতরূপকে স্বরলিপিতে পরিণত ও নিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে থাকবে, অনুমান করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংগীতের ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করে উক্তরূপ প্রয়োজন বা প্রয়োজনবোধের দিঙ্‌নির্ণয় করা যায়।

উচ্চারিত শব্দরূপকে স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যবস্থা খুবই স্বাভাবিক। স্মৃতিশক্তি সহজে ও সাধারণভাবে অতীত বিষয়ের প্রবর্তন করে। অতীত বিষয়ের বিশেষ কোনো রূপ গ্রহণ ধারণ ও পুনরুদ্ধারসাধন করে ধৃতি। এবং উদ্ধারকার্যের সময়ে বহু বিভিন্ন শ্রব্য দৃশ্য প্রভৃতি রূপ একসঙ্গে উঠে আসতে পারে। কিন্তু উদ্ধারকারীর প্রয়োজনের বশে মাত্র বিশিষ্ট এক বা বহু রূপের সমঞ্জসভাবে উদ্ধার-সাধন করে মেধা। বহু প্রাচীন কালের ভারতে গুরুশিষ্য-সংবাদ ও শাস্ত্রোপদেশের গ্রহণধারণ বিষয়ে ঐ রকম স্মৃতি ধৃতি ও মেধার চিন্তা হয়েছিল।

সেই সময়ের একদল লোক মনে করতেন, শব্দরূপের মধ্যে যেমন সাধারণ আছে, যথা প্রচলিত কথোপকথন, সেরকম অসাধারণ শক্তিবিশিষ্ট বা প্রভাববিশিষ্ট শব্দরূপও আছে, যেমন মন্ত্র। সাধারণ শব্দ সহজেই মনে থাকে, তবে কিছু বিকৃত হলেও দোষ নেই। কিন্তু অসাধারণ শব্দরূপ বিকৃত হলে অভীপ্সিত ফলপ্রসব করে না; এ কারণে এইসকল শব্দরূপকে স্মৃতিতে যথারূপে ধরে রাখবার জন্য তাঁরা বিচিত্র কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ছন্দঃ ঘণ্টাপাঠ জটাপাঠ প্রভৃতি ব্যাপারগুলির উদ্ভব হয়েছিল ঐরূপ প্রয়োজনের বশে সন্দেহ নেই। অনুমান করা যায়, এই জাতীয় চিন্তা থেকে শব্দরূপকে অক্ষররূপে পরিণত করার ইচ্ছা উদ্ভূত হয় নি, কারণ প্রয়োজনই নেই। বিশেষ এই যে, শব্দরূপকে স্মৃতিতে ধরে রাখলে মাত্র উচ্চারণ করার সময়ে ছাড়া তারা অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু লিখিত রূপ সর্বদাই সকলের প্রত্যক্ষ। এখন যদি মনে করা যায়, অসাধারণ শব্দরূপ প্রত্যক্ষ করায় জনসাধারণের অধিকার নেই এবং সমাজে বিশিষ্ট এক শ্রেণীরই সেরূপ অধিকার আছে, তাহলে এই বিশিষ্ট শ্রেণী কখনোই মন্ত্রগুলিকে দৃশ্য অক্ষররূপে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এককথায় এই শ্রেণীর লোক শব্দের আক্ষরিকলিপিকরণের প্রয়োজন বোধ করে নি; অতএব এঁরা অক্ষরলিপির উদ্ভাবনের দাবি করতে পারেন না।

ঐসকল মন্ত্রজাতীয় শব্দরূপের মধ্যে সুরও ছিল, এবং মন্ত্রগুলি সুর করে উচ্চারণ করা হত, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মন্ত্রশব্দগুলিকে যদি সাধারণ প্রত্যক্ষ থেকে গোপন করে রাখাই অভিপ্রেত হয়, তাহলে সুরগুলিও অনিবার্যভাবে গুপ্ত বা রহস্য থেকে যাওয়ারই কথা এবং এখনও তারা রহস্যই থেকে গিয়েছে। 'রহস্য' শব্দটির অর্থ এই যে, অনধিকারীর সম্মুখে গোপনীয় কিন্তু নিভৃতে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যই আলোচ্য। প্রাচীন ভারতের বেদানুবর্তী শিক্ষাজাতীয় গ্রন্থে গীত ও স্বরোচ্চারণ সম্বন্ধে যে সাংকেতিক মন্তব্য সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি ধীরভাবে আলোচনা করলেই দেখা যায়, রহস্যজ্ঞানকে রহস্যরূপে রক্ষা করা অথচ কোনো গোষ্ঠীবিশেষের প্রয়োজনে তাদের সংকলিত করা— এই দুটি আপাতবিরুদ্ধ মনোভাব প্রবল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ এই শ্রেণীর বিধিবিধান কখনোই স্বরলিপির প্রয়োজন বোধ করে নি। স্মৃতি ধৃতি ও মেধাশক্তি দিয়ে গুরুশিষ্যপরম্পরায় স্বরবিন্যাসগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রয়োগ প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। পরে কোনো অবনতির অবস্থায় স্মৃতি প্রভৃতি শক্তির ক্ষুণ্ণতার কারণে এই শ্রেণীর জ্ঞানী ও কর্মী ব্যক্তিবৃন্দ আক্ষরিক-লিপির সাহায্য নিয়েছিলেন, গত্যন্তর ছিল না বলে। ঠিক কি রকম আক্ষরিকলিপির প্রবর্তন ছিল বুঝা যায় না। এবং যুগে যুগে এই লিপির পরিবর্তন-সাধন হওয়াই স্বাভাবিক; একেবারেই, আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনারও বাধা নেই; কারণ অবনতি ও লোপ প্রায়ই একত্রে আসে।

তবুও, ঐ রহস্য গীত ও স্বরবিন্যাসের সম্বন্ধে কিছুকিছু তথ্য গোষ্ঠীর বাইরেও প্রকাশ হয়েছিল, অনুমান করা যায়। বিশেষ করে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, বায়ুপুরাণ, নারদীয় সংগীত-মকরন্দ ও সংগীতরত্নাকরে এমন যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যা থেকে নিঃসন্দেহ অনুমান হয়, ভরতমুনির আবির্ভাবেরও পূর্বে বৈদিক যাগসংশ্লিষ্ট বিশেষ গীতরূপ ও স্বরবিন্যাসপদ্ধতি ছিল এবং রহস্য-ব্যাপারগুলির রহস্য ঔপপত্তিক ছিল। ঔপপত্তিকাংশ আলোচনা করে দেখা যায়, সর্বসাকল্যে ষড়্‌জ ও মধ্যমগ্রামের চৌরাশি মূর্ছনা-তান দিয়ে মন্ত্রযাগাদি নিষ্পন্ন হত। বায়ুপুরাণে ত্রিশটি গান্ধারগ্রামিক বিন্যাস পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ রকমের আভিচারিক ক্রিয়াতে প্রযোজ্য ছিল এরূপ অভিপ্রায়ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলিকে নিয়ে সর্বশুদ্ধ এক শ চৌদ্দটি বিন্যাস লভ্য হয়। মাত্র এই বিন্যাসগুলিকে স্মৃতিতে রক্ষা করা অথবা স্মৃতির বশে বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয় এবং স্বরস্মৃতিমান লোকের পক্ষে কঠিনও নয়। অতএব, এই জাতীয় মন্ত্রগীতের ঔপপত্তিক ও প্রয়োগের পক্ষে গীতলিপি বা স্বরলিপির প্রয়োজনই ছিল না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ-তৃপ্তি, চিত্তবিনোদন, অথবা রসভাবের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এই শ্রেণীর গীতের লক্ষ্য ছিল না; এই হেতুতে যে শিক্ষাজাতীয় পুস্তকে ঐরকমের উদ্দেশ্য বা প্রাপ্তির কোনোও সংকেত নেই। অর্থাৎ শিক্ষাজাতীয় উপদেশের প্রবক্তা বা সংগ্রহকর্তা রসভাবগর্ভ গীতি ও তদনুযায়ী স্বরবিন্যাস বা গান-ক্রিয়ার প্রসঙ্গ করেন নি।

কিন্তু প্রাচীন ভারতে সংগীতবিষয়ে মাত্র পূর্বোক্তরূপ একমাত্র চিন্তা ও ব্যবহার ছিল, সমাজে অন্য কোনো শিল্পাদর্শ ছিল না একথাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং নাট্যশাস্ত্রে অন্যরকমের শিল্পসমৃদ্ধি ও সংগীত-চিন্তা পাওয়া যায়।

সমাজে এক শ্রেণীর ব্যক্তি যেমন যাগ-মন্ত্র-তপশ্চর্যা নিয়ে কালাতিপাত করাকে কর্তব্য

মনে করেছেন, মোক্ষ বা চরম পুরুষার্থের অসাধক কাব্য রসচর্চা ও গীতবাদ্যনৃত্ত বর্জনীয় মনে করেছিলেন, তেমন অন্য মতের ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা কাব্য গীতবাদ্যনৃত্ত প্রভৃতিকে হেয় মনে করেন নি বরং এগুলিকে যথেষ্ট সমাদর করে দার্শনিক বুদ্ধি দিয়ে অলংকার ও সংগীতের উপাদেয়ত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। অনুমান করা যায়, কাব্যের বহুল ও ব্যাপক চর্চা হয়ে পরিশেষে পূর্বসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দঃ ও শব্দের বিকার হতে থাকলে পরে মহর্ষি পাণিনি আবির্ভূত হয়ে বিকার বা অবনতি নিরোধ করার উপায়স্বরূপ শব্দানুশাসন উপদেশ করেছিলেন। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রারম্ভেই অনুশাসন হয় না; সংস্কারের বহুমুখী বিস্তার হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সময়েই অনুশাসন আরম্ভ হয়, এরূপ মতই সমীচীন। ঐরকমে সমাজে গীতবাদ্যনৃত্তের ও নাট্যের ব্যাপক বহুধা-প্রসার ও উৎকর্ষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে অপব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আবির্ভূত হতে থাকলে পরে ভারতীয় নাট্যানুশাসন সম্ভব হয়েছিল, একথাও অনুমান করা যায়। এককথায়, মহামুনি ভরতের সাক্ষাৎ-আবির্ভাবকালের পূর্ব থেকেই কাব্য নাট্য ও সংগীতের বহুল চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল এবং যুগপ্রভাবে পূর্ব থেকেই কিছুকিছু উন্মার্গ গতিও দেখা দিয়েছিল; যাকে একেবারেই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে করা যায় না। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এবং শেষ অধ্যায়ে ঐরকম উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ ও হেতুদর্শন আছে।

অতএব মহামুনি ভরতের আবির্ভাবের পূর্বে কাব্য ও সংগীতের বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে দশরূপকপ্রসঙ্গে যে সূক্ষ্ম সুচিন্তিত বিশ্লেষণ দেখা যায় তা থেকে প্রমাণ হয় সেই সময়ে ও তার পূর্বে কাব্য ও নাটকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়ে গিয়েছে। এখন কথা এই যে, সেইসকল কবিতা ও নাটককে কারা স্মৃতিতে ধরে রাখত; গীতিকাব্য, কাব্যবদ্ধগীতি, রসবদ্ধগীতি কে কত মুখস্থ করবে; অসংখ্য অজস্র স্বরসন্দর্ভকে কে ধারণ করে রাখবে। সাধারণ সামাজিক মানুষের পক্ষে শ্রুতিধর ও মেধাবী হওয়া খুবই কঠিন কথা। এবং যাঁরা নিভৃতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বৈদিকছন্দ, ঘণ্টাপাঠ প্রভৃতি দিয়ে বৈদিক তথ্যগুলি স্মৃতিতে ধারণ করতেন তাঁরাই সমাজে সাধারণ কাব্য, গীতি ও গীতিরূপ চর্চা করে কণ্ঠস্থ বা হৃদয়স্থ করে রাখতেন এরূপ মনে করবার কিছুমাত্র হেতু নেই; কারণ প্রয়োজনবোধই ছিল না। এই কারণেই মনে হয়, ঐসকল চতুর্বর্ণ-নির্বিশেষে শিল্পপ্রচেষ্টা, জ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা ও সমৃদ্ধির সময়ে অক্ষরলিপি উদ্ভাবিত হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। অধিকন্তু, একই সময়ে সমাজে একশ্রেণীর লোক আক্ষরিকলিপি ব্যবহার করতেন না, এবং অন্য লোকে তাদের প্রয়োজনে কোনো আক্ষরিকলিপি ব্যবহার করছে— এরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়, বিচিত্রও নয়। বরং, ভারতে এককালীন একেবারেই লিপিপদ্ধতি ছিল না এবং অকস্মাৎ একদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মী বা কোনো আক্ষরিকলিপির প্রবর্তন হয়ে গেল, এইরূপ হওয়াই অসম্ভব বোধ হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, মহামুনি ভরতের সময়ে বা তার পূর্বে নাটক ও সংগীত বিষয়ে যে সমৃদ্ধি হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ আছে কি? এর উত্তরে বলা যায়, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির মধ্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অন্তত নিদর্শন আছে। এগুলিকে প্রমাণের সাধারণ ভিত্তি মনে করা যায়। এবং ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র নামে অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পশাস্ত্রই সেই সমৃদ্ধির বিশিষ্ট প্রমাণ। নাট্যবিজ্ঞান ও শিল্প প্রয়োগের অসংখ্য বিষয়ের বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে মাত্র

গীত ও স্বরবিন্যাস সম্বন্ধে যেসকল প্রয়োজনীয় পদার্থের আলোচনা আছে তাদের স্থূলরূপ ও সংক্ষিপ্ত-সারগুলি আলোচনা করলে বুঝা যায় সমৃদ্ধির পরিমাণ কিরূপ এবং প্রয়োজনবোধ কতখানি সূক্ষ্ম ছিল। প্রয়োজন ও প্রয়োজনবোধের আভাস থেকে অনুমান করা সম্ভব হয়, সে সময়ে আক্ষরিকলিপি ছিল, এমনকি গীতের স্বরলিপি ছিল।

ভরতমুনির সময়ে সাধারণভাবে কত রকম ছন্দ ব্যবহৃত হত মাত্র তখনই আন্দাজ করতে পারি যখন দেখি, নাট্যের উপযোগী এবং সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে থেকে ভরতমুনি মাত্র একান্ন রকমের ছন্দকে নির্বাচিত করেছেন এবং বলেছেন, ছন্দ অসংখ্য; তবে এইগুলিই নাট্যের পক্ষে প্রশস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবান্তর হলেও একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। আমরা যে ছন্দকে 'মন্দাক্রান্তা' বলে জানি, নাট্যশাস্ত্রে তার নাম 'শ্রীধরা'। তা ছাড়া প্রাকৃত বা অপভ্রংশেরও নিদর্শন প্রভৃতি আছে।

ভরতমুনির সময়ে সংগীতসমাজে বা লোকায়তরূপে কত রকমের স্বরবিন্যাস বা রাগ ছিল তখনই মাত্র আন্দাজ করতে পারি যখন দেখি তাদের মধ্যে থেকে তিনি তিন শ তিয়াত্তরটি স্বরবিন্যাসকে নাট্যোপযোগী ও উৎকৃষ্ট বলে নির্বাচন করার সংকেত উপদেশ করে গিয়েছেন। এগুলি আবার শুদ্ধ বা তাত্ত্বিকরূপ (category)। এগুলির উপযুক্ত মিশ্রণ দিয়ে কত রকম হতে পারে হিসাব করেই বলা যায়। উক্ত তিন শ তিয়াত্তরটি বিন্যাসকে শৃঙ্গার প্রভৃতি আটটি নাট্যরস এবং নির্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চারিভাবের উদ্বোধকরূপে প্রয়োজনসাপেক্ষ ব্যবহারের অনুযায়ী গ্রাম, সন্ধি, জাতি, সাধারণ প্রভৃতিতে বিভাগ করা হয়েছে প্রয়োক্তার সুবিধার জন্য। এগুলি ছাড়াও ভরতমুনি উপদেশ করেছেন, কার্যক্ষেত্রে ও নাট্যের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী বেদানুবর্তী সামিক, আর্চিক প্রভৃতি বিন্যাস এবং কিরাত প্রভৃতি জাঙ্গলিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি অপকৃষ্ট অনিয়ত বিন্যাসও প্রয়োজন হতে পারে। অনুমান করা যায়, ভরতমুনির সময়ে বেদানুবর্তী রহস্য স্বরবিন্যাসের স্থূলরূপগুলি সাধারণ সংগীতসমাজের করায়ত্ত হয়েছে। ত্রেতাযুগের প্রথমকালে মহামুনি ভরত আবির্ভূত হয়েছিলেন এইরূপ শ্রৌত সিদ্ধান্ত নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের আচার্যসিদ্ধির প্রমাণ থেকে অনুমান করেছি খৃস্টপূর্ব ন্যূনপক্ষে এক হাজার বৎসর অতীতে ভরতমুনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহর্ষি পাণিনির সময়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুই শাখা ছিল এবং তার মধ্যে তিনি প্রাচ্যশাখার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

মহামুনি ভরতের সময়ে অথবা তারও পূর্ব থেকে 'নারদীয় গান্ধর্ব' নামে একটি মূল সাংগীতিক সম্প্রদায় ছিল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাতি নামধেয় একটি বাদ্যসম্প্রদায় ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রে। মহামুনি উক্ত নারদ ও স্বাতির শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখ করে একাধিকবার তাঁদের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। 'নারদীয় গান্ধর্ব' -বিষয়ে অন্য শ্রৌত সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ থেকে অনুমান করেছি, ভরতমুনির সময়ে নারদীয় গান্ধর্ব অনুযায়ী কমপক্ষে এক হাজার শুদ্ধ-মিশ্র-সংকীর্ণ রাগবিন্যাস এবং তৎসংক্রান্ত রাগবিন্যাসের 'পুংস্ত্রীনপুংসকভেদ'তত্ত্ব ছিল। নাট্যব্যাপার ও নাট্যসংগীতের পক্ষে এই শেষোক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োজন হয় নি বলে মহামুনি এসকল তত্ত্ব ও তথ্যের উপদেশ করেন নি।

তা ছাড়াও মহামুনি ভরতের আবির্ভাবকালে এমন এক শ্রেণীর গীতবাদ্যবিশারদ ও বীণাবাদন-কুশলী গোষ্ঠী বা সংঘ ছিল যারা প্রাচীন বেদানুবর্তী পদ্ধতি, নারদীয় শ্রৌত পদ্ধতি অথবা ভারতীয় সংগীত-

পদ্ধতির চেয়ে লোকায়ত সংগীত-মতই গ্রাহ্য করেছিলেন। অর্থাৎ একই সমাজে বাস করে মূলে একই সংস্কার ও লোকাচারের আশ্রয়ে থেকেও এঁরা সাংগীতিক মত হিসাবে বৈদিক মূর্ছনাপদ্ধতি এবং নারদীয় গান্ধর্বকে অনুসরণ না করে সংগীত অর্থাৎ গীতবাদ্যনৃত্ত বিষয়ে আপন-আপন প্রত্যক্ষ লোকায়ত অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক মূর্ছনা রহস্যবাদী; নারদীয় গান্ধর্ব রহস্যবাদী না হলেও বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের আশ্রিত ছিল। লোকায়তবাদী পূর্ণরূপে empirical ও pragmatic ছিলেন; এবং এদের একখানি হাত নাস্তিকদের দিকে প্রসারিত ছিল। সর্বকালেই জগতের শিষ্ট সমাজে লোকায়তপন্থী দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তির সম্ভাবনা এবং যথাযোগ্য সমাদরও হয়েছে। বিশেষ করে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতমুনি সংগীত ও নাট্যশিল্প বিষয়ে আগম বা শাব্দপ্রমাণের পরই লোকপ্রমাণ বা লোকব্যবহারের প্রামাণ্য উপদেশ করে গিয়েছেন।

মহামুনি ভরতের সময়ে সংগীতে লোকায়ত পন্থা ছিল তার প্রমাণ আলোচন করার বিশেষ কারণ এসে পড়ে। কারণ, একমাত্র তা থেকে বুঝা যায় সংগীতের তাৎকালিক ও সর্বতোমুখী সমৃদ্ধি ছিল, ভরতমুনি লোকায়ত মতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং গীতবাদ্যপ্রচার বিষয়ে যথার্থই প্রয়োজনবোধ ছিল কি না এবং কতখানি ছিল।

নাট্যশাস্ত্রের মতে নাট্যপ্রয়োগের অধিকারে পূর্বরঙ্গ ও নাট্যব্যাপার স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বরঙ্গ বা যবনিকার বহিস্থিত সাধারণ গীতবাদ্যব্যাপারগুলিকে বহির্গীত বলা হয়েছে; এবং নাট্যের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ মূল নাট্যবিষয়ের সংশ্লিষ্ট গীতবাদ্যকে সামান্যত অন্তর্গীত বলা হয়েছে। এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে যা-কিছু সাধারণভাবে উপযোগী তাকে 'গীত' শব্দে সূচিত করা হয়েছে। এসকল কথা নাট্যশাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। পরে, উনত্রিশ অধ্যায়ে, উক্তরূপ গীতব্যাপারের সংশ্লিষ্ট বীণাবাদ্য ও পদ্ধতি প্রসঙ্গ করে মহামুনি উপদেশ করেছেন, যথা—

> ত্রিবিধং বৈণবং বাদ্যং কর্তব্যং গীতসংশ্রয়ং তজ্জ্ঞৈঃ।
> তত্ত্বং তথানুগত মোঘমনেককরণসংযুক্তম্॥ ১০২
> লয়তালবর্ণপদযতিগীত্যক্ষরভাবকং তত্ত্বম্।
> গীতং চ যদনুগচ্ছেদনুগতমিত্যুচ্যতে বাদ্যম্॥ ১০৩
> আবিদ্ধকরণবহুলং উপর্যুপরিপাণিকং দ্রুতলয়ং চ।
> অনপেক্ষিতগীতার্থং বাদ্যং চৌঘং বুধৈর্জ্ঞেয়ম্॥ ১০৪

এর সরলার্থ এই, গীতসংশ্লিষ্ট তিন প্রকার বীণাবাদ্য তজ্জ্ঞ অর্থাৎ বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞদিগের কর্তব্য (বা প্রযোজ্য); যথা, তত্ত্ব অনুগত ও ওঘ। (এদের মধ্যে) অনেককরণসংযুক্ত, লয়-তাল-বর্ণ-পদ-যতি-গীত্যক্ষরভাবক বাদ্য তত্ত্ব (নামে উল্লিখিত)। এবং যা দিয়ে গীতব্যাপার অনুগমন করা উচিত, তাকে অনুগত বলে। এবং বুধদিগের জানা উচিত যে আবিদ্ধকরণবহুল, উপর্যুপরিপাণিক দ্রুতলয়, তথা গীতার্থনিরপেক্ষ বাদ্যই ওঘ।

এখানে তত্ত্ব প্রভৃতি তিনরূপ বাদ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মাত্র প্রথম শ্লোকের প্রথমার্ধই আলোচ্য।

তজ্জ্ঞৈঃ, অর্থাৎ যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের দ্বারা বা তাঁদের পক্ষে কর্তব্য বা করণীয়, তিনরূপ

বাদ্য। কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? অবশ্যই বৈণববাদ্য বা বীণাবাদ্য বিষয়ে যাঁরা ইতিপূর্বেই পরিজ্ঞাত বা বিশারদ। এখানে যাঁরা বীণাবাদন সম্বন্ধে মাত্র ঔপপত্তিক অংশ (theory) জানেন তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না; যাঁরা বীণাবাদনকার্যে সম্যক্ কুশলী তাঁদের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, 'কর্তব্যং' শব্দ দিয়ে প্রয়োগ বা বস্তুত কার্যই সূচিত। যারা বীণা বাজাতে জানে না তাদের যত কিছুই জ্ঞান হোক তারা মাত্র ঐ জ্ঞান দিয়ে বীণা বাজাতে পারে না। এককথায়, 'তত্ত্বজ্ঞ' ও 'কর্তব্য' এই দুটি শব্দ দিয়ে পূর্বসঞ্চিত বীণাবাদন কুশলতা বা অভ্যাসই বুঝায়।

প্রসঙ্গত, সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে কোথাও গান-বাদন-নর্তনে অনভ্যস্ত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাথমিক শিক্ষা ও অভ্যাসের ক্রম উপদেশ করা হয় নি। নাট্যশাস্ত্রে 'music made easy' বলে কোনো প্রকরণ নেই। অতএব 'তজ্জ্ঞ' শব্দের দ্বারা এমন ব্যক্তিকে সূচিত করা হয়েছে যিনি ইতিপূর্বেই বীণাবাদনে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাৎপর্য এই নাট্যব্যাপারে বীণাবাদ্যের প্রয়োজন মনে করা হয়েছে; সেই প্রয়োজনের বশেই বীণাবাদকের প্রয়োজন। বীণাবাদক অর্থে ইতিপূর্বেই বীণাবাদনে দক্ষ। এই রকম দক্ষ ব্যক্তিকে নাট্যসংগীতে নিয়োজিত করার প্রাক্‌কালে নাট্যোপযোগী বীণাবাদ্যের তত্ত্ব ও স্বরূপ উপদেশ করা হয়েছে।

সেই 'তজ্জ্ঞ' বা বীণাবাদনদক্ষ ব্যক্তি যখন ইতিপূর্বেই অভিজ্ঞ ও দক্ষ তবে তাকে আবার কর্তব্য-উপদেশ করা কেন। তিনি তসবই জানেন। তা নয়; তিনি অন্য রকম পদ্ধতি বা রীতিতে বীণাবাদন করতে পারেন, সেই হিসাবে তিনি দক্ষ। কিন্তু বক্ষ্যমাণ নাট্যোপযোগী গীতসংশ্রয় যে বীণাবাদ্য তার স্বরূপ প্রভৃতি তিনি জানেন না। এ কারণে তার মত দক্ষ ব্যক্তিকে নাট্যোপযোগী বীণাবাদ্যের স্বরূপ উপদেশ করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, তিনি ইতিপূর্বে সামান্য-নাট্যোপযোগী বীণাবাদন জানেন অথবা ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত অন্য-কোনো লোকায়ত সম্প্রদায়ের অনুবর্তী বীণাবাদনপদ্ধতি অবগত আছেন। সে ক্ষেত্রেও ভারতীয় নাট্যপদ্ধতিবিশেষের প্রকরণভুক্ত যে গীতব্যাপার, যা পূর্বেই বলা হয়েছে সেই গীতব্যাপারের সংশ্রিত বীণাবাদনপদ্ধতি তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হবে এরকম অভিপ্রায় নিয়েই ভরতমুনি ঐ উপদেশ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হয়, ভরতমুনি তজ্জ্ঞ শব্দের বহুবচন প্রয়োগ করলেন কেন? মাত্র ছন্দ রক্ষার খাতিরে তিনি ওরূপ করেছেন বলা যায় না। কারণ দেখা যায় নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে এমন অনেক শ্লোক বলা হয়েছে যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থতা রক্ষা করতে গিয়ে ছন্দোভঙ্গ হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র কাব্য নয়, শিল্পশাস্ত্র। আরও এই যে, প্রবন্ধলেখক ভরতমুনির উপদেশের মধ্যে কোথাও অনাবশ্যক শব্দের প্রয়োগ অবগত নয়।[১] অতএব বহুবচন প্রয়োগের মধ্যে কিছু সংকেত ও সার্থকতা আছে।

সংকেত ও সার্থকতা, যথা ভরতমুনির সময়ে ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত এবং ন্যূনকল্পে তিন রকম বিভিন্ন পদ্ধতি বা মতের বীণাবাদনসম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ছিল। বহুবচন দিয়ে ন্যূনত তিন বুঝায়; এবং এইরূপ বক্তব্যের পরে যদি প্রসঙ্গক্রমে কখনও চার বা তারও অধিক সংখ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ

১ নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বা মত আছে। সিদ্ধান্ত-বিরোধের ছাঁকনি দিয়ে এগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বা সংকেত না থাকে, তাহলে বহুবচন দিয়ে নির্দিষ্টরূপে তিনই সূচিত হয়। অতএব ভরতমুনির আবির্ভাব-সময়ে, নাট্যশাস্ত্রের মুদ্রিত সংকলনের সময়ে নয়, ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের বীণাবাদনপদ্ধতির অতিরিক্ত অপর তিনটি বিশিষ্ট বীণাবাদন পদ্ধতি ছিল।

এরূপ অনুমানের পরই প্রশ্ন হয়, পদ্ধতির প্রকারভেদগুলি কি রকম। এরও সংগত বা আনুমানিক উত্তর আছে ; যথা, প্রথম, নারদীয় গান্ধর্বসম্প্রদায়ের ও চিন্তাধারার এমন অংশও ছিল যাকে ভরতমুনি নাট্যসংগীতের সহায়ক মনে করেন নি, তথা নাট্যশাস্ত্রের গান্ধর্বাংশে সংগ্রহ করেন নি। ভরতমুনির সশ্রদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায়, তিনি নারদীয় গান্ধর্বের অংশমাত্র 'সংগ্রহ' করেছেন। যথা নাট্যশাস্ত্রে আঠাশ অধ্যায়ে তেরো থেকে সতেরো শ্লোকের মধ্যে উদ্ধৃত গান্ধর্বের প্রকরণগুলির প্রস্তাব করে তিনি আঠারো শ্লোকে বলেছেন, "গান্ধর্বসংগ্রহোহ্যেষ বিস্তারং চ নিবোধত"। গান্ধর্বসংগ্রহের মূল তত্ত্বসমুচ্চয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

গান্ধর্বমেতৎ কথিতং ময়া হি
পূর্বং যদুক্তং ত্বিহ নারদেন।
কুর্যাদ্য এবং মনুজঃ প্রয়োগং
সম্মানমগ্র্যং কুশলেষু গচ্ছেৎ ॥ ৪৮৪ শ্লোক, ৩২ অধ্যায়

এখানে 'গান্ধর্বং' ও তার বিশেষণ 'এতৎ' এই উক্তি দিয়ে গান্ধর্বের সংগৃহীত অংশমাত্রকেই বুঝায়, সমগ্র নারদীয় গান্ধর্বকে বুঝায় না ; কারণ দ্বিতীয় চরণে 'তু' শব্দের দ্বারাই মূল নারদোক্ত গান্ধর্ব এবং সম্প্রতি ভরতোক্ত গান্ধর্বাংশের ভিন্নতা অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব সূচিত হয়েছে।

সংক্ষেপে, মূল নারদীয় গান্ধর্বের অনেক ধারা ছিল। তার মধ্যে একটি ধারা ভরতমুনির গান্ধর্ব-সংগ্রহ। মূল নারদীয় গান্ধর্বে স্ত্রীপুংনপুংসক-রাগতত্ত্ব ও তদনুযায়ী বীণালাপপদ্ধতিও ছিল। এর একটি প্রমাণ উল্লিখিত 'তজ্জ' শব্দের সংকেতের মধ্যে। অন্য বিশিষ্ট প্রমাণ ভারতীয় গান্ধর্বের রাগ-প্রকরণে 'রাগ' পদার্থের সংজ্ঞার অভাব। ভরতমুনি 'রাগ' শব্দ ব্যবহার করেও তার সংজ্ঞা দেন নি, তার কারণ এই যে তাঁর সময়ে বা পূর্ব থেকেই রাগবস্তু সিদ্ধপদার্থরূপেই ছিল। ইতিপূর্বে 'সিদ্ধ' শব্দ বা পদার্থের সংজ্ঞা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, যদি সেই শব্দ বা পদার্থ বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে থাকে। এবং ভরতমুনি 'জাতি' বা 'জাতিরাগ' প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন, সেই 'জাতি' বা 'জাতিরাগ' মূল গান্ধর্বের অঙ্গীভূত হলেও সংগীতসমাজে বা লোকে প্রচলিত ছিল না ; অথবা সে বিষয়ে সংগীতসমাজের মার্জিত বুদ্ধি ছিল না। একারণে তিনি 'জাতি' সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ করেছেন।

দ্বিতীয়, মন্ত্রযাগকুশল ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র রহস্য, যজ্ঞসংশ্লিষ্ট বীণাবাদন প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি ছিল। রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ একটি প্রাচীন শ্রুতি উদ্ধার করে বলেছেন "গীতস্য ধর্মসাধনত্বং তাবদশ্বমেধপ্রকরণে ব্রাহ্মনৌ বীণাগায়িনৌ গায়তঃ ব্রাহ্মণোহন্যো গায়েৎ, ইতি শ্রুতেঃ"। ঐতরেয় আরণ্যকে দৈবী বীণা ও মানুষী বীণার উপমান প্রসঙ্গে এমন একরকম বীণার উল্লেখ পাওয়া যায় যা লোমশ চর্ম দিয়ে গঠিত ছিল। নারদীয় গান্ধর্বের তথা ভারতীয় গান্ধর্ব সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত বীণার মধ্যে এর সদৃশ কোনো বীণা পাওয়া যায় না। এই বীণার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেসব নাম পাওয়া যায়, সেগুলি প্রচলিত সংস্কৃতভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।

তৃতীয়, লোকায়ত স্বতন্ত্র বীণাবাদন ব্যাপার ও পদ্ধতি ছিল। বলাই বাহুল্য, এই ব্যাপার বা পদ্ধতি কোনো পুরাসিদ্ধ সম্প্রদায়কে অনুবর্তন করে নি। ইতিপূর্বেই বলেছি, কোনো বিশিষ্ট দার্শনিক-মতবাদ বা ideology না মেনেও মাত্র প্রত্যক্ষ ও সামান্য অনুমানের উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এবং লোকায়ত হলেই যে কোনো শিল্প গ্রহণের অযোগ্য হবে এরূপ চিন্তা প্রাচীনদের মনে স্থান পায় নি। স্বরবিন্যাস সম্বন্ধে এর উদাহরণ, মতঙ্গোক্ত নন্দিকেশপ্রবর্তিত দ্বাদশস্বর-মূর্ছনা। দ্বাদশস্বরমূর্ছনা, অর্থাৎ সপ্তকে মাত্র বারোটি স্বর স্বীকার করে তার উপর ঔপপত্তিক ভিত্তি রচনা করা। সাধারণভাবে লোকসংগীতে বারোটি স্বরের প্রয়োগই যথেষ্ট। নারদীয় গান্ধর্বে বাইশ শ্রুতি দিয়ে যে সূক্ষ্মতর স্বরপ্রস্তাবনা করা হয়েছে সেসকল ব্যাপার লোকায়ত সংগীত গ্রহণ করতে অক্ষম, অনুভবের অক্ষমতার কারণে। কিন্তু, মাত্র এই কারণেই এই লোকায়ত মতকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় না। এবং মহামুনি ভরত যে লোকায়ত সংগীতকে শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ নাট্যশাস্ত্রেই আছে এবং একাধিক বার উপদেশ আছে। তার মধ্যে একটি, যথা "নোক্তা যে চ ময়া তত্র লোকগ্রাহ্যাস্তু তে বুধৈঃ। লোকো বেদাস্তথাধ্যাত্ম প্রমাণং ত্রিবিধং মতম্"।

এই অনুমানের সার্থকতা দেখা যাক। নাট্যের কার্যে উত্তম শিল্পীর প্রয়োজন। শিল্পী-নির্বাচনের সময়ে তার সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠার চেয়ে কার্যদক্ষতাই বিচারের যোগ্য। নাট্য ও গান্ধর্বের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবৈষম্যমূলক চিন্তা নেই; এর ইঙ্গিত আছে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে। ফলে, শিল্পীনির্বাচনের পক্ষে সকল দুয়ারই খোলা; এবং এ-ব্যাপারে দক্ষ কুশলী ব্যক্তিই অধিকারী, তিনি ব্রাহ্মণই হন বা আর-কিছু হন। 'তজ্জ্ঞৈঃ' শব্দের প্রয়োগ দিয়ে ভরতমুনি নারদীয় পদ্ধতি, বেদানুবর্তী পদ্ধতি এবং লোকায়ত পদ্ধতি তিনটিরই যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বীণাবাদক নাট্যের বা গান্ধর্বের সহায়তা করতে যাবেন কেন; নাট্যব্যাপার নটনটীসংশ্লিষ্ট। ধর্মশাস্ত্রে নটনটীদের ও তাদের সংশ্রবের নিন্দা করা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায়, ভরতমুনির আবির্ভাবের সময়ে নাট্যের অখ্যাতি ছিল না নিশ্চয়; নচেৎ অনধ্যায়ের অবকাশে একদল মুনি ভরতের সমীপবর্তী হয়ে নাট্যের উপদেশ শুনতে যেতেন না। আরও এই, ভরতমুনির সময়ে সংগীত ও নাট্যশিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকলেও জনসমাজের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা আবির্ভূত হয় নি; ফলে, তখনও বর্ণভেদগত ছুন্মার্গ দেখা দেয় নি। তখনকার সময়ে অর্থাৎ ভারতীয় নাট্য-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও সমৃদ্ধির সময়ে সাধারণসমাজ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল এসকল বিষয়ে কিছুকিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বাহুল্য হবে বলে এখানে তার আলোচনা করা গেল না।

এখন গীতব্যাপারের অন্তর্গত পদার্থ বিষয়ে তখনকার সংগীতজ্ঞদের প্রয়োজনবোধ কি রকম ছিল আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্তর্গীত অর্থাৎ নাটকীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট গীতকে ধ্রুবা ও কাব্যবন্ধ নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ধ্রুবা অর্থাৎ রসবন্ধ গীতের পদ ও স্বরবিন্যাস দিয়ে কোনো রসের উদ্দীপন করাই লক্ষ্য। এ রকম উদ্দেশ্য স্বীকার করে ভারতীয় গান্ধর্বের মধ্যে গীতরূপ রচনা বিষয়ে (theory of musical

composition) আমরা যে বিশিষ্ট জ্ঞানানুভবসম্বলিত সিদ্ধান্ত পাই তার তুলনা নেই; কারণ আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর সাংগীতিক ইতিহাসের মধ্যে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বা ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় নি। সমস্যাটি এই রূপ — যে-কোনো গীতি বা পদকে গান করে গীতরূপে যথাযথ অভিব্যক্ত করতে হলে কি রকম সুর দিয়ে তাকে গান করা উচিত। গীতির ভাবসম্পদ্ বা রসদ্যোতনার সঙ্গে স্বরবিন্যাসের কোনো নিয়ত ও সুন্দর সম্বন্ধ আছে কি না; যদি থাকে, তাহলে সেই নিয়তি বা নিয়মটি কিরূপ। মহামুনি ভরত পূর্বপ্রাজ্ঞদের অনুসরণ করে স্বীকার করে নিয়েছেন গীতি ও স্বরবিন্যাসের মধ্যে একটি শুভ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটি স্বাভাবিক, অর্থাৎ কৃত্রিম নয়। এবং এই শুভ সম্বন্ধকে সংগীতজগতে প্রচারিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মূল নারদীয় গান্ধর্বের অংশবিশেষ সংকলন করে সুচারুরূপে উপদেশ করে গিয়েছেন[২]। গীতি ও স্বরবিন্যাসের নিয়ত সম্বন্ধবিষয়ে মহামুনি ভরতের গান্ধর্বপ্রস্তাবনা আজ পর্যন্ত জগতে এক ও অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তসমুচ্চয়রূপেই থেকে গিয়েছে, অর্থাৎ ভরতমুনিই একমাত্র theory of musical composition প্রতিপাদিত করে গিয়েছেন। ইউরোপীয় সংগীতজগতেও এখন পর্যন্ত এরূপ প্রস্তাব আবির্ভূত হয় নি; যদিও অনেক দিন ধরে কতকগুলি পরীক্ষা চলেছে।

এই প্রস্তাবের অনুযায়ী প্রতি সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি, তিনটি সপ্তক বা স্থান, ষড়্জ ও মধ্যম নামে গ্রাম, চৌরাশি প্রাথমিক মূর্ছনা, পঁচিশটি স্বরবিন্যাস জাতি, আঠারোটি প্রকরণ জাতি, তিন শ তিয়াত্তর মৌলিক স্বরবিন্যাস, চার রকম স্বরবর্ণ, তেত্রিশটি স্বরালংকার প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য এগুলি স্থূল সিদ্ধান্ত। অন্য দিকে গীতি ও পদবিষয়ে ছন্দ রস ভাব উচ্চারণ ও অলংকার বিষয়ে নানারকমের ন্যায়সংগত এবং পরীক্ষাসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এবং গীতি ও স্বরযোজনার শুভ-সম্বন্ধবিষয়ে বাদী-সম্বাদী-বিবাদী-অনুবাদী ও গ্রহ-অংশ-ন্যাস-অপন্যাস ব্যাপার যথাযথ প্রস্তাবিত হয়েছে।

মহামুনি ভরত অথবা ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের গীতবিষয়ে জ্ঞান, অনুভব-সূক্ষ্মতা ও প্রয়োজন-বোধের দিগদর্শনী দেওয়া গেল। প্রয়োজন ও প্রয়োজনবোধই (necessity) বড় কথা। কারণ, প্রয়োজনবোধ হলে তবে আবিষ্কারের কথা ওঠে।

এখন, ভরতমুনির সময়ে গায়কবাদকমাত্রেই শ্রুতিধর ছিল এরূপ মনে করার যুক্তি পাওয়া যায় না। বিশেষ এই যে, ভরতমুনি উত্তরোত্তর কালের মেধানাশের কথা বলেছেন এবং সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অবনতির তথ্যও দিয়ে গিয়েছেন। শ্রুতিভেদসমন্বিত মৌলিক তিন শ তিয়াত্তর স্বরবিন্যাস স্মৃতিতে ধারণ করা অসম্ভব বলে মনে হয়। অতএব এইসমস্ত প্রয়োজনীয় পদার্থকে রক্ষা করার উপায়ও নির্ণীত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এ থেকেও বড় কথা এই যে, উক্ত ব্যাপারগুলিকে চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করার পূর্বেই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তখনকার, অথবা কোনো কালের, স্মৃতি-ধৃতি-মেধা দিয়ে এসকলের খুঁটিনাটি পরীক্ষাই অসম্ভব।

এসকল কথা ভেবে দেখলে আমরা অনুমান করতে পারি, সে সময়ে কোনো-এক রকমের বা

২ বিশেষ করে নাট্যেশাস্ত্রে ২৮শ থেকে ৩৪শ অধ্যায়

বহু রকমের স্বরলিপিপ্রথা ছিল। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে আচার্যকল্প, জ্ঞানী ও অনুভবী ব্যক্তির মনে প্রয়োজনবোধ হয়েছে অথচ সেই প্রয়োজনবোধের অনুযায়ী কোনো উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করেন নি এরূপ কথা মনে করা যায় না। অন্তত আমি মনে করতে পারি নে, কারণ গত কুড়ি বৎসর ধরে ঐসকল তথ্য পরীক্ষা করে দেখে এখন বলতে পারি যে, সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ন্যায়সংগত ও অতুলনীয়। অথবা, প্রয়োজন অনুভব করেও আলস্যের কারণে উপায় উদ্ভাবন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, এরূপ অনুমান করা নাট্যশাস্ত্রের সহৃদয় পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভরতমুনির সময় চিত্রাঙ্কনশিল্প ও বর্ণযোজনশিল্প ছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সময় আক্ষরিকলিপিও ছিল।

সেই প্রাচীনকালের প্রয়োজনবোধ বাদ দিয়ে আধুনিক গীতশিল্পীর প্রয়োজনবোধ পরীক্ষা করা যাক।

গানবাজনার পক্ষে কড়ি-কোমল দিয়ে মাত্র বারোটি স্বরই প্রয়োজন। গীতির স্বরযোজনা হয় সামান্য অনুভব ও সংস্কার দিয়ে। রাগশিল্পী বিলাসখানি রাগের আলাপের সময়ে ঋষভস্বরটিকে বিশিষ্ট-ভাবে প্রকাশ করতে থেকেও তাকে সাধারণভাবে কোমল ঋষভ বলেই বর্ণনা করেন। পুরিয়ারাগের ধৈবতস্বরটি সোহিনী বা ভূপালীরাগের ধৈবত থেকে একশ্রুতি কোমলতর হলেও স্বরলিপিতে তার কোনো নিদর্শন নেই ; কারণ প্রয়োজনবোধ নেই। অলংকারের চারুপ্রয়োগ ও তাদের ভেদ অনুভবে সাড়া দেয় না বলে অলংকারের বিশেষ চিন্তা ও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় স্বরলিপিপদ্ধতি দেখলে বোঝা যায়, তাতে ভরতোক্ত স্বরালংকার ও বর্ণালংকার সর্বশুদ্ধ ছেচল্লিশ অলংকারের মধ্যে মাত্র পাঁচটির অনুভব হয়েছে। ইউরোপীয় শিল্পী এই কয়টির প্রয়োজন অনুভব করে বলেই স্বরলিপির মধ্যে এদের সংকেত থাকে। আমাদের ভারতীয় শিল্পীরা সকলেই এই পাঁচটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন— স্বরলিপিতে এদের নিদর্শন দূরের কথা।

এই রকম সামান্য প্রয়োজনবোধের কারণে যদি স্বরলিপিকরণ উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে প্রাচীন শিল্পপ্রতিভার পক্ষে স্বরলিপি উদ্ভাবন না করে নিশ্চেষ্ট থাকা কি করে সম্ভব হয়।

প্রশ্ন হয়, প্রাচীনকালে যদি কোনো রকম স্বরলিপি বা সংকেতলিপি থাকত তাহলে সংগীত-বিষয়ক বা অন্য জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থে তার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন। উত্তরে সামান্য ভাবে বলা যায়, মাত্র অনুল্লেখ দিয়ে অনস্তিত্ব অনুমান করা সংগত হয় না। যথা, এ পর্যন্ত সংস্কৃতসাহিত্যের গ্রন্থে 'দেবনাগরী' 'দেবনাগরী লিপি' 'ব্রাহ্মী' বা 'ব্রাহ্মীলিপি' শব্দগুলি কোথায় ও কতবার উল্লিখিত হয়েছে প্রণিধান করার যোগ্য। লিপি বা অন্য কোনো বস্তুর ব্যবহার থাকলেই যে সেই সেই কালের লিখিত গ্রন্থে তাদের উল্লেখ থাকবে এমন কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। অন্যপক্ষে, কোনো বস্তুর উল্লেখ না থাকলেও অনুমান প্রয়োগ করে যদি সেই অনুল্লিখিত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় তবে সেই সংগত অনুমান অনুসারেই বস্তুর তাৎকালিক অস্তিত্ব ছিল স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত গীতবিষয়ক বস্তুগুলির সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধই অনুমানের প্রথম সোপান। বস্তুগুলি জ্ঞান বা অনুভবের গ্রাহ্য না হলে প্রসঙ্গই থাকত না।

অতএব, বস্তুপরিচয় ছিল। বস্তুপরিচয় ও তাদের সূক্ষ্ম ভেদগুলি সমগ্রত বা ব্যষ্টিত স্মৃতিতে

ধরে রাখা অসম্ভব; অতএব স্মৃতি ছাড়াও অন্য-কোনো উপায়ে সেসকল বস্তুকে যথাযথভাবে রক্ষণ করা হত। শব্দবস্তুকে গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত যন্ত্রে রক্ষা করা চলে, এবং লেখরূপে পরিণত করে রক্ষা করা চলে। এই দুটি উপায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে কোন্‌টি হওয়া সম্ভব বা অসম্ভব এরূপ বিচার করে বলা যায় যে গীতলিপি বা স্বরলিপি ছিল কিন্তু গ্রামোফোন-জাতীয় যন্ত্র ছিল না।

অবশ্য ঐ গীতলিপি বা স্বরলিপির নিদর্শন পাওয়া যায় না। তার কারণ এই যে, নাট্যসম্প্রদায় বা গান্ধর্বের উৎকর্ষ নিরোধ ক্রমশ অবনতি ও ব্যবহারিক অবলোপ হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক অবলোপের অর্থ প্রয়োগ বা ব্যবহারের সংকেত লুপ্ত হওয়া। এর একটি দৃষ্টান্ত আয়ুর্বেদের চরক সম্প্রদায়ের অবলোপ। জৈব বিজ্ঞানের একটি কথা এখানে খাটে, যথা অবনতি বা degenerationএর মুখে 'latest to evolve, first to go' অর্থাৎ যেটি সকলের শেষে উদ্ভূত হয় সেইটি প্রথমে অন্তর্ধান করে। প্রাচীন সংগীতের সমৃদ্ধির আলোচনা করে দেখা যায়, ভারতীয় গান্ধর্বের রসবন্ধ বা ধ্রুবা গীত এবং কাব্যবন্ধ গীত তথা আনুষঙ্গিক স্বরবিন্যাসগুলিই চরম উন্নতির সূচনা করে। অবনতির মুখে ঐ দুটিই সকলের আগে ধ্বসে পড়েছে। ফলে এদের সংশ্লিষ্ট গীতলিপি বা সংকেতকৌশলও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। স্বরলিপির অন্তর্ধান হতে থাকলে ক্রমশ পূর্বেকার সামান্য বা আদিম রূপটি দেখা দেওয়ার কথা। এই রূপটি পাওয়া যায় মতঙ্গপ্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে। এর মধ্যে **স রি গ ম** প্রভৃতি কঙ্কালমালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত-ভাবে দেখা যায়। মতঙ্গের সময়ে ভারতীয় গান্ধর্বসম্প্রদায়ের ব্যবহার লোপ পেয়েছিল বলেই তিনি অবলুপ্ত সভ্যতার উপর দেশী ও মার্গ চিন্তা দিয়ে অভিনব সিদ্ধান্তসৌধ রচনা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রপ্রবৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য হয়। এখন যেমন সকলেই সব-কিছু শাস্ত্র বা বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করার অধিকার দাবি করে, তখন সেরকম ছিল না। সে সময়ে মাত্র জ্ঞানী বিশেষজ্ঞ আচার্যবৃন্দই শাস্ত্র প্রণয়ন করতেন। এঁদের দৃষ্টি একান্তই তত্ত্ব অর্থাৎ categorical principle এবং শাশ্বত সত্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বিশিষ্ট স্মৃতি ধৃতি মেধাশক্তির অধিকারী হয়ে এঁরা প্রখর বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও প্রতিভার বলে মাত্র সেই জাতীয় জ্ঞান ও পদার্থের অনুশীলন করতেন যে জ্ঞান ও পদার্থের কোনো কালে বিনাশ নেই। এবং যা-কিছু আজ আছে, কাল থাকে না, যা-কিছু দেশকালপাত্র ও রুচিভেদে সর্বদাই পরিবর্তনশীল এ রকম অনাদি অনন্ত কালের ক্ষণবিধ্বংসী অভিজ্ঞতা ও বস্তুরূপকে গৌণ মনে করেই এগুলি শাস্ত্রে নিবদ্ধ করতেন না ও লেখরূপে নিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। ফলে এঁদের মত জ্ঞানী ব্যক্তি যখন সংগীতের শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন তখন গীত বাদ্য নৃত্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক পদার্থ বস্তু রূপ ও প্রয়োগই এঁদের লক্ষ্য ছিল। এঁদের রচিত গ্রন্থে যদি গীত বা বাদ্যরূপের স্বরলেখ বর্ণনা না থাকে, কোনো স্বরলিপির উল্লেখ না থাকে তাহলেও এঁদের দোষী করা যায় না। এবং তা থেকে প্রমাণও হয় না যে এঁরা লিপি বা স্বরলিপির প্রয়োজন বোধ করেন নি।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-জীবন ও -সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য ও তথ্যপ্রধান আলোচনা
এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে' নিতে পেরেছেন— চলিত কথায় যাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি— তার পরিধি কত বিস্তৃত, এবং তা'তেও কিরকম অপরূপ কারিগরী দেখিয়েছেন, তার একটি স-দৃষ্টান্ত আলোচনা সংগীতমহলে করি। রবীন্দ্রসপ্তাহ উপলক্ষ্যে সেই সাধ পূর্ণ হল।

গান ভাঙা দু রকমে হতে পারে— এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো। এক্ষেত্রে পরের সুরে নিজের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। পরের কথায় সুর দেবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; যদিও একেবারে নেই, তা নয়। এই প্রথম শ্রেণীকে আমি সুবিধার্থে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি: ১, অ-বাংলা ভাষার গান ভাঙা; ২, বাংলা ভাষার গান ভাঙা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতগুলির কথার সম্পদ বাদ দিয়ে শুধু সুরের দিক থেকে আলোচন করলেও আমাদের হিন্দু-সংগীতের একটি বিপুল রত্নভাণ্ডারের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাবে। আজ যে ভাঙা গানের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারও অধিকাংশ এই ভাণ্ডারেই সঞ্চিত। কবি নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশবিদেশ থেকে যে-সব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিকেই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। মাঘোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তার অন্যতম কারণ হতে পারে।

১

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশ, তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গান ভাঙার নমুনার কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে তিনি কারওয়ার নামক বোম্বাইয়ের যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে। তাদের কাছে কয়েকটি **কানাড়ী** ভাষার গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'। সেইগুলির দৃষ্টান্তই প্রথমে দিচ্ছি, কারণ আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে বিদেশী গানের মধ্যে এইগুলিই প্রথমে গ্রথিত। তবে বলে রাখা ভালো যে, উদাহরণগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজাবার কোনো চেষ্টা করা হয় নি।

মূল ॥ সখি বা বা
ভাঙা ॥ বড় আশা করে
মূল ॥ পূর্ণ চন্দ্রাননে
ভাঙা ॥ আজি শুভদিনে
মূল ॥ চারি বর্ষা পর্যন্ত
ভাঙা ॥ সকাতরে ওই কাঁদিছে

মারাঠী যদিও ও-অঞ্চলের একটি প্রধান ভাষা, এবং আমি তার তিন-চারটি গান যে না শিখেছিলুম তাও নয়, তবু কেন জানিনে, রবীন্দ্রনাথের মারাঠী থেকে ভাঙা কোনো গান মনে করতে পারছি নে।

গুজরাটী সম্বন্ধেও প্রায় তথৈবচ। অর্থাৎ যদিও একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের ("কোথা আছ প্রভু") মাথায় 'গুজরাটী ভজন' লেখা আছে, কিন্তু তার মূল কথাগুলি আমি জানিনে। তবে ঐ শিরোনামার সাক্ষ্যের জোরে ভাঙা গানটির উল্লেখ করে' গুজরাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছি। এটি এখন চলিত না থাকলেও আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম। এ গানটিতে সুরের বিশেষ চটক না থাকুক, বেশ একটি ধীর শান্ত ভাব আছে, যা ভজনের উপযোগী। যেখানে কথাই প্রাণ, সেখানে সুরের অলংকরণে তাকে চেপে না দেওয়াই সংগত; সেইজন্য ধর্মসংগীতের পক্ষে টপ্পার চালের চেয়ে ধ্রুপদের চালই প্রশস্ত মনে হয়। কৃষ্ণধন বাঁড়ুজ্যেও এই মত সমর্থন করেন।

আর-একটি ভজনের সুরও সরলা দেবীচৌধুরানীর 'শতগানে' গুজরাটী নামাঙ্কিত আছে বলে সাহস করে এই পর্যায়ে ফেলছি। সেই সুরে বসানো দ্বিজেন্দ্রনাথের "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি" গানটি হয়ত ব্রাহ্মসমাজে বেশি পরিচিত; কিন্তু তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি গানে ঐ ভজনের সুর দিয়েছেন— "এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি"; "নমি নমি ভারতী" (বাল্মীকি-প্রতিভা); "যাও রে অনন্তধামে" (কাল-মৃগয়া)। এ সরল সুরটিও ভজন বা ধর্মসংগীতের উপযোগী।

মাদ্রাজী ও মহীশূরী॥ মাদ্রাজী সুরের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষিত হয়। তার একটি কারণ আমার মনে হয় কার্যোপলক্ষ্যে সরলা দেবীর অনেককাল মহীশূরে অবস্থান ও সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর গান আনয়ন, যথা "এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ"। তার মধ্যে "আনন্দলোকে" গানটিই বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, যদিও তার মূল কথা জানিনে। এই সহজ সুন্দর সুরটি ভজন গানের বিশেষ উপযোগী। আবার "সংগচ্ছধ্বং" নামক বিখ্যাত বৈদিক শ্লোকে এই সুরটিই একটু ইতরবিশেষপূর্বক সরলাদিদিই বসিয়েছেন ও সামান্য স্বরসন্ধি লাগিয়ে কত সভাস্থলে গান করিয়েছেন, তা হয়ত একালের অনেকে নাও জানতে পারেন। আরও বেশি সেকালে গেলে "নমামি মহিষাসুরমর্দিনি" নামক মাদ্রাজী ভজন-ভাঙা "ভজো রে ভজো রে ভবখণ্ডনে" গানটি আমাদের কালে খুব চলিত ছিল; এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাঙা। আবার দেশকালপাত্রে সমসাময়িকের কাছ ঘেঁষে এলে দেখা যায় আমরা মাদ্রাজে যাই না-যাই, মাদ্রাজ আমাদের কাছে এসেছে। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনেরই একজন মাদ্রাজী ছাত্রীর কণ্ঠের সুন্দর সুন্দর মাদ্রাজী গান রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতর ভাবে ভেঙেছেন, তা এখানকার অনেকে আমার চেয়ে ভালই জানেন। যথা "বেদনা কী ভাষায়" "বাজে করুণ সুরে" ইত্যাদি।

"চিরসখা মোরে ছেড়ো না" এবং "চিরবন্ধু চিরনির্ভর" গান দুটির সুরও মহীশূরী বলে প্রসিদ্ধ। "প্রণমামি অনাদি-অনন্ত সনাতন পুরুষ" গানটি মাদ্রাজী ভজন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের আমলে গেলে "জয় দেব" "হায় একি হেরি শোভা" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ভজন-ভাঙা গান পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবী বা শিখ ভজন॥ শিখ ভজনও আমরা সুন্দর সুন্দর পেয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে

সুন্দর "বাজে বাজে রম্য বীণা"। আমার মনে হয় এটি ভাঙা গানের রাজা— এই হিসেবে যে, যতদূর সম্ভব কম পরিবর্তনে[১] বিদেশীকে স্বদেশীতে পরিণত করা হয়েছে, যেন একই স্বর্ণমুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। অবশ্য মূল গানের ("বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ") ভাষাই তাঁকে সে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু যদিও স্বীকার করি যে তিনি মূলের প্রত্যেক কথা অনুবাদ করেছেন মাত্র, তাহলেও শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে শুনেছি যে শুধু প্রথম কলির কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, বাকি দুটি কলি তিনি পূর্বাপর সংগতি রেখে নিজেই সংযোজন করেন। অবশ্য তাঁর কারিগরী বা শিল্পচাতুরী এতই স্বয়ম্প্রকাশ যে, আমাদের মত লোকের অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখাতে যাওয়া অনেকটা প্রদীপ ধরে সূর্যের আলো দেখাবার মতন। তবে প্রদীপেরও প্রয়োজন আছে, নইলে দীপালি হবে কিসে?

এই শিখ-ভজনেরই আর-একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সূত্রে তা

---

১ এ রকম আর-একটি দৃষ্টান্ত ১৩২০ চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী থেকে উদ্ধৃত করছি—

॥ হিন্দী আরতি ॥

অমৃতসর গুরুদরবারে গীত

[মূল]

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণ'পর সির নমেঁ ॥

সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাকে বেদন বেদন।
সুখীজনাকে আনন্দ এ ॥

বনা বনামেঁ সাবঁল সাবঁল,
গিরি গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর সাগর গম্ভীর এ। ॥

চৌন্দ সুরয বরৈ নিরমল দীপ।
তেরো জগমন্দির উজার এ ॥

[অনুবাদ]

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
মস্তক নমি তব চরণ-পরে।
সেবক জনের সেবায় সেবায়,
প্রেমিক জনের প্রেম-মহিমায়,
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে,
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে;
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
সাগরে সাগরে গম্ভীর হে;
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বালে নির্ম্মল দীপ,
তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তবে এ অনুবাদটি গানরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, আমাদের ঠিক জানা নেই।—মূলগানটি বাংলাদেশেই একসময় এত সুপ্রচলিত হয়েছিল যে, তার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদটি গান হিসাবে মূলগানটির পাশাপাশি প্রচলিত না হওয়াই সম্ভব।—রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে এ অনুবাদটি এযাবৎ স্থান পায় নি।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

জানি নে; এবং আশ্চর্যের বিষয়, সেটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করেছেন। গানটি এই—

মূল ॥ গগনোমে থাল রবিচন্দ্র দীপ বনি
তারকামণ্ডল জনক মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চঙর করে
সগল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
ক্যায়সি আরতি হুয়ি হো ভবখণ্ডন তেরি আরতি
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে॥

ভাঙা ॥ গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে॥
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥

কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের। এই আক্ষরিক অনুবাদ যে এত অবিকল করা সম্ভব হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় শিখদের গুরুমুখী ভাষা কতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা। যাকে পাঞ্জাবী ভাষা বলা যায়, তার নমুনা রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-ভাঙা গানের মূলে পাওয়া যাবে।

আর-কোনো স্বদেশী ভাষা থেকে তিনি গান ভেঙেছেন বলে মনে করতে পারছি নে। তাই এবার যে ভাষা নিতান্ত পরদেশী হলেও ঘটনাচক্রে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিতান্ত আপনার করবার প্রাণপাত চেষ্টা করতে হয়েছে, সেই **ইংরেজী** বিমাতৃভাষার গান ভাঙার দু-একটি নমুনা দিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করছি।

কবি প্রথমজীবনে বিলাতপ্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথমদিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' ও 'কাল-মৃগয়া'য়। "কালী কালী বল রে আজ" নামক ডাকাতদের কালী-বন্দনার সুর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজী গান থেকে তোলা; সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।

মূল ॥ Nancy Lee — ভাঙা ॥ কালী কালী
মূল ॥ Ye banks and braes — ভাঙা ॥ ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
মূল ॥ Robin Adair — ভাঙা ॥ সকলি ফুরালো
মূল ॥ Go where glory — ভাঙা ॥ মানা না মানিলি;
মরি ও কাহার বাছা;
ওহে দয়াময়

মূল ॥ The British Grenadiers ভাঙা ॥ তুই আয় রে কাছে আয়
মূল ॥ ? ভাঙা ॥ ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে
মূল ॥ Auld Lang Syne ভাঙা ॥ পুরানো সে দিনের কথা
মূল ॥ Drink to me only ভাঙা ॥ কতবার ভেবেছিনু [অচলিত]

কাল-মৃগয়ার অনেক গানই ইংরেজী বা স্কচ ও আয়রিশ সুরভাঙা। Go where glory waits thee -সুরটি Tom Mooreএর *Irish Melodies*এর অন্তর্গত। কবীন্দ্রের জীবনীকারেরা জানেন, তাঁর অল্পবয়সে তাঁদের দলে মূর-এর কবিতার এক সময় খুব চল ছিল। এই গানটির সুর আমার বড় মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই লেগেছিল, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া দুই নাট্যেই বনদেবীদের করুণভাবাত্মক দুটি গানে এই সুর দিয়েছেন। আর-একটি ধর্মসংগীতে দিয়েছেন — "ওহে দয়াময়", যা হয়ত এখনকার লোকে তত জানে না। এই সুরটি আমার তো মোটে বিদেশী লাগে না।

সূক্ষ্মভাবে ধরলে হয়ত রবীন্দ্রসংগীতে বৈলাতিক প্রভাব আরো দেখানো যেতে পারে; তবে এও ঠিক যে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি খুব বেশি বিদেশিয়ানার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি; বরাবরই স্বদেশী ভিত্তির উপর মজ্জাগত মৌলিকতা স্থাপন করেছেন। কোনো-কোনো উত্তেজনাপূর্ণ গানে তিনি বিলেতী 'কোরাস্' বা গানের প্রত্যেক কলির শেষে একটি ধুয়া সমবেত কণ্ঠে গাবার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যথা "জনগণমন"-র 'জয় হে জয় হে', কিম্বা "মাতৃমন্দির"-এর 'জয় জয় নরোত্তম' ইত্যাদি। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল। আর-একটি বিলেতী সুরবৈশিষ্ট্য — যাকে বলে হার্মনি বা স্বরসন্ধি — সেদিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর বংশের কেউ কেউ এদিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন; কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের অভাবে সে চেষ্টা ছেলেখেলামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে। তিনি তাদের এ খেলায় যোগ না দিলেও তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। এবং যদি এর পরে কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন তো তিনি থাকলে সর্বাগ্রে তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য দিতেন, এটুকু বলতে পারি।[২]

মনে করেছিলুম, **হিন্দী** ভাষা থেকে ভাঙা গানের একটি আলাদা বিভাগ করব, কারণ হিন্দী ভাষা একাই এক-শ'। কিন্তু সেগুলি এতই সংখ্যাবহুল যে, আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে তার অবতারণা করা সংগত মনে করলুম না। সেকালের ও মধ্যকালের রবীন্দ্রসংগীত হিন্দী থেকে এত ভাঙা হয়েছে যে, তার আলোচনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তবে আমার বক্তব্যের সম্পূর্ণতাসাধন এবং রবীন্দ্রসংগীতরসজ্ঞের কৌতূহল নিবারণার্থে পরিশিষ্টে তাঁর হিন্দী থেকে ভাঙা গানের একটি স্বতন্ত্র তালিকা যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছি সংযোজন করে দেওয়া গেল; যার যেমন মনে পড়ে, যদি এই জাতীয় হিন্দী গানের আরও নাম ও কথা বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ বা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তালিকাটি ক্রমশ সুসম্পূর্ণ হবার আশা করা যায়।— হিন্দী গানের প্রথম লাইন মাত্র দিলেও, অনুসন্ধিৎসুর সৌকর্যার্থে তার উৎপত্তিস্থানও যথাসম্ভব নির্দেশ করে দেওয়া হল। সুরে তালে

২ সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে পারা যায়।

উভয়বিধ গান শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হবে, তাঁরা দেখবেন যে এর মধ্যেও তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

২

আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় **বাংলা** ভাষা থেকে ভাঙা গান। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানই বেশির ভাগ ভেঙেছেন। কিন্তু আমি একটিমাত্র— বাঙলায় যাকে বলে রাগসংগীত— জানি, যা তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শলাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছে। এটির সঙ্গেও আমার ছেলেবেলাকার স্মৃতি জড়িত, কারণ এটি বোধহয় আমার বাইরের লোকের কাছে শেখা প্রথম গান। সে বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, কিন্তু এই গানের মধ্যে তাঁর অনামী স্মৃতি রয়ে গেছে। নীচে সেটির উল্লেখ করছি—

মূল ॥ চাঁচর চিকুর আধো
ভাঙা ॥ বেঁধেছ প্রেমের পাশে

এ গানটির কথা ও সুরের বাঁধুনি ভালো। আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এর মধ্যেও তিনি নিজত্ব দেখিয়েছেন, অর্থাৎ দুই ভাগের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছেন— যা মূল সুরে ছিল না।

বাংলা গানের সুরের সম্পর্কে এখানে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না ক'রে আমি থাকতে পারছি নে। এই একটিমাত্র সুর-রচনাতেই এমন ঐক্য, ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে শুনলেই রামপ্রসাদী সুর বলে দেশসুদ্ধ লোকে চিনতে পারে, এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড় কৃতিত্ব তা বোধহয় আমরা কখনো ভেবে দেখি নে বলেই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা তাঁকে দিই নে। এই খাঁটি সরল বাংলা সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বেঁধেছেন, যথা "আমিই শুধু রইনু বাকী" "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" "শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা" ইত্যাদি। শেষ গানটি যখন নিজে বাল্মীকি সেজে তাঁর পূর্ণ গলা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়পূর্বক গাইতেন, তখন ভাষায় রূপে রসে যে কী অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হত, যাঁরা না-দেখেছেন না-শুনেছেন তাঁদের শুধু শুষ্ক কথায় তা বোঝানো অসম্ভব।

বাউল সুরের চর্চা, ও বলতে গেলে তাকে জাতে তুলে নেওয়া, রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অঙ্গ, তা আগেই বলেছি। এ স্থলে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বাউল-ভাঙা সংগীতের উল্লেখ ক'রে এ পর্ব শেষ করব—

মূল ॥ হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে
ভাঙা ॥ যদি তোর ডাক শুনে কেউ
মূল ॥ আমি কোথায় পাব তারে
ভাঙা ॥ আমার সোনার বাংলা
মূল ॥ মন-মাঝি সামাল সামাল
ভাঙা ॥ এবার তোর মরা গাঙে

৩

আমি এই বলে আরম্ভ করেছিলুম যে, পরের কথায় নিজের সুর দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতে বিরল হলেও, একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়।

যতদূর জানি, বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর" এবং গোবিন্দদাসের "সুন্দরি রাধে" এই দুটি ব্রজভাষার গানেই কেবল তিনি সুর দিয়েছেন।

অবশ্য সংস্কৃত বেদগানে এবং পালি বৌদ্ধমন্ত্রে সুর দেওয়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেদগানের মধ্যে "যদেমি প্রস্ফুরন্নিব" "য আত্মদা বলদা" "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" "তমীশ্বরাণাং" এই চারটিই এখন প্রচলিত। কিন্তু "এষাস্য প্রশাসনে গার্গি", "ধীরাত্বস্য মহিম্না" এই দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন জানি; ব্রহ্মসংগীতে এর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু জানিনে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কোন নিয়মানুসারে এর সুরগুলি একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কেউ যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে দিতে পারেন ত বড়ই বাধিত হব।

পালি শ্লোকগুলি শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' পুস্তকে এবং সুরগুলিও তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ("রবীন্দ্রগীত-জিজ্ঞাসা", গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩১০) দেখলুম, রবীন্দ্রনাথের পরের কথায় সুর দেবার আরও কয়েকটি উদাহরণ আছে, যথা—

"মিলে সবে ভারত সন্তান", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩]

"বুঝতে নারি নারী কি চায়", অক্ষয়কুমার বড়াল

"গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে", সুকুমার রায়

আর-একটি পরস্ব গানে তিনি আংশিক ভাবে সুর বসিয়েছেন, যেটি একাই এক-শ'; সেটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামধন্য সর্বজনমান্য "বন্দে মাতরম্" গান। সেইটি গাইয়ে আমি আজকের আসর ভঙ্গ করব। শুধু তাই নয়, আপনাদের সেই সুর ধরিয়ে দেব যার রেশ কানের ভিতর দিয়ে মরমে নিয়ে আপনারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মহীয়ান মন্ত্র উচ্চারণ করতে সমর্থ হবেন, যার বলে স্বাধীনতার সিংহদ্বার অনায়াসে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। এখনো যেন বিশ্বাস হয় না যে আমাদের সেই স্বপ্নরাজ্য বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, সেই স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হয়েছে। কিন্তু যদি হয়ে থাকে তো এই গান তা'তে অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।†

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

---

৩ প্রবন্ধলেখক 'শতগান' থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটির সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬) গ্রন্থ থেকে এই কয় ছত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

"সত্যেন্দ্রনাথের গাও ভারতের জয় ··· হিন্দু মেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন— সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা জোরাল' সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।"—পৃ ১৪২

† শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসপ্তাহে বক্তৃতার সারমর্ম।

পরিশিষ্ট ॥ হিন্দীভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের তালিকা

এই তালিকা প্রণয়নে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীমান শান্তিদেব ঘোষ আমাকে প্রভূত সহায়তা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীমান প্রফুল্লকুমার দাসের কাছ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছি।

	বাংলা গান	মূল হিন্দী গান	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
১।	অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী ভয়ো	বেহাগ, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা †
২।	অমৃতের সাগরে	মৈ তো না জাউ	কামোদ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
৩।	অশ্রুভরা বেদনা	তনমনধন ভূয় পরবারে	-	-
৪।	অসীম আকাশে অগণ্য	সকল গুণ প্রকাশ	মারুকেদারা, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
৫।	অসীম কালসাগরে	সারদা বিদ্যাদেনী	ভৈরবী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা[১]
৬।	অহো! আস্পর্ধা একি	দারা দ্রিম্ তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	-
৭।	আইল আজি প্রাণসখা	খোল অব ঘুঁঘট পট	কেদারা, আড়াঠেকা	-
৮।	আঁখিজল মুছাইলে	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলি, ত্রিতাল	ইন্দিরা
৯।	আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধরো ধীর	কাফি, চৌতাল	-
১০।	আজ বুঝি আইল প্রিয়তম	ফুল রহি কলিয়াঁ মধুবন	সাহানা, ত্রিতালা	গীতসূত্রসার(২)
১১।	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	বহুর বজাও বংশী	পূরবী, তেওরা	গীতপ্রবেশিকা
১২।	আজি কমলমুকুলদল	মনকী কমলদল	মিশ্রবাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
১৩।	আজি বহিছে বসন্ত পবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন	বাহার, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৪।	আজি মম জীবনে নামিছে	অব মোরি পায়েলা বাজেন্থ	আড়ানা, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৫।	আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন মোর	বাহার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৬।	আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার	দেশ, পঞ্চমসওয়ারি	ইন্দিরা
১৭।	আজি হেরি সংসার অমৃতময়	এরি পরমেশ্বর	বেলাবলী, চৌতাল	-
১৮।	আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
১৯।	আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু রচো করতার	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
২০।	আমারে কর জীবন দান	ইয়া জগ ঝুট	শঙ্করা, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
২১।	আমি দীন অতি দীন	-	রামকিরি, ঝাঁপতাল	-
২২।	একি এ সুন্দর শোভা	বাজু রে মন্দর বাজু	ইমনভূপালি, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
২৩।	একি হরষ হেরি কাননে	মনকী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
২৪।	এত আনন্দধ্বনি উঠিল	আজু ব্রজমে	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী

† এই তালিকায় যে যে গানের বিপরীতে 'ইন্দিরা' উল্লিখিত হয়েছে, সেসব মূল হিন্দী গানের সম্পূর্ণ কথা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর কাছে পাওয়া যাবে।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

১ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

২৫।	এ পরবাসে রবে কে হায়	ও মিঞা বেজন্নুওয়ালে	সিন্ধু, মধ্যমান	-
২৬।	এ ভারতে রাখ	এ বতিয়াঁ মেরো	সুরট, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
২৭।	এ মোহ আবরণ খুলে দাও	ঘুঁঘট পট খোলি	ইমন, আড়াঠেকা	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
২৮।	এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গ রস সন	ইমনকল্যাণ, ত্রিতাল	সঙ্গীত মঞ্জরী
২৯।	এই যে হেরি গো দেবী	মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
৩০।	এস শরতের অমল মহিমা	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	জৌনপুরী, ত্রিতাল	-
৩১।	এসেছে সকলে কত আশে	বুঁদ পবন পুরবাই	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৩২।	ঐ পোহাইল তিমির রাতি	তোমতানা নানা নানা	আলাইয়া, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
৩৩।	ও কেন ভালোবাসা	কৌন পরদেশ	পিলু, খেমটা	-
৩৪।	ওঠ ওঠ রে বিফলে	-	বিভাস, চৌতাল	-
৩৫।	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে	এরিমা সব বন অমুয়া	পরজ-বাহার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[২]
৩৬।	কামনা করি একান্তে	প্রথম কর শিঙ্গার	দেশকার, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
৩৭।	কার বাঁশি নিশিভোরে	মোরে কান ভনকবা	গান্ধারী, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[৩]
৩৮।	কার মিলন চাও বিরহী	তন্থু মিলন দে পরবর	শ্রীরাগ, তেওরা	কণ্ঠকৌমুদী
৩৯।	কি করিলি মোহের ছলনে	অবদিন থোড়ি রহি	ভজন, ঠুংরি	সঙ্গীতপ্রকাশিকা[৪]
৪০।	কি ভয় অভয় ধামে	নিডর ডর নিমাই	শঙ্করা, ঝাঁপতাল	গীতসূত্রসার(২)
৪১।	কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁডে	সিন্ধু, মধ্যমান	সঙ্গীতবিজ্ঞান[৫]
৪২।	কেমনে ফিরিয়া যাও	বাবরে কি সঙ্গসাথ	ভৈরবী, চৌতাল	ইন্দিরা
৪৩।	কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত	আলাইয়া, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
৪৪।	কোথা যে উধাও হল	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার, ত্রিতাল	-
৪৫।	কোথা হতে বাজে	বাজ রহী সখি	সুরট, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৪৬।	কোলাহল ছাড়িয়ে	কাহ্ন ন কর মোসে	দরবারী টোড়ি, ঢিমাতেতালা	
৪৭।	খেলার সাথী বিদায়দ্বার	মহারাজা কেবড়িয়া	-	
৪৮।	গহন ঘন ছাইল	ইন্দহুঁকী অসাবরী	গৌড়মল্লার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৪৯।	গহন ঘন বনে	আলি রি, গরজত	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৫০।	ঘোরা রজনী এ	বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া	কানাড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
৫১।	চরণধ্বনি শুনি	মুরলী ধ্বনি শুনি	সিন্ধু, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৫২।	চরাচর সকলি মিছে মায়া	দারা দ্রিম্‌ তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	

২ আশ্বিন ১৩২৫

৩ ভাদ্র ১৩২৬

৪ আশ্বিন ১৩১১

৫ ফাল্গুন ১৩৩৪

৫৩।	চিরদিবস নব মাধুরী	নব ভবন নব রাঘব	নট্‌মল্লার, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
৫৪।	জগতে তুমি রাজা	অচল বিরাজ	কানাড়া, চৌতাল	-
৫৫।	জর জর প্রাণে নাথ	অব তেরি বাঁকিবাঁকি চিত	সিন্ধুড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
৫৬।	জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
৫৭।	জয় রাজরাজেশ্বর	-	ভূপালী, তালফেরতা	-
৫৮।	জাগ জাগ রে জাগ	প্রথম পরবর দিগারহি	তিলককামোদ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
৫৯।	জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজু রঙ্গ খেলত হোরি	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
৬০।	জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল	ঊঁচি চিত বন	বিভাস, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
৬১।	ডাক মোরে আজি	ক্যা করু ন মানেরী সখিরি	পরজ, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
৬২।	ডাকি তোমারে কাতরে	তুঁহি ভজ ভজ রে	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	-
৬৩।	ডাকিছ কে তুমি	হাঁরে ডফ বাজন	খাম্বাজ, ধামার	-
৬৪।	ডাকে বার বার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেদারা, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
৬৫।	ডুবি অমৃত পাথারে	-	ললিত, চৌতাল	-
৬৬।	তব অমল পরশ রস	তুয়া চরণ কমল 'পর	আশাবরী, ত্রিতাল	গীতপ্রবেশিকা
৬৭।	তব প্রেমসুধারসে মেতেছি	-	পরজ, ত্রিতাল	-
৬৮।	তবে কি ফিরিব	-	দেশীটোড়ী, ঢিমাতেতালা	-
৬৯।	তাঁহার প্রেমে কে ডুবে	-	ভৈঁরো, একতালা	-
৭০।	তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত	বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল	-
৭১।	তিমির বিভাবরী কাটে	ক্যায়সে কাটোঙ্গি	বেহাগ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
৭২।	তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবল দল মেঘ	মেঘ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৭৩।	তুমি আপনি জাগাও মোরে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈঁরো, ত্রিতাল	-
৭৪।	তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গৌড়, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
৭৫।	তোমা লাগি নাথ	তুম বিন রহো	পূরবী, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
৭৬।	তোমার দেখা পাব বলে	কর কঙ্গনওয়া	মল্লার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[৬]
৭৭।	তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	মেরে গিরিধর গোপাল	ভৈরবী, একতালা	-
৭৮।	তোমারি গেহে পালিছ	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	খাম্বাজ, একতালা	গীতপরিচয়
৭৯।	তোমারি মধুর রূপে	তেরো হি নয়নবাণ	ঝিঁঝিঁট, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
৮০।	তোমায় যতনে রাখিব হে	-	দেশখাম্বাজ, ঝাঁপতাল	-
৮১।	দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	রামকেলি, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৮২।	দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	এরি অব আনন্দ	ভীমপলাশী, সুরফাঁক	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(১)
৮৩।	দিন যায় রে দিন		পিলু, মধ্যমান	

৬ পৌষ ১৩২২

৮৪।	দুখ দূর করিলে	বাজত বীণ	রামকেলী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৮৫।	দুয়ারে বসে আছি প্রভু	মৈতো ন জাঁউ	কামোদ, ধামার	-
৮৬।	দেখা যদি দিলে	পিয়া বিন কৈসে	বেলাবলী, ত্রিতাল	-
৮৭।	দেবাধিদেব মহাদেব	দেবন দেব মহাদেব	দেওগিরি, সুরফাঁক্তা	গীতসূত্রসার(২)
৮৮।	নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বনবাঁশরী	টোড়ি, ত্রিতাল	-
৮৯।	নব নব পল্লবরাজি	মনমথ তন দহে	বাহার, চৌতাল	-
৯০।	নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলেরে	শ্যাম, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
৯১।	নাথ হে, প্রেমপথে	বলমা রে চুনরিয়া	সুহাকানাড়া, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
৯২।	নিকটে দেখিব তোমারে	আয়ু আইল ভোর কি	রামকেলি, ত্রিতাল	-
৯৩।	নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ানা, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
৯৪।	নিশিদিন চাহ রে	আজু মনভাবন যোগি আয়ে	যোগিয়া,আড়াঠেকা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(১)
৯৫।	নূতন প্রাণ দাও	সোতন মদ মাত	নাচারীটোড়ি,ধামার	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(১)
৯৬।	পান্থ এখন কেন অলসিত	রঙ্গ যুগত সৌঁ গাবে বজাবে	ললিত, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(১)
৯৭।	পিপাসা হায় নাহি মিটিল	সঁইয়া জাঁউ-জাঁউ নাহি বোলেঙ্গি	ভৈরবী, ত্রিতাল	-
৯৮।	পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম	কল্যাণ, চৌতাল	-
৯৯।	পেয়েছি অভয়পদ	ঈশ্বরী নাম জপ	খট্, ঝাঁপতাল	গীতসূত্রসার(২)
১০০।	পেয়েছি সন্ধান তব	-	গৌড়সারং, চৌতাল	-
১০১।	প্রচণ্ড গর্জনে	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১০২।	প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিব শক্তি	সোহিনী[১] সুরফাঁকতাল	গীতসূত্রসার(২)
১০৩।	প্রথম কারণ আদি কবি	প্রথম মঞ্জন করে বৈঠে	শুক্লবেলাবল, চৌতাল	ইন্দিরা
১০৪।	প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদনগর বসায়ে	গুর্জরী টোড়ি,চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(১)
১০৫।	ফিরায়ো না মুখখানি	কহো ন ঐসী বাত	হাম্বীর, ত্রিতাল	-
১০৬।	বন্ধু রহো রহো সাথে	সঙ্গে চলা, দিয়া, হাওয়ে	ভৈরবী, কার্ফা	-
১০৭।	বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ	দুসহ দোখ-দুখ দলনী	নিশাসাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১০৮।	বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১০৯।	বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিরখত ভুমঙ্গ	আড়ানা, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১১০।	বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ এ	ভীমপলশ্রী, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
১১১।	বিমল আনন্দে জাগ রে	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে	গান্ধারী, ত্রিতাল	-
১১২।	বিশ্ববীণা রবে	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস	শঙ্করাভরণ, তালফেরতা	ইন্দিরা
১১৩।	বীণা বাজাও হে	বীণ বাজাই রে	পূরবী, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
১১৪।	ভক্ত হৃদি বিকাশ	শম্ভু হর মহেশ	ছায়ানট, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

[১] গীতসূত্রসারে সোহিনী রাগিণী বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা দীপক পঞ্চম হইবে।

১১৫।	মধুররূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো	তিলককামোদ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১১৬।	মন জাগো মঙ্গললোকে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈরোঁ, ত্রিতাল	
১১৭।	মন জানে মনোমোহন	জান সব জগজন	নট, চৌতাল	
১১৮।	মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগি রহে	আড়ানা, একতালা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
১১৯।	মম অঙ্গনে স্বামী	আজু ব্রজমে সৈঁইয়া	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২০।	মহারাজ একি সাজে	মেরে দুন্দ দল সাজে	বেহাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২১।	মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরি নয়ি লগন লাগি রে	নটমল্লার, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২২।	রাখো রাখো রে জীবনে	জান না দোঙ্গি এরি মা	শ্যাম, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা(২)
১২৩।	রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল	-
১২৪।	শক্তিরূপ হের তাঁর	সপ্তসুর তিনগ্রাম	ইমন, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২৫।	শান্তি কর বরিষণ	শম্ভু হর পদযুগ	তিলককামোদ, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২৬।	শান্তি সমুদ্র তুমি	হো নর হর	টোড়ি, ঢিমাতেতালা	-
১২৭।	শীতল তব পদছায়া	বাঙ্গুরী মোরী	ইমনকল্যাণ, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২৮।	শুভ্র আসনে বিরাজ	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন	ভৈঁরো, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১২৯।	শূন্য প্রাণ কাঁদে	-	সিন্ধু, একতালা	-
১৩০।	শূন্য হাতে ফিরি হে	রুমঝুম বরখে	কাফি, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৩১।	শোন তাঁর সুধাবাণী	শুধমুদ্রা শুধবাণী	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
১৩২।	শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ	-	পূরবী, ত্রিতাল	-
১৩৩।	সখা সাধিতে সাধাতে	সখি তরসে তরসে	মিশ্র, খেমটা	-
১৩৪।	সখি আঁধারে একেলা ঘরে	-	-	-
১৩৫।	সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী	ইমনকল্যাণ, তেওরা	গীতসূত্রসার(২)
১৩৬।	সবে আনন্দ করো	সুখ আনন্দ করো	দেওগিরি-বেলাবলী, আড়াচৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
১৩৭।	সবে মিলি গাও রে	সব মিল গাও	হেমখেম, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)
১৩৮।	সংশয় তিমির মাঝে	অজ্ঞান তমনিকরে	দশসিন্ধু, কাওয়ালি	কণ্ঠকৌমুদী
১৩৯।	সংসারে কোন ভয় নাহি	শ্যামকো দরশন নাহি	ইমনকল্যাণ, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৪০।	সাজাব তোমারে হে	ভুলিসি গোবারণ	নটকিন্দ্র, ধামার	গীতসূত্রসার(২)
১৪১।	সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারাদীম দারাদীম	নটমল্লার, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৪২।	সুধাসাগর তীরে	আয়ো ফাগুন বড়ো মান	নায়কীকানাড়া, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৪৩।	সুন্দর বহে আনন্দ	শঙ্কর শিব পিনাকী	ইমনকল্যাণ, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
১৪৪।	সুমধুর শুনি আজি	কৌন পাপৈন জাগাও	শঙ্করাভরণ, আড়াঠেকা	কণ্ঠকৌমুদী
১৪৫।	স্বপন যদি ভাঙিলে	-	রামকেলি, একতালা	-
১৪৬।	স্বামী তুমি এস আজ	সাঁই তো ন আওয়ে আজ	বেহাগ, চৌতাল	গীতসূত্রসার(২)

১৪৭।	হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা	তানানা দ্রে দ্রে	দেশ, ত্রিতাল	-
১৪৮।	হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে	সখি কা পত বাকে	জয়জয়ন্তী, ধামার	-
১৪৯।	হিয়া মাঝে গোপনে হেরি যে	পিয়া বিদেশ গয়ে	ভৈঁরো	-
১৫০।	হৃদয়নন্দনবনে	উড়ত বন্দন নব	ললিতাগৌরী, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা
১৫১।	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল	মিয়া বে মাহুলে	ঝিঁঝিঁট, মধ্যমান	-
১৫২।	হৃদয় বেদনা বহিয়া	-	সিন্ধু, তেওরা	-
১৫৩।	হৃদয়মন্দিরে, প্রাণাধীশ	-	বেহাগ, ত্রিতাল	-
১৫৪।	হে মন তাঁরে দেখ	এ মনকে আঁখ	বেলাবলী, রূপক	গীতসূত্রসার(২)
১৫৫।	হে মহাপ্রবল বলী	হে মা প্রবল বলী	মিশ্র কানাড়া, চৌতাল	ইন্দিরা
১৫৬।	হে সখা মম হৃদয়ে রহ	এ সখি অব কৈসে করু	ছায়ানট, একতালা	-

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে আত্মভোলা সাহিত্যিক নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিয়া নানাভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ একান্ত শ্রদ্ধাভরে 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সেই কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম মাত্র আমরা স্মরণে রাখিয়াছি। তাঁহার জীবনীর সামান্য উপকরণ ঘাঁটিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, তিনি সত্যই সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন— যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। ইঁহার সহধর্ম্মিণী বাংলা কথাচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িত্রী— শরৎকুমারী চৌধুরাণী সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ অবহিত ছিলাম না। এই সাহিত্যিক দম্পতি শুধু নিজেদের দানে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, তাঁহাদের কালে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সাহিত্যিককে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কিছু কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া রবীন্দ্রভক্তদের গোচরে আছে। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির খবর আজ কেহ বড়-একটা রাখেন না।

বংশ-পরিচয় : শিক্ষা

অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম ১৮৫০ সনে, আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশে। তাঁহার পিতার নাম— মিহিরচন্দ্র চৌধুরী, সে-যুগের একজন এটর্নী। অক্ষয়চন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ সন্তান; অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন।

অক্ষয়চন্দ্র বিলক্ষণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব দিতেছি :

ইং ১৮৬২	... এন্‌ট্রান্স		...	কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল।
১৮৬৪	... এফ. এ.	দ্বিতীয় বিভাগ	...	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭০	... বি. এ.		...	ঐ
	... এম. এ.		...	ঐ
১৮৭৫	... বি. এল.	দ্বিতীয় বিভাগ	...	ঐ
১৮৭৮, ১৫ এপ্রিল	... এটর্নী			

বিবাহ

চোরবাগানের বসু-বংশের শশিভূষণ বসু অবস্থাবিপর্য্যয়ে ভাগ্যপরীক্ষার্থ ১৮৬৩ সনে প্রবাস-জীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল লাহোর। কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সদ্য এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ অক্ষয়চন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা শরৎকুমারীর বিবাহ দেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়— ২৯এ ফাল্গুন ১২৭৭ (১২ মার্চ ১৮৭১) তারিখে।[১] অক্ষয়চন্দ্র তখন তরুণ কবি ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

---

১ শরৎকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু আমাকে জানাইয়াছেন— "আছে কেবল বাবার ডায়ারী। ১৮৭১ সালে দিদির বিয়ে সম্বন্ধে বাবার যে লেখা আছে তাতে দেখা যায় অক্ষয়চন্দ্রের তখন ২১ বৎসর বয়স, এবং এম. এ. পাস।"

ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে

অক্ষয়চন্দ্র অল্প বয়স হইতেই (আনুমানিক ১৮৬৫ সনে) জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে প্রকাশ :

"জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে সমস্বরে পাঠ করানো হইত। যেখানে এক সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

"ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই 'Poet' 'Poet' বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।"— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি,' পৃ. ৫৩

১৮৬৮, ১১ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের উদ্যানে চৈত্রমেলার (পরে, হিন্দুমেলা) দ্বিতীয় অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "উদ্বোধন" নামে এবং অক্ষয়চন্দ্র "ভারত" নামে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কবিতা দুইটি মেলার কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাই বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র— উভয় বন্ধুতে মিলিয়া অবাধে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র বাঁয়া তবলা বাজাইতে ভালবাসিতেন; অনেক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেয়ালা বাজাইতেন, তিনি তবলায় সঙ্গত করিতেন।

১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকে'র জন্য রবীন্দ্রনাথ "জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" গানখানি রচনা করিয়া দিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন্ দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চ্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" পৃ. ১৫১

'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে

বিবাহের পর অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারী পিতার সহিত আবার লাহোর চলিয়া গিয়াছিলেন। বছর-পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায় স্বামীর কাছে আসেন; অক্ষয়চন্দ্র তখন মানিকতলা

স্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে অবস্থান করেন। এই সময়ে 'ভারতী' প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭, জুলাই) মাসে 'ভারতী'র উদয় হয়। ইহার ভিত্তিস্থাপনার মূলে ছিলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারীও 'ভারতী'র সম্পাদক-মণ্ডলীতে একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। "ভারতীর ভিটা" প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :

"আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। একটি হলুদে রঙের বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার।...সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' [অক্ষয়চন্দ্রকে] লইয়া ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন। কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম— সেখানে ন-বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন শেক্সপিয়ার পাঠ করিতেন। ...সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১টা বাজিয়া যাইত।...

"পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন ভারতীর সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও 'তাঁহার' রচনা কিছু না কিছু প্রকাশিত হইতই।...ভারতীর খোরাকের অভাব কখনও হইত না; বাহিরের প্রবন্ধাদি বড় একটা আবশ্যক হইত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু সস্ত্রীক দীর্ঘকালের জন্য স্টীমারে জলযাত্রা করিলেন, তখন 'ভারতী' পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার 'তাঁহার' উপর ন্যস্ত হইল। অনেক সময় দেখিয়াছি প্রবন্ধের জন্য প্রেসের লোক বসিয়া রহিয়াছে, 'তিনি' তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে 'তাঁহার' কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা বোধ হয় ভারতীর জন্যই প্রথম রচিত হইয়াছিল।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

অক্ষয়চন্দ্র 'ভারতী'র সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :

"প্রথম বর্ষের 'ভারতী'তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল।...অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক-একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।" 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১৫২

অক্ষয়চন্দ্রের একটা বিশেষত্ব— তিনি মোটেই নামের বা যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই। এই জন্য দেখি 'ভারতী'র ('সাধনা'রও বটে) পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার অধিকাংশ রচনাই স্বাক্ষরবিহীন; আজিকার দিনে সেগুলি চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

সঙ্গীতরচনা

অক্ষয়চন্দ্র সঙ্গীত রচনাতেও সুপটু ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবা মাত্র, সেটি আরও কয়েক বার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।...স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।...

"এক দিন জ্যোতিবাবুরা কয়েক জন বন্ধুবান্ধব সহ স্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত স্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর-রচনা করিতেছিলেন, ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে 'মানভঙ্গ' নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। 'মানভঙ্গ' প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়।" 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি,' পৃ. ১৫৫-৫৭

এই গীতিনাটিকাখানি 'মানভঙ্গ' নহে—'মানময়ী,' ১৮০২ শকে (=ইং ১৮৮০) প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ গানই অক্ষয়চন্দ্রের রচিত।

অক্ষয়চন্দ্র "লৌকিক প্রেমাদি বিষয়ক" গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর তেরটি গান ১৩০৪ সালে (ইং ১৮৯৭) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'য় আছে ; ইহার দুইটি আবার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তেও (পৃ. ১৫৫) স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গীতিনাট্যেও অক্ষয়চন্দ্রের রচিত গান মিশিয়া আছে। তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন— "বাল্মীকি-প্রতিভায় [বাং ১২৯২] অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে।" ইহার একটি "রাঙাপদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা"। তাঁহার 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে "দে লো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে" গানটিও অক্ষয়চন্দ্রের রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।

রচনাবলী

অক্ষয়চন্দ্র মাত্র তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুইখানিতে তাঁহার নামই ছিল না। এগুলির প্রকাশকাল সহ তালিকা :

১। **উদাসিনী** (গীতিকাব্য) : সংবৎ ১৯৩০ (৯-২-১৮৭৪)। পৃ. ১০৮।

২। **সাগর-সঙ্গমে** (গাথা) : শকাব্দা ১৮০৩ (২০-৬-১৮৮১)। পৃ. ৬৬।

১২৮৫, অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে।

৩। **ভারত-গাথা** : ২৪ মাঘ ১৩০১ (৬-২-১৮৯৫)। পৃ. ৭৮।

সূচী : (প্রথম স্তবক)— আর্য্যপর্ব্ব, আর্য্যবিপ্লব-পর্ব্ব, বৌদ্ধপর্ব্ব, পাঠানপর্ব্ব, মোগলপর্ব্ব, বঙ্গপর্ব্ব, মার্হাট্টা পর্ব্ব, শীখ-পর্ব্ব, মহীশূর-পর্ব্ব।

(দ্বিতীয় স্তবক) ইংরাজ পর্ব্ব—বিদেশী বণিক্, ইষ্ট্-ইন্দ্ কোম্পানী, কর্ণাট যুদ্ধ, ইংরাজ শাসন-পর্ব্ব, ক্লাইভ হইতে ক্যানিঙ্গ পর্য্যন্ত, কল্পনা-চিত্র, সিপাহী-বিদ্রোহ, উপসংহার।[২]

আমরা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় অক্ষয়চন্দ্রের স্বাক্ষরিত এই কয়টি কবিতার সন্ধান পাইয়াছি : (ক) মাধবমালতী : 'জ্ঞানাঙ্কুর' পৌষ ১২৮২। (খ) অভিমানিনী নির্ঝরিণী : 'ভারতী' অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ (ইহা ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীতে' "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" কবিতার সহিত পুনর্মুদিত হইয়াছে)। (গ) 'অশ্রুকণা'-পাঠে : 'ভারতী ও বালক' আশ্বিন ১২৯৪। (ঘ) প্রকৃতি-মন্দিরে : ঐ আষাঢ় ১২৯৮। (ঙ) জন্মদিন : সাধনা, পৌষ ১২৯৯। (চ) স্তব-গান : ঐ আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১। (ছ) বন্ধু-বিয়োগ : 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। (জ) ভারত : ঐ চৈত্র ১৩১৩ (ইহা ১৮৬৮ সনে অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

রচনার নিদর্শন

অক্ষয়চন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের গ্রন্থাগারে এগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এগুলির কোন কোন স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

'উদাসিনী'

৩য় সর্গ : পৃ. ১৯-২০

যে ভেলা নির্ভর ক'রে, দুস্তর ভব সাগরে,
জননি গো দিয়েছি সাঁতার।
সহসা ভাসায়ে জলে, অতল জলধি-তলে,
মগ্ন হ'ল অদৃষ্টে আমার॥

চারি দিক শূন্যাকার, ধূ ধূ করে পারাবার,
হুতাশে হতাশ প্রাণ মন।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, কল্পনা শক্রতা করি,
বিভীষিকা করে প্রদর্শন॥

---

২ শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু জানাইয়াছেন, "অক্ষয়বাবুর আর একটি ছোট কাব্য ছাপা হয়, বন্ধুবান্ধবদের বিতরণের জন্তে। তার যে কি নাম ছিল, আর কোন্ বছরে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে ছাপে, কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে তার প্রথম লাইনটুকু— 'ডাগর ডাগর ফুটেছে টগর'।"

কোন দিকে নাহি স্থল, গর্জ্জয়ে গভীর জল,
আর্ত্তনাদ শূন্যেতে মিশায়।
আতঙ্কেতে অনুক্ষণ, সঘনে শীহরে মন,
ভাবনায় ছিন্ন ভিন্ন প্রায়॥

'সাগর-সঙ্গমে'

১ম সর্গ : পৃ. ৬-৭

নেহারে যুবক দামিনীর পানে,
দ্বাদশবর্ষীয়া রূপসী বালা,
দ্বিতীয়ার শশী, পড়িয়াছে খসি,
আধো-ফোটো রূপে সাগর আলো।

হেথায় হোথায়, সাগরের বায়,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে, পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।

আ-নাভী মগন সাগর সলিলে,
ঝাঁপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল, জলধি কমল,
টল মল করে স্রোতের ঘায়!

সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে!

পলকে পলকে বিজলী দলকে,
অধরে মধুর হাসির ছটা,
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ,
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।

লহরী লীলায়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
উজল রূপের উজল ছায়া,
কষিত তরল হিরণ-বরণ
হ'য়েছে শ্যামল সাগর কায়া!

৫ম সর্গ : পৃ. ৫৭

হ'য়েছে প্রভাত ;—মৃদুল পবন
সাগরের সনে করিছে খেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আঁধার,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা চিকন-মেঘেতে
পূরব আকাশ হ'য়েছে লাল,
গগনে উড়িছে সাগর-কপোত,
বেলায় খেলায় হরিণী পাল।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তরী,
পাল তুলে তারা ছাড়িল সব,
মাঝিরা ধরিল সুখে সারী-গান,
বাতাসে উথলে সেই সে রব।

'ভারত-গাথা'

পৃ. ১৪

কিছু কাল আর্য্যাবর্ত্ত আছে শান্তিময়,
নদী দিয়া রক্ত-ধারা আর নাহি বয়।
নিভে গেছে রণঅগ্নি, ঘুচে গেছে ত্রাস,
রণক্ষেত্রে করে কৃষি সুখে চাষবাস।
বাজায়ে বাঁশের বাঁশী প্রফুল্ল রাখাল
চরায় কন্দরে মাঠে গো-মহিষ-পাল।
বারো মাসে হিন্দুদের পার্ব্বণের ধুম—
দিনে নাহি কর্ম্মকায, রাত্রে নাহি ঘুম
দেবালয়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজে অনিবার,
গঙ্গা-যমুনার ঘাটে শাস্ত্রের বিচার।

অসি আছে নিজ কোষে, ঘরে ঝোলে ঢাল,
নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করে আর্য্যমহীপাল।
ক্ষত্রে ক্ষত্রে ছিল বটে সমর-উৎপাত,
তা কিন্তু ক্ষণিক মাত্র, নহে মর্ম্মাঘাত,
কত দিন থেমেছিল ঝটিকার বেগ—
সহসা পশ্চিম-কোণে দেখা দিল মেঘ!
কহ গো, ভারতলক্ষ্মি! লুকাব কোথায়,
আর তো এ আর্য্যভূমে থাকা হ'ল দায়।
অনৈক্য আর্য্যেরা এবে, কেবা লয় ঝুঁকি,
গিজনীর 'মামুদ' ওই মারিতেছে উঁকি।

মৃত্যু

মাত্র তিন দিনের অসুখে অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-তারিখ— ২৩এ ভাদ্র ১৩০৫ (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার "বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা" অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :

"বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার

যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে [জ্যৈষ্ঠ ১২৮১] যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।[৩]

"সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔদার্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায়-তোলা মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে-লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।"

---

৩ "ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্ব্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"—পাণ্ডুলিপি

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বানুবৃত্তি

মঙ্গল [১৪ অক্টোবর ১৮৯০]। Gibএ পৌঁছন গেল। ভয়ানক বৃষ্টি হচ্চে। Gibralterএর পাহাড় মেঘে অনেকটা ঢেকে ফেলেচে। দুটি Sisters of Mercy alms for the poor বলে সকলের কাছে২ ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছিল— আমি তাদের একটি অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা দিলুম— একটু আশ্চর্য্যভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে— অধিকাংশ ইংরেজসন্তান প্যাণ্ট্‌লুনের পকেটে হাত গুঁজে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন ক্রোশ তিনেকের মধ্যে আর কোন জনমানবের সম্পর্ক নেই।

(মানুষের সবলতা দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে উদয় হল। নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর চেয়ে অধিকতর পরিণত ও বলিষ্ঠ। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চল্‌বার আগে পড়তে হয় না— মানুষকে সহস্রবার পড়তে হয়। জন্তুদের জীবনের প্রসার সঙ্কীর্ণ এইজন্যে আরম্ভকাল থেকেই তারা শক্ত সমর্থ— মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্যে সে বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিণত দুর্ব্বল। যে সকল মানুষের অত্যন্ত অবিচলিত সঙ্কল্প, প্রচণ্ড strong will, যারা কখনো ভ্রমে পড়ে না, চিরদিন শক্তভাবে চলে, তাদের জীবনের মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্ত প্রসরতার ব্যাঘাতজনক কঠিন সঙ্কীর্ণতা আছে— তাদের জীবনের পরিণতি অতি শীঘ্রই বদ্ধ হয়ে যায়। Instinct ঠিক পথে চলে কিন্তু বুদ্ধি ইতস্ততঃপূর্ব্বক ভ্রমের মধ্যে দিয়ে যায়— Instinct পশুদের এবং বুদ্ধি মানুষের— Instinctএর গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে— বুদ্ধির শেষলক্ষ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আবশ্যকের আকর্ষণ অতি সাবধানে আমাদের সুবিধার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় স্বার্থপরতার মধ্যেই তার সীমা— সৌন্দর্য্য ও ভালবাসার আকর্ষণ আমাদের সহস্রবার ধূলায় ফেলে দেয়, অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে কিন্তু তার সীমা কোথায় কে জানে। অনন্তের দিকে যার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই আপনাকে পদে পদে দুর্ব্বল বলে অনুভব করে— ক্ষুদ্র সীমা ও সঙ্কীর্ণ সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে যার জীবনের স্বাভাবিক বিলাস, সে যতটুকু মৎলব করে ততটুকু করে ওঠে, যতটুকু চায় ততটুকু আদায় করে নেয়। সেই সবল— তার সবলতা দেখে আমরা আপাততঃ হিংসা করি কিন্তু চিরজীবনের raceএ একদিন হয়ত তাকে আমরা অবহেলে ছাড়িয়ে যাব। মানবসন্তান বলে বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা, বহুকাল আমরা পড়ি বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদের শিখ্‌তে যায়— অনন্তের সন্তান বলে

এতকাল ধরে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য— সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ— তাতেই আমাদের বলে দিচ্চে এখনো আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের শেষ হয়নি। শৈশবই যদি মানুষের শেষ হত তা হলে মানুষের মত অপরিস্ফুটতা প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যেত না— আমাদের এই অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনই যদি আমাদের শেষ হত তাহলেই আমরা একান্ত দুর্ব্বল সন্দেহ নেই। কিন্তু শৈশবের দুর্ব্বলতাই যেমন প্রকাশ করচে তার উন্নততর ভবিষ্যৎ আছে— তেমনি মানুষের এই দুর্ব্বল ইহজীবনই তার ভবিষ্যৎ উন্নততর জীবনের সূচনা।

পৃথিবীর কত পতিত কত অপরাধী, পৃথিবীর কত বলিষ্ঠহৃদয় সাধুর চেয়ে প্রকৃতপক্ষে মহৎ এবং কুলীন বংশোদ্‌ভব তা চিরজীবনের হিসাবে ক্রমশঃ ব্যক্ত হবে।

Natural Selectionএর নিয়ম মানুষ পর্য্যন্ত এগিয়ে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে— তার শেষ ফল কি ভাল করে বুঝে ওঠা যায় না। দেখা যাচ্চে সৌন্দর্য্যপ্রেম অনেক স্থলে আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের হানিজনক। শিল্পচর্চ্চার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়— অনেক বড় বড় শিল্পী বিস্তর দারিদ্র্যকষ্ট এবং জীবনের ক্ষতি স্বীকার করে শিল্পচর্চ্চা করেচে— এবং এইরকম করেই অল্পে অল্পে শিল্পবিদ্যার উন্নতি হয়েচে— Natural Selectionএর নিয়মে এর কোন কারণ পাওয়া যায় না। জীবনের ক্ষতির মধ্যে দিয়েই উন্নতি এ কেবল মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে দেখা যায়। বিজ্ঞান সম্প্রতি মানুষের কাজে লেগেচে কিন্তু তার আরম্ভকালে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা থেকে যখন বিবিধ শারীরিক দুর্গতি এবং প্রাণপণ স্বীকার করে বহুকাল ধরে মানুষ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে এসেচে তার কারণ কি? দুয়ের মধ্যেই দেখা যাচ্চে রহস্যের প্রতি মানবমনের অসীম আকর্ষণ— এমন কি অনেক স্থলে তা জীবনাসক্তিকেও ছাড়িয়ে ওঠে। আমাদের যা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা এই Natural Selection নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। আমরা প্রাণ সমর্পণ করে জ্ঞান পেয়েচি ধর্ম্ম পেয়েছি শিল্প রচনা করেচি। সভ্যতার সঙ্গে২ মানুষের মধ্যে ভালবাসা যে ক্রমে বাড়চে তা অনেক পরিমাণে তার অকারণ দুঃখজনক, এবং তার জীবনরক্ষার বিরোধী— কিন্তু তবু কোন্ নিয়মানুসারে আমরা উত্তরোত্তর তাকে এত উচ্চ আসন দিচ্চি?

পৃথিবীতে কোন একটা সীমায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে থেমে থাকবার যো নেই— তাহলেই আবার হুহু করে পিছিয়ে পড়তে হয়। আপনাকে কোন এক স্থানে বজায় রাখ্‌তে হলেও অবিশ্রাম চেষ্টার আবশ্যক। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই চেষ্টার বাইরে এসে পড়ে যা পেয়েছিলুম তা উত্তরোত্তর হারাচ্ছি। Australiaর Apteryx পাখীর মত আমাদের ডানা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে— কিন্তু এখনকার জীবনসংগ্রামের মধ্যে পড়ে আবার কি সেই ডানা আমরা ফিরে পাব? কিম্বা আত্মরক্ষার উপযোগী আর কোন রকম নতুন ইন্দ্রিয় উদ্‌ভূত হবে।

✓ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যা প্রাচীন সভ্যতা প্রাচীন প্রাণ খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মত সঞ্চিত হয়ে রয়েচে। তার মধ্যে বহুযুগের উত্তাপ এবং আলোক প্রচ্ছন্ন আছে— কিন্তু আমাদের

কাছে তা ঘোর অন্ধকারময় শীতল, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারের স্তূপ। অগ্নিশিখা যদি না থাকে তাহলে গবেষণাদ্বারা পুরাকালের মধ্যে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড তুলে আন না কেন তা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বরঞ্চ য়ুরোপীয়েরা তাকে ব্যবহারের মধ্যে আন্‌তে পারে কারণ তাদের হাতে সেই অগ্নিশিখা আছে— আমরা তাকে নিয়ে কেবল খেলা করব কিন্তু তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারব না। বর্ত্তমানকালে প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র নিয়ে আমরা যে রকম খেলা আরম্ভ করেচি তাই দেখে আমার মনে এই কথা উদয় হল। আমরা মনে করচি পুনর্ব্বার মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে টিকি প্রচলিত করে এবং হবিষ্যান্ন খেয়ে আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি হব। এদিকে য়ুরোপীয়েরা আমাদের শাস্ত্র থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও শব্দবিজ্ঞান উদ্ধার করচে আমরা যে যার ঘরে বসে নবোদ্‌ভূত টিকি আন্দোলনপূর্ব্বক তাদের পরম মূর্খ বলে বিদ্রূপ করচি।

আজ আর একজন সহযাত্রীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হল। সে নতুন ভারতবর্ষে যাচ্চে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে তাকে অনেক কথা বল্লুম। সে বল্লে English people are very selfish, they can be very nice and all that so long as their self-interest is untouched but—

আজ ডিনার টেবিলে একটা মস্ত জোয়ান মোটা আঙ্গুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল— সুন্দরী উল্লেখ করলে— পাখাওয়ালারা পাখা টান্‌তে২ ঘুমোয়— গৌরাঙ্গ বল্লে তার উপায় হচ্চে লাথি কিম্বা লাঠি— এবং তাই নিয়ে উভয়ে মিলে ঘোঁট চল্‌তে লাগল। আমার এমন অন্তর্দাহ হচ্ছিল বল্‌তে পারিনে। এদের এমন সভ্যতা যে এদের মেয়েদের পর্য্যন্ত দয়ামায়া নেই। এইরকমভাবে যারা সর্ব্বদা কথা কয় তারা যে অনায়াসে পরম ঘৃণার সঙ্গে আমাদের দেশের গরিব দুর্ব্বল বেচারাদের খুন করে ফেল্‌বে তার আর বিচিত্র কি? আমি ত সেই অপমানিত পদদলিত জাতির একজন— কোন্ লজ্জায় কোন্‌মুখে আমি এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং ভদ্রতার দন্তবিকাশ করি! আমার নবপরিচিত বন্ধু আমার পাশে বসেছিল তাকে আমি বল্লুম "আমার এই ভারি আশ্চর্য্য মনে হয় তোমাদের মেয়েদের মনেও দয়া নেই?" সে বল্লে "Our women are quite callous & indifferent where it is fashionable to show pity they perform their part beautifully well— where it is just the other way they show an amazing lack of the so-called womanly quality." এদিকে সভা করে সমিতি করে চাঁদা তুলে মহাসমারোহের সঙ্গে দয়া করে থাকেন অথচ উপস্থিতক্ষেত্রে যেখানে তাঁদের চোখের সাম্‌নে একান্ত অসহায় দুর্ব্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন চল্‌চে সেখানে দয়ার উদ্রেক নেই এবং তাই নিয়ে এইরকম নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বর্ব্বরভাবে আন্দোলন! ইংরিজি ভাষা আমার তাড়াতাড়ি আসে না— বিশেষতঃ মন যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়।— আমি বসে বসে মনে মনে ইংরিজি বানাতে লাগ্‌লুম— A gentleman is a gentleman whatever inconveniences he may have to put up with. And I think it is a gross act of cowardice to hit a fellow who can't return you blow for blow. Yes admittedly we are a weaker people and you are very strong with your brute strength.

—But muscular superiority is not a thing to be particularly proud of. Perhaps you will say "Arn't we your superior in any other respect?" Well, you may be for aught I know but certainly you don't show it when you strike a weak helpless poor man. And for what? Imagine a miserable creature who has been working all day with perhaps only one meal in the early morning, gives up his night's rest for the chance of earning a few more pice, and can you wonder that he should doze off to sleep and couldn't keep himself awake even to save his life? And Pankhapulling is the sovran remedy for insomnia. If ever you are troubled with sleeplessness just take your punkhawalla's place and pull your own punkha.—It will do you more good than any medicine in the world. If the author of Vice Versa could write a story reversing the positions of the punkhapuller and his master it could be made a source of infinite amusement and I hope of instruction to the Anglo-Indian.

You always try to set our social shortcomings against our political aspirations and say, the people who have early marriage is not fit for self-government. We may with greater justice say, people who bully their weaker fellow-beings, who habitually ill-treat their servants who have not the power to retaliate, who indulge in barbarous exercise of brute power whenever they imagine themselves perfectly secure, are not fit to govern any nation. Of course, moral retribution comes very slowly, but surely —it very often has no immediate means of revenge like the cowardly kick that ruptures spleen, but it is all the more thorough and unrelenting in its action. Even if these repeated insults do not arouse our miserable people from their lethargy and goad them to take God's revenge in their own hands, this unbridled exercise of tyranny is sure to react on your national character; this growing habit of revelling in the wild display of gross physical power will be one of the potent sources of your national downfall. It will undermine the true love of freedom on which your greatness rests— and maltreated humanity will thus have its awful revenge by depriving you for ever of the only source of all real powers.

What I cannot understand is how your ladies, who are ever ready with their noisy demonstrations of pity where their pity is very often superfluous and even harmful, do not feel for the wretches who are treated in such heartless manner by their husbands and brothers before their eyes. We thank God that our early marriages and myriad other social evils have not produced such utter heartlessness in our women.

যাহোক আমার বুদ্ধি যতই বাড়তে লাগ্‌ল চোর ততই দূরবর্ত্তী হতে লাগ্‌ল। তারা অন্য নানা কথায় গিয়ে পড়ল আমি আর কিছু বল্‌বার সময় পেলুমনা— কেবল নিষ্ফল আক্রোশে রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমার ইংরিজি শিক্ষার অভাব আর কখনো এমন অনুভব করিনি। কোন কিছু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজেকে এমন stupid বলে মনে হয়! কিন্তু মজা দেখেচি এক একজন লোকের সঙ্গে এবং এক একটা বিষয়ে আমি বেশ বলে যেতে পারি। Evansএর সঙ্গে যখন আমার আলোচনা চল্‌ত আমি নিজে আশ্চর্য্য হয়ে যেতুম— বেশ গুছিয়ে বল্‌তে পারতুম। কিন্তু যখন excited

হয়ে ওঠা যায় এবং যখন ভালরকম করে বলা বিশেষ আবশ্যক হয় তখন অনেকগুলো কথা একসঙ্গে উঠে কণ্ঠরোধ করে দেয়— গুছিয়ে নেবার সময় পাওয়া যায়না। এই অবসরে কিছু বলে নিতে পারলুম না বলে আমার নিজের উপর এমন বিরক্ত বোধ হচ্চে। আমি সত্যিং এমন stupid, অথচ আমার বুদ্ধি নেই একথা বল্‌তে পারিনে— ঘরে বসে বসে অনেক বুদ্ধি জোটে, কিন্তু ঠিক আবশ্যকের সময় কোনটাকে ডেকে পাওয়া যায়না।— Cabinএ ফিরে এসে Connollyর কাছে আমার মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করতে লাগ্‌লুম। আমি বল্লুম It makes me feel wild— সে বল্লে I can quite understand your feeling— বলে অনেকক্ষণ দুজনে কথা হল। তার পরে ছাতে গিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গেও এই নিয়ে আন্দোলন করে মন কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হল। এমন সময়ে একজন Lady এসে আমাকে গান গাইতে ডেকে নিয়ে গেল— Good night— chantez— Ave Maria গাইলুম— আমার গলার জন্যে খুব প্রশংসা পেয়েছি। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলে কোথায় আমার শিক্ষা— আমি বল্লুম মস্ত Professor আমার nieceএর কাছে। তার পরে "অলি বারবার"টা গাইতে হল— খুব ভাল বল্লে।

বুধবার [১৫ অক্‌টোবর]। সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে আমার খুব ভাল লাগে আমি দেখ্‌ছিলুম ক'দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করছিল কিন্তু আমার stupidity বশতঃ আমি ধরা দিইনি— সে কাল রাত্তিরে আপনি এসে বল্লে Aren't you going to sing ?— আমি কেবল বল্লুম Yes বলে গান গাইতে গেলুম। আজ সকালে তার সঙ্গে আলাপ করলুম। তার মুখে এমন একটি প্রশান্ত গম্ভীর সুমিষ্ট earnestness আছে— এমন সুন্দর চোখ নাক এবং ঠোঁট— আমার ভারি ভাল লাগে। আমার বোধ হয় আমাকেও তার মন্দ লাগেনা। একজন Australian মেয়ে আজ আমার সঙ্গে আলাপ করলে— তার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে গল্প চলেছিল।— ক্রমেই গরম পড়চে— আজ পরিষ্কার দিন— যার সঙ্গে দেখা হচ্চে সেই বল্‌চে What a lovely morning! আমি বল্‌চি Isn't it! দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূল একটু একটু দেখা যাচ্চে। আমাকে বারবার Quoits খেল্‌তে অনুরোধ করেছিল— আমি অনেক করে এড়ালুম— এরা সকল বিষয়েই gambling ধরেচে।

আমার নববন্ধুর সঙ্গে ইংরাজ সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। Anglo-Indian মেয়েদের হৃদয়হীনতার প্রসঙ্গে বলছিল "এখনকার মেয়েরা বড় হৃদয়হীন হয়ে গেছে— মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে একটা ideal আছে কিন্তু উত্তরোত্তর ক্রমশই তাতে আঘাত লাগ্‌চে।" বল্‌ছিল, ছোট ছোট বিষয়ে দেখা যায় একজন মেয়ে একটা গাড়ির ঘোড়াকে যত হয়রান্ করে ঘুরিয়ে বেড়াতে পারে একজন পুরুষ তেমন পারেনা। তাদের সমস্ত হৃদয় অসীম কাপড়চোপড় সাজসজ্জার মধ্যে অহর্নিশি এত ব্যস্ত থাকে যে বাস্তবিক কোন রকম অসুবিধাজনক বা আরামের ব্যাঘাতজনক দয়ার কাজ করা তাদের অনভ্যস্ত হয়ে আস্‌চে। ভারতবর্ষীয়ের প্রতি দয়া প্রকাশ করার মানে অসুবিধে সহ্য করা— চক্ষুপীড়ক দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করা— ফ্যাসানের বিরুদ্ধাচরণ করা— সুতরাং তা লেডির পক্ষে অসম্ভব। যাকে বলে luxury of sentiment— আরামসঙ্গত অশ্রুবর্ষণ— সুশোভন দয়া তাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ।— লোকটা বোধ হয় কোন মেয়ের কাছে আঘাত সহ্য করেচে, খুব যেন অন্তর্বেদনার সঙ্গে কথা কচ্ছিল।— আর এক সময়ে কথায় কথায় বলছিল তার এক ছোট বোন Boyদের সঙ্গে বেশি মেশে, তার ভাইদের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব— আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন বল দেখি? আরো অনেকের কাছে ঐ

কথা শুনেছি। সে বল্লে— I suppose girls find their brothers much nicer than their sisters. Sisters are so spiteful to each other. বল্‌ছিল মেয়েদের বিরুদ্ধে মেয়েরা যেমন তীব্র হতে পারে এমন আর কেউ নয়।— "However I have my ideal of a woman somewhere in my heart—a fellow must have something of that kind—but I have given up all hopes of meeting her in the region of Reality."— লোকটাকে আমার বেশ লাগ্‌চে— খুব অল্প বয়স— পড়াশুনো ভালবাসে— মন খুলে কথা কয়— আমার সঙ্গে খুব বনে গেছে। শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ। এ লোকটা কারো সঙ্গে মেশে না। একলা একলা বসে বসে বই পড়ে এবং ভয়ানক হাসে।

ডিনারের পর আজ আবার নাচ আরম্ভ হল। খানিকটা দেখে আমার মন বিগ্‌ড়ে গেল। আমি একটা ঘোর অন্ধকার কোণে বেঞ্চির উপর বসে নানা কথা ভাব্‌ছিলুম— মন্দ লাগ্‌ছিলনা— সমুখে অন্ধকার রাত্রি এবং অন্ধকার সমুদ্র— থেকে থেকে Phosphorescence ঢেউয়ের মাথার উপরে অগ্নিরেখা এঁকে যাচ্ছিল— এমন সময়ে ধীরে২ সেই Australian মেয়েটি আমার পাশে এসে বস্‌ল এবং অল্পে২ গল্প জুড়ে দিলে। ক্রমে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। সে আমাকে বল্লে— চল Music Saloonএ গিয়ে আমরা গানবাজনা করিগে। সেখেনে গিয়ে গান আরম্ভ করে দেওয়া গেল— ক্রমে২ লোক জড় হতে লাগ্‌ল। আজ আমাকে বারবার করে অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত গাইয়েচে। Ave Maria এবং আর দুয়েকটা গান বেশ রীতিমত ভাল করে গেয়েছিলুম। বিস্তর অপরিচিত মেয়ে জানলার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বহুল সাধুবাদ দিয়ে গেল। আজ ভাবে বোধ হল আমার গান এদের বাস্তবিক ভাল লেগেছে— Indianএর গান বলে কেবলমাত্র বিস্ময় নয়।— এইমাত্র Connolly এসে আমাকে বলে গেল I say Tagore you sang awfully well this evening। আমি আগে যেরকম গলা চেপে গাইতুম এখন দেখ্‌চি সেটা ভারি ভুল।— Then [you'll] remember me বলে একটা গান গাইলুম আমার নব-বন্ধুর সেটা ভারি ভাল লেগেচে— বোধ হয় তার ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন যোগ আছে। Brindisiতে শুন্‌চি ৮৫জন লোক উঠ্‌চে— আমাদের Cabinএ আর দুটো berth আছে সে দুটোতেও লোক আস্‌চে— শুনে-অবধি বিষম চিন্তিত হয়ে আছি। Connollyর সঙ্গে যেমন বনে গেছে এমন বোধ হয় কারো সঙ্গে সম্ভাবনা নেই। একরকমে ভাল— এইরকম করে experience লাভ হয়।— যে মেয়েকে আমার বেশ লাগে তার নাম Miss Long— সে Indiaতে বিয়ে করতে যাচ্চে— একজন কার সঙ্গে engaged। তিন Australian বোনকে মন্দ লাগ্‌চেনা— তার প্রধান কারণ, আমাকে তারা বিশেষ করে বেচে নিয়েছে, এবং মন্দ দেখ্‌তে না, এবং বেশ Piano বাজায়— সেদিন একটা সুর বাজাচ্ছিল আমার খুব পরিচিত— যেটা নিয়ে Park Stএ থাক্‌তে প্রায় parody করতুম— বোধ হয় কি একটা Cavatina কিম্বা Estudiantina কিম্বা Dames de Seville কিম্বা ঐরকম একটা বিদিগিচ্ছি ব্যাপার— কিন্তু পরিচিত বলেই আমার ভারি ভাল লাগ্‌ল। Australian মেয়েদের নাম Misses Bayne.

আমি মজা দেখেচি অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ তাদের স্বদেশী সুন্দরীদের ছেড়ে এই অষ্ট্রেলিয়ান মেয়েদের সঙ্গলালসায় ব্যস্ত। সকলেই বলে They are very nice। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন বল দেখি— তারা বলে— They are so unaffected, childlike, they are not at all *smart*। বাস্তবিক ইংরেজ অল্প বয়সী মেয়েরা বড্ড বেশি smart। বড্ড চোখমুখ নাড়া, বড্ড নাকেমুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি বড্ড চোখাচোখা জবাব— কারো কারো হয়ত লাগে ভাল কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে একান্ত শ্রান্তিজনক,— মেয়েদের বেশ unaffected simplicity এবং earnestness দেখ্‌লে বেশ একটু আরাম পাওয়া যায়— যথার্থ স্থায়ী সুখ অনুভব করা যায়।]

ক্রমশ

গ্যেটে দ্বিশতবার্ষিকী

মহামনীষী গ্যেটে

গ্যেটে মানুষী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতীক। সেই সংস্কৃতির পূর্ণতা যেমন তেমনি তার পরিণতি, অর্থাৎ তার অন্ত বা শেষও এই মনীষীর মধ্যে সাকার হয়েছে। গ্যেটে মানুষের সেই চেতনা, সেই চেতনার প্রবেগ যা চিরন্তন চায় ক্রমগতি ক্রমবৃদ্ধি। ফলতঃ জানবার আয়ত্ত করবার যা কিছু থাকতে পারে, কৌতূহল ঔৎসুক্য স্পৃহা যত বহুল ও বিচিত্র হতে পারে, তাই নিয়েই তো মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব। গ্যেটের সৃষ্ট ফাউস্ট এই পূর্ণ মানুষী মানুষ। গ্যেটে নিজেও দেখি একাধারে কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক— এমন বিষয় খুব অল্পই আছে যা তাঁর চেতনার পরিধির মধ্যে আসে নি এবং যার উপর তাঁর জ্ঞানপ্রভা প্রতিফলিত করে তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন নি। কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি যে দক্ষতা দেখান নি তা নয়। রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসনেও তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ রয়েছে। এত বহুমুখী প্রতিভা এবং প্রতি ক্ষেত্রে এত উচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিভা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এক লেওনার্দো(Leonardo da Vinci)র কথা। তবে উভয়ের পার্থক্য রয়েছে, কোথায় তা পরে যথাস্থানে বলছি।

গ্রীক জাতি একটা সভ্যতার সূত্রপাত করেছিল, তার চরম এবং শেষও এই জার্ম্মান মনীষীর মধ্যে। গ্রীকের হল মানস-প্রতিভা, বুদ্ধিগত সংস্কৃতি, বলেছি মানুষের "মানুষী" প্রকৃতি। অফুরন্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, অফুরন্ত চলবার আকাঙ্ক্ষা— আমাদের বৈদিক ঋষিরা মানুষের যে বৃত্তিকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন এই অপূর্ব্ব মন্ত্র "চরৈবেতে", মানুষের অন্তরের অনির্ব্বাণ আস্পৃহা, এই নিত্যসমিদ্ধ অগ্নি, তাই ত মানুষকে মানুষ করেছে, ইতর প্রাণীর চক্রগতির পর্য্যায় থেকে তাকে তুলে ধরেছে এই উর্দ্ধতর অগ্রগতির পর্য্যায়ে। মানুষের এই যে আস্পৃহা, গ্যেটে তার তিনটি মূলধারা নির্দ্দেশ করেছেন; গ্যেটের ফাউস্ট এই ধারাত্রয়ী, এই ত্রিস্রোতা দিয়ে গঠিত চরিত্র।

প্রথমতঃ মানস আলো, বুদ্ধির চিন্তার বিচার বিতর্কের খেলা— বিশুদ্ধ জ্ঞানৈষণা। সব জিনিস নিয়ে আলোচনা, তাদের প্রকৃতি কি ধর্ম্ম কি কর্ম্ম কি তার গবেষণা, বস্তুর আদি কি মধ্য কি অন্ত কি তার একটা মানচিত্র অঙ্কন— এই সব নিয়ে মস্তিষ্কের বৃত্তি; এই বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের ফলে মানুষ যে সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে, জীবজগতে প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। তবুও বলতে হবে এই যে জ্ঞান তা বেশির ভাগ জিনিসের খোলসেরই পরিচয় দেয়, জিনিসের অন্তরের বার্ত্তা এদিক দিয়ে মেলে না। একটা জগৎ রয়ে গেছে, জ্ঞানেরই বিষয় তা, কিন্তু মানস আলোর বাহিরে তা, তর্কবুদ্ধি তাকে ধরতে পারে না। তা ছাড়া, বিশুদ্ধ জ্ঞানৈষণা মানুষকে খণ্ডিত করে ধরে, মস্তিষ্ককে বিপুল করে ধরে বটে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ হয় পঙ্গু। অনেক সময় দেখি অতিরিক্ত জ্ঞানের ফলে— বহুনা শ্রুতেন— যে অনুপাতে মানুষ বিদ্বান বা পণ্ডিত হয়ে উঠেছে সে অনুপাতে কর্ম্মঠ, স্থূল জগতে দক্ষ সমর্থ হয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের মধ্যে রয়েছে আর-একটি নিভৃত স্তর, তাতে দেয় সূক্ষ্মতর জ্ঞান কিন্তু সেই সঙ্গে নিবিড়তর প্রবলতর সামর্থ্য। এ হল গুহ্য বিদ্যার জগৎ, মানুষের চেতনার দ্বিতীয় ধারা। প্রথম ধারাকে যদি বলি

জ্ঞান, এই দ্বিতীয় ধারাকে তবে বলব বিজ্ঞান। কারণ এটি হল বিশেষ বিবিধ ও বিপুল জ্ঞান। আর স্থূল বিজ্ঞানের মতই এ বিজ্ঞান দেয় জিনিসের কল-কবজার খবর, জিনিস যে বলের চাপে চলে এবং যে নিয়ম অনুসরণ করে চলে তা আমরা জানি এই বিজ্ঞানের ফলে ; জিনিসের উপর আমাদের কর্তৃত্বও আসে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জোরে। মনের বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া রয়েছে সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎবোধের জগৎ। পঞ্চভৌতিক প্রকৃতি আর তার অন্তর্গত যে জীব-জন্তু যে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ তা হল অনন্তের স্থূল দেহ ; কিন্তু এই স্থূলের পিছনে রয়েছে সূক্ষ্মভূত, যা হল বিশ্বের অন্তঃশরীর, যাতে রয়েছে গূঢ়তর গাঢ়তর শক্তিসব, যারাই অন্তরাল থেকে অনুপ্রাণিত করে পরিচালিত করে এই স্থূল-ভূতের জগৎ— স্থূল ত সূক্ষ্মের যন্ত্র বা বাহন মাত্র। আর এখানেই রয়েছে যাদের নাম দেওয়া হয় যক্ষ রক্ষ জিন দানা প্রেত পিশাচ দেবদানব পর্য্যন্ত। ফাউস্ট তাঁর বাহ্যজ্ঞানের জগৎ শেষ করে এগিয়ে চললেন আরো এই অন্দরমহলের শক্তিময় কিন্তু বিপদসঙ্কুল জগতের মধ্যে ; বিপদসঙ্কুল, কারণ, অজানা অচেনা অন্য ধরনের এ জগৎ ; তারপর এখানকার শক্তি শক্তিমান ত বটেই, তাতে রয়েছে আবার বিস্ফোরকের আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতা, রয়েছে একটা অনিশ্চিত পরিণতি, কল্যাণের দিকে হোক কি অকল্যাণের দিকে। কিন্তু মানব চেতনা, মানুষের যাযাবর প্রবৃত্তি তাকে এখানেও থামতে দেয় না। বাহ্যজ্ঞান কেবল নয়, অন্তর বা গুহ্যবিজ্ঞানও নয়, মানুষকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে, দেহের আবেগ দিয়ে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে হবে— নতুবা পূর্ণ পূর্ণতা মানুষের লাভ হবে না। মানুষের ভোগায়তনেই ত রূপগ্রহণ করে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পায় তার স্বভাবের সামর্থ্য ও সার্থকতা। সম্যক্ ভোগ ছাড়া জীবন নাই, জীবনের রসে জারিত নয় যে চেতনা তা শুষ্ক পত্রের মত, বড় জোর গ্রন্থপৃষ্ঠার মত ; তাই ত কবি বলছেন (যদিও শয়তানের মুখ দিয়ে)—

Grey, my dear friend, is all theory,
And green the golden tree of life.

ফাউস্টের জীবনে মার্গারেট-বাহিনী যে একটা সুন্দর কবিত্বময় করুণ শোভামাত্র তা নয়, এ হল দেহের মধ্যে কর্ম্মায়তনে তার সমগ্র প্রাণধারার, তার অন্তর ও সূক্ষ্ম জীবনগতির মূর্ত্ত প্রপাত। ফলতঃ এই ত সেই ক্ষেত্র, সেই রণাঙ্গন যেখানে হয় অন্তিম যুদ্ধ ; শয়তানের হয় জয় কি পরাজয়, মানুষ হারায় কি পায় তার অন্তরাত্মা।

কারণ এখানেই মানুষের সাক্ষাৎপরিচয় তার মূল বাধাটির সঙ্গে। মানুষের যে প্রবেগ অগ্রগতির জন্যে, ঊর্দ্ধগতির জন্যে, সর্ব্বব্যাপী গতির জন্যে, তা হল আসলে প্রচ্ছন্ন আত্মার ধর্ম্ম, অন্তঃপুরুষের দান, ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত যে অঙ্গ যে স্তর বা অংশ সেখান হতে উৎসারিত। কিন্তু আর-একটা দিক আছে মানুষের— এবং প্রকৃতি ও জগতেরও— রক্তমাংসের কামনা, অন্ধলিপ্সার বুভুক্ষা, তামসপ্রবেগের খরধারা ; ঊর্দ্ধের, আলোকের, প্রশান্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নাস্তিক এই অঙ্গ— মানুষকে তা টেনে নিয়ে চলে অধঃপতনের পথে, চিরন্তন নিরয়ের অতলে, শয়তানের আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে। এই যে চতুর্থ— বিপরীত অর্থে তুরীয়— অধস্তন পদ, শয়তান স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত সেখানে, তার সমস্ত আশা ভরসা মানুষের এই পদতলের রন্ধ্র দিয়ে অন্তরে প্রবেশ। এই যে দ্বন্দ্ব, নির্ম্মম কঠোর, মনে হয় চিরন্তন— মানুষের জীবন দ্বিধা ভিন্ন তাতে, প্রতিপদে ক্ষতবিক্ষত। তাই ত ফাউস্ট বলছে—

Two souls, alas, dwell in my breast . . . the one clings to the world . . . the other lifts itself . . . to the realms of an exalted ancestry.

এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা, এই দ্বৈতের হাত থেকে উদ্ধার কি ভাবে কোন দিকে? একবার যখন মানুষের দৃষ্টি ঔৎসুক্য গিয়ে পড়েছে বাহিরের দিকে, অধোদিকে যেমনি পা বাড়িয়েছে সে শয়তানের প্ররোচনায়, কি তার সঙ্গে সন্ধি করে, তেমনি তাকে যেন পিচ্ছিল পথে গিয়ে পড়তে হয়েছে, ক্রমে ঝড়ের বেগে ছুটতে হয়েছে অব্যর্থভাবে অসহায়ভাবে নিরালোকের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে, অজ্ঞানের অরাজকতার মধ্যে, মহতী বিনষ্টির মধ্যে (Walpurgis' Night)।

গ্যেটের মীমাংসা খৃস্টীয় মীমাংসা। মানুষ আপাদমস্তক কলুষিত, পাপ তার মেদমজ্জাগত। নিজে কখন নিজের কৃতিত্বে নিজেকে সে উদ্ধার করতে পারে না। তার উদ্ধার সম্ভব ভগবৎপ্রসাদে। এটিকে আমরা তবে বলতে পারি সৃষ্টিরহস্যের পঞ্চমতত্ব। শয়তান মানব আত্মাকে প্রলুব্ধ করে তার রাজ্যের, নরকের দুয়ার অবধি নিয়ে এসেছে— নিয়তি কি? প্রবেশ করতে হবে কি হবে না? কর্ম্মফল বলে প্রবেশ করতে হবে— শয়তানের নিজেরও বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা তাই, এমন কি আত্মারও শঙ্কা অন্যগতি তার বুঝি আর নাই।

তবে মানুষের একমাত্র পুণ্য বা সুকৃতি আছে; ভগবানকে ভালবাসা তার পক্ষে সহজ ও সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু সে মানুষকে ত ভালবাসতে পারে, মানুষী ভালবাসা দিয়েও সে যদি সত্যকার ভালবাসা উদ্রেক করতে পারে, তবে তার আর ভয় নাই। মানুষী প্রেমের সে অধিকার সে সামর্থ্য আছে মনে হয়, প্রাকৃত আত্মাকে নিরয়গমনোন্মুখকে উদ্ধার করতে পারে— শয়তানের হাত থেকে তাকে ছিনিয়েই নিতে পারে। যে কামনাবেগ নরকের দ্বার নামে লাঞ্ছিত, যাকে হাতিয়ার করে শয়তান মানুষকে নিজের সাথী করে টেনে নিয়ে চলেছে অব্যর্থ অধঃপতনের শেষ সীমায়— শেষ সীমায় দেখা গেল সেই বস্তুই হয়ে উঠেছে উদ্ধারিণী শক্তি। কি যাদুর বলে দোষ গুণে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ফাউস্টের প্রথম ভাগে যবনিকা পতন হল যেন একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে। প্রেমের সত্য সত্যই জয় হল কি? প্রেমিকাকে তবে স্পর্শ করতে পারলে না নরকের রাজা, প্রেমিককেও নয়? রিক্ত হস্তে ফিরে গেল শয়তান? দ্বিতীয় ভাগে কবি মীমাংসাটা স্ফুট করে ধরলেন। মানুষ, মানুষের আত্মা নিরয়গামী হয় না শয়তানের জীবনব্যাপী যুগব্যাপী চেষ্টা সত্বেও। যে মানুষ সত্য সত্যই ভালবেসেছে মানুষী ভালবাসা দিয়েই, সেই ভালবাসা তাকে রক্ষা করেছে নিভৃতে— ভালবাসা যে বেদনার জন্মদান করে, যে অশ্রুধারা উৎসারিত করে, তা সকল পাপ, সকল ত্রুটি ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে দেয় যেন (গ্রীক মতে ট্রাজেডীর ধর্ম্ম যা), অন্তর্হৃদয়ের অশ্রুলেখা বৈতরণী অতিক্রম করবার ক্ষমতা শয়তানের নেই। একদিক দিয়ে প্রেম স্বর্গীয়, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বরূপে। মার্গারেট পার্থিব প্রেম, কিন্তু তার স্বর্গীয় প্রতিরূপ হেলেন। স্বর্গীয় প্রেম আর ভগবৎপ্রসাদ একই। সে এসে তার যাদুমন্ত্রে শয়তানের আসন্ন গ্রাস থেকে উদ্ধার করে নিলে মানবাত্মাকে।

ফলতঃ গ্যেটের মতে শয়তান মূলতঃ ভগবানের বৈরী নয়, ভগবানের সমান একান্ত বিরোধী শক্তি নয়। শয়তানও ভগবানের ভৃত্য, এমন কি ভগবানেরই শক্তি, বলা যেতে পারে 'বামা শক্তি'। তার কাজ হল যেন আমাদের পুরাণে যাকে বলে শত্রুভাবে সাধনা— ভগবানের দিকে গতি যাতে হয় প্রবলতর তীব্রতর, ক্ষিপ্রতর— প্রাকৃত জীবনের চরম, যাতে নবজীবনের আরম্ভ হয়

নিঃসন্দেহে। শয়তান মানবাত্মাকে গ্রাস করছে ততখানি নয় যতখানি সে করে আত্মহত্যা হারাকিরি, সে নিজেই বলছে—

I ascend the witch mountain for the last time ; and because my own cask runs thick, the world also is come to the dregs.

ভগবানের উপর প্রীতি মানুষকে ভগবানের দিকে চালিয়ে নেয় ; ঠিক তেমনি আবার সংসারের দুঃখাভিঘাতও তাকে অল্পের মধ্যে, দৈনন্দিন সুখের মধ্যে চিরকাল তৃপ্ত হয়ে থাকতে দেয় না। শয়তানের তাড়না, অঙ্কুশাঘাত মানুষকে থামতে দেয় না, তমোগ্রস্ত নিদ্রাভিভূত হতে দেয় না, ক্রমাগত তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। শয়তানকে ভগবান দিয়েছেন এই সদাজাগ্রত প্রহরীর কাজ।

গ্যেটে মানুষের দিয়েছেন ক্রমগতির, চিরন্তন যাত্রার অর্থাৎ চির-অতৃপ্তির ইতিহাস। মানুষ চায় আলো, আরো আলো— চায় শক্তি, আরো শক্তি— চায় আনন্দ, আরো আনন্দ। মানুষ চায় অনন্তকে অধিকার করতে। কিন্তু কোথায় কি রকমে এই চিরদীপ্ত আস্পৃহার হবে চরিতার্থতা, পরিপূর্ণতা ? গ্যেটে চলেছেন সাধারণ মানুষের পথে, সাধারণ মানুষের চেতনা ও বৃত্তি নিয়ে— তার যতখানি প্রসার বা পরিস্ফূর্তি হতে পারে তাকে আশ্রয় করে— তার অতিরিক্ত কিছু ধরে নয়। মানবীয় মানসিক চেতনা দিয়ে, তাকে ধরে যতদূর যতদিকে এগিয়ে চলা যায় এবং সে ভাবে যা কিছু লভ্য কাম্য অধিগত করা যায়, গ্যেটে দিয়েছেন তার চিত্র। কিন্তু অনন্ত সান্তের যোগফল নয়, সান্ত থেকে সান্তে চলে চলে কখন অনন্তে পৌঁছান যায় না, অনন্তকাল ধরেও নয়। অশেষ প্রয়াসের পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফাউস্ট বলছে :

Where shall I seize thee, Infinite Nature ? Ye breasts, where ?

প্রকৃতিকে অধিকার করবার, সমগ্রভাবে তাকে আলিঙ্গন করবার রহস্য কি ? প্রকৃতির ঈশ্বর হতে হলে প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠতে হবে— মানুষী চেতনা অতিক্রম করে একটা অতিমানুষী চেতনা অর্জ্জন করতে হবে। ফাউস্ট নিজেই তার এই অক্ষমতার কথা বলেছে, কি করুণভাবে—

In vain have I scraped together and accumulated all the treasures... I am not a hair's breadth *higher*.

উপনিষদে বলছে দুটি বিদ্যার কথা, এক পরা আর এক অপরা। গ্যেটে মগ্ন রয়েছেন অপরাকে নিয়ে, তাঁর প্রয়াস অপরাকে ধরে পরার দিকে বা পরার মধ্যে পৌঁছান। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অপরাকে জানতে হবে, জানতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু পরাবিদ্যার পথ ভিন্ন ভঙ্গি ভিন্ন, তাকেও অধিকার করতে হবে, তবে তার ধারায় চলে। সে পরাবিদ্যা সাধারণ জ্ঞানে, তর্কবুদ্ধির মধ্যে নাই, তা বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মভৌতিক বিদ্যার মধ্যেও নাই, তা নাই জীবনের বাস্তব কর্ম্মে বা স্থূল উপভোগে।

গ্যেটে তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সে রহস্যভেদ করতে হয় যে পরারহস্যবিদ্যা দিয়ে তার সন্ধান ঠিক তাঁর মেলে নি। এই যে মানবীয় দেহ-প্রাণ-মন দিয়ে গড়া উর্ণনাভের জাল বা গুটিপোকার গুটি, তা কেটে বের হয়ে আসতে তিনি পারেন নি। জালকে টেনে টেনে বৃহদায়তন করে চলেছেন, গুটিকেও প্রসারিত বিপুল করে ধরেছেন, কিন্তু এ স্ফীতির নাম আনন্ত্য নয়। এ স্ফীতির পরিণতি বিনষ্টি— mole ruat sua— নিজের ভারে নিজে ভেঙ্গে পড়া। ফলতঃ গ্যেটে

বলতে চান মানুষী জীবনের অব্যর্থ স্বাভাবিক পরিণামই একটা নিদারুণ ব্যর্থতা, গতির বেগ নিয়ে চলে শেষে এক পাষাণপ্রাচীরের উপর, যখন মনে হয় চূর্ণ মস্তিষ্ক ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই কিছু। অবস্থার যখন এই চরম তীব্রতা তখন ঘটে এক অঘটন— মানুষের উদ্ধার সেই এক পথে। অন্তিমে ভগবৎকরুণার এক অহেতুক প্রকাশ, গ্যেটে একমাত্র এই আশ্বাসের উপর ভর করেছেন।

বলেছি, ভগবৎকরুণা গ্যেটের কাছে এসেছে প্রেমরূপে, নারীমূর্ত্তি নিয়ে। খৃস্টীয় ধর্ম্মসাধনায় মধ্যস্থ— Intermediary বা Paracleteএর কথা আছে, মানবাত্মাকে ভগবানের কাছে পৌছে যে দেয়। মানুষ নিজে নিজের উদ্ধারসাধন করতে পারে না, ভগবানও রয়েছেন অতি দূরে তাঁর কূটস্থ পরম শুভ্রতার মধ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেন মানুষের কাছে, মানুষেরও সে হয় দূত ও দিশারী। বেয়াত্রিস এই ভাবে তার প্রেমিক দান্তেকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। গ্যেটেও বললেন সেই সনাতনী নারীশক্তির কথা, যার নিবিড় প্রেম তার ঐকান্তিক তীব্রতার জোরেই পুরুষকে উদ্ধার করলে প্রকৃতির প্রাকৃত কবল থেকে।

গ্যেটের মীমাংসায়— সাধারণতঃ সকল প্রপত্তির সাধনাতেই— দেখতে পাই মানুষী আস্পৃহা বা তৃষ্ণা আর ভগবৎকরুণা এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে একটা ফাঁক— কার্য্যকারণ দূরে থাক, একটা সাজাত্যের সম্বন্ধও উভয়ের মধ্যে বুঝি নাই। ভগবৎকরুণা আকস্মিক অহেতুক, তা অঘটন ঘটায়, অপ্রত্যাশিতকে বাস্তব করে। বর্ত্তমান যুগে আজ আমরা যে অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি সেখানে এ মীমাংসা বা উদ্ধারের পথ আমাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। আজ আমরা একটা শেষ সীমায় এসে পৌছে গেছি, এর পরে যেন পথ বন্ধ। এগিয়ে চলবার আর অবকাশ নাই। মানস-চেতনার চিন্তা-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা হয়েছে আজ, তা নিয়ে গিয়েছে অস্পৃশ্য সব আয়তনে— মেফিস্টোফেলিসের ভাষায়—

> The march of intellect which licks all the world into shape
> has even reached the devil.

তাই আজ আমরা যেন অন্তিম দশায় অসহায় অবস্থায় বসে আছি এক অঘটনঘটন- পটীয়সীর হঠাৎ আবির্ভাবের জন্যে।

এ জিনিস যে সম্ভব নয়, তা বলছি না। কিন্তু তাতে রহস্যের সব কথা বলা হয় না। মানুষকে ঘিরে আছে এক দৃঢ় গণ্ডীর রেখা, অকাট্য নিয়তির পাশ— মানুষ তাকে কেটে পার হয়ে যেতে পারে; তার এই উত্তরণ-সিদ্ধির সঙ্গে ভগবৎপ্রসাদের বিরোধ কিছু নেই। বরং এই হল ভগবৎপ্রসাদকে সার্থক করার সজ্ঞান প্রণালী। আমরা যাকে বললাম গণ্ডী, প্রাচীন ঋষিরা তাকেই বলেছেন "হিরণ্ময় পাত্র"—মানসবুদ্ধির প্রোজ্জ্বল যবনিকা— যাতে সত্যের মুখ ঢেকে রাখে। এই হিরণ্ময় পাত্রকে সরিয়ে দেবার কি অতিক্রম করবার সাধনা গ্যেটে দিতে পারেন নি— তিনি অজ্ঞানের (অর্থাৎ অর্দ্ধজ্ঞানের) মধ্য থেকে কেবল আহ্বান করেছিলেন পতিতোদ্ধারিণী ভগবৎকরুণাকে। এ হল সেই আর্ত্তভক্তের উদ্বাহু— De profundis clamavi—"অতলে পড়ে আছি আমি, সেখান থেকে তোমায় ডাকছি, হে ভগবান।"

আমি লেওনার্দ্দোর কথা বলেছি গোড়ায়। গ্যেটের মত ইনিও ছিলেন মহামনীষী, মানুষী প্রতিভার সমগ্রতার প্রতীক। তবে গ্যেটের মধ্যে যে জিনিসটি ছিল বিরল ও দুর্লভ— মানুষীভাবের

অতিক্রমণ— লেওনার্দোর মধ্যে তা অনেকখানি সহজ ও সুলভ। লেওনার্দোর চেতনায় রয়েছে কেমন এক আনন্ত্যের লোকোত্তরের আবেশ বা ছন্দ, গ্যেটে সকল প্রয়াস সত্ত্বেও ঐহিক মানুষই রয়ে গেছেন। গ্যেটে মানুষের উর্দ্ধমুখী আশা আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহার আবেগ— লেওনার্দো সহজ উর্দ্ধস্থিতির প্রশান্ত ঔদার্য্য। অথবা গ্যেটে এপারের আলো, তীব্র সন্ধানী আলো— লেওনার্দোর মধ্যে রয়েছে ওপারের সৌম্য জ্যোতির ছায়া।

মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য দুই প্রকার বিভূতির আবির্ভাব হয়। এক মানুষের মানুষী-ভাবের আকৃতি নিয়ে, নীচে হতে উর্দ্ধের দিকে চলেছে যে জীব— গ্যেটে এই পর্য্যায়ের। আর এক হল তারা যারা এসেছে যেন উপরের থেকে, সেখানকার সহজ সিদ্ধি নিয়ে এই ভূতলে, মর্ত্ত্যের মধ্যে অমৃতের আলো তারা বিতরণ করে স্বচ্ছন্দে— লেওনার্দো এই পর্য্যায়ের। এ ধারায় যাঁরা আবার উর্দ্ধতর বা উর্দ্ধতম স্তরে, যাঁরা পেয়েছেন পূর্ণভাবে আত্মার দৃষ্টি তাঁদের নাম হল ঋষি। কবিরা মোটের উপর বলা যেতে পারে প্রকৃতির পূজারী। ঋষি হলেন পুরুষের পূজারী, পুরুষ অর্থ প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতির যতখানি পূর্ণাঙ্গ গ্যেটের চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিল অন্যত্র তা আমরা বেশী দেখি না এ কথা সত্য। তবে তাঁর কবিচিত্ত এবং মানব-চিত্তেরও নিভৃত আকৃতি ছিল অচিৎ ছেড়ে বা ধরে চিৎকে লাভ করা; বলেছি সে সিদ্ধির সন্ধান তিনি পান নি। তার জন্যে নির্ভর করেছিলেন একমাত্র অহেতুক ভগবৎকরুণার উপর। আমরা আশা করি ভগবৎকরুণা তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করেছিল, মুক্তি যদি না দিয়ে থাকে তবে দিয়েছিল শান্তি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গ্যেটে ও তাঁর দেশকাল

গ্যেটের বয়স যখন চল্লিশ তখন ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—ফরাসী বিপ্লব। গ্যেটের ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্যে নয়, অথচ এর সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধও ছিল। সমষ্টির জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন নানা অদৃশ্য সূত্র দিয়ে বাঁধা।

ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে, যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া পড়ে তার পূর্বে। ফরাসী বিপ্লবের ছায়া কেবল ফ্রান্সে নয়, ফ্রান্সের বাইরেও পড়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। জার্মানীতে এই ছায়াপাতের যুগটাকে বলা হয় ঝড়ঝাপটার যুগ। এর নেতা ছিলেন আর কেউ নয়, গ্যেটে স্বয়ং। তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা 'গ্যোট্স' নাটক ও তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'ভের্টর' উপন্যাস জার্মানীতে যে ঝড়ঝাপটার সূচনা করে তা কেবল জার্মানীতেই আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপের সর্বত্র 'ভের্টর'এর অনুবাদ হয়। তা পড়ে বহু যুবক আত্মহত্যা করে। তরুণের প্রাণে তখন এক অভূতপূর্ব অশান্তি। তার যেন কত কী করবার আছে, না করতে পারলে তার জীবন বৃথা, অথচ সময় অনুকূল নয়। সময়ের জন্যে সবুর করতে হবে। সবুর করতে করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত হবে। তত দিনে বল বয়স চলে যাবে। কে করবে সবুর!

গ্যেটে হয়তো এই জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যা করতেন। কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করল

তাঁর ভাগ্য। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাইমারের সামন্তরাজার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। রাজকার্যের দায়িত্ব তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারলেও নিত্য নূতন প্রয়াসে ব্যাপৃত রাখল। তাঁর প্রয়াসের বিষয় ছিল কৃষি ও খনি। অন্য কোনো ভাগ্যবান হলে অবিলম্বে বিবাহ করতেন। উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। কবি কিন্তু সে দিকে উদাসীন। থাকতেন একটি ছোট বাগানবাড়ীতে। ওটি যদি না পেতেন তা হলে মন্ত্রীপদ স্বীকার করতেন না, ভাইমার থেকে চলে যেতেন। ঐ তপোবনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর মালী ও একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিশ্বপ্রকৃতি। সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপের ভাষা হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাঁকে তন্ময় করে রাখল।

এইভাবে কেটে গেল দশ-এগারো বছর। বিপ্লবের ছায়া পড়ছে দেশে বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ সমানে চলেছে। লোকে আশা করছে গ্যেটে থাকবেন যুগের পুরোভাগে। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়লেন। তেমন লেখা আর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না। দিন দিন তিনি নিজেকে সংযত ও অনাসক্ত করতে লাগলেন। অথচ সন্ন্যাসীর মতো নয়। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের সমানধর্মা। রুশো-ভলতেয়ারের সগোত্র। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি ইতালী যাত্রা করেন তখন তাঁর জীবন নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোলায়মান ও বিক্ষুব্ধ। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ঝড়ঝাপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্ খানে নোঙর ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বিজ্ঞানসাধক হিসাবে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান তো মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা মেটাতে পারে না। সামাজিকতা তিনি পরিহার করেছেন, ভলতেয়ার ও রুশোর মতো তিনি অবন্ধন। কিন্তু এমন কোন্ পাখী আছে যার নীড় নেই, সঙ্গিনী নেই, সন্তান নেই ? স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু অতিমাত্র স্বাধীনতা ভালো নয়।

বছর দুই পরে যখন তিনি ইতালী থেকে ফেরেন তখন তাঁর সাহিত্যের আদর্শ স্থির হয়ে গেছে। ঝড়ঝাপটা এর পর থেকে তাঁর বাইরে। ভিতরে তার প্রবেশ নেই। জানালার খড়খড়ি ও সার্শী তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের মতো তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ ক্লাসিক। স্বদেশের ও স্বকালের রোমান্টিক আদর্শ তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিম্বা বলা যেতে পারে তিনিই পেছিয়ে যেতে যেতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পৌঁছে গেছেন। আর কেউ অমন করে পিছু হটে নি। অথচ বিজ্ঞানে তিনি সবচেয়ে আধুনিক। তখনকার দিনে বিবর্তনবাদের উদয় হয় নি। গ্যেটেই তার পূর্বদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো মতবাদই চিরস্থায়ী হয় না, তাঁর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

ইতালী থেকে ফিরে তিনি সঙ্গিনী গ্রহণ করলেন। শ্রেণীর বাধা ছিল বলে হোক বা ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল বলে হোক বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটল না। হয়তো এ ক্ষেত্রেও তাঁর উপর রুশোর প্রভাব পড়েছিল। গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহ পেয়ে তিনি স্থিতি পেলেন। অথচ সামাজিক মানুষ হলেন না। সমাজ থেকে যেমন দূরে ছিলেন তেমনি দূরেই, বোধ হয় তার চেয়েও দূরে, রইলেন। ও দিকে ডিউক দিলেন তাঁকে রাজকীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালন ভার। থিয়েটার তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এবার সুযোগ জুটল ইচ্ছামতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার।

এসব নিয়ে যখন তিনি সুশৃঙ্খল ও শান্ত তখন এলো কিনা ফরাসী বিপ্লব। আর পাঁচ-দশ বছর আগে আসতে কে বারণ করেছিল! এমন অকস্মাৎ আসবে বলে কেন নোটিস দিল না! দেখুন দেখি কী দারুণ অভদ্রতা! মানুষ একটু শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বাদ পাবে চল্লিশ বছর বয়সে, তাও বরাতে নেই। গ্যেটে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির প্রথম কথা হলো ওটা শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ভুলে গেলেন যে জার্মানীর ঝড়ঝাপটাও আইন বাঁচিয়ে চলবে বলে অঙ্গীকার করে নি। মোট কথা, সবুর করতে পারবে না বলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল। সবুর করতে করতে কেউ কেউ বোঝাপড়া করেছিল। অনেকের বেলায় সে বোঝাপড়া আপোসের পর্যায়ে পড়ে। গ্যেটের বেলায় তা হয় নি। তাঁর জীবনযাত্রা আর দশ জন অভিজাতের মতো ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ফিউডাল যুগের নয়। যেসব শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব তাদের চেয়ে তিনি নিকটতর ছিলেন যেসব শক্তির অনুকূলে বিপ্লব, তাদের। তাঁর স্ত্রী জনগণের কন্যা, যেমন 'এগমণ্ট'এর ক্লারা। তাঁর প্রকৃতি-আরাধনা বিপ্লবী নায়কদের ধর্ম। তাঁর 'হেরমান ও ডোরোতেয়া' নতুন ধরনের লোকসাহিত্য। বিপ্লবের পূর্বে রচিত ঝড়ঝাপটা যুগের নাটক উপন্যাস প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা। বিপ্লবের পরে রচিত 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী' সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানবমানবীর স্বাধীন সম্পর্ককেই বড় স্থান দিয়েছে। 'ফাউস্ট' নাটকের জীবনদর্শন যে অক্লান্ত ও অনাসক্ত কর্মযোগ সে তো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পুরাতন হয় নি।

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী পঁচিশ বছর ইউরোপের জীবনে যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃখে দ্বন্দ্বে ভরা। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত ইউরোপ কবিকে হয়তো পাগল করে তুলত, যদি না থাকত তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও ক্লাসিক মার্গ। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি একপ্রকার বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। সেটা এক হিসাবে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকেই, কিন্তু বিশেষ করে চল্লিশের পর। নেপোলিয়নের পতন হলে যখন বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায় তখন গ্যেটের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সারা হয়। তখন বাইরের জগতে শান্তি আসে, শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। জানালার সার্শী-খড়খড়ি বন্ধ করে রাখার দরকার থাকে না। পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ ইতিমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কবির ঘরসংসারের ভার নেন উচ্চ-বংশীয়া পুত্রবধূ। বাগানবাড়ী থেকে ইতিপূর্বে উঠে আসা হয়েছিল বাসগৃহে। গ্যেটের জীবনের অবশিষ্ট সতেরো বছর যে-কোনো একজন পদস্থ রাজপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। নানা দিগ্‌দেশ থেকে ভক্তেরা আসতেন তাঁর দর্শন পেতে। আরাম ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না। লোকে বলত, 'ইওর একসেলেন্সী'। পদবী মিলেছিল 'ফন গ্যেটে'। এই বয়সেও তাঁর প্রকৃতিপূজার বিরাম ছিল না, তাঁর ক্লাসিক মার্গও ছিল অপরিত্যক্ত, কিন্তু একটু তফাত ছিল।

নেপোলিয়নের ফরাসী ফৌজ বার বার জার্মানী আক্রমণ করায় জার্মানদের জাতীয় ঐক্যবোধ নতুন করে উদ্দীপিত হয়। এ বোধ যে কোনো কালে ছিল না, তা নয়। বহু বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বোহেমিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য ছিল না; কিন্তু সংস্কৃতিতে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে জার্মানমাত্রেরই একটা মিলনভূমি ছিল, যদিও সেখানেও প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকের ভেদবুদ্ধি ছিল। এবার রাজনৈতিক জীবনকেও এক সূত্রে বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাজনৈতিক ঐক্যের দরুন দিগ্বিজয়ী হয়েছে, ভূমণ্ডলের সর্বত্র রাজ্যলাভ করেছে, অর্থে ও

সামর্থ্যে তারা অগ্রগণ্য। জার্মানী তাদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও সব বিষয়ে পশ্চাৎপদ শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে। জার্মানী যদি এক রাষ্ট্র হতো, জার্মানরা যদি এক নেশন হতো তা হলে কি নেপোলিয়নের হাতে বার বার লাঞ্ছিত ও পরাজিত হতো ?

এমনি করে ন্যাশনালিজ়মের সূত্রপাত হয়। সারা শতাব্দী ধরে এর মরসুম চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা এর পরিণাম দেখেছি। ন্যাশনালিজ়মের সঙ্গে তথাকথিত সোশ্যালিজ়ম মিলিত হয়ে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারও পরিণাম লক্ষ্য করেছি। গ্যেটে গোড়া থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, ফরাসীদের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস, ইংরেজদের লণ্ডন। জার্মানদের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু ভিয়েনা নয়, বার্লিন নয়— জার্মানীর প্রাণ বহুকেন্দ্রিক। ফ্রাঙ্কফোর্ট, লাইপৎসিগ, মিউনিক প্রভৃতিও ভিয়েনা-বার্লিনের মতো প্রাণবন্ত। জার্মানীর মতো দেশকে ইংলণ্ডের মতো নেশন করতে গেলে তার সভ্যতার মূলসূত্রটি হারিয়ে যাবে। প্রাণধারার ঐক্যই আসল ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য তা নয়। গ্যেটের কথা যদি তাঁর দেশ মনে রাখত তা হলে তার আজ এ দশা হতো না। কিন্তু তখনকার দিনের জার্মানরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে গালমন্দ দিয়েছিল, তার পরেও তাঁকে ঠিক বোঝে নি, এখনো ভুল বোঝে। তিনি তাঁর দেশকে, তাঁর জাতিকে কারো চেয়ে কম ভালোবাসতেন না ; কিন্তু তাঁর নেশনবিরোধিতার কদর্থ করা হলো এই বলে যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তাই আর সকলের মঙ্গল চান, স্বদেশের চান না। তিনি নেপোলিয়নের ভক্ত, তাই স্বদেশের বিপদে সাড়া দেন না, ছেলেকে যুদ্ধে পাঠান না। তিনি ফরাসী জাতির গুণমুগ্ধ, জার্মান জাতির নিন্দা ছাড়া প্রশংসা করেন না। অর্থাৎ তিনি পোয়েট, কিন্তু পেট্রিয়ট নন।

গ্যেটের শেষজীবন তাই অবিমিশ্র শান্তিময় ছিল না। শিলারকে তাঁর দেশবাসী মাথায় তুলে নিয়েছিল। শিলারের জনপ্রিয়তার একাংশও গ্যেটের ভাগ্যে জোটে নি। তিনি জানতেন যে তাঁর লেখা সকলের জন্যে নয়। সকলে যেদিন বুঝবে সেদিন অবশ্য সকলের হবে, তার দেরি আছে। সেইজন্যে জনপ্রিয়তার প্রত্যাশা রাখেন নি। কিন্তু যশ তিনি আজীবন পেয়েছিলেন। স্বদেশে বিদেশে—সব দেশে। নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন, একটা মানুষ বটে। দিগ্বিজয়ী তাঁর 'ভের্টর' পড়েছিলেন সাত বার। যুদ্ধযাত্রার সময় যেসব বই নেপোলিয়নের সঙ্গে যেত 'ভের্টর' তার একটি।

গ্যেটের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর উপর কেটে গেছে। এখনো তিনি জনপ্রিয় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর যশ তাঁকে অলিম্পস পর্বতের গ্রীক দেবতাদের সঙ্গে আসন দিয়েছে। আর-কোনো জার্মান সাহিত্যিক এ সম্মান লাভ করেন নি। দান্তে ও শেক্স্পীয়ারের পরবর্তী ও টলস্টয়ের পূর্ববর্তী আর-কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য নন। ইউরোপের বাইরে একালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুল্য। হাজার বছরে সারা পৃথিবীতে যে পাঁচ জন অমর সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন গ্যেটে তাঁদের মধ্যমণি। মধ্যম পাণ্ডবের মতো তিনি সব্যসাচী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফাউস্ট', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্টার' ও অজস্র প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

কিন্তু তাঁকে যে অলিম্পিয়ান বলা হয় এ শুধু তাঁর সাহিত্যসাধনার জন্যে নয়। এ তাঁর জীবন-দর্শনের জন্যেও। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বাহির থেকে, ভিতর থেকে, উপর থেকে, তল থেকে। দেখেছিলেন মানুষের চোখে, প্রকৃতির চোখে, দেবতার চোখে। তন্নতন্ন করে দেখেছিলেন, নেতি নেতি

করে দেখেছিলেন। যেটি যেখানকার সেটিকে সেখানে রেখে দেখেছিলেন, তার আশেপাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, সমগ্রের মধ্যে স্থাপন করে দেখেছিলেন। দৃষ্টির তপস্যা তাঁর মতো আর কেউ করেন নি সর্বতোভাবে। গাছ পাতা ফুল প্রজাপতি হাড় দাঁত কঙ্কাল করোটি গ্রহ তারা মেঘ বাষ্প রং রেখা রূপ স্পর্শ কিছুই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে ছিল না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নারীর সঙ্গে নরের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এমনি কত রকম সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টির বিষয় ছিল। তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল অন্তহীন প্রগতি, যার মূলে অবিরাম পরিশ্রম পরীক্ষা ও পরিত্যাগ। কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে থাকলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তা সে যতই পুরাতন, যতই পরিচিত, যতই প্রিয় হোক। মনে হবে হৃদয়হীনতা, আসলে বেদনার পর বেদনার অভিজ্ঞতা।

আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে, এই উন্মত্ত পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সভ্য মানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউস্টের বন্ধু নয় মেফিস্টোফেলিস। গ্যেটে পাঠ করে কী আমাদের সান্ত্বনা?

এর উত্তর নানা পাঠক নানা ভাবে দেবেন। একজন পাঠক হিসাবে আমার উত্তর দিই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় এখন চলছে। এ অধ্যায় কবে শেষ হবে, কে হারবে, কে জিতবে, গ্যেটের মতো আমাদেরও অজানা। তাঁর দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি তা হলে বাইরের শত অশান্তি সত্ত্বে অন্তরে আমরা প্রকৃতিস্থ থাকব, আত্মস্থ থাকব, ধ্যানস্থ থাকব। এ অধ্যায় এক দিন শেষ হবেই। তত দিন যদি বেঁচে থাকি তা হলে বাইরেও শান্তি আসবে। যত দিন বেঁচে আছি তত দিন সাধ্যমতো বাইরের শান্তির জন্যেও চেষ্টা করব। গ্যেটের হৃদয়ে জাতিপ্রেম ছিল; কিন্তু জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর জন্ম উচ্চ শ্রেণীতে, কিন্তু বিবাহ নিম্ন শ্রেণীতে। স্বয়ং অভিজাত হয়েও জনগণের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য। মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ এক দিনের জন্যেও তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। না ব্যক্তিগত জীবনে, না সমষ্টিগত জীবনে। বহু অত্যাচার তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে। তার দরুন তিনি বেদনাবোধ করেছেন। কিন্তু মানুষকে তার জন্যে ঘৃণা করেন নি। হিংসার বদলে হিংসার কথা ভাবেন নি। তাঁর মতো আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল হোক, নির্বিষ হোক। তাঁর স্বাস্থ্য যেন আমরাও পাই। মত্ততার যুগে তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত। আমরাও যেন থাকি।

অপ্রমাদের জন্যে তাঁকে করতে হয়েছিল এক হাতে বিজ্ঞানচর্চা, আরেক হাতে ক্লাসিকচর্চা। একসঙ্গে প্রকৃতির আরাধনা তথা শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসনা। এই দুই ডিসিপ্লিন এখনো আমাদের পরম প্রশান্তি প্রদান করতে পারে। তা হলেও আধুনিক সাহিত্যিকের চিত্ত সান্ত্বনা মানে না। দিনের পর দিন যে প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলেছে সে প্রশ্ন কি গ্যেটের মতো অলিম্পিয়ানকেও আকুল করে নি? আমরা কি কেবল নীরব সাক্ষীর মতো দেখে যাব, পরে সাক্ষ্য দেব? আমরা কি কোনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করব না, কণ্ঠক্ষেপ করব না? এই নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা কি পুরুষোচিত? এ কি অমানুষিক নয়?

গ্যেটের কাছে এর উত্তর আশা করা বৃথা। তার জন্যে যেতে হবে টলস্টয়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

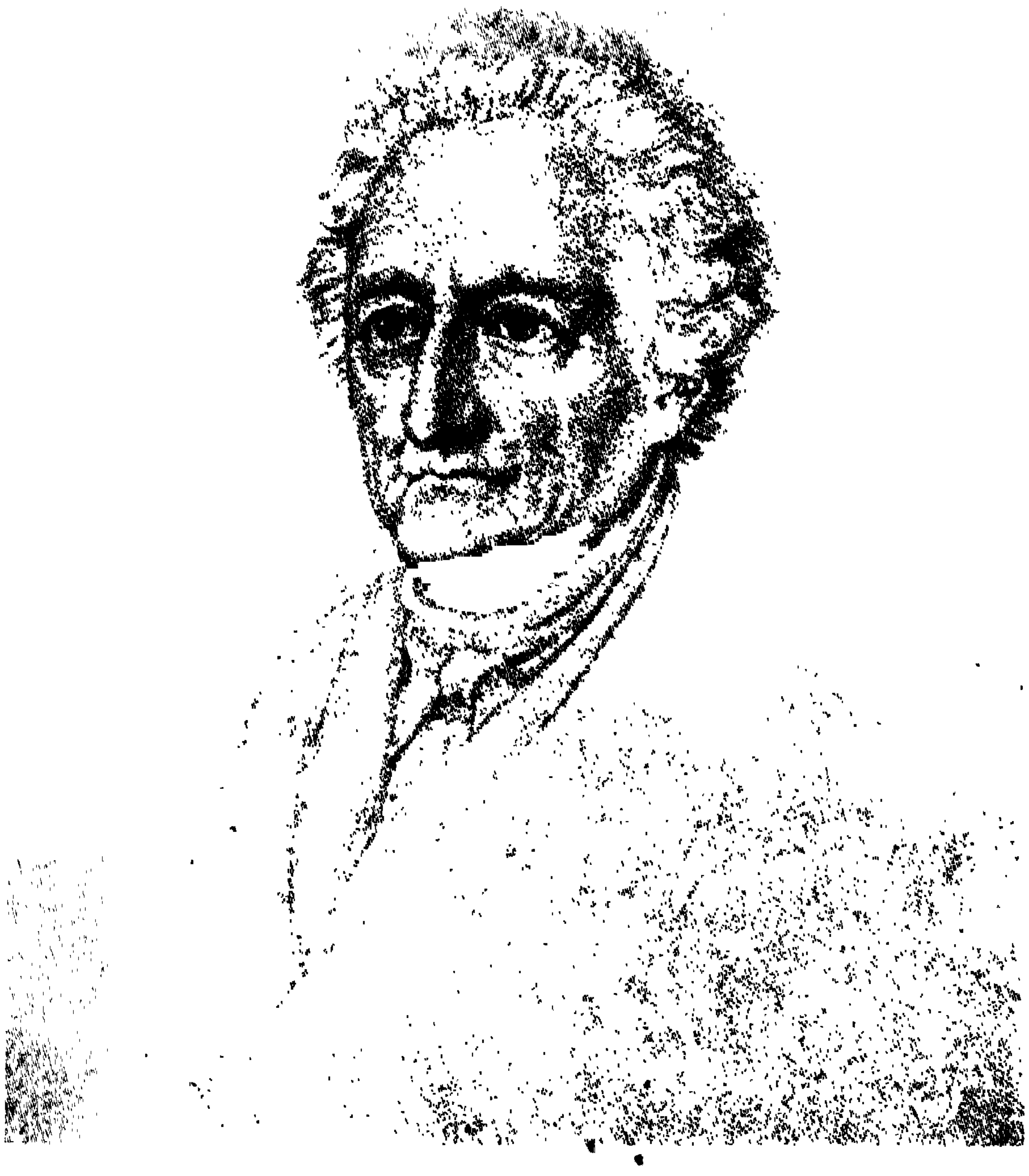

১৮৩২

গয়্‌ঠে ও রবীন্দ্রনাথ

১

"Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichters Lande gehen."

'কবিকে যদি জানতে হয়, কবির স্বদেশে না গেলে নয়।'— হ্বাইমারের 'রাজকবি'[১] গয়্‌ঠের নিজেরই এই উপদেশ। যতই সত্য হোক না কেন, বিদেশী রসপিপাসুদের পক্ষে বড়ই নিষ্করুণ এর তাৎপর্য। আমাদের স্বদেশের কবিগুরু তাঁর জীবনের শেষ বৎসরের একটি কবিতায় অতি সহৃদয় সমাধা করেছেন এই সংকটের :

"বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে,
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।…"

মূল জর্মন ভাষায় পাঠ না করা পর্যন্ত গয়্‌ঠে-কাব্য আমাদের অধিকাংশের কাছেই অজানা কুসুমের পর্যায়ভুক্ত তো বটেই ; তবু সেই কাব্যের প্রতি অন্তরের উদার যে-অভ্যর্থনাটি আমাদের মধ্যে জাগে তার ভূমিকা রচনা হয়, কবির ভাষায়, 'আত্মার আনন্দক্ষেত্রে'। সেইখানে আমরা অনুভব করি জর্মন মহাকবি গয়্‌ঠের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের আত্মীয়তা। সে-আত্মীয়তা অনায়াসে পরাভূত করে সুদূর দেশকালের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানকে।

গয়্‌ঠে-সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে দেখার মতো জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে হলে সাধারণ একটি মানুষের সমগ্র জীবন কেটে যাবার কথা— এত বিপুল ও বিচিত্র তাঁর নিজেরই রচনা। তার ওপর রয়েছে দেশ-বিদেশের সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকারদের অজস্র গবেষণাপূর্ণ রচনা। শেক্‌স্‌পীয়র ছাড়া পৃথিবীর অন্য আর কোনো কবিসাহিত্যিকের সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক পত্রিকা, পুস্তিকা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ইত্যাদি লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ। গয়্‌ঠের নিজস্ব রচনার বৃহৎ পরিধি নির্ণয় ইতালীয় মনীষী বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) যা করেছেন তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে, তা একজন অবিশ্বাসীর মতো যেন অনেকটা রহস্যচ্ছলে ; কারণ সেখানে তিনি গয়্‌ঠে-কাব্যের প্রাণবস্তুর সন্ধানী। তবু সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু প্রণিধানযোগ্য। ক্রোচে বলছেন যে, এক হিসাবে বলা চলতে পারত, গয়্‌ঠে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রথম পথিকৃৎ :

Goethe, the initiator of all the literary forms of the nineteenth century, of the systematized poem (*Faust*), of the autobiographical-sentimental novel (*Werther*), of the novel of educational development (*Meister*), of the historical novel and drama (*Goetz* and *Egmont*), of the novel of passionate and moral casuistry (the *Wahlverwandtschaften*), of the Utopian novel (the *Wanderjahre*), of neo-classical tragedy (*Iphigenie*), of neo-Homeric poetry (*Hermann und Dorothea*), of the revival

১ The last great representative in the line of "Court poets".—Croce.

of the ancient myths (*Achilleïs, Helena*), of the lyric in the manner of the folk-song (the *Lieder*), of ballads tragic and gnomic (the *Braut von Corinth*, the *Zauberlehrling*), of poetry with an oriental tinge (the *Divan*), of the impassioned lyric in free verse (*Wandrers Sturmlied, Seefahrt*, etc.) ; even one might say, of the esoterical lyric, a series of saltatory impressions connected by some deep and unexpressed ideal thread (as in the *Harzreise*) ; and even, if one wishes, the initiator of "free phrases", which the "Futurists" of to-day think they have invented (see any portion of the *Campagne in Frankreich*) ; not to mention all the separate motives which he has created and which have produced and continue to produce a large progeny, from Faust and Prometheus to Wagner and Mephistopheles, from Iphigenie, Margarete and Mignon to Marianne and Philine.

—*Goethe*, pp. 200-201.

কিন্তু ক্রোচের বিচার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণেই থেমে থাকে নি ; অবশেষে বরং তিনি উলটো কথাই স্মরণ করাতে চেয়েছেন যে,

Every poet is an initiator, but every poet initiates something which ends with him, because the beginning and the end are his own personality. (p. 203)

অর্থাৎ, সব কবিই এক হিসাবে পথিকৃৎ, আবার পথিকৃৎ ননও বটে। যে-পথ তাঁরা নিজে নির্মাণ করেন তার শুরু এবং শেষ তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য ; কারণ তাঁদের কোনো অনুগামী উত্তরসাধক যদি যথার্থ কবি হন, তবে তিনিও নিশ্চয় নিজের প্রতিভায় নতুন পথ গড়ে নেবেন। আর যিনি শুধুই কেবল তাঁদের অনুগামী তিনি তো কবি নন, অনুকারীই মাত্র। তাঁদের হিসাব রাখা নিষ্ফল। গয়্‌টের বিরাট ও জটিল সাহিত্যলোকের গভীরে ক্রোচে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন এমন একটি অখণ্ড মানসমুকুর, যার স্বচ্ছ সুপ্রশস্ত বক্ষে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও-বা আভাসে, সর্বপ্রথম বিম্বিত হয়েছে মানবমনের আধুনিক যুগপ্রেরণাটি, ইংরেজিতে যাকে modern spirit বলা যেতে পারে।

আমাদের মতো বিদেশীয়দের পক্ষে হয়তো গয়্‌টেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভার এই সমগ্রতায় দেখতে চেষ্টা করাই অধিক সমীচীন। সেখানে নিজের কাব্যকীর্তির চেয়ে তাঁর কবিমানস এক মহত্তর সার্বভৌম স্বরূপে বিকশিত হয়েছে ; সেখানে তিনি খাঁটি য়ুরোপীয় হয়েও বিশ্বমানবিক ; আধুনিকতার উৎসমুখের আদিকবি হয়েও সেখানে তিনি নিত্যকালীন কাব্যপ্রেরণার রৌদ্রোজ্জ্বল স্বর্ণপ্রতীক।

২

রবীন্দ্রনাথের মতে কবিরা প্রধানতঃ দুজাতের— একদল শুধুই সাহিত্যজগতের কবি, অন্যদল হলেন বিশ্বজগতের। যতই কেন না আভাসে হোক, বিদেশীয় হয়েও আমরা আমাদের অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছি যে, গয়্‌টে শুদ্ধমাত্র সাহিত্যজগতের কবি নন, তিনি বিশ্বজগতের কবি। পরম সৌভাগ্য আমাদের যে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে অনেক কাছের থেকে জানি। তা না হলে 'বিশ্বজগতের কবি' বলতে কি বোঝায় তার কোনো স্পষ্ট ধারণাই আমাদের হত না। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞান ও কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে সুদূর য়ুরোপের এই বিদেশী

কবিপ্রতিভাকে জানতে ও বুঝতে, যেমন সাহায্য করেছিল গয়্‌ঠে সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা তাঁর স্বদেশের একজন সদ্যপরলোকগত মনীষীকে রবীন্দ্রপ্রতিভার তাৎপর্য বুঝতে। হের্‌মান্‌ কাইজর্‌লিং (Hermann Keyserling) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে য়ুরোপের, এবং বিশেষ ক'রে তাঁর স্বদেশবাসী জর্মনদের, ধারণা স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেছিলেন :

Rabindranath . . . is the great model of the full-grown oecumenic Indian of centuries to come. In this he should mean much the same to India as Goethe has meant and means to Germany.—*The Golden Book of Tagore*, p. 127.

তাঁর এই সুচিন্তিত উক্তিটিকে একটু পালটে নিয়ে আমরাও বোধ হয় বলতে পারি যে, 'গয়্‌ঠের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে ভবিষ্যৎ জর্মনজাতির শতশতাব্দীপারের বলিষ্ঠ সার্বভৌম স্বরূপ। সে ভাবে দেখলে ভারতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের যে মূল্য জর্মনির ইতিহাসে গয়্‌ঠের অনেকটা অনুরূপ মূল্য।'

অধুনা জীবিত স্বনামধন্য জর্মন মনীষী অ্যাল্‌বার্ট শ্বাইট্‌জর্‌ তাঁর ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থখানির ইংরেজি অনুবাদ *Indian Thought and its Development* (Hodder & Stoughton, 1936) যখন রবীন্দ্রনাথকে পাঠান, সঙ্গে তিনি একখানি পত্রও লেখেন। তাতেও দেখতে পাই ওই একই ধরনের তুলনা :

. . . Let me tell you on this occasion the great love I have for you and your thought. When I call you in this book the Goethe of India[২] that is because, in my opinion, you are as important for India as Goethe was for Europe. (Dated Gunsbach, près Munster, Alsace, France, 15 August, 1936)[৩]

রবীন্দ্রনাথ কে ? না, ভারতবর্ষের গয়্‌ঠে।— এই হল শ্বাইট্‌জর্‌-এর মতো মনীষীরও তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচার। আমরাও এই নজিরে গয়্‌ঠেকে Rabindranath of Germany, অথবা 'জর্মনির রবীন্দ্রনাথ' ব'লে যদি কল্পনা করি তবে খুব ভ্রান্ত কল্পনা করব না; অথচ আমাদের পক্ষে 'লেজেণ্ড'-রাজ্যের কীর্তিমান বীরের মতো অতি দূরের এই জর্মন-কবিসূর্যকে আমাদের মনোমুকুরে অত্যন্ত নিকটের ক'রে প্রতিবিম্বিত দেখতে পাব।

ম্যুনিখ থেকে ডয়েশ অ্যাকাডেমির প্রেসিডেণ্ট থিওডর্‌ ফন্‌ উইন্‌টর্‌স্টাইন (Theodor Von Winterstein, President, Deutsche Akademie, Munich) রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ১৯৩১ সালে কবির সপ্ততিতম জন্মদিনের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। তাঁর স্বদেশের কবি গয়্‌ঠের বাণীই তখন তাঁকে সাহায্য করেছিল রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার নিগূঢ়তম সত্যটিকে অনুধাবন করতে। অন্যান্য নানা কথার মধ্যে তিনি বিশেষ ক'রে লিখেছিলেন :

Goethe's immortal words 'eternal urge and unceasing exertion' [ewig strebend sich bemühen][৪] have been actually realized in this man [Rabindranath]

---

২ দ্রষ্টব্য, Chapter XV : *Modern Indian Thoughts*, p. 249.

৩ *Rabindranath Through Western Eyes* by A. Aronson, p. 131, footnote No. 2.

৪ 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ দৃশ্যে দেবদূতদের সংগীতের নিম্নোদ্ধৃত সুবিখ্যাত পংক্তিটি তুলনীয় :
Wer immer strebend sich bemüht
(Whoever strives without resting).

and it is a very significant accident that, soon after Rabindranath's seventieth birth-day anniversary, the world is going to celebrate the hundredth death anniversary of the great German poet.—*The Golden Book of Tagore*, p. 267.

এইসব জর্মন গয়্‌ঠে-সমঝদারদের মনীষার অনুসরণে আমরাও আমাদের কবিগুরুর অমর বাণী ঈষৎ উদার অর্থে প্রয়োগ ক'রে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করতে পারি জর্মন কবিকুলগুরুর উদ্দেশে। "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি"—রবীন্দ্রনাথের অতি অপূর্ব এই কবিবর্ণনা আশ্চর্য সার্থকতায় পরিস্ফুট ক'রে তোলে গয়্‌ঠের আদিপ্রাণোচ্ছল কবিজীবনের ধ্যান-সুগম্ভীর সর্বশেষ পরিণামটিকে। তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত থাকতে পারলে পর্যুদস্ত জর্মনির বর্তমান যুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় কবিগুরু গয়্‌ঠেকে স্মরণ ক'রে অব্যর্থ এক নূতন অর্থব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই বলতে পারতেন :

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।

দুই খণ্ডে সুসম্পূর্ণ 'ফাউস্ট' মহাকাব্যখানি 'মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত' ভিন্ন আর কি? আরম্ভে তার যতই থাক্ না কেন নিরাশার বেদনা, 'চিরপ্রাণ আশার উল্লাস' সর্বত্র নিঃশ্বসিত তার শেষাংশে। যে 'উদার মৃত্যু'তে মানবপথিক ফাউস্ট-এর কাহিনীটির পরিসমাপ্তি তার চরম পরিণামে উদাত্তকণ্ঠে নির্ঘোষিত হয়েছে মানব-'আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান'।

ব্যক্তিগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ও গয়্‌ঠের কবিচরিত্রে একটি কেন্দ্রগত মিল লক্ষ্য না ক'রে থাকা যায় না। যৌবনে গয়্‌ঠে নিজেকে বর্ণনা করেছিলেন 'ধরিত্রীর কোলের সন্তান' (das Weltkind : the Child of the World) ব'লে,—অনেকটা 'বসুন্ধরা'র কবি রবীন্দ্রনাথের মতো। "দক্ষিণে প্রফেট্, বামে প্রফেট্, ধরিত্রীর সন্তান মাঝখানে"[৫] ;—আমাদের তত্ত্বজ্ঞানীর দেশে রবীন্দ্রনাথের যৌবনও কি কাটে নি এমনি তরোই এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায়? হুবহু অনুরূপ না হোক, দুরন্ত-আলোড়নমুখর গীতোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে কেটেছে উভয় কবিরই জীবন সেই আদিপর্বে। তৎপূর্বের বেদনাজনক 'হৃদয়-অরণ্য'বাসও ঘটেছিল উভয়েরই জীবনে, তাও লক্ষ্য করেছি তাঁদের আত্মজীবনীতে। অতঃপর এক অন্তর্গূঢ় বিবর্তনের মানস-ইতিহাসটিই এঁদের দুজনের জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় কথা। গয়্‌ঠে তাঁর পরিণত বয়সের একটি কবিতায় সূক্ষ্ম রূপকের আবরণে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা মিথ্যা নয় : জীবনের প্রভাতলগ্নে উদ্দাম লীলায় তুমি মগ্ন ছিলে যৌবনের উন্মত্ত সঙ্গীদের নিয়ে, আসুরিক কোন্ প্রমত্ত প্রভাবে। 'বৎসরের পর বৎসরের সোপান বেয়ে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হলে তুমি

---

৫ Prophete rects, Prophete links,
Das Weltkind in der Mitten.
—গয়্‌ঠের আত্মজীবনী *Dichtung und Wahrheit* [Poetry and Truth] গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ধ্যানলোকে, দেবতুল্য শান্তিলোকে [die Weisen, Göttlich-Milden]'।[৬] এ সেই লোক জীবনমধ্যাহ্নে রবীন্দ্রনাথ যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি"; "ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা" যে-লোকে নিত্যবিরাজিত। গয়্টের কবিজীবনের এই নিগূঢ় পরিবর্তনটিকে ক্রোচে বলতে চেয়েছেন ethical transition, এবং আলোচনার মুখবন্ধেই খুব জোর দিয়ে তিনি এই নৈতিক বিবর্তন সম্বন্ধে বলেছেন, The fact of cardinal importance for the artistic development of Goethe (p. 17)।

কবিমানসের এই বিকাশ ও বিবর্তনের ফলেই সেতুবন্ধন ঘটেছে উভয় কবির জীবনের গভীরে তাঁদের কাব্যলোকের সঙ্গে ধ্যানলোকের, যে পরম লগ্নে আমাদের কবির অতুলনীয় ভাষায় "অবশেষে এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর আমার ভুবন"। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কবিজীবনের সে-কাহিনী ব'লে যেন আর শেষ কিছুতেই করতে পারতেন না।[৭] গয়্টে সে-তুলনায় অনেক নীরব; অন্তত স্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যেন কম। তাঁর দীর্ঘজীবনের সীমান্তে এসে তাই গয়্টে যখন বলেন :

I have never affected anything in my poetry [Ich habe in meiner Poesie nie affektiert]. I have never uttered anything I have not experienced, which has not urged me to production (March 14, 1830).[৮]

স্বভাবতই আমাদের তখন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আত্মোক্তি :

"জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"—ছিন্নপত্র, ৮ মে, ১৮৯৩

"সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই।...যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম— ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই।"—আত্মপরিচয়, পৃ ৩৬

এ কথা অন্তত স্বীকার করতেই হবে যে, গয়্টে বা রবীন্দ্রনাথ— দু'জনের কেউই আমাদের মতো 'জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করেন নি'। দুকূলপ্লাবী প্রাণশক্তির প্রচণ্ড তাড়নায় তাই স্বদেশের জীর্ণ সংকীর্ণ সীমারেখা চূর্ণ ক'রে বিশ্বমানব-জগতের উন্মুক্ত উদার প্রাঙ্গণে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন; উভয়েই অধোবদনে সহ্য করেছিলেন আপন স্বদেশবাসীদের ক্ষুদ্র মনের অক্লান্ত বিদ্রূপবাণ-বর্ষণ।

---

৬ Dann sachte schlossest du von Jahr zu Jahren
Dich näher an die Weisen, Göttlich-Milden.

—*West-östlicher Divan.*

—এই সূত্রে গয়টের বিখ্যাত *Das Göttliche* (The Godlike) কবিতাটি অনুধাবন করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ও গয়টে প্রতিভার মৌলিক প্রভেদটিও আলোচ্য কবিতাটিতে স্পষ্টই ধরা পড়ে।

৭ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৮ *Goethes Gespräche mit J. P. Eckermann* (1823-1832), অথবা ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ *Conversations of Goethe with Eckermann* (Everyman's Library).

এই প্রসঙ্গে গয়্‌টের পরিণত বয়সের কিছু কিছু বাঙ্ময় চিন্তা একেরমান্‌-এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের৮ থেকে উদ্ধৃত করা গেল। উভয় কবির মধ্যে এই ক্ষেত্রেই মনে হয় সবচেয়ে অধিক ঐক্য।—

"জাতীয়-সাহিত্য [Nationalliteratur] শব্দটির আজ আর কোনো অর্থ হয় না। বিশ্বসাহিত্যের যুগ সন্নিকটবর্তী হয়েছে [die Epoche der *Weltliteratur* ist an der Zeit] ; আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য প্রাণপণ যত্ন করা যাতে সে-যুগ সত্বর এগিয়ে আসে।"—জানুয়ারি ৩১, ১৮২৭

"মানবের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এমন একটি সজীব চিত্ত যা সত্যকে ভালোবাসে, এবং যেখানেই তার দেখা পাক না কেন তাকে শোষণ ক'রে আপনার ক'রে নেয়।"—ডিসেম্বর ১৬, ১৮২৮

"মোটের ওপর বলতেই হয়, জাতিতে জাতিতে দ্বেষ [dem Nationalhass] এক বিচিত্র ব্যাপার। যেখানে সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তর [untersten Stufen der Kultur], সেখানেই দেখবে এর শক্তিমত্তা ও ভয়ংকরতা সবচেয়ে অধিক। কিন্তু এমন উচ্চ স্তরেও ক্রমশঃ পৌছন যায় যখন এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়; সেখানে আমরা দাঁড়াই, কতকটা যেন, জগতের সমস্ত জাতির উর্ধ্বে [über den Nationen]।৯ সে অবস্থায় যে-কোনো প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীর আনন্দ অথবা বেদনা নিজেরই ব'লে অনুভব হয়।"— মার্চ ১৪, ১৮৩০

"একজন মানুষ বা নাগরিক হিসাবে কবি তার স্বদেশকে অবশ্যই ভালোবাসবে, কিন্তু তার কবিপ্রতিভার ও কাব্যকীর্তির স্বদেশ হল জগতের যা কিছু সুন্দর মহৎ ও মঙ্গলময়, [aber das Vaterland seiner poetischn Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das Gute, Edle und Schöne] কোনো নির্দিষ্ট প্রদেশ বা দেশের সীমায় তাআবদ্ধ নয়; তাকে যেখানেই সে দেখতে পাবে. সবলে অধিকার করবে এবং নিজের মতো ক'রেগড়ে নেবে।"১০ —মার্চ ১৮৩২১১

"আর তা ছাড়া, স্বদেশানুরাগের কি অর্থ? দেশকর্ম [patriotisch wirken] বলতেই বা কি বোঝায়? কবি যদি নিয়োগ ক'রে থাকে তার জীবন মারাত্মক যত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নানা সংকীর্ণ চিন্তা বা বিচারের দূরীকরণে, নিরালোকিত মানবচিত্তে আলোক বিকীরণে, তার রুচি ও রসবোধের কলঙ্ক মোচনে, স্বদেশবাসীর হৃদয়-মনের উন্নতিসাধনে, তবে তদতিরিক্ত আর কি-ই বা সে করতে পারে? কেমন ক'রে সে দেবে এর চেয়ে অধিক স্বদেশানুরাগের প্রমাণ?"—মার্চ, ১৮৩২১১

মনে মনে ভাবি, গয়্‌টের শেষের এই বাক্যগুলি কি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত পূর্বদেশীয় অনুজের উদ্দেশে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্‌বাণী! রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে পাঠ করলে তাঁর বাক্যের অর্থ আমাদের নিকট আরও অনেক গভীর, অনেক বেশী সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। একেরমান্‌-এর কাছে বলা তাঁর আর-একটি শেষবাণী এই উপলক্ষে উদ্ধৃত না ক'রে পারলাম না।

---

৯ তুলনীয়: ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁ (Romain Rolland) প্রণীত ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পত্রাবলী সংগ্রহ *Au-dessus de la Melée* (1015) C. K. Ogden কৃত ইংরেজি অনুবাদ *Above the Battle* (Allen and Unwin, 1916)।

১০ রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' (উৎসর্গ) কবিতা তুলনীয়:

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

Geben Sie acht, der Politiker Kird Der Poeten aufzehren: Mind, the politician will devour the poet!—Later in March, 1832.[১১]

'স্মরণ রেখো, রাষ্ট্রকর্মী গ্রাস করবে কবিকে!' ত্রিকালদর্শী কবির মুখের এই সাবধানোক্তি কালের ক্রূর পরিহাসে জগতে ক্রমশঃ কী ভয়ংকর ভাবেই না বাস্তব হতে চলেছে। গয়্‌ঠে-রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য আর-এক নূতনকোনো বলিষ্ঠকবিপ্রতিভা ছাড়া কে রোধ করবে সর্বগ্রাসী দুরন্ত এই বন্যা!

গয়্‌ঠে-সাহিত্যের এই সুস্থ-উদার বিশ্বগত প্রকৃতিটি শুরুতেই ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ক্রোচে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে নিজের জীবনের নিভৃত একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত দরদের সঙ্গে। গত প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের মেঘাচ্ছন্ন বৎসরগুলিতে গয়্‌ঠের রচনা তিনি পুনর্বার পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি বলেছেন যে, তাতেই তিনি তখন লাভ করেছিলেন গভীরতম সাহস ও সান্ত্বনার বাণী তাঁর হতাশ্বাস প্রাণে।[১২] সে পরম দুর্দিনে বিশ্বের অন্য আর কোনও কবি তাঁকে অনুরূপ ভরসা বা সান্ত্বনা দিতে পারতেন কি না সন্দেহ।

৩

সূক্ষ্ম 'প্রভাব'-সন্ধানী মন যে-সব সাহিত্য সমালোচকের, গয়্‌ঠে পরম বিরক্তির সঙ্গে তাদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'ফিলিস্টাইন' (die Philisterei)। তিনি বলতেন, গভীরতম ভাব বা তত্ত্বের রাজ্যে 'আমার-তোমার' (Mein und Dein) ভেদাভেদ বিচারের কি কোনো অর্থ আছে? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন গয়্‌ঠের হুবহু অনুরূপ ছিল, যাঁরাই কবির নিকটে এসেছেন তাঁরাই সে কথা খুব ভালো ক'রে জানেন। 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের 'রসিকতার ফলাফল' লেখাটি অনেকেরই হয়তো এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে—'গোবিন্দবাবুর সুগভীর প্রবন্ধে'র বিরুদ্ধে 'সম্মার্জনী' সাপ্তাহিক পত্রের সেই 'অকাট্য যুক্তি': "ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন 'জন্মিলেই মরিতে হয়'—এই চমৎকার ভাবটি যদি পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম।"

কে প্রতিভাবান লেখক কোথায় কার কাছ থেকে পেলেন তাঁর মানস-শরীরের কতখানি অন্নপুষ্টি, গয়্‌ঠে মনে করতেন নিতান্তই হাস্যকর এ ধরনের সন্ধান। "আমরা তার চেয়ে প্রশ্ন করলেও পারি কোনো একজন সুস্থ জোয়ান মানুষকে [einen wohlgenährten Mann] যে, সে কয় গণ্ডা ষাঁড় শুয়োর বা ভেড়া খেয়েছে [den Ochsen, Schafen und Schweinen fragen] তার শরীরে শক্তিলাভ করার জন্যে!"—অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গয়্‌ঠে স্বয়ং এই কথা একদিন (ডিসেম্বর ১৬, ১৮২৮) বলেছিলেন একেরমান্‌-কে।

---

১১ মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বের উক্তি। গয়্‌ঠের মৃত্যু হয় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে।

১২ "During the sad days of the World War I re-read Goethe's works and gained deeper consolation and greater courage from him than I could have gained perhaps in equal measure from any other poet."—*Goethe*, p. xviii.

অতএব "রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র উপরে গ্যেটের স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলীর কিছু ছায়াপাত,"[১৩] "প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যে ফাউস্টের প্রভাব,"[১৪] কিংবা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় গয়্‌ঠের 'মহম্মদের গান' (*Mahomets Gesang*) কবিতার সুগভীর সাদৃশ্যলক্ষণ,[১৫] ইত্যাদি প্রমাণহীন নানা নিষ্ফল জল্পনার মধ্যে প্রবেশ না ক'রে গয়্‌ঠের জীবনী, রচনা ও চিন্তাজগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-যোগাযোগের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করাই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র বছর সতরো ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (১২৮৫) কার্তিক সংখ্যায় তিনি প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী (পৃ ২৮৯-২৯৮) এক প্রবন্ধ লেখেন গয়্‌ঠে সম্বন্ধে। প্রবন্ধটির নাম 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'। গয়্‌ঠে তাঁর আত্মজীবনীতে যে-কয়জন প্রণয়িনীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে শুধু কেবল সেই কয়জনের কথাই সংক্ষেপে বলেছেন, এবং তাও অনেক ক্ষেত্রেই গয়্‌ঠের নিজের উক্তির সরল অনুবাদের মধ্য দিয়ে। প্রবন্ধটির সূচনা অংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল :

"গেটের বোধহয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্মান-সাহিত্যের অহঙ্কার ও অলঙ্কার স্বরূপ,—যিনি "ফষ্ট" নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন,[১৬] তাঁর আর নূতন পরিচয় কি দিব ?— কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি—" —ভারতী ১২৮৫, পৃ ২৮৯

কিন্তু এই একটিমাত্র প্রবন্ধের সাহায্যে গয়্‌ঠে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ঔৎসুক্য অনেকটা প্রমাণিত হলেও গয়্‌ঠে-সাহিত্য পাঠের তেমন কোনোই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিলাতযাত্রার (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮) পূর্বে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাস ছয়েক কাটিয়েছিলেন। "শাহিবাগে জজের বাসা ;···মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন ;···একটি বড়ো

---

১৩ কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'কবিগুরু গ্যেটে' গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮। 'স্বয়ম্বৃত সম্পর্কাবলী' অথবা *Die Wehlverwandtschaften* (The Elective Affinities)।

১৪ 'দেশ' পত্রিকা, ১০ ভাদ্র ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

১৫ এই কবিতাপ্রসঙ্গে ক্রোচের উক্তি তুলনীয়: "Truly remarkable is the song which the prophet sings, magnificent in its lyrical flight, celebrating the increase, the spread and the triumph of his doctrine in the future, under the image of the brook [মূল কবিতা অনুসারে den Felsenquell] which gushes out from the rock, and through the flowering fields, never stopping and welcoming many other streamlets, widens out to a regal river and flows into the ocean."—*Goethe*, p. 104.

১৬ প্রাচীন সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের আরম্ভাংশ তুলনীয়। গয়্‌ঠের বিখ্যাত 'শকুন্তলা' [Sakontala] শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবরত্নমালা' প্রথম সংস্করণের (১৩১৪) 'তৃতীয় ভাগ'। কবি ও কাব্য' বিভাগে ৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কবিতাটিতে সেখানে রবীন্দ্রনাথের নামের আদ্যক্ষরস্বরূপ "র" স্বাক্ষর আছে।

ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার• বইগুলি সাজানো ছিল। ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।"[১৭] জীবন-স্মৃতির বর্জিত আদি পাণ্ডুলিপিতে তিনি আর একটু বিশদ করে লিখেছিলেন: "ইংরেজিতে আমি যে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। মেজদাদাকে বলিলাম, 'আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।' তিনি আমার সম্মুখে টেন্ [Hippolyte Adolphe Taine] প্রভৃতি গ্রন্থকার-রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি, অ্যাংলো স্যাক্‌সন ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[১৮] কিন্তু উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের তিনজন স্বনামধন্য কবির প্রণয় কাহিনী নিয়েও তৎকালে বালক রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' সেই প্রবন্ধমালারই অন্তর্গত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অ্যাংলো-স্যাক্‌সন, অ্যাংলো-নর্মান প্রভৃতি আদিযুগের পুরাবৃত্ত-চর্চার অবকাশে বৃহত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যলোকের থেকে দান্তে পিত্রার্কা গেটে ও তাঁদের প্রণয়িনীদের এই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-রাজ্যে প্রথম প্রবেশ, এর সম্ভাবনার মূলে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে উল্লিখিত "এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা" বোম্বাইয়ের সেই মরাঠী মহিলাটি নেই তো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যিনি ঝক্‌ঝকে ক'রে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে"? অন্নপূর্ণা তরখড়কর ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে সময়ে কবিকাহিনীর আদান-প্রদান হওয়াটা খুব অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের মানসলোকের 'কবিকাহিনী' উপহার দিয়েছিলেন, আমরা জানি। তার পরিবর্তে পাণ্ডুরঙ-কন্যা তাঁকে তাঁর বিদেশীয় বিদ্যার ভাণ্ডার থেকে হয়তো কিছু বাস্তব কবিকাহিনী উপহার দিয়ে থাকবেন। দান্তে এবং পিত্রার্কা সম্বন্ধে প্রবন্ধ দুটিতে[১৯] উভয় কবির কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের অনেক দীর্ঘ অংশ রবীন্দ্রনাথ বাংলায় কাব্যানুবাদ করে দিয়েছিলেন। 'গেটে' প্রবন্ধে তার ব্যতিক্রমটি আমাদের লক্ষ্য করা কর্তব্য; প্রবন্ধটির শেষের দিকে লিলির গানের একটিমাত্র ছত্র ছাড়া অন্যত্র আর কোথাও তিনি গয়্‌ঠের কাব্যের সঙ্গে নিজের পরিচয়ের সে ভাবে প্রমাণ দেন নি। অবশ্য, প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি এ-কথাও ব'লে নিয়েছেন, "দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।...গেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না।" বলা বাহুল্য এই উক্তি অর্ধ-সত্য। 'কবিকাহিনী' কাব্যের নির্জলা আদর্শবাদী ভাববিলাসী বালক-কবিকে বস্তুত গয়্‌ঠের উপমা-অলংকারবিরল বাস্তবমুখী কাব্য তখনো তেমন গভীর-ভাবে আকর্ষণ করে নি।

১৭ জীবনস্মৃতি, 'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদ।

১৮ জীবনস্মৃতি, নূতন সংস্করণ: 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ দ্রষ্টব্য।

১৯ "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য"; ভারতী, ১২৮৫ ভাদ্র, পৃ ২০১-১২

"পিত্রার্কা ও লরা"; ভারতী, ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ ২৭২-৭৯

লিউইস্‌-এর গয়্‌ঠে-জীবনী[২০] থেকে তাঁর প্রবন্ধটির মাল-মশলা প্রধানতঃ সংগ্রহ করে থাকলেও কিছু কিছু বাইরের বিবরণ যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তা আমরা তুলনা ক'রে দেখেছি। গয়্‌ঠের প্রণয়িনীর সংখ্যা একাধিক। প্রেমিক গয়্‌ঠের জীবনের নিজস্ব যে একটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, সেইটিই তিনি তাঁর প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। আমাদেরও লক্ষ্য করবার বিষয়, তখন থেকেই গয়্‌ঠে-কাব্যের চেয়ে গয়্‌ঠে-চরিত্রের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের অধিক কৌতূহল এবং আকর্ষণ। গয়্‌ঠের প্রণয়ী-জীবনে 'ফ্রেডেরিকা'র (Friederike Brion) স্থান সকলেই মনে করেন সবার উর্ধ্বে, উক্ত বিয়োগান্ত কাহিনীর উপসংহারে গয়্‌ঠের আবেগপূর্ণ মূল্যবান যে-মন্তব্য, তার রবীন্দ্রনাথকৃত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"গ্রেষেণ আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল—আনষেণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।"[২১] —ভারতী ১২৮৫, পৃ ২৯৬

এই মহিলা আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন, এবং শোনা যায় কারও কাছে বলেছিলেন, 'যে হৃদয় গয়্‌ঠেকে ভালোবেসেছে, সে আর অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে না।'

আলোচ্য প্রবন্ধটির আরম্ভাংশে রবীন্দ্রনাথ গয়্‌ঠের আর একটি মূল্যবান উক্তির ভাবানুবাদ দিয়েছেন, এবং সেটি তিনি সম্ভবত লিউইস্‌গ্রন্থের বাহির থেকে সংগ্রহ করেছেন, বিশেষ ক'রে বেটিনার (Bettina Brentano) মন্তব্য অংশটি। গয়্‌ঠের মানসচরিত্রের একটি নিজস্বতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত সেই উক্তিটিতে :

"গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে—পাখীর পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কিরূপে গ্রথিত আছে।[২২] বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন।"—ভারতী ১২৮৫, পৃ. ২৮৯

---

২০ *The Life and Works of Goethe* by George Henry Lewes (1855)। খুব সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ *The Story of Goethe's life* (1873) রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন। কবির স্বহস্তে "Rabindranath Tagore" নামাঙ্কিত পুরাতন গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে।

২১ তুলনীয় : Gretchen had been taken from me; Annchen had left me; but now, for the first time, I was guilty; I had wounded, to its very depths, one of the most beautiful and tender of hearts. And that period of gloomy repentance, bereft of the love which had so invigorated me, was agonising, insupportable. But man will live; and hence I took a sincere interest in others.—*The Story of Goethe's Life*, Book III, Chap. I, p. 76.

গয়্‌ঠে-আত্মজীবনীর সেকালে প্রচলিত John Oxenford কৃত ইংরেজি অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি তার অন্যতম একটি প্রমাণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, সেখানে Annchen নামটির ইংরেজি রূপ 'Annette' আছে।

২২ তুলনীয় : From my earliest years I felt a love for the investigation of natural things. . . . I remember that as a child, I pulled flowers to pieces to see how the leaves were inserted into the calyx, or even plucked birds to observe how the feathers were inserted into the wings.—*Truth and Poety*, Part I, Book IV, Oxenford's translation,

আবাল্যকালের এই বিশ্লেষণমুখী পর্যবেক্ষক-মনটি গয়্‌ঠের সমগ্র মানসিক চরিত্রের একটি অতি বিশিষ্ট অঙ্গ। এরই প্রেরণা জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর মনোযোগ ও লেখনীকে বিজ্ঞানের নানা রহস্যময় রাজ্যেও বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করেছে, সে কথা কারো অবিদিত নেই। এই বিজ্ঞানী-গয়্‌ঠে সম্বন্ধে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত 'সাধনা'-পর্বে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা (১২৯৮-৯৯) পত্রালাপের মধ্যে এক জায়গায় অতি সুস্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন :

"গেটে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদ্‌রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায় নি, অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে।"[২৩]

এই মন্তব্যটির উৎপত্তি যে গভীরতর বিশ্বাসের থেকে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বলেছেন, "পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" এ হল তত্ত্বের রাজ্যের তর্ক, মতভেদের সূক্ষ্ম অবকাশ এর মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, গয়্‌ঠের সুবিপুল বিজ্ঞানচর্চার মধ্যেও যে সর্বত্র একটি বৃহৎ কবিমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচ্য পত্রালাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা খুব সম্ভবত পরিষ্কার ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার যে-প্রেরণায় একদা তাঁর সমন্বয়দর্শী কবিসুহৃদ্‌ রবীন্দ্রনাথকে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছিল, গয়্‌ঠের আবিষ্কারের যথার্থ প্রকৃতিটি জানতে পেলে সে-ক্ষেত্রেও কবি সেই একই ধরনের প্রেরণা লাভ করতেন বলে আমাদের বিশ্বাস। গয়্‌ঠের জীবনে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সন্ধান বিশ্বপ্রকৃতিতে নিগূঢ় একটি সামঞ্জস্য ও বৃহত্তর ঐক্য-সন্ধানের প্রবল এক আন্তরিক আগ্রহ থেকেই উদ্‌ভূত। এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।—

From first to last, in his nature-study, be it noted, Goethe's attitude differed from that of the ordinary man of science. His interest in such discoveries as he made was not for themselves, but for the light they cast on the processes of nature as a whole. His persistent endeavour was to attain a conception of the *Kosmos* which would satisfy both his intellect and his heart.[২৪]

এই লেখকই অন্যত্র আরো ভালো করে ধরিয়ে দিয়েছেন গয়্‌ঠের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ ও কবি স্বরূপের অন্তর্নিহিত আত্মীয় সম্বন্ধটি :

Kant's conception "that a work of art should be treated as a work of Nature and a work of Nature as a work of art" was, however, no new revelation to Goethe. . . . It was his deep conviction that to the production of a poem and to the making of a scientific discovery the same faculty was needful—the imaginative reason. For him, therefore, there was no incongruity between the labour that went to the creation of *Faust* and the labour that resulted in the discoveries of the

---

২৩ "পত্রালাপ (২)," 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৪৭০।

২৪ *Life of Goethe* by P. Hume Brown; Vol. I, p. 274-75.

metamorphosis of plants, of the intermaxillary bone, and of the relation between the skull and the vertebra.[২৫]

গয়্‌ঠে ও রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কবিমানসের মধ্যে যে একটি ঐক্যলক্ষণ দেখা যায় তার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ; উপরের উদ্ধৃতিগুলির এবার তুলনা ও বিচার করলে অনায়াসেই ধরা পড়বে, কোথায় তাঁদের কবিপ্রকৃতির অন্তর্গত নিগূঢ় পার্থক্যটি। তাঁদের উভয়ের উচ্চ-উদার কবি-মানসের শেষ ঐক্যতীর্থে পাশ্চাত্য ও পূর্বদেশের কবি পৌঁছেছিলেন, এক হিসাবে বলতে হয় বিপরীত-মুখী দুইটি কবিপ্রকৃতির সুদীর্ঘ গিরিপথ বেয়ে। একদা তাঁদের উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পূর্বে শিলার (C. F. Johann Schiller) তাঁর কবিবন্ধুর বিষয়ে বলেছিলেন,

His [Goethe's] philosophy is not wholly to my liking ; it draws too much from the sensible world, whereas I draw from the soul.[২৬] আমাদের তাই মনে হয় কবিপ্রকৃতির এই বিপরীত-মুখীনতা কিছু প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভৌগোলিক বিভেদের উপরে নির্ভর করে না। বস্তুত এ ভেদ মানব সাধারণের স্বভাবগত 'বহির্মুখীন' অথবা 'অন্তর্মুখীন' প্রবণতারই অনেকাংশে পরিচায়ক।

৪

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে তাঁর প্রথম বিলাতযাত্রার বৎসর, ইংরেজি ১৮৭৮ সাল, বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ বৎসরেই যতই দুর্বল পদক্ষেপে হোক না কেন—আর বয়সের অনুপাতে দুর্বলই বা সম্পূর্ণ বলি কেমন করে ?—রবীন্দ্র-কবিমানসও বেরিয়ে পড়ল য়ুরোপীয় সাহিত্যরাজ্য ভ্রমণে। এ কথাও কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সে-ভ্রমণের প্রধান বাহন চিরদিনই ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, এবং সে দুর্ভাগ্য ভারতে একা রবীন্দ্রনাথের কেবল নয়, অধিকাংশ ভারতবাসীরও। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে খুব খাঁটি কথাই বলেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে :

"আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে সে-সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এইজন্য সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"—জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়' পরিচ্ছেদ।

রবীন্দ্রনাথের বন্ধুভাগ্য এই সময়ে বাস্তবিকই যথেষ্ট পরিমাণে অনুকূল হয়েছিল। বিলাতে গিয়ে তিনি সহপাঠীরূপে পেয়েছিলেন তারক পালিত মহাশয়ের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে ; ভারতে ফিরে অনতিকালের মধ্যেই পেলেন প্রিয়নাথ সেন ও আশুতোষ চৌধুরীকে। এঁদের মধ্যে প্রিয়নাথের সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা

২৫ *Life of Goethe* by P. Hume Brown; Vol. II, p. 413-14.
২৬ Ibid, p. 412.

আনাগোনা।" আশুতোষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল।" বস্তুত প্রিয়নাথ সেনেরও মুখ্য ঝোঁক ছিল এই ফরাসি সাহিত্যেরই দিকে। ফলে, প্রধানতঃ রেনেসাঁস, রোম্যান্টিক ও ভিক্‌টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্য, ভিক্টর হ্যুগো, থিওফিল্ গোতিয়ে (Theophile Gautier) প্রমুখ ফরাসি সাহিত্যিকের রচনা, এবং কিছু ইতালীয় রচনা'[২৭] যুবক রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। তাঁদের সে-যুগের সাহিত্য-আলোচনায় তাই জর্মন সাহিত্যের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই হয়। পরবর্তী যুগে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-সঙ্গের ফলাফলও রবীন্দ্রজীবনে অনুরূপ ফরাসি সাহিত্য ঘেঁষাই হয়েছিল, সে কথাও সর্বজনবিদিত। এই পটভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত লোকেন পালিতকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির শেষাংশ যখন পাঠ করি তখন মোটেও আশ্চর্য হই না। সেখানে তিনি সমকালীন ইংরেজি (১৮৯০-৯২ খ্রীস্টাব্দ) আধুনিক সাহিত্যে 'আদিম জর্মানিক প্রকৃতি'র প্রতি ঝোঁকের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "আমার একটা অন্ধ সংস্কার আছে যে, সত্যকে যে অবস্থায় যতদূর পাওয়া সম্ভব তাকে তার চেয়ে ঢের বেশি পাবার চেষ্টা ক'রে, জর্মানেরা তার চারদিকে বিস্তর মিথ্যা স্তূপাকার ক'রে তোলে। ইংরেজেরও হয়তো সে-রোগের কিঞ্চিৎ অংশ আছে।"[২৮] এই কড়া মন্তব্যটিকে 'একটা প্রাইভেট প্রগল্‌ভতা মাত্র' ব'লে লঘু করবার চেষ্টা তিনি সেখানে ক'রে থাকলেও, আমাদের মনে হয় এই মনোভাবই জর্মণ সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের অভাবের জন্য বিশেষ ক'রে দায়ী। সে যুগের কাব্য 'প্রভাত সংগীত' ও 'কড়ি ও কোমলে'র 'অনুবাদ'-কবিতাগুলিতে বা 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছে' তাই আমরা ফরাসি মহাকবি ভিক্টর হ্যুগোর সাক্ষাৎ অনেক বারই পাই, কিন্তু গয়্‌টে, হাইনে প্রমুখ জর্মন কবিদের কারোই দেখা একটিবারের জন্যও পাই না।[২৯]

এই ধরনের অননুরাগের—অথবা হয়তো বলা সমীচীন অননুকূল—আবহাওয়ারমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জর্মন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কিন্তু বাস্তবিকই অবাক হতে হয় তাঁর উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখে। ইংরেজি ১৮৮৪ সালের রবীন্দ্র-স্বাক্ষর সংবলিত *The Dramatic works of G. E. Lessing* / Bohn's Standard Library / 1878, থেকে শুরু ক'রে "Rabindranath Tagore / July 1892" স্বাক্ষর যুক্ত প্রথম খণ্ড 'ফাউস্ট'-এর হেওয়ার্ড-কৃত গদ্যানুবাদের ১৮৯২ সালে প্রকাশিত সংশোধিত নূতন সংস্করণ[৩০] পর্যন্ত জর্মন সাহিত্যের সেরা খান কয়েক বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ যা তিনি সে-যুগে কিনেছেন ও পড়েছেন ব'লে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থ-সংগ্রহে আজও দেখা যায়, তা নিতান্ত নগণ্য নয়।[৩১]

---

২৭ দ্রষ্টব্য: 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' (১) প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২, পৃ. ১৫।

২৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৪৭৫।

২৯ আলোচ্য অনুবাদগুলির অধিকাংশই ভারতীতে ১২৮৮ (ইং ১৮৮১) সালে বাহির হয়।

৩০ 'বন্‌স্ লাইব্রেরি'র [Bohn's Libraries] গ্রন্থতালিকায় বইটির পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নরূপ আছে:

Goethe's *Faust*, Part I. The original text, with [Abraham] Hayward's Translation and Notes, carefully revised, with an Introduction and Bibliography by C. A. Buchheim, PH.D., Professor of German Language and Literature at King's College, London. [April-may, 1892.]

৩১ 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে'—প্রবোধচন্দ্র সেন; 'দেশ' পত্রিকা, ২১ মাঘ ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য

১৮৮৭ সালের ২৫ বৈশাখ, কবির জন্মদিনে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র, ভাগিনেয় জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল মাতুল রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন *The Poems of Heine* / Translated by Edgar Alfred Bowring, C. B. / George Bell and Sons, / 1884, গ্রন্থখানি। সেই একই বৎসরে "মেজ বোঠান" জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তাঁর জন্মদিনে, "১২ই শ্রাবণ ১২৯৪" [২৭ জুলাই ১৮৮৭] তারিখে "রবি" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপহার দেন Henry Irving Edition / *The First Part of Goethe's Faust from the German* / by John Anster LL.D. / with an introduction / by Henry Morley LL.D. / Illustration by J. P. Laurens, / London, George Routledge and Sons / 1887, সচিত্র শোভন-সংস্করণ গ্রন্থটি। George Bell and Sonsএর *The Dramatic works of J. W. Goethe* (1880) গ্রন্থখানি ইতিপূর্বেই ক্রয় বা সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবতঃ পূর্বোল্লিখিত *The Dramatic works of G. E. Lessing*এর জুড়ি বই হিসাবে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উক্ত নাট্যসংগ্রহে ফাউস্ট' নাটকটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

অতএব, ১৮৮০ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েক বৎসরের মধ্যে, ইং ১৮৮৪ সাল থেকে জর্মন সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন শুরু করেন। সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর সমসাময়িক ও কিয়ৎপরবর্তীকালের কাব্যে, এবং বিশেষ ক'রে গদ্য-প্রবন্ধাদিতে ও চিন্তায় এই সময় থেকে সূচিত হয়ে থাকলেও, তাতে কিন্তু জর্মনিক প্রভাব বিশেষ ক'রে নজরে পড়বার কোনো হেতু নেই। বলা বাহুল্য ইংরেজি চিন্তা ও সাহিত্য তখনো তাঁর মানসরাজ্যের রাজাসনে।[৩২]

১৮৮৭ সালে জন্মদিনে উপহার-প্রাপ্ত 'হাইনে'র অনুবাদ কাব্যখানি (*The Poems of Heine*) পাঠ ক'রে মূল জর্মনভাষা শিক্ষা করার উৎসাহ জাগে রবীন্দ্রনাথের, সে কথা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। সেই প্রাসঙ্গিক উক্তিটুকু আমরা অনতিবিলম্বেই উদ্ধৃত করব। এখানে শুধু লক্ষ্য করা দরকার যে, গয়্ঠে-কাব্য পাঠ তাঁকে জর্মনভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ করে নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিকে বস্তুতঃ আকর্ষণ করেছিলেন জর্মনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবিই; রবীন্দ্রনাথের কাছে গয়্ঠে তখনো প্রধানতঃ নাট্যকার, তাঁর গীতি ও গাথা কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বোধ হয় কোনো দিনই যথেষ্ট ভালো ক'রে ঘটে নি। যাই হোক, অবশেষে শুরু হল তাঁর জর্মন ভাষা শিক্ষা, ১৮৮৭ সালের পরবর্তী কোনো এক সময়ে। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের তখন যোগাযোগ ঘটে যায় এক জর্মন মিশনরি মহিলার সঙ্গে; তাঁর সাহায্য গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বেশ কয়েক মাস ধরেই উৎসাহের সঙ্গে জর্মন শিক্ষার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শুভ প্রয়াসে বাধ সাধল কবির প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি ও সতেজ কল্পনাশক্তি,— ভাষা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অধ্যবসায় ও মনোযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে ক্রমেই কঠিন হতে লাগল, কারণ ভাষাজ্ঞান বাস্তবিক তাঁর যে-পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি ও অনেক গভীর বিষয়

৩২ তুলনীয়: বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩); আলোচনা (১৮৮৫); কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)—"আমি তখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি [আশুতোষ চৌধুরী] ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন।"—জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য; চিঠিপত্র (১৮৮৭); সমালোচনা (১৮৮৮); পারিবারিক স্মৃতিলিপি [১২৯৫-১৩০২] ও পঞ্চভূত (১৮৯৭) প্রভৃতি রচনা তুলনীয়। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), বা য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১, ১৮৯৩) গ্রন্থ দুটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

ও ভাব তিনি আন্দাজে কতকটা যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বুঝে ফেলতে লাগলেন। এই দুর্বল ভাষাজ্ঞানের উপরেই ষোলো-আনা নির্ভর ক'রে, এবং নিজের কল্পনা ও উপস্থিতবুদ্ধির পাখা মেলে দিয়ে জর্মনভাষার রাজ্যে তাঁর সেই যে স্বপ্নে উড়ে চলা, বিদেশী শিক্ষয়িত্রী তার সম্পূর্ণ রহস্য ধরতে না পেরে ভাবলেন সত্যিই বুঝি তাঁর ভাষাজ্ঞান পাকা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের জবানিতে এবার উদ্ধৃত করা যাক তাঁর জর্মনভাষা-শিক্ষার এই কৌতূহল উদ্দীপক বিবরণ :

I also wanted to learn German [ইতিপূর্বে লেখক বলেছেন, when I was young I tried to approach Dante.] and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language,—which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকলেন না। অতঃপর পরম উৎসাহে ঝাঁপ দিলেন তিনি গয়্‌টে-সাহিত্যে :

Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*. I believe I found my entrance to the palace, not like an intimate who has keys for all the doors but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dark to me.

রবীন্দ্রনাথের এই অত্যন্ত মূল্যবান আত্মোক্তিটির প্রতি সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র পরিবর্ধিত সংস্করণে (১৩৫৩)। সেখানে কিন্তু তিনি উদ্ধৃতিটি করেছেন স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও জে. এইচ. মূইরহেড (S. Radhakrishnan and J. H. Muirhead) সম্পাদিত *Contemporary Indian Philosophy* (1936) গ্রন্থের 'The Religion of an Artist' (p. 31) নামক রবীন্দ্রথাথের লেখা প্রবন্ধটি থেকে।[৩৩] বস্তুতঃ এ উক্তিটি ১৯৩৬ সালের বহু পূর্বেকার ; ১৯২৪ সালের মে মাসে চীন-প্রবাসের সময় পেকিং শহরে সেখানকার সাহিত্যিকদের এক ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথ মূল বক্তৃতাটি সর্বপ্রথম দেন।[৩৪]

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালের ১৬ অগস্ট তারিখে তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, ১৮৮৯-৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে জর্মনভাষা শিক্ষার এই বিফল প্রয়াস করেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে শিলাইদা থেকে লেখা ৩ জুন, ১৮৯০ তারিখের এক পত্রে তিনি লিখেছেন :

"জর্মান *Faust* অল্প অল্প ক'রে পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা

৩৩ 'রবীন্দ্রজীবনী', পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩। পৃ ৭১, ৪নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪ *Talks in China* [1925], p. 67-68.

নায়েবের কৈফিয়ত প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।"[৩৫]

'Properly speaking, I do not know my Goethe'—এটি রবীন্দ্রনাথের বিনয়বচন বটে, বহুলাংশে সত্য উক্তিও বটে। ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যে গয়্‌ঠের প্রভাব সন্ধান করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদেরই সম্ভাবনা অধিক, বিশেষতঃ সেই সব রচনায় যার মূল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবনের নিগূঢ়তম তত্ত্বেরই একটি সবিশেষ প্রতিবিম্ব মাত্র। তবে এ কথাও সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গয়্‌ঠেকে তাঁর প্রতিভার সমগ্রতায় বুঝে নিতে রবীন্দ্রনাথের মনীষার পক্ষে শেষ পর্যন্ত কোনো বাধা ঘটে নি, ভাষাগত এই বাইরের বাধা সত্ত্বেও। তাঁদের উভয়ের ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার মধ্যে অনেক বিভেদ থাকলেও, গোত্রগত একটি মৌলিক মিল সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর অজস্রতার মধ্যে কয়েক জায়গায় তাই স্পষ্টই দেখতে পাই তিনি গয়্‌ঠের লেখায় স্থানে স্থানে প্রাণের গভীর সায় পেয়েছেন।

গয়্‌ঠের সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষানুরূপ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ঘটে নি ; কিন্তু এ কথাও দেখেছি তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, With the help of the little German I had learnt, I did go through *Faust*.

গয়্‌ঠের 'ফাউস্ট' মূল জর্মনভাষায় পড়ার চেষ্টা যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কয়েক বৎসরেও পরিত্যাগ করেন নি, তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আমরা পাই তাঁর "July 1892" তারিখের স্বাক্ষর সংবলিত 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের ইতিপূর্বে উল্লিখিত হেওয়ার্ড-কৃত গদ্যানুবাদ গ্রন্থটি থেকে। বইটিতে বাম পৃষ্ঠায় মূল জর্মণ পাঠ ও ডান পৃষ্ঠাতে তার ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া আছে। প্রথম অঙ্কে আরম্ভের দিকে NACHT অথবা Night Scene স্থানে স্থানে কবির হস্তাক্ষর চিহ্ন এখনো বহন করছে বলে মনে হয়। ফাউস্ট-এর কবির 'প্রভাব' বলব না, তবে নিজের আদর্শ ও কল্পনায় তাঁর কোনো কোনো আদর্শ ও কল্পনার 'সায়' যে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ কবির পুরাতন চিঠিপত্রের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

কুষ্টিয়া থেকে ১৮৯৫ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের একটি চিঠিতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখেছেন :

"ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখই প্রচুর সুখ। ···Goethe-র একটি কথা আমি মনে ক'রে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় ক'রে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকম পাই।" —'ছিন্নপত্র'

বলা প্রয়োজন, 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের চতুর্থ দৃশ্যে (ফাউস্টের 'পাঠাগার' বা STUDIRZIMMER দৃশ্যে), ফাউস্টের চতুর্থ উক্তির ষষ্ঠ পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন। ঈশোপনিষদের 'মা গৃধঃ'

---

৩৫ চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৩৫ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রের আদর্শে ও জাগ্রত প্রেরণায় আজীবন মানুষ হয়েছিলেন যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণে গভীর সাড়া তো জাগবেই গয়্‌টের এই Thou shalt renounce মন্ত্রে।

প্রায় সমসাময়িক আর-একটি পত্রে গয়্‌টের কল্পনায় সাড়া ও সায় পাবার খবর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন; সে চিঠি সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না, অথচ অমূল্য তার সেই ইঙ্গিতটুকু। কবি তাঁর 'চিত্রা' কাব্যের অনেকগুলি কবিতার বিষয়ে আলোচনা ক'রে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দীর্ঘ এক পত্র লেখেন শিলাইদহ, কুমারখালি থেকে, ৬ চৈত্র ১৩০২ [১৮৯৬] তারিখে। তার মধ্যে এক জায়গায় লিখেছিলেন :

"তুমি যে লিখিয়াছ, ' উর্বশী বহুকাল পরে একটা কবি-কম্‌প্লিমেণ্ট পাইয়াছেন' সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পৌরাণিক উর্বশী নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewig Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ তখন 'ফাউস্ট' পড়েছেন, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। অতএব বলাই বাহুল্য, এই 'অনন্ত-নারী'র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন 'ফাউস্ট'-দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহারে সুবিখ্যাত Chorus Mysticusএর নিম্নোদ্ধৃত সর্বশেষ দুটি ছত্রে :

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ মূল 'ফাউস্ট' ছাড়া গয়্‌টের 'একেরমান-এর সহিত আলাপ' (*Goethes Gespräche mit Eckermann*) গ্রন্থটিও মূলভাষায় না হোক, অনুবাদে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়' পরিচ্ছেদে "আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম," ব'লে যে চিঠিখানির অংশমাত্র তিনি উদ্ধৃত করেছেন সেটি ১৮৯১ সালের কাছাকাছি লেখা হবার কথা, অর্থাৎ তাঁর গয়্‌টে-সাহিত্য পাঠের পূর্বোল্লিখিত পর্বটির আরম্ভে। উক্ত চিঠির সবচেয়ে চমকদেওয়া পংক্তিটি গয়্‌টের উক্তির একটি ছত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যে আশ্চর্য রকম মিলে যায়। আমাদের মনে হয় সদ্য পাঠ করা গয়্‌টের রূপকটি অর্ধসচেতন মুহূর্তে প্রবেশ করেছে কবির নিজের লেখায়। ছত্র দুটি তুলনার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn: When I was eighteen, all my country was eighteen too. (February 15, 1824).

—*Goethe's Conversations with Eckermann.*

"মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল।"[৩৭] —জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়'

---

৩৬ 'চিত্রা' নূতন সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয় অংশের পৃ ১২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে 'ভগ্নহৃদয়' গীতি-কাব্যখানির স্থান কিয়দংশে গয়্‌টের কবিজীবনে 'হ্বের্টর' (Werther) গ্রন্থের সহিত তুলনা করা চলে।

গয়্‌ঠে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনীয় বয়সে বৎসরের সংখ্যা পর্যন্ত হুবহু একই হওয়ায় উপরে বর্ণিত সন্দেহের উদয় হয়েছে আমাদের মনে।

৫

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তবুও আমাদের মূল বক্তব্যটিকে হারালে চলবে না। গয়্‌ঠে-সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতঃ 'ফাউস্ট', এবং তৎসঙ্গে তাঁর 'আত্মজীবনী' 'কথোপকথন' ও 'উক্তি সংগ্রহ' (Sprüche, অথবা Sayings)[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে পাঠ করেছিলেন, তাঁর বছর বাইশ-তেইশ থেকে শুরু ক'রে বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ (১৮৮৪-১৮৯৫) বয়সের মধ্যে। কিন্তু গয়্‌ঠের জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের যথার্থ পরিমাপ গয়্‌ঠে-সাহিত্যে তাঁর সাক্ষাৎজ্ঞান দিয়ে করা চলে না। উভয়েই ব্যক্তিত্বপ্রধান বলিষ্ঠ জাতের কবি; কাব্যরচনা ও জীবন-রচনা উভয়ের কবিপ্রতিভায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, অর্থাৎ উভয়েই কেবলমাত্র কথাশিল্পী নন, জীবনশিল্পীও; উভয়েই আলোর প্রেমিক, অনন্তজীবনের প্রেমিক, বিশ্বমানবতার প্রেমিক; উভয়েই ব্রতযাপনের মতো ক'রে তাঁদের সুদীর্ঘ কবিজীবন যাপন করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। তাই দেখতে পাই গয়্‌ঠে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সের অসমাপ্ত দৃষ্টি পরিণত যৌবনে ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জীবনকাহিনী রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ পাঠ করেছেন, স্নেহভাজনদের পাঠ করতে উৎসাহিত করেছেন, এবং তাঁর আশ্চর্য কবিপ্রকৃতির রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনের বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক ও ঘটনা-সংস্থানের পর্যালোচনা ক'রে। নিজের শান্ত সীমায়িত জীবনের সঙ্গে গয়্‌ঠের জীবনের তুলনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো এমনকি নিরুৎসাহ বোধ করেছেন আপন প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে। কখনো হয়তো বা নিজের নিভৃত জীবনে জর্মন মহাকবির বলিষ্ঠ জীবন থেকে প্রেরণা সঞ্চয়ও করে থাকবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুরাতন পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ এই সূত্রে উদ্ধৃত করলে আমাদের বক্তব্য অনেকটা পরিষ্কার হবে মনে হয়:

"গেটের জীবনীটা[৩৯] তোর ভালো লাগচে? একটা তুই লক্ষ্য ক'রে দেখে থাক্‌বি, গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাক্‌ত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল—জর্মনীতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হের্ডের, শ্লেগেল্, হুম্বোল্ট্, শিলার, কাণ্ট্ প্রভৃতি বড় বড় চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারিদিকে জেগে উঠছিল—তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে—নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়।...গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তাহলে আমাদের মতো

৩৮ 'গ্যেটের উক্তি সংগ্রহ'—পাঠ-সঞ্চয় (১৩১৯), পৃ ১৯৭-৯৯ দ্রষ্টব্য। অনূদিত উক্তি-সংখ্যা মোট কুড়িটি মাত্র।

৩৯ *The Story of Goethe's Life* by G. H. Lewes (1873); ইতিপূর্বে ২০ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থখানি হওয়াই সম্ভব।

লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত আবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব।"[৪০] —শিলাইদহ, ১১ অগস্ট [১৮৯৪]

"আমি আলো ও আকাশ এত ভালোবাসি। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন More light—আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি More light and more space।"[৪১] —বোয়ালিয়ার পথে, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

"কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ[৪২] পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কি এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কি এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল— তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কি একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মত কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে— মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি—শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে; মনে হয়, যদি গেটের মত শুভাদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলা দেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এদেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকৃত— তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম— এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি ত আমিও একসময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব— এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।"[৪৩] —পতিসর, ২৫ নভেম্বর [১৮৯৫]

"...সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালচে, গোয়ালে ধোঁয়া দিচ্চে—দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মত নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্চে—আমি খড়খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করচি। কোথায় নাগর নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি— আর কোথায় বিচিত্রকর্ম সংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!"[৪৪] —পতিসর, ২৯ নভেম্বর [১৮৯৫]

নাগর নদীতীরের সেদিনের সেই কবি বাস্তবিকই একসময়ে উদার বিশ্বনাগরিকতার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অবশেষে বেরিয়ে পড়লেন বৃহত্তর বিশ্বজগতে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গয়্‌টের স্বদেশে গিয়ে তিনি স্বয়ং রাজসম্মান ও সমাদরও লাভ করলেন,—কে বলবে তখন মনে পড়েছিল কি না যৌবনের এই

৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ ২৩২

৪১ ছিন্নপত্র, পৃ ২৯৭

৪২ *New Studies in Literature* by E. Dowden [1895]

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়: পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহারে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায়; শেলি, গেটে, কোলরীজ
কার কোন্ শ্রেণী। —চিত্রা, 'পূর্ণিমা'

৪৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ ২৪৭

৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩, পৃ ৪

'ভাইমার রাজসভার রাজকবি'টিকে। গয়্‌ঠের জন্মনগরী ফ্রাঙ্কফোর্ট-এও রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সন্ধান পাই, কিন্তু হ্বাইমার-এ বোধ হয় নয়। গয়্‌ঠের স্মৃতিতীর্থও কোথাও কিছু দেখতে গিয়েছেন বলে শুনি না। এ রহস্যের সমাধান পাই এই ভেবে যে, তখনকার সে-রবীন্দ্রনাথ তো আর গয়্‌ঠে যাকে বলতেন Das Weltkind (The world-child), সেই ধরিত্রীর দুলাল কবিসাহিত্যিক মাত্র নন; তখন তিনি গয়্‌ঠের ভাষাতেই, Prophete বা প্রফেট্। World-Child গয়্‌ঠের সঙ্গে মিলন বা সাক্ষাৎকার ঘটে নি তাই সেদিনের সেই প্রফেটের।

১৯৩২ সালে উদ্‌যাপিত গয়্‌ঠের মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজন সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন রবীন্দ্রনাথ World Goethe Honouring [Welt-Goethe-Ehrung] দলের দলপতি Prof. Ch. H. Kleukens-এর কাছ থেকে। ১১।১০।৩১ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি পত্র লিখলেন তাঁকে

Dear Sir, I gladly consent to become a Patron of the World-Goethe-Honouring which you are organising in Germany. I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe.[৪৫]

কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র-স্বর্ণগ্রন্থের জন্যে ইতিপূর্বে যেমন অমর কাব্যপুষ্পাঞ্জলি রচনা করেছিলেন তেমন কোনো প্রেরণা সেদিন তিনি অনুভব করেন নি মনে হয়। তখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন পারশ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কবি হাফিজের দেশ জানিয়েছে সাদর আমন্ত্রণ সেদিন রবীন্দ্রনাথকে, যে-হাফিজ একদা গয়্‌ঠের শেষজীবনের কাব্যে[৪৬] যৌবনের জোয়ার জাগিয়েছিলেন। †

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্যেটে ও অর্বাচীন কালের সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অর্বাচীন কালের সাহিত্যের একটি প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কোথায় সেই প্রভেদটা, কেন সেই প্রভেদ দেখা দিল বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে থাকে যে দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা পার্থক্য বিদ্যমান। স্বদেশ হইতে বিদেশে আসিয়া পড়িলে আবহাওয়ার একটা পার্থক্য অনুভূত হইতে থাকে— এও অনেকটা সেইরকম। প্রাচীন সাহিত্যের আবহাওয়া অর্বাচীন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু আবহাওয়া বলিতে অস্পষ্ট ও ব্যাপক একটা কিছু বোঝায়, নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। নির্দিষ্টভাবে দুই সাহিত্যের প্রভেদ বোঝা এবং বোঝানো নিরতিশয় কঠিন।

কালিদাসের শকুন্তলা আর গ্যেটের 'ফাউস্ট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুয়ের আবহাওয়া কি স্বতন্ত্র নয়? আবার সোফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটক ও শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' দুইই মহৎ কাব্য, কিন্তু

৪৫ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত।

৪৬ *West-östlicher Divan* অথবা West-eastern Divan [1917]

† জর্মন মূল পাঠের প্রয়োজনীয় অনুবাদ ও তুলনা কার্যে বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যাপক ফজ্‌ল্‌ল্ মহ্‌মুদ অসিরি সর্বত্রই প্রভূত সাহায্য করেছেন।—লেখক

দুয়ের আবহাওয়া যে স্বতন্ত্র! আবার একদিকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য লওয়া যাক্ আর-একদিকে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি দীর্ঘাকার কবিতা, মনে করা যাক, মানস সুন্দরী দুইই মহৎ— কিন্তু দুটি কাব্যজগতের এক দেশের অধিবাসী নয়। এমন উদাহরণ আরও লওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

উপরের উদাহরণগুলিতে যে পার্থক্য অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তাহাকে পূর্ণতার অভাব বলা যাইতে পারে। জানি, পূর্ণতার অভাব বলিতে স্পষ্ট কিছু বোঝায় না, কিন্তু যেখানে মূল প্রভেদটাই অস্পষ্ট, সেখানে তাহার সংজ্ঞা অস্পষ্ট না হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান গুণ পূর্ণতা, বা নিখুঁৎ ভাব। অর্বাচীন সাহিত্যে তাহারই অভাব অনুভব করি।

প্রাচীন কালের মহাকবিগণের রচনায় বা মহাকাব্যে এই পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান এমন নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর রচনাতেও এমন একটি নিখুঁৎ নিটোলতা আছে যাহা অর্বাচীন কালের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

'রেবা রোধসি বেতসতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে মে'

বা স্যাফোর সেই বিখ্যাত অনায়ত্ত আপেল সম্বন্ধীয় কবিতায়[১] প্রকৃতিদত্ত পূর্ণতা দেখা যায়, অর্বাচীন কালের মহাকবিগণের কাব্যেও তাহা সহজপ্রাপ্য নয়।

পূর্ণতা ও পূর্ণতার অভাব দুই ভিন্নকালের সাহিত্যে এতই স্বাভাবিক, প্রাচীন কালের সাধারণ কবির রচনাতেও সুলভ আর একালের মহাকবিগণের রচনাতেও এমন দুর্লভ যে— এ দুটি লক্ষণকে ভিন্ন-কালের কবিদের প্রতিভার লক্ষণ না বলিয়া দুই ভিন্ন কালেরই লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রাচীন কালের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতার ভাব ছিল অর্বাচীন কালে যাহা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আর এই দুই কালের কাব্যে এই দুই ভিন্ন লক্ষণ যেন স্বতঃই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সীমারেখাটা কোথায়? কালের পরিবর্তন সূক্ষ্ম সীমানা মানে না, স্থূলভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আমার বিশ্বাস দান্তেকে এবং তাঁহার মহাকাব্যকে দুই কালের সীমান্তে ফেলা যাইতে পারে। 'ডিভাইন কমেডি'তে প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের ভিন্ন লক্ষণ বর্তমান। কাব্যখানি অর্বাচীন কালের অনুগত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, যদিচ দান্তে গোড়ার দিকের আটটি সর্গ প্রথমে লাটিন ভাষাতেই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাষান্তর অর্বাচীন কালের উপক্রমণিকা। ডিভাইন কমেডির নিখুঁত পূর্ণতা প্রাচীন কালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যদিকে অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণটিও বর্তমান, 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তেকে পাই, কেবল কবিরূপে নয়, কাব্যের নায়করূপে। প্রাচীন কালের কাব্যে এমন কখনই ঘটিতে পারিত না। প্রাচীন কালের কাব্যে আর সকলকেই পাই কবিকে ছাড়া, অর্বাচীন কালের কাব্যে আর কাউকে পাই বা না পাই কবিকে পাইবই। কবিকে কাব্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দান্তে অর্বাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কাব্যের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অর্বাচীন কালের

১ "As the sweet apple reddens on a bough's end, at its very end; the gatherers have forgotten it; nay, they did not forget but could not reach it."

সঙ্গে তবু একটু প্রভেদ দেখা যায়। দান্তে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কবি-দান্তে ও কাব্যের নায়ক-দান্তে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অর্বাচীনতর কালের কবিদের হাতে এমন সংযত আত্ম-অস্বীকৃতি পাওয়ার আশা নাই।

আগে বলিয়াছি যে, অর্বাচীন কালের সাহিত্যে অপূর্ণতার ভাব বিদ্যমান, আবার এখন বলিলাম যে এই কালের সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব অনুস্যূত। এবারে বিচার করা আবশ্যক—এ দুয়ের মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে কি না। এখানে গ্যেটের কাব্য আমাদের প্রধান সহায়, কারণ তাঁহার কাব্যে অর্বাচীন কালের বলিয়া কথিত এই দুটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। গ্যেটের গদ্য ও পদ্য রচনা স্বকীয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও (হারমান এণ্ড ডরোথিয়া এবং ছোট ছোট লিরিকগুলি ছাড়া) পূর্ণতার অভাবেই যেন বিশিষ্ট; আবার তাঁহার সমস্ত রচনাই গ্যেটের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আবিষ্ট। যে দুটি লক্ষণকে অর্বাচীনকালের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছি— গ্যেটের কাব্যে তাহাদের প্রকাশ আত্যন্তিক। এ বিষয়ে গ্যেটের রচনা অর্বাচীন সাহিত্যের সব চেয়ে বড় শিক্ষার ও সতর্কতার স্থল; গ্যেটে অর্বাচীন সাহিত্যের চরম দৃষ্টান্ত।

২

অর্বাচীন কালের কবিগণ জগতের মানদণ্ড হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিম্বা এই ধারণাটাকে আর-এক আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জগৎ-পরিধি মাপিবার সূত্ররূপে তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানেই প্রাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কবিগণের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। প্রাচীন কালের কবিগণের জগৎপরিধি পরিমাপের সূত্র ছিল দৈব-বিধান। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তাহার নিকষ ছিল দৈববিধান। অর্বাচীন কালের হাতে একমাত্র নিকষ আপন ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন কালের সাহিত্যে যে পূর্ণতা দেখা যায়, আধুনিক কালের সাহিত্যে যে অপূর্ণতা দেখা যায়— এবারে তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হোক না কেন জগৎপরিধি পরিমাপের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়, সূত্র খাটো হইবেই, আর যে পরিমাণ খাটো হইবে, সেই পরিমাণে জগদংশ কবির অনায়ত্ত থাকিয়া যাইবেই— ইহাই অপূর্ণতার মূল কারণ। খণ্ড জীবনকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে বাধা নাই, কিন্তু খণ্ডতার মধ্যেও পূর্ণতার আভাস স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণতার রূপ যদি কবির অপরিচিত হয়, তবে কিরূপে সে পূর্ণতার আভাস দান করিতে সমর্থ? অর্বাচীন কালের খণ্ডকাব্য নিতান্তই খণ্ড, শুক্ল তৃতীয়ার চন্দ্রকলার উজ্জ্বলতা যেমন সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে আভাসে প্রকাশ করে, অর্বাচীন কালের খণ্ড কাব্য তেমন করিয়া আভাসে পূর্ণতাকে দেখাইতে অসমর্থ; এই অসামর্থ্যেরই অপর নাম অপূর্ণতা।

প্রাচীন কালের কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা দৈববিধান রূপ সূত্র হাতে জগৎপরিধি পরিমাপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দৈববিধান ব্যক্তিত্বের চেয়ে অনেক প্রশস্ততর, বাস্তবিক তার চেয়ে আর কিছু বড় কল্পনা করা যায় না। এই কারণেই প্রাচীন কালের কবিরা জগৎ-পরিধি পরিমাপে সমর্থ ছিলেন— তাঁহাদের কাব্যের পূর্ণতার ইহাই প্রকৃত কারণ। এই জন্যই প্রাচীন কালের অধিকাংশ কাব্যের নায়ক দেবতাগণ। যেখানে দেবতাগণ প্রত্যক্ষতঃ নায়ক নহে, সেখানেও

তাহারা অন্যতম প্রধান পাত্রপাত্রী। অর্বাচীন কালের কাব্যের নায়ক মানুষ। আধুনিক কালের মানুষ মর্ত্ত্য হইতে দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছে।

দুই কালের মধ্যে আরও একটু প্রভেদ আছে। ইতিমধ্যে জগৎ অনেক জটিল, অনেক বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। হোমার যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন গ্যেটের জগৎ ও জীবন তাহার চেয়ে বৃহত্তর, জটিলতর; দান্তে যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন তাহার চেয়ে জটিলতর, বৃহত্তর; তাহাতে সূত্রের ন্যূনতা আরও বেশি ধরা পড়িয়াছে। হোমারের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব যদি অযেথষ্ট হয়, তবে গ্যেটের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও বেশি অযথেষ্ট। অথচ কবির হাতে তাহাকে পরিমাপের আর কোনো সূত্র নাই, ফলে অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে দুই কালের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দুই কালের শিল্পাদর্শে কিছু ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে। অর্বাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ সৌন্দর্যসৃষ্টি; প্রাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল পূর্ণতা সৃষ্টি। প্রাচীনেরা পূর্ণরূপ সৃষ্টি করিতেন বলিয়া তাহা আপনিই সুন্দর হইত; অর্বাচীন কবিগণ পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে চান বলিয়া তাহা সুন্দরও হইয়া উঠে না। পূর্ণতাই সুন্দর, অপূর্ণতাই অসুন্দর; আবার পূর্ণতাই সত্য, কাজেই পূর্ণতা = সত্য = সুন্দর। অর্বাচীন কালের অনেক কবি তত্ত্বতঃ একথা জানেন, কিন্তু কার্যতঃ এই আদর্শকে অনুসরণ করিতে পারেন না, আবার অনেকেই এ কথাকে আদৌ স্বীকার করেন না। শেষোক্ত দল সাহিত্যে জগৎ-রীতিকে অনুকরণ করিয়া যান, ইহাই সাহিত্যে 'রিয়ালিজম্'; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে চারদিকে আপন অতিপ্রত্যক্ষতার দ্বারা 'রিয়াল' বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়— তাহাই একমাত্র 'রিয়ালিটি' না হইতেও পারে; বস্তুতঃ তাহা রিয়ালিটির মুখোস মাত্র। মুখোসটা রূপ, মুখোস-খোলা মুখেই স্বরূপ; সে স্বরূপের সংবাদ তাঁহারা রাখেনও না, রাখিতেও চান না।

তবেই তিনটি পর্যায় পাওয়া গেল। প্রাচীন কালের কবি, দৈববিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র; পূর্ণতা যাঁহার শিল্পের লক্ষ্য; তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ যিনি এই আদর্শকে অনুসরণ করেন। অর্বাচীন কালে পাই দুইটি পর্যায়। ব্যক্তিত্বের বিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র; সৌন্দর্য সৃষ্টি যাঁহার শিল্পের লক্ষ্য; অথচ পূর্ণতার সংবাদও তাঁহারা রাখেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক তাহাকে অনুসরণ করিতে অসমর্থ। তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেই দল ব্যক্তিত্বের বিধান ছাড়া আর কিছুই যাঁহারা মানেন না, জানেন না; পূর্ণতাকেই যাঁহারা তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ অস্বীকার করেন; অতিপ্রত্যক্ষকে 'রিয়ালিটি' মনে করিয়া যাঁহারা তাহার মানচিত্র অঙ্কিত করিতে অভ্যস্ত। ইঁহাদের মানচিত্র অঙ্কনকারী বলাও উচিত নয়, যেহেতু মানচিত্রও সমগ্রতার সন্ধান দেয়— ইঁহারা সরস্বতীর আমিন, সম্মুখে যাহা পাইতেছেন জরিপ করিয়া যাইতেছেন, সে প্রচেষ্টা কোনো কালেই কোনো সমগ্রতায় পৌঁছিবে না, কারণ তাঁহাদের মনে সমগ্রতার আদর্শেরই যে অভাব। ইঁহারাই অর্বাচীনতম কালের 'রিয়ালিস্ট'।

৩

গ্যেটে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। নিঃসন্দেহ তিনি অর্বাচীন কালের কবি, অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণ অপূর্ণতা তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ বা দোষ। কবি গ্যেটে, বৈজ্ঞানিক গ্যেটে, রাজনীতিক

ও রাষ্ট্রশাসক গ্যেটে জানেন যে জগৎ কি বৃহৎ, জীবন কি জটিল। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি তাঁহার সমকালীন অধিকাংশ লোকের চেয়ে অনেক অধিক। এ হেন জগৎ-জীবনের পরিমাপে তিনি উদ্যত, কিন্তু বিষম সঙ্কট এই যে একমাত্র ব্যক্তিত্বের সূত্র ছাড়া অপর কোন সূত্র তাঁহার হাতে নাই।

ফাউস্ট কাব্যের কথাই ধরা যাক। ফাউস্ট অবশ্য মানব, কিন্তু মেফিস্টোফিলিস মানুষ নয়, তাহা ছাড়া 'প্রোলোগ ইন হেভেন' অধ্যায়ে স্বয়ং লর্ড ও দেবদূতগণ আছে, নাটকের অন্তিমে দৈববাণী শ্রুত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় মনে করা অসম্ভব নয় যে দৈববিধানকেই এই নাটকের পরিমাপ সূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়, বরঞ্চ দৈববিধানের অনস্তিত্বই এই নাটকে সূচিত হইয়াছে। ফাউস্ট আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা জগৎ-পরিমাপে উদ্যত। জাদুমন্ত্রের প্রভাবে তাহার জগৎ যত বাড়িয়াছে, নিজের ব্যক্তিত্ব-সূত্রকে তত সে টানিয়া বাড়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের দ্বারা জগৎকে বেড় দিতে পারে নাই। এই প্রচেষ্টায় মেফিস্টো তাহাকে উস্কানি দিয়াছে; বলিয়াছে, তোমার ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়াও, আরও বাড়াও, দেখো বেড় দিতে পারো কি না! 'লর্ডে'র সহিত রেষারেষি করিয়া সে ফাউস্টের কাঁধে আসিয়া ভর করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ সে লর্ডের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু করিয়াছে কি? মানুষ যে স্বয়ম্পূর্ণ নয়, 'লর্ড ইন হেভেন' এবং 'ম্যান অন আর্থ'— মিলিয়াই যে পূর্ণতা— ইহাই কি প্রকারান্তরে, ট্রাজেডির দ্বারা মেফিস্টো প্রমাণ করে নাই? ফাউস্টের ট্রাজেডি কি? জগৎ পরিমাপের পক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট নয়— ইহাই কি তাহার ট্রাজেডি নয়? আমার তো মনে হয় গ্যেটে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। তবে আবার গ্যেটেকে অর্বাচীন কালের কবি বলি কেন? বলি এই জন্য যে ব্যক্তিত্বের বিধান যে যথেষ্ট নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু অপর কোন বিধান, দৈববিধান, তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। এখানেই কবির ট্রাজেডি, আর সে ট্রাজেডি ফাউস্টের চেয়েও গুরুতর। ফাউস্ট ব্যক্তিত্বের বিধানকেই যথেষ্ট ও একমাত্র বলিয়া জানিত। গ্যেটে জানিতেন, ইহা যথেষ্ট নয়; কিন্তু অপর কোনো বিধানও তাঁহার জানা ছিল না। কেন ছিল না সে অনেক কথা। যে-কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে-কাল দৈববিধানের চূড়ান্ত মহিমায় বিশ্বাস করিত না। এখানে কালের ধর্ম গ্যেটের ধর্ম।

এই জন্যেই আগে গ্যেটের জীবন ও কাব্যকে অর্বাচীন কালের শিক্ষা ও সতর্কতার দৃষ্টান্ত বলিয়াছি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিধানকে জানিতেন অথচ জানিতেন যে ইহা যথেষ্ট নয়; তিনি পূর্ণতার তত্ত্ব জানিতেন অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সত্যের সংবাদ রাখিতেন অথচ বিপুলা পৃথীর সমস্ত তথ্যকে কুড়াইয়া লইয়া সত্যের পূর্ণ মূর্তিতে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তত্ত্বে ও কার্যে সমন্বয় করিতে না পারিলে যে পরম দুঃখ অনুভূত হয় সেই দুঃখ ছিল গ্যেটের জীবনের, আর সেই দুঃখের সমষ্টিই তাঁহার রচনা।

৪

পরবর্তী কালের সাহিত্যের উপরে গ্যেটের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথার উল্লেখ করিলেই চলিবে।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুগ এক একখানি মহাগ্রন্থে

আপনার ধ্যানধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত সম্ভাবনাকে চূড়ান্তরূপ দিয়া থাকে। সে যুগের অন্য সমস্ত রচনা ঐ মহাগ্রন্থের খসড়া বই আর কিছু নয়। কিম্বা শাখানদীসমূহ যেমন মূল নদীতে মিলিত হইয়া তাহাকে স্ফীতকায় করিয়া তোলে প্রত্যেক যুগের মহাগ্রন্থের সহিত অন্যান্য গ্রন্থের সম্বন্ধ সেইরূপ। গ্রীক জগতের এইরূপ মহাগ্রন্থ হোমারের কাব্যদ্বয়। ইউরোপের খৃষ্টীয় মধ্যযুগের মহাগ্রন্থ দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'। আমাদের দেশের প্রসঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও রামচরিত-মানসের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরবর্তী কালের পক্ষে গ্যেটের ফাউস্ট ঐরূপ একখানি মহাগ্রন্থ। 'ইলিয়াড' 'ওডিসি' ও 'ডিভাইন কমেডি'র সহিত তুলনায় 'ফাউস্ট' দীনতর ও অপূর্ণতর কিনা সে প্রসঙ্গ তুলিয়া লাভ নাই। আমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থসমূহের তুলনায় ফাউস্ট নিশ্চয়ই দীনতর ও অপূর্ণতর। কিন্তু সে দীনতা ও অপূর্ণতার কারণ গ্যেটের যুগের মধ্যেই নিহিত, কেন নিহিত পূর্বে তার আলোচনা করিয়াছি। রেনেসাঁস বলিতে ইউরোপের ইতিহাসে যে মনোভাব ও যে পর্বকে বোঝায় গ্যেটের ফাউস্ট তাহারই মহাকাব্য। ফাউস্ট মানব-মনের চিরন্তন ও বৃহত্তর অতৃপ্তির মহাকাব্য। এই কাব্যের নায়ক ফাউস্ট অতৃপ্তির কূল হইতে তৃপ্তির কূলে, অপূর্ণতার জগৎ হইতে পূর্ণতার জগতে যাত্রা করিয়াছে। মাঝ সমুদ্রে তাহার ভরাডুবি হইয়াছে কি হয় নাই, তাহার লক্ষ্য ভ্রান্ত কি শুদ্ধ সে প্রশ্ন অবান্তর। তৃপ্তি ও পূর্ণতাতে পৌছিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাটাই এই কাব্যের প্রাণ, সেই প্রাণের পরিচয় দিবার চেষ্টাই গ্যেটে করিয়াছে।

গ্যেটের পরবর্তীকালেও এই শ্রেণীর মহাগ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। হুগোর 'লে মিজারেবল', টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', হার্ডির 'দি ডাইনস্টেস্', শ-র 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা' প্রভৃতি যুগন্ধর মহাগ্রন্থ রচনার চেষ্টা। কিন্তু বোধ করি চেষ্টামাত্রের চেয়ে অধিক নয়।

গ্যেটের মৃত্যুর পরবর্তী শত বৎসরের মধ্যে মানুষের জীবন আরও জটিলতর, ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়াছে এবং তুলনায় মানুষের ব্যক্তিত্বের সূত্র আরও হ্রস্বতর হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই যুগ-সম্বিৎপূর্ণ মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনাও ক্রমে স্বল্পতর হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্ভাবনা কখনো পূর্ণ হইবে কিনা জানি না! কেননা বর্তমান জগৎ ও জীবন পরিমাপের জন্য ব্যক্তিত্ব বিধানের চেয়ে দীর্ঘতর সূত্র আবশ্যক। সে সূত্র কি? পূর্বতন দৈববিধান চলিবে না, বর্তমানের ব্যক্তিত্ব বিধানও অচল। তবে আর কি বিধান হইতে পারে? যতদিন না সেই নূতন বিধান উদ্ভাবিত হয়, ততদিন যুগন্ধর মহাগ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আর নূতন বিধান উদ্ভাবিত হইলেও যুগন্ধর মহাকবির আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগ সেই মহাকবির আবির্ভাব জন্য, সেই মহাকাব্যের সম্ভাবনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ততদিন গ্যেটের ফাউস্টকেই অর্বাচীনতম মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ-প্রকাশ

১

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন সুরু হয়। এই ব্যাপারে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, কলিকাতা স্কুল-বুক ও স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, জোড়াসাঁকো রাজ-পরিবারের রাজা বৈদ্যনাথ রায়-প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতির সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌরমোহন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দুমহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে এ-দেশের শাস্ত্রীয় রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাহারই প্রমাণের চেষ্টা আছে। দুই বৎসর পরে পুস্তকখানি তৃতীয় বার পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রচারিত হয়। এই সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন"-এর নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে-সময় সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েরা বিদ্যাচর্চায় কত দূর অনগ্রসর ছিলেন, তাহার একটি চিত্র পাওয়া যাইবে—

"প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেগাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া

করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুড়ি বেটাছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।" পৃ. ১-৪

মিশনরী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি এত করিয়াও জনপ্রিয় হয় নাই। দরিদ্র ঘরের— অনেক স্থলে নিম্ন বর্ণের মেয়েরা আকৃষ্ট হইলেও শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারা যে সেগুলিতে যোগদান করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ বা বেথুনই কলিকাতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল (বর্ত্তমান বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং কালোপযোগী বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের বাধাবিপত্তি দূর করেন। তদবধি দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ অনতিকালমধ্যে আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। তাঁহাদের রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে সাদরে স্থান লাভ করিত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ছাপার হরফে বঙ্গমহিলা-রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি কাব্য; নাম— 'চিত্তবিলাসিনী'; রচয়িত্রী— কৃষ্ণকামিনী দাসী। গুপ্ত-কবি ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮-১১-১৮৫৬) লেখেন :— "আমরা পরমানন্দ-সাগর সলিলে-নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে 'চিত্তবিলাসিনী' নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এ-দেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ,……অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা।"

১৮৫৬ সনে প্রকাশিত 'চিত্তবিলাসিনী' হইতে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে যে-সকল গ্রন্থকর্ত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদের নাম ও রচনার উল্লেখ ১৮৬৫-৬৬ ও ১৮৬৬-৬৭ সনের সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে (*General Report on Public Instruction*) আছে :—

১। কৃষ্ণকামিনী দাসী : 'চিত্তবিলাসিনী' (কাব্য)…ইং ১৮৫৬। পৃ. ৭২।

২। বামাসুন্দরী দেবী (পাবনা): 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।'…৪ বৈশাখ ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ২০।

এই সন্দর্ভটির ভূমিকায় লোকনাথ মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :— "ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না, বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।"

৩। হরকুমারী দেবী (কালীঘাট): 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' (কাব্য)…১২ আশ্বিন ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ৮৪।

পুস্তকে লেখিকা নিজ নাম এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"পঞ্চমীতে যেই দ্রব্য না করে ভক্ষণ।
তার আদ্য বর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ॥
কর্ক্কট মিথুন রাশে হয় যেই নাম।
রচয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম॥"

৪। কৈলাসবাসিনী দেবী (দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী):
'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (সন্দর্ভ)…১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৭২।
'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'…১৭৮৭ শক (ইং ১৮৬৫)। পৃ. ৩৯।

৫। মার্থা সৌদামিনী সিংহ: 'নারীচরিত'…ইং ১৮৬৫। পৃ. ৯৪।

৬। রাখালমণি গুপ্ত: 'কবিতামালা'…ইং ১৮৬৫। পৃ. ৭২।

৭। কামিনীসুন্দরী দেবী (শিবপুর): 'উর্ব্বশী নাটক'…১২৭২ শাল (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৮৫।

নাটকখানিতে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম "দ্বিজতনয়া" আছে। কিন্তু ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত ইঁহার পরবর্ত্তী পুস্তক 'বালা বোধিকা'য় "উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত" মুদ্রিত হইয়াছে।

৮। বসন্তকুমারী দাসী (বরিশাল): 'কবিতামঞ্জরী'।

বঙ্গমহিলারা ক্রমশঃ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেকের রচনা ১৮৬৩ সন হইতে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র "বামাগণের রচনা"-বিভাগে সাদরে স্থান পাইতে লাগিল। ফলে পরবর্ত্তী দশ-এগার বৎসরে গ্রন্থকর্ত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইল। আমরা ইঁহাদের জন-কয়েকের নামোল্লেখ করিতেছি :—

কামিনীসুন্দরী দেবী: 'বালা বোধিকা'…১২৭৫ সাল (এপ্রিল ১৮৬৮)। পৃ. ৩৯।
'ঊষা নাটক'…(আগষ্ট ১৮৭১)। পৃ. ১৩২।

কৈলাসবাসিনী দেবী: 'বিশ্বের শোভা' (সন্দর্ভ)…(এপ্রিল ১৮৬৯)। পৃ. ১১৭।

দময়ন্তী দেবী: 'পতিব্রতা ধর্ম্ম' (সন্দর্ভ)…(জুন ১৮৬৯)। পৃ. ৫২।

নবীনকালী দেবী: 'কামিনী কলঙ্ক' (উপন্যাস)…(এপ্রিল ১৮৭০)। পৃ. ২৪৩।

কৃষ্ণময়ী দাসী: 'পদ্যমালা' (আগষ্ট ১৮৭০)। পৃ. ৬০।

অন্নদাসুন্দরী দাসী: 'অবলা-বিলাপ' (কাব্য)…চৈত্র ১২৭৮ (ইং ১৮৭২)। পৃ. ৩৭।

লক্ষ্মীমণি দেবী : 'চিরসন্ন্যাসিনী' (সামাজিক নাটক) : (ইং ১৮৭২)। পৃ. ১২৯।

হেমাঙ্গিনী : 'মনোরমা' (আখ্যায়িকা) : আষাঢ় ১২৮১ (জুলাই ১৮৭৪)। পৃ. ৯৫।

সুরঙ্গিনী দেবী : (প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পত্নী) 'তারাচরিত' (রাজস্থানীয় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা)···১২৮১ সাল (জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ. ৫৫।

বসন্তকুমারী দাসী (বরিশাল) : 'যোষিদ্বিজ্ঞান'···ভাদ্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।

বিরাজমোহিনী দাসী : 'কবিতাহার'···১২৮৩ সাল (মার্চ ১৮৭৭)। পৃ. ৭০।

তরঙ্গিণী দাসী (কোন্নগর) : (চন্দ্রমোহন ঘোষের পত্নী) 'নিষ্ফল তরু' (সন্দর্ভ ও কবিতা) ···আশ্বিন ১২৮৪ (অক্টোবর ১৮৭৭)। পৃ. ৫৬।

সে-যুগে যথোচিত শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার কথা স্মরণ করিলে এই সকল বঙ্গমহিলার দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না।

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এমন একজন প্রতিভাশালিনী সাহিত্যিক আবির্ভূত হন, যাঁহার গদ্য-পদ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম নূতনত্বের আস্বাদ পাই। ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রতিভার যাদুস্পর্শে সর্ব্বপ্রথম ইঁহার রচনাই শিল্পসুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে, এ কথা বলা চলে। সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহার দান বিপুল। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের দর্শন পাই, যাঁহারা সাহিত্যে বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-মন্দিরের এই সকল পূজারিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রচনাবলীর তালিকা সহ, নিম্নে দিতেছি ; স্থানাভাবে সর্ব্বত্র রচনার নিদর্শন দেওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বর্ণকুমারী দেবী।— আনুমানিক ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা ; রবীন্দ্রনাথের ভগিনী। ১৮৬৭ সনের ১৭ই নবেম্বর ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার দান সুবিপুল। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। দীপ-নির্ব্বাণ (উপন্যাস) : ১২৮৩ সাল (১৫-১২-১৮৭৬)। পৃ. ৩২১।

২। বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য) : ১৮০১ শক (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ. ৪০।

৩। ছিন্নমুকুল (উপন্যাস) : (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ. ২৩৮।

৪। মালতী (উপন্যাস) : ১২৮৬ সাল (২৫-৩-১৮৮০)। পৃ. ৪৪।

৫। গাথা : ১২৮৭ সাল (২০-১২-১৮৮০)। পৃ. ৯৫।

৬। পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) : আশ্বিন ১২৮৯ (২৭-৯-১৮৮২)। পৃ. ১৮৪।

৭। সখি সমিতি : ১২৯৩ সাল (১২-৮-১৮৮৬)। পৃ. ২৪।

৮। মিবাররাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭-৬-১৮৮৭)। পৃ. ৮০।

৯। হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : পৌষ ১২৯৪ (৮-১-১৮৮৮)। পৃ. ২৫৬।

১০। বিদ্রোহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ (৯-৮-১৮৯০)। পৃ. ২৮২।

১১। বিবাহ উৎসব (নাটক): (১৩-৫-১৮৯২)। পৃ. ২৩।

১২। নবকাহিনী (ছোট গল্প): (১৭-৮-১৮৯২)। পৃ. ১২৮।

১৩। স্নেহলতা বা পালিতা (উপন্যাস):

১ম খণ্ড। ১২৯৯ সাল (১৩-১০-১৮৯২)। পৃ. ২৩৮।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯ (১৫-৩-১৮৯৩)। পৃ. ১৮২।

১৪। ফুলের মালা (উপন্যাস): (১২-৩-১৮৯৫)। পৃ. ১৫৯।

১৫। কবিতা ও গান: কার্ত্তিক ১৩০২ (১-১২-১৮৯৫)। পৃ. ২৪০।

১৬। কাহাকে ? (উপন্যাস): জুলাই ১৮৯৮। পৃ. ১২১।

১৭। কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা: ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ. ৮১।

১৮। দেবকৌতুক (কাব্য নাট্য): ১৩১২ সাল (২৬-২-১৯০৬)। পৃ. ৯৬।

১৯। কনে-বদল (প্রহসন): বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১৯০৬। পৃ. ৫৮।

২০। পাকচক্র (প্রহসন): (২৮-২-১৯১১)। পৃ. ৭০+১৮।

২১। রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস): (১৭-৪-১৯১৩)। পৃ. ৮২।

২২। নিবেদিতা (নাটক): ৩ এপ্রিল ১৯১৭। পৃ. ৬০।

২৩। যুগান্ত কাব্যনাট্য: (২০-১-১৯১৮)। পৃ. ৩৬।

২৪। বিচিত্রা (উপন্যাস): ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭-৫-১৯২০)। পৃ. ১৫৭।

২৫। স্বপ্নবাণী (উপন্যাস): জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪-১০-১৯২১)। পৃ. ১৭২।

২৬। মিলন রাত্রি (উপন্যাস): জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। পৃ. ২৮৫।

২৭। দিব্য-কমল (নাটক): (১৪-৪-১৯৩০)। পৃ. ১৬৩।

স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকেরও রচয়িত্রী। তিনি অতীব যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩২ সনের ৩রা জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নময়ী দেবী।— ইনি সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা; জন্ম— ১৮৫৭ সনে। ইঁহার পিতা— পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম-নিবাসী দুর্গাদাস চৌধুরী। দশ বৎসর বয়সে পাবনা গুণাইগাছা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার বাগচীর সহিত প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হন; সেই অবধি তিনি পিত্রালয়েই কাটাইয়াছেন।

প্রসন্নময়ী শৈশব হইতেই সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বনলতা' ও 'নীহারিকা' কাব্য দুইখানি তাঁহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা:—

১। আধ আধ ভাষিণী (কাব্য): ১২৭৬ সাল (১৪-২-১৮৭০)। পৃ. ১২।

২। পূর্ব্বস্মৃতি। কৃষ্ণনগর ২১ বৈশাখ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)।*

* এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাধারণী' (৩ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন:—"কৃষ্ণনগরে যে জাতীয় সম্মিলন সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রসন্নময়ী এই 'পূর্ব্বস্মৃতি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বস্মৃতিতে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আস্থা হইল ও ভবিষ্যৎ আশা জাগ্রতা হইল। প্রসন্নময়ী দেবী ভারতের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন, আর ভারতমহিলার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমরাও অশ্রুপাত করিলাম।"

৩। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন (কবিতা) : (২৭-১২-১৮৭৫)। পৃ. ২৬।
৪। বনলতা (কাব্য) : ১২৮৭ সাল (২০-৫-১৮৮০)। পৃ. ১১৯।
৫। নীহারিকা (কাব্য) :
১ম ভাগ, ১২৯০ সাল (২৩-৮-১৮৮৪)। পৃ. ১৪৯।
২য় ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৮১৮ শক (১১-১২-১৮৯৬)। পৃ. ১৬২।
৬। আর্য্যাবর্ত্ত (ভ্রমণ) : পৌষ ১২৯৫ (১২-১-১৮৮৯)। পৃ. ১৭৭।
৭। অশোকা (উপন্যাস) : ১২৯৬ সাল (১০-৪-১৮৯০)। পৃ. ৬২।
৮। তারাচরিত (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (৩-৯-১৯১৭)। পৃ. ১১৬।
৯। পূর্ব্বকথা (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (১৯-১০-১৯১৭)। পৃ. ১৮৭।

১৯৩৯ সনের ২৫এ নবেম্বর প্রসন্নময়ী পরলোকগমন করিয়াছেন।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (মোক্ষদা দেবী)।— ইনি ডবলিউ সি বোনার্জ্জীর সহোদরা। বউবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র— শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বন-প্রসূন' কাব্য সমালোচনাকালে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :— "মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে।···আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর— ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার— লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা— আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা মোক্ষদায়িনী-লিখিত "বাঙ্গালির বাবু" কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
দশ্‌টা হ'তে চারটাবধি দাস্য বৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সব্‌জজ কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারা দিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।"

আমরা মোক্ষদায়িনীর রচিত এই তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি :—

১। বন-প্রসূন (কাব্য)। ইং ১৮৮২।

২। সফল স্বপ্ন (ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৪ (১২ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৬৯।

৩। কল্যাণ-প্রদীপ (জীবনী)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ৪২৯।

১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (ইং ১৮৭০) "খিদিরপুর-নিবাসিনী" জনৈক মহিলার সম্পাদনায় বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র— 'বঙ্গমহিলা' (পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, এই "খিদিরপুর-নিবাসিনী" আর কেহই নহেন,— মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।— ইঁহার জন্ম ১৮৫৮ সনের ১৮ই আগষ্ট। পিতার নাম—হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত, বউবাজার-নিবাসী অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৪ সনে গিরীন্দ্রমোহিনীর বৈধব্য ঘটে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দ্বাদশ বর্ষ হইতেই কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত 'অশ্রুকণা' বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থগুলির তালিকা :—

১। জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী : (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)। পৃ. ১৭।

২। কবিতাহার (কাব্য) : ২৯ মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৩৯।

৩। ভারত-কুসুম (কাব্য) : ১ কার্ত্তিক ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। পৃ. ৮৮।

৪। অশ্রুকণা (কাব্য) : ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)।

৫। আভাষ (কাব্য) : ১২৯৭ সাল (৫-৪-১৮৯০)। পৃ. ১৪১।

৬। সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য) : ১ কার্ত্তিক ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১০৩।

৭। শিখা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৮-৪-১৮৯৬)। পৃ. ১৫৮।

৮। অর্ঘ্য (কাব্য) : ১৩০৯ সাল (১০-৯-১৯০২)। পৃ. ৮২।

৯। স্বদেশিনী (কাব্য) : ১৩১২ সাল (২৫-২-১৯০৬)। পৃ. ২৭।

১০। সিন্ধুগাথা (কাব্য) : ১৩১৪ সাল (৬-৫-১৯০৭)। পৃ. ৮২।

গিরীন্দ্রমোহিনী তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) 'জাহ্নবী' নামে মাসিক পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সনের ১৬ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কামিনী রায়।— ১৮৬৪ সনের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ সনে কামিনী বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সনে ষ্ট্যাটুটরি সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৯ সনে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

কামিনী আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'আলো ও ছায়া' কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে স্থায়ী আসন দান করিয়াছিল। কামিনী রায়ের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। আলো ও ছায়া (কাব্য) : ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।

২। নির্মাল্য (কাব্য) : (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৫৫-১৯৩২

কামিনী রায়

১৮৬৪-১৯৩৩

৩। পৌরাণিকী (কাব্য): ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৬০।

৪। গুঞ্জন (শিশুরাজ্যের কবিতা): ১৩১১ সাল (১৫-৫-১৯০৫)। পৃ. ৬৬।

৫। ধর্ম্মপুত্র (গল্প): ১৩১৪ সাল (১৫-৭-১৯০৭)। পৃ. ৪২।

৬। অশোক-স্মৃতি (জীবনী): (২ জুন ১৯১৩)। পৃ. ৩২।

৭। শ্রাদ্ধিকী (জীবনী): ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩।

৮। মাল্য ও নির্ম্মাল্য (কাব্য): ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৬০।

৯। অশোক-সঙ্গীত (সনেটগুচ্ছ): ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৮।

১০। অম্বা (নাট্যকাব্য): ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।

১১। সিতিমা (গদ্য নাটিকা): ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।

১২। বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্ত্তমান (নিবন্ধ): (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫।

১৩। ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা): (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ. ২৩।

১৪। দীপ ও ধূপ (কাব্য): ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৬।

১৫। জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ): ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০।

১৯৩৩ সনের ২৭এ সেপ্টেম্বর কামিনী রায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

বিনয়কুমারী বসু (ধর)।— ইনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদরার কন্যা। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ডাঃ ভারতচন্দ্র ধরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; এই বৎসরের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইঁহার নামের শেষে "বসু" আছে, কিন্তু পৌষ-সংখ্যায় "ধর" দেখিতেছি। বিনয়কুমারীর কবিতা 'সাহিত্য,' 'ভারতী,' 'দাসী,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে সাদরে স্থান লাভ করিত। আমরা তাঁহার দুইখানি কাব্যের উল্লেখ পাইয়াছি; উহা—

১। নব মুকুল (কাব্য): (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৯০।

২। নির্ঝর (কাব্য): (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ১০২।

প্রমীলা বসু (নাগ)।— ইনিও মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী,— কনিষ্ঠা সহোদরার কন্যা। ইঁহার পিত্রালয়— বিক্রমপুর। ১২৯৭ সালে বিলাত-ফেরত ডাঃ গঙ্গাকান্ত নাগের সহিত প্রমীলার পরিণয় হয় (দ্র° "শুভদিনে"— 'প্রতিমা' অগ্রহায়ণ ১২৯৭)। অতি অল্প বয়সেই ইঁহার কাব্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয়। ১২৯৩ সাল হইতে ইঁহার রচিত কবিতা 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' 'ভারতী,' 'নব্যভারত,' 'সাহিত্য' (১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫), 'প্রতিমা' প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রমীলার এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—

১। প্রমীলা (কাব্য): জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১২৫।

২। তটিনী (কাব্য): ইং ১৮৯২। পৃ. ১৪৮।

প্রমীলা অকালে পরলোকগমন করেন; ১৩০৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় (দ্র° "প্রমীলা নাগ" কবিতা: শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ— 'সাহিত্য' পৌষ ১৩০৩)।

মানকুমারী বসু।— ১৮৬৩ সনের ২৫এ জানুয়ারি যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে মানকুমারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। ১৮৭৩ সনে, দশ বৎসর বয়সে,

বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের বিবুধশঙ্কর বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উনিশ বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই তাঁহার বৈধব্য ঘটে। বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে মানকুমারীর মন বসিত না, তিনি শেষে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা দিতেছি—

১। প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারাণো প্রণয় (গদ্য-পদ্য): ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৩০।

২। বনবাসিনী (উপন্যাস): ভাদ্র ১২৯৫ (৫-৯-১৮৮৮)। পৃ. ২৩।

৩। বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম (সন্দর্ভ): (১৫-৭-১৮৯০)। পৃ. ১২।

৪। দুইটি প্রবন্ধ: ১২৯৮ সাল (২২-১২-১৮৯১)। পৃ. ৩২।

৫। কাব্যকুসুমাঞ্জলি (কাব্য): ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ. ২৭১।

৬। কনকাঞ্জলি (কাব্য): ১৩০৩ সাল (২৯-১০-১৮৯৬)। পৃ. ২৬০।

৭। বীরকুমার-বধ কাব্য: ১৩১০ সাল (১০-৫-১৯০৪)। পৃ. ২৩৫।

৮। শুভ সাধনা (গদ্য-পদ্য): ইং ১৯১১। পৃ. ১৮৪।

৯। বিভূতি (কাব্য): চৈত্র ১৩৩০ (১২-৪-১৯২৪)। পৃ. ৩১১+১।

১০। সোনার সাথী (কাব্য): (২-৫-১৯২৭)। পৃ. ৫০।

১১। পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা): (২৫-৭-১৯৩৬)। পৃ. ১৩১।

ছোট গল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'কুন্তলীন-পুরস্কারে'র প্রথম (১৩০৩), তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে (১৩০৫-৬) তাঁহার গল্প স্থান পাইয়াছিল। ১৯৪৩ সনের ২৬এ ডিসেম্বর, ৮১ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কুসুমকুমারী দেবী।— ইনি বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী, কবি দেবকুমার রায় চৌধুরীর জননী। কুসুমকুমারী স্বামীর নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া স্বীয় অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; তিনি কোন পুস্তকেই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই:—

১। স্নেহলতা (সামাজিক উপন্যাস): ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৩-১-১৮৯০)। পৃ. ২০৪+৭।*
ইহা "কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত।"

২। প্রেমলতা (সামাজিক উপন্যাস): ১১ আশ্বিন ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ২৬৮।

৩। প্রসূনাঞ্জলি (সন্দর্ভাবলী): ১৩০৭ সাল (৩০-৯-১৯০০)। পৃ. ২৭+১৬।

৪। শান্তিলতা (উপন্যাস): (২৭-৯-১৯০২)। পৃ. ২৫৭।

৫। লুৎফ-উন্নিসা (ঐতিহাসিক উপন্যাস): ১৩১২ সাল (৩-৯-১৯০৫)। পৃ. ২০৩।

---

* স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' বাহির হইলে স্বর্ণকুমারী তাঁহার উপন্যাসখানির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পালিতা' রাখেন ('ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৭ দ্রষ্টব্য)। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'স্নেহলতা বা পালিতা' নামে, ১২৯৯ সালে (১৩-১০-১৮৯২), পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৩৮। আমি 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত 'স্বর্ণকুমারী দেবী' পুস্তকে ইহার যে প্রকাশকাল দিয়াছি, তাহা ঠিক নহে।

কুসুমকুমারীর পুস্তকগুলি* সুধীসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। 'স্নেহলতা'-পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন :— "সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন :— "আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।" ১৩২২ সালের ভাদ্র মাসে কুসুমকুমারী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে (দ্র° 'ভারতবর্ষ,' আশ্বিন ১৩২২)।

সরোজকুমারী দেবী।— ইনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী। ইঁহার জন্ম— ৪ নবেম্বর ১৮৭৫ তারিখে। দশ বৎসর বয়সে (ইং ১৮৮৬) কলুটোলার সেন-বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; যোগেন্দ্রনাথ সম্বলপুরের গবর্মেণ্ট উকীল ছিলেন। সরোজকুমারী বিবাহের পর নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ১২৯৫ সাল হইতে তিনি 'ভারতী'তে ও ১২৯৭ সাল হইতে 'সাহিত্যে' লিখিতে সুরু করেন। তাঁহার রচিত এই কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে :—

১। হাসি ও অশ্রু (কাব্য) : মাঘ ১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ. ২৯৫।

২। অশোকা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (৬-৭-১৯০১)। পৃ. ২৭৪।

৩। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প : ১৩১২ সাল (৩০-১১-১৯০৫)। পৃ. ৩১৬।

৪। শতদল (কাব্য) : (২৬-৯-১৯১০)। পৃ. ১০২।

৫। অদৃষ্ট-লিপি (গল্প) : (২২-৩-১৯১৫)। পৃ. ১৭৭।

৬। ফুলদানি (গল্প) : (৮-১০-১৯১৫)। পৃ. ১৫৫।

১৯২৬ সনে সরোজকুমারীর মৃত্যু হইয়াছে (দ্র° 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।— ১৮৭০ সনে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে অম্বুজাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর একজন উকীল ছিলেন। কবি রজনীকান্ত সেন এই গোবিন্দনাথেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। অম্বুজাসুন্দরীর বিবাহ হয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কৈলাসগোবিন্দ দাসের সহিত। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়; বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয় ও তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সুযোগ লাভ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' 'সাহিত্য,' 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ও 'কুন্তলীন-পুরস্কারে' অম্বুজাসুন্দরীর গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি এই :—

১। কবিতালহরী : (১০-৯-১৮৯২)। পৃ. ২১।

২। অশ্রুমালা (কাব্য) : (১২-১০-১৮৯৪)। পৃ. ২৪।

৩। প্রীতি ও পূজা (কাব্য) : ১৩০৪ সাল (২-৯-১৮৯৭)। পৃ. ১৪১।

৪। খোকা (শোক-কবিতা) : সংবৎ ১৯৫৯ (২৫-৪-১৯০৩)। পৃ. ২১২।

৫। প্রভাতী (উপন্যাস) : ইং ১৯০৫ (১০ জুলাই)। পৃ. ৪৬।

---

* ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ১৮৭৮ সনে বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কুসুমকুমারী"-রচিত 'কুসুমিকা' নামে একখানি কাব্য আছে। ইনি ও কুসুমকুমারী দেবী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

৬। দুটী কথা (গল্প): ১৩১২ সাল (৬-২-১৯০৬)। পৃ. ৬৯।

৭। ভাব ও ভক্তি (কাব্য): ১৩১৩ সাল (২৫-১-১৯০৭)। পৃ. ১৬৮।

৮। গল্প: ১৩১৩ সাল (১৭-৪-১৯০৭)। পৃ. ১৭৭।

৯। প্রেম ও পুণ্য (কাব্য): ১৩১৭ সাল (২০-৫-১৯১০)। পৃ. ১৮৩।

ইহা ছাড়া তিনি ভাগবতের সারাংশ লইয়া 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' (ইং ১৯৩২) ও পরে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কেলিরসালাপ,' 'শ্রীশ্রীরামকীর্ত্তি সুধা,' 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে অম্বুজাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে।

রাসসুন্দরী।— রাসসুন্দরী ছিলেন— কিশোরীলাল সরকারের মাতা। তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আত্মকথা লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার লিখিত 'আমার জীবন' বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়— ১২৮৩ সালে (২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৬)।* ১৩০৫ সালে ডাঃ সরসীলাল সরকার পিতামহীর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম দয়ামাধব, তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কূল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও, আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল, আমরা দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া কত ডাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুস পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব স্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদিকর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভাল বাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, তাহাই শুনিয়া থাকি, এই মাত্র জানি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, এজন্য

* প্রথম সংস্করণের পুস্তকের এই প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। স্মৃতিকথায় সন-তারিখের গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক; রাসসুন্দরী লিখিয়াছেন :—"১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন আমার বয়ঃক্রম উনষাইট বৎসর ছিল।"

সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।"

মৃণালিনী সেন।— ইনি লাড্‌লিমোহন ঘোষের কন্যা, শৈশবে পাইকপাড়ার ভূমাধিকারী ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত পরিণীতা হন। অল্প কাল পরে ইঁহার বৈধব্য ঘটে ; স্বামি-বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় ইনি কাব্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। তাঁহার রচিত এই চারিখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

১। প্রতিধ্বনি (কাব্য) : ১৩০১ সাল (১০-৮-১৮৯৪)। পৃ. ১৮৪।
২। নির্ঝরিণী (কাব্য) : ১৩০২ সাল (৭-৫-১৮৯৫)। পৃ. ১৬৩।
৩। কল্লোলিনী (গীতিকাব্য) : ১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ২৩৭।
৪। মনোবীণা (কাব্য) : মাঘ ১৩০৬ (২৪-৪-১৯০০)। পৃ. ২৫৯।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী)।— ইঁহার পিতার নাম নৃত্যগোপাল সরকার। ১৮৭৮ সনে নগেন্দ্রবালার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি হুগলি জেলার সুখড়িয়া গ্রাম-নিবাসী খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফীর সহিত বিবাহিত হন। বিবাহের পর হইতে নগেন্দ্রবালা কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত এই সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ—

১। মর্ম্মগাথা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৫-৯-১৮৯৬)। পৃ. ১৭০।
২। প্রেম-গাথা (কাব্য) : অগ্রহায়ণ ১৩০৫ (১০-১২-১৮৯৯)। পৃ. ১৫৫।
৩। নারীধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (৪-১২-১৯০০)। পৃ. ১০৮।
৪। অমিয়গাথা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (২৫-৩-১৯০২)। পৃ. ২১০।
৫। ব্রজগাথা (কাব্য) : (২০-১২-১৯০২)। পৃ. ২৫০।
৬। ধ্বলেশ্বর (কাব্য) : (১৭-৩-১৯০৩)। পৃ. ২২।
৭। গার্হস্থ্যধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (১২-১২-১৯০৪)। পৃ. ১২৮।
৮। বসন্ত গাথা (কাব্য) : (২৩-১-১৯০৫)। পৃ. ৩১।
৯। কণা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১৬-৬-১৯০৫)। পৃ. ৬০।
১০। কুসুম গাথা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১২-১২-১৯০৫)। পৃ. ৯০।
১১। সতী (সামাজিক উপন্যাস) : ১৩১৩ সাল (২-৮-১৯০৬)। পৃ. ৭৮।

১৩১৩ সালে নগেন্দ্রবালার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রিয়ম্বদা দেবী।— ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সনে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সনে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬-৯-১৮৯৫) ঘটে।

শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ফুল" নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার মুদ্রিত প্রথম রচনা। পর-বৎসর 'ভারতী' ও 'বালকে' (কার্ত্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি "গান" 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে 'ভারতী'তে তাঁহার গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :—

১। রেণু (কাব্য) : (১-৯-১৯০০)। পৃ. ৬৯।
২। তারা (শোক-কবিতা) : (১৮-১১-১৯০৭)। পৃ. ৩৪।
৩। পত্রলেখা (কাব্য) : (১০-১-১৯১১)। পৃ. ১৫৮।
৪। অংশু (কাব্য) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। পৃ. ১২৫।
৫। চম্পা ও পাটল (কাব্য) : (ইং ১৯৩৯)। পৃ. ৩৮।

ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—'অনাথ' (১৮-২-১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (ইং ১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু হইয়াছে (দ্র° 'ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪১)।

সরলা দেবী।— ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা; জন্ম—১৮৭২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯০ সনে ইনি বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সনে পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ-নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৯২৩, ৬ই আগষ্ট রামভজের মৃত্যু হয়।

জীবনের দীর্ঘকাল দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেও সরলা দেবী মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবাবধি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বালকে' তাঁহার লিখিত প্রথম রচনা— "দুর্ভিক্ষ (বালিকার রচনা)" প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'সখা'য় তাঁহার পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা— "পিতা মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য" স্থানলাভ করে; রচনার শেষে লেখিকার বয়স "১২ বৎসর ১১ মাস" দেওয়া আছে। ১২৯৪ সাল

" 'ভারতী'তে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৯] ও 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' ['ভারতী ও বালক,' পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৮] পড়ে' তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট্ ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।···শ্রীশ মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে বঙ্কিম আমার লেখাগুলি সম্বন্ধে না কি নিজের সবিস্ময় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—তা তাঁদের লিখিত বঙ্কিমের জীবন-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বঙ্কিমের লিপি আর অন্যের লিপিতে অনেক তফাৎ। বঙ্কিমের লিপিখানি ছিল পুরো বঙ্কিমী ঠাটের সাহিত্যের একখানি হীরের কুচি। বিদূষক সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি। তার উল্লেখ করে "গরীব বিদূষকের" পক্ষ নিয়ে তাঁর সরস লেখনী দুই এক ছত্রে কি হাস্যের ছটাই তুলেছিল। তাই বলছি তাঁর চিঠিখানি ছিল একটি সাহিত্যিক ক্ষুদ্র রসকুম্ভ।"

হইতে আরম্ভ করিয়া সরলা দেবী 'ভারতী'তে বহু গদ্য-পদ্য রচনা ও স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াছেন; ১৩০০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' তাঁহার কৃত "বন্দে মাতরং" গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে। তিনি অনেক কাল 'ভারতী'ও সম্পাদন করিয়াছেন। একদা তাঁহার রচনা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাও অর্জন করিয়াছিল। সরলা দেবী তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

সরলা দেবীর বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা খুবই কম। তিনি নিজেই জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—

"আজ পর্য্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয় নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনার এডিশনে ছাপান 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাসমিতিতে ভাষিত ইংরেজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, 'বঙ্গের বীর' সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই ছাড়া। লাহোর থেকে দুএকবার আগেকার লেখাগুলি বই আকারে ছাপাবার চেষ্টা করে ব্যর্থশ্রম হয়েছি। 'কবিমন্দির' প্রভৃতি দুতিন ফর্ম্মা ছেপে, প্রেসওয়ালাদের পকেটে টাকা ভরে' রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে।"

আমরা সরলা দেবীর লিখিত এই কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়াছি :—

১। শতগান (স্বরলিপি সহ) : বৈশাখ ১৩০৭ (ইং ১৯০০)। পৃ. ২১৬।

২। বাঙ্গালীর পিতৃধন : (২৬-২-১৯০৩)। পৃ. ৯।

৩। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল : (৭-৩-১৯১১)। পৃ. ২৪।

৪। নব-বর্ষের স্বপ্ন (গল্প) : শ্রাবণ ১৩২৫ (১৫-৭-১৯১৮)। পৃ. ১৫২।

৫। কালীপূজায় বলিদান ও বর্ত্তমানে তাহার উপযোগিতা (২-২-১৯২৬)। পৃ. ২১।

৬। শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রিপূজা (ইং ১৯৪১)।

৭। বেদবাণী (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশাবলী ৺সরলা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত)···১ম খণ্ড (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)—৭ম খণ্ড (পৌষ ১৩৫৬) ইং ১৯৪৭—৫০।

১৮ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, সরলা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (১১-১১-১৯৪৪—৯-৬-১৯৪৫) "জীবনের ঝরা পাতা" নামে জীবনস্মৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটিও ('ভারতবর্ষ,' কার্ত্তিক ১৩৪৬) পঠিতব্য।

২

গত শতাব্দীতে এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের সন্দর্শন পাই, যাঁহারা সাহিত্যসেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ বর্তমান শতাব্দীতে মুদ্রিত হইয়াছে; তাঁহাদের কেহ কেহ আবার পুস্তকাকারে কোন কিছুই প্রকাশ করিয়া যান নাই। এরূপ কয়েক জনের পরিচয় দিতেছি :—

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।— ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৯ সনে, আট বৎসর বয়সে, মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহ ও নিজের যত্ন-চেষ্টায় জ্ঞানদানন্দিনী নিজেকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষের 'ভারতী'তে তাঁহার এই তিনটি রচনা স্থান পাইয়াছিল :—

শ্রাবণ, ১২৮৮ : ইংরাজ-নিন্দা ও দেশানুরাগ
আশ্বিন, ১২৮৮ : স্ত্রী-শিক্ষা
অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ : কিণ্টার গার্টেন।

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) জ্ঞানদানন্দিনী 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :— "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" জ্ঞানদানন্দিনীরও কোন কোন রচনা 'বালকে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট হইতে আমরা দুইখানি সুলিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তক লাভ করিয়াছি; সেগুলি—

১। টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ (নাটিকা) : (৬-৬-১৯১০)। পৃ. ১৭।
২। সাত ভাই চম্পা (নাটিকা) : (২৬-১২-১৯১১)। পৃ. ৫২।

(১৩৫১ সালে বিশ্বভারতী এই দুইখানি নাটিকার সচিত্র নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন)

১৩৪৮ সালের ১৫ই আশ্বিন, ৯০ বৎসর বয়সে, জ্ঞানদানন্দিনী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী।— শরৎকুমারীর জন্ম ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই। তাঁহার পিতার নাম—শশিভূষণ বসু (কলিকাতা চোরবাগানের বসু-বংশজাত); তিনি ১৮৬৩ সনে চাকুরী উপলক্ষে সুদূর লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। শরৎকুমারীর শৈশব লাহোরেই কাটে। ১৮৭১ সনের ১২ই মার্চ আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., এটর্ণির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র সুকবি ছিলেন; স্বামীর ন্যায় শরৎকুমারীও মাতৃভাষার পরম অনুরাগিনী ছিলেন। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাঁহার বহু রস-রচনার সন্ধান মিলিবে। তাঁহার প্রথম রচনা—"কলিকাতার স্ত্রীসমাজ" ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এক মাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া শরৎকুমারীর আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মজুমদার লাইব্রেরি (বঙ্গদর্শন-কার্য্যালয়) হইতে 'শুভবিবাহ' প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে (২৬-৩-১৯০৬)। এই সামাজিক চিত্রখানি বঙ্গসাহিত্যে লেখিকাকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ইহার যে সমালোচনা করেন, তাহাই তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; তিনি লিখিয়াছিলেন :— "এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই।"

শরৎকুমারীর শেষজীবন বৈধব্য অবস্থায় কাটে; স্বামীর মৃত্যুর (৭-৯-১৮৯৮) ২২ বৎসর পরে—১৯২০ সনের ১১ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

সরলাবালা দাসী।— বাংলায় যে-কয়খানি সুপরিচিত শোক-কাব্য আছে, তাহার মধ্যে সরলাবালা দাসীর 'প্রবাহ' অন্যতম। তিনি কিশোরীলাল সরকারের কন্যা, ডাঃ সরসীলাল সরকারের ভগিনী। ১২৮২ সালের ২৫এ অগ্রহায়ণ তাঁহার জন্ম, এবং ১২৯৪ সালে রায়-বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরচ্চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। ১৩০৫ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

তরুণ বয়স হইতেই সরলাবালার কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "লজ্জাবতী" নামে কবিতাটিই বোধ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি বহু সাময়িক-পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে; তাঁহার প্রথম গল্প—"ঘরের লক্ষ্মী" তৃতীয় বর্ষের 'সাহিত্যে' (কার্ত্তিক ১২৯৯) মুদ্রিত হয়। 'উৎসাহ,' 'জাহ্নবী,' 'উদ্বোধন' প্রভৃতির পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে সরলাবালার বহু গদ্য-পদ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। তিনি যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তালিকা :—

১। প্রবাহ (শোককাব্য): ১৩১১ সাল (৮-১০-১৯০৪)। পৃ. ২৫৩।

২। চিত্রপট (গল্প): (১৫-১-১৯১৭)। পৃ. ২০৪।

৩। নিবেদিতা (জীবনী): জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (১০-৬-১৯১২)। পৃ. ৫৩।

৪। কুমুদনাথ (জীবনী): ১৩৪৪ সাল (১-৩-১৯৩৮)। পৃ. ১৫৩।

লজ্জাবতী বসু।— ইনি স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। ইঁহার বহু কবিতা 'সাহিত্য' 'প্রদীপ,' 'নব্যভারত,' 'প্রবাসী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার রচিত কোন পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাই নাই।

হিরণ্ময়ী দেবী।— ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১২৯২ সালে প্রকাশিত 'বালকে' ইঁহার একটি প্রাথমিক রচনা মুদ্রিত হয়। ইঁহার পর ১২৯৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া 'ভারতী'তে বহু গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকাকারে কোন কিছুই রাখিয়া যান নাই। ইনিও অন্যতর সম্পাদিকা-রূপে তিন বৎসর 'ভারতী' পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৫, ১৩ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সারদাসুন্দরী দেবী।— ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জননী। ১৮৯২ ও ১৯০০ সনে ইঁহার বিবৃত আত্মকথা যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১৯১৪ সনের জানুয়ারি মাসে 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

পঙ্কজিনী বসু।— ১৮৮৪ সনে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর গ্রামে পঙ্কজিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফী। তের বৎসর বয়সে বজ্রযোগিনী গ্রামে কুমুদবন্ধু বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুবোধ বসুর সহিত পঙ্কজিনীর বিবাহ হয়। সতের বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ২ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সকল কবিতাই বিবাহের পরে রচিত। ১৯০১ সনে 'হেলেনা' কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র স্বীয় ভূমিকা সহ 'স্মৃতি-কণা' নামে পঙ্কজিনীর কবিতাগুলি প্রকাশ করেন। পনর বৎসর পরে ১৯১৬ সনে ইঁহার পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ বাহির হয়; এই সংস্করণে খ্যাতনামা পণ্ডিত হরিনাথ দে কর্ত্তৃক "সূর্য্যমুখী" কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদও স্থান পাইয়াছে।

সুরমাসুন্দরী ঘোষ।— ইনি ঢাকা জেলার মালখানগর-নিবাসী উমেশচন্দ্র বসুর কন্যা, জন্ম— ১২৮১ সালের ৪ঠা ভাদ্র। ১২৯৩ সালের ১৯এ অগ্রহায়ণ বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের চন্দ্রকান্ত ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিশিকান্তের সহিত সুরমাসুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ১২৯৬ সালে স্বামীর রচিত 'অশ্রু' নামে কবিতা-পুস্তকে তাঁহার কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। ১৩০৩ সালে প্রথম বর্ষের 'কুন্তলীন-পুরস্কারে'ও সুরমাসুন্দরীর একটি রচনা দেখিতে পাই। তাঁহার রচিত এই কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়াছি :—

১। সঙ্গিনী (কাব্য) : ১৩০৭ সাল (১১-৩-১৯০১)। পৃ. ১৪৪।

২। রঙ্গিনী (কাব্য) : ১৩০৯ সাল (৭-৮-১৯০২)। পৃ. ১৪৪।

৩। দিদিমার কথা : (১৩-৯-১৯১৪)। পৃ. ১২।

বিংশ শতাব্দীতে প্রতিভাশালিনী বহু মহিলা-সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছে; কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কেহ কেহ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

আগামী সংখ্যায় এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গমহিলা" প্রকাশিত হইবে।

চিত্র-পরিচয়

মহাকবি গ্যেটের অসংখ্য চিত্র আছে, কিন্তু সব চিত্রে তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটি মাত্র চিত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান, কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার নিবিড় মানবিকতার আভাস পাইতে হয়, তবে দেখিতে হইবে ফ্রাঙ্কফোর্টের স্টেডেল শিল্পভবনে রক্ষিত টিশ্‌বাইন-অঙ্কিত চিত্র। —চিত্রটি এই সংখ্যার মুখপাত রূপে প্রকাশিত হইল। রোমে অবস্থানকালে টিশ্‌বাইন ও গ্যেটে একই গৃহে বাস করিতেন জনতার কলকোলাহল হইতে বহুদূরে। তাই হয়ত টিশ্‌বাইন যেমন করিয়া গ্যেটের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমন আর কোনো শিল্পী পান নাই। তাঁহারা গ্যেটের বাহিরের রূপটি অঙ্কন করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, অন্তরের রূপের সন্ধান পান নাই।

গ্যেটের প্রিয়তম নগর রোমের অতীত ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টিশ্‌বাইন গ্যেটেকে আঁকিয়াছিলেন। পশ্চাৎপটে সেসিলিয়া মেতেলার সমাধি ও দূরবিসর্পী আল্‌বানিয়ান-পর্বতমালা। সমস্ত ছবিটিতে রোমের আলোকোজ্জ্বল আকাশ এবং বর্ণাঢ্য প্রকৃতির অনুপম আভাস।

গ্যেটে তখন 'ইফিজেনিয়া'-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত পার্শ্বে অর্ধভগ্ন তক্ষণে, বন্দী ওরেস্টেস্‌ ও পাইলেড্‌স্‌ আসিতেছে ডায়ানার পূজারিণী ইফিজেনিয়ার নিকট।—আ.

গ্রন্থপরিচয়

কবিগুরু গ্যেটে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।[১] কাজী আবদুল ওদুদ। জেনারাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রথম খণ্ড পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড চার টাকা।

কাব্যে ও সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ কি এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আলোচনার ফলে যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ দাবী করা যায় না। তবে এই আলোচনা যে আমাদের সাধারণ ধারণা পরিষ্কার করিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য মোটামুটি আবেগপ্রধান ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। বাস্তব জীবনের সমস্যা, জীবনের সামগ্রিক সমালোচনা ও মননশীলতা তখনও কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে নাই। হয় মুহূর্তের আবেগ ও ভাবানুভূতি নাহয় স্থির ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন কাব্যের উপজীব্য বিষয় ছিল। গীতিকবিতাতে তীব্র হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি, মহাকাব্যে সাধারণ-লক্ষণান্বিত, একই আদর্শের অনুবর্তী জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, দার্শনিক কবিতায় চিরপ্রচলিত ধর্মসংস্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিরচনা— কাব্যসাহিত্য এই ত্রিধারা অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। শেষ দুই জাতীয় কাব্যে চিৎপ্রকর্ষ বা মননশীলতার যে পরিচয় তাহা চিরপ্রথাগত জীবনবাদ ও অধ্যাত্ম নিষ্ঠাপ্রসূত, তাহাতে বর্তমান জীবনের নূতন ছন্দকে অঙ্গীভূত করার, সদ্যোউদ্ভূত সমস্যাসমূহের উদার স্বীকৃতির কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার-ভার্জিল-মিল্‌টন্‌-স্পেন্সার-ট্যাসো-আরিয়স্টো প্রমুখ মহাকাব্য রচয়িতাগোষ্ঠী যে জীবনদর্শন রূপায়িত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজস্ব আবিষ্কার বা অনুভূতির ফল নহে, সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনস্বীকৃত নীতি ও আদর্শবাদের কাব্যসৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ অনুস্মৃতি মাত্র। তাঁহাদের মানস-সত্তা প্রতিবেশের সহিত নিবিড় সংশ্লেষপুষ্ট হইয়াই নিজ সক্রিয়তার নিদর্শন দিয়াছে। তাঁহাদের মানসমুকুরে জাতীয় সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়গত মনোভাবই অখণ্ড সমগ্রতায় ও সুদীর্ঘ পরিচয়সঞ্জাত ভাব গভীরতার সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এই বহুশতাব্দীব্যাপী ধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম মিলে ডাণ্টের মহাকাব্যে। এখানে ব্যক্তিগত তীব্র অনুভূতির সহিত মহাকাব্যের চিরপ্রথানুযায়ী সার্বভৌম ভাব-সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। মহাকাব্যের ঘটনাবিন্যাস গঠনবৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড ভাবসংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার চির-নির্দিষ্ট আধারে সমসাময়িক ইতিহাসের তীব্র মানসবিক্ষোভ ও আদর্শ-সংঘাত, দ্রবীভূত গৈরিক প্রবাহের ন্যায় প্রবৃত্তির ধূমায়িত উষ্ণ উচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষোদ্গার—এককথায় বাস্তবতার তপ্ত কটাহে আবর্তিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপ ও অস্বস্তি আশ্চর্য কলাকৌশল ও সঙ্গতিবোধের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাকাব্যের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীরেখার মধ্যে হৃদয়াবেগের, আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির কি উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বাহিরে বিড়ম্বিত কিন্তু অন্তরে আদর্শলোকের স্থির জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, সার্থক প্রেমের কি মহিমামণ্ডিত, মর্মভেদী আনন্দ-বেদনা! মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ও যাজকতন্ত্রের মধ্যে এক বিরাট্ আত্মার অধ্যাত্ম আকুতি, স্বর্গ-নরকের রহস্যভেদী দিব্যদৃষ্টি, দৈববিড়ম্বিত মানবিকতার বিশ্বগ্রাসী

---

১ এই গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইলেও গ্যেটে-দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্যেটে সম্বন্ধে বাংলায় এই একমাত্র গ্রন্থের উল্লেখ বিশেষ প্রাসঙ্গিকবোধে আমরা ইহার সমালোচনার ব্যবস্থা করিয়াছি।—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

ক্ষুধা যে কেমন করিয়া সঙ্কীর্ণ বোতলের মধ্যে ধূম্রপুঞ্জাকৃতি দৈত্যদেহের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিধৃত হইল তাহা শিল্পপ্রতিভার এক অপূর্ব বিস্ময়। এই মহাকাব্যে মননশীলতা, দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইহাতে বিশ্ববিধানকে নূতন করিয়া দেখিবার কোন চেষ্টা নাই, প্রচলিত ধর্মসংস্কারকেই আত্মানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে। তাই ডান্টের মৌলিক প্রতিভা পুরাতনকেই নবসৌন্দর্যমণ্ডিত, নবপ্রাণোচ্ছলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সংস্কার-মুক্তি ও চিত্তের উদার অগ্রগতির প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয় নাই।

ইহার পর আসিয়াছে নবজাগৃতির যুগ (renaissance)। এই যুগে মানবচেতনায় আসিয়াছে নবভাবপ্লাবন, নূতন আলোক ও অনুভূতির জোয়ার। মধ্যযুগের ধর্মতন্ত্রশাসিত সীমা অতিক্রম করিয়া মানবমন এক নূতন জীবনবাদ ও সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে— জীবনপরিধি সুদূর, অপরিজ্ঞাত দিগন্তরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। মানুষ নিজেকে দৈবের ক্রীড়নক, এক অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থার অঙ্গরূপে বিবেচনা না করিয়া আত্মশক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মানবের দুঃসাহসিকতা ভৌগোলিক রাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে নব নব দেশ আবিষ্কার ও জয়ের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এক অভূতপূর্ব উল্লাস ও উদ্দীপনা তাহার সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইয়াছে— আত্মকেন্দ্রিকতায় আবর্তিত চিত্ত মুক্তি ও অগ্রগতির আকর্ষণে বিশ্বকেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মানবমনের আধুনিকতার মন্ত্রদীক্ষায় নবজাগৃতি-যুগের দানের মূল্য অপরিসীম। তথাপি এ যুগেও কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই— সংস্কারমুক্তির উৎকট আনন্দ, শিশুসুলভ মনের বিস্ময়-প্রত্যাশী উত্তেজনা প্রজ্ঞাবোধসঞ্জাত সামগ্রিক জীবনবিচারকে বিচলিত করিয়াছে। শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীতে মানবহৃদয়ের চমকপ্রদ বিচিত্র বিকাশের স্বরূপ নিরূপণের ভিতর দিয়া যে জীবনদর্শন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রশান্ত গভীরতা, ক্ষমাস্নিগ্ধ ঔদার্য ও আকস্মিক ব্যতিক্রমের সমীকরণনৈপুণ্য মানব-প্রজ্ঞার চরম উৎকর্ষরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু এই জীবনদর্শন ধীর, অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধির আলোচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা দিব্যদৃষ্টির ধ্যানলব্ধ অতর্কিত আবিষ্কার। শেক্সপিয়ার যে অজ্ঞাত কৌশলে বিশ্বস্রষ্টার অপক্ষপাত মনোভাব ও সৃষ্টিরহস্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার রসাস্বাদন করি, কিন্তু এই অলৌকিক প্রতিভার নিগূঢ় প্রেরণা আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইউরোপের কাব্যসাহিত্যে কবিকল্পনা অপেক্ষা যুক্তিবাদ ও মননশীলতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই শতাব্দীতে অভিনব আবিষ্কারের বিস্ময়-চমক ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া জীবনকে নিয়মশৃঙ্খলার অধীনরূপে দেখিবার প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের অন্তরজীবনের নিগূঢ় রহস্য অপেক্ষা তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণই বিশেষভাবে সাহিত্যের বিষয় হইয়া উঠে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সঙ্গে যুক্তিবাদ ও তার্কিকতা সাহিত্যের সাধারণ গুণরূপে প্রকটিত হয়। কিন্তু এই তর্কপ্রবণতা মানুষের বহির্জীবনের কয়েকটি অগভীর দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা জীবনের সূক্ষ্ম, সুকুমার, রহস্যমণ্ডিত, অধ্যাত্মাভিমুখী বিকাশগুলিকে নিজ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নাই— একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। বিজ্ঞান পূর্বধারণা ও সমন্বয়কে বিপর্যস্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু জীবনের ছন্দোমধ্যে ইহা গ্রথিত হয় নাই। প্রাচীন জীবনের ঠাসবুননি আল্‌গা হইয়াছে, কিন্তু ইহার শূন্য স্থানগুলিকে নূতন উপাদানে পূর্ণ করিবার কোন

ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। জীবন-দর্শনের অগভীর একদেশদর্শিতা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনিবার্য প্রাথমিক ফলরূপে দেখা দিয়াছে।

এই পটভূমিকায় গ্যেটের আবির্ভাব ও সাহিত্যরচনার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হইবে। আধুনিকতার পূর্ণ দ্যোতনা সর্বপ্রথম তাঁহার মনে প্রতিবিম্বিত হয় ও তাঁহার সাহিত্যেই ইহার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি। দুই শত বৎসরের জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানসাধনা ও স্বাধীন মননশীলতা যে-সমস্ত নূতন তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে, মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভিনব ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে সে সমস্তই গ্যেটের কাব্যে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক নূতন জীবনবেদের ভিত্তিরচনা করিয়াছে। তাঁহার সর্বতোমুখী স্বীকরণশক্তি জীবনের কোন অংশকেই বর্জন করে নাই— ইহার ক্রমবর্ধমান জটিলতা, ইহার সংশয়ক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তি, ইহার প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে নূতন তাৎপর্য ও প্রাণশক্তির আবিষ্কার, সর্বোপরি ইহার নানা বিচিত্র, বিভ্রান্তকারী অভিজ্ঞতার এক গভীরতর ঐক্যসূত্রে বিধৃতি তাঁহার অনুভূতি ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে ধরা দিয়াছে। বিজ্ঞান তাঁহার নিকট কেবল নেতিমূলক নিষেধবাক্য নহে, দর্শন কেবল মতবাদের সংঘর্ষাত্মক কূটতর্ক নহে, সাহিত্য কেবল সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ নহে, জীবন কেবল কতকগুলি বিভিন্নাভিমুখী প্রবৃত্তি ও প্রেরণার আকস্মিক সংযোগভূমি নহে। তাঁহার হাতে কাব্য ক্রীড়াশীল, দায়িত্বজ্ঞানহীন শৈশবকল্পনা ও তরুণের ভাববিহ্বল স্বপ্নাবেশের পর্যায় অতিক্রম করিয়া পূর্ণ-পরিণত, বিদগ্ধ রসিকচিত্তের উজ্জ্বল প্রজ্ঞাশক্তিতে উন্নীত হইয়াছে। এই সাহিত্য তাহার আবেগধর্মিতা না হারাইয়া ইহার সহিত বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাইয়াছে; গীতিকবিতার ক্ষুদ্র পরিসর ও ক্ষণিক ভাবানুভূতির মধ্যে ক্রমবিবর্তনের সমস্ত নিগূঢ় ইঙ্গিত, সত্যানুসন্ধিৎসার সমস্ত সাধনা ছন্দের ললিত ভঙ্গী ও শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মহাকাব্য 'ফাউস্ট' আধুনিকতার জীবনবেদরূপে অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যযুগের একটি সুপরিচিত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া, মধ্যযুগীয় মানসসংস্কৃতি ও আদর্শের কাহিনীকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া গ্যেটে এই বিরাট মহাকাব্যে মানবাত্মার অগ্রগতির সমস্ত স্তর ও পর্যায়পরম্পরা রূপক-ব্যঞ্জনার অসামান্য সার্থকতার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন কাহিনীর স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া জীবনের নূতন ব্যাখ্যা, অনুভূতির নূতন প্রগাঢ়তা, অভীপ্সা ও আকাঙ্ক্ষার নূতন প্রেরণা, অস্তিত্বের লক্ষ্য ও পরম আদর্শের নূতন রূপ, আত্মবিকাশের অদম্য আগ্রহ গভীর দ্যোতনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগীয় কল্পনার স্বর্গ-নরক-দেবদূত-সয়তান-ঈশ্বর এক অভিনব অর্থগৌরবমণ্ডিত হইয়া, নিগূঢ় বিশ্ববিধানের নূতন তাৎপর্য প্রতিফলিত করিয়া আধুনিক ভাবধারাপুষ্ট তত্ত্বান্বেষী মনের নিকট এক-একটি নূতন ভাববিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। প্রাচীন আখ্যানাশ্রয়ী শাশ্বত ধর্মবোধ কবিমানসম্পর্শে পুরাতনের মধ্যে নূতন প্রাণরসের সন্ধান পাইয়া আবার ভবিষ্যৎ যুগের যাত্রাপথের পাথেয় ও প্রেরণা যোগাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যই গ্যেটে মানবের চিন্তাক্ষেত্রে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন। তাঁহার মানস উদারতা ও প্রসার, প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল, সমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান যুগের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া জীবনের মূল্যনির্ধারণ ও জীবনযাত্রার আদর্শ নির্ণয় করিয়াছে। তাঁহার সহানুভূতিস্নিগ্ধ ক্ষমাশীলতা, জীবনের অপরিমেয় রহস্যের উপলব্ধি প্রায় শেক্সপিয়ারের অনুরূপ; কিন্তু

এই মনোভাব-অনুশীলনের পদ্ধতিটি বিভিন্ন। শেক্সপিয়ার নৈসর্গিক প্রতিভাবলে সৃষ্টিরহস্যের মূল তত্ত্বটি আয়ত্ত করিয়াছেন— একপ্রকার সহজ-সংস্কারলব্ধ দিব্য চেতনা তাঁহার নিকট জীবনের কেন্দ্রীভূত মর্মকথাটি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। গ্যেটে সমস্ত জীবনের শাখা-প্রশাখা, ইহার অসংখ্য বিচিত্র আবেগ ও প্রেরণাকে, বহুশতাব্দীব্যাপী জ্ঞানসাধনার পরিপূর্ণ সঞ্চয়কে ধীর স্থির প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া ইহার মূলগত তাৎপর্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণ মননশক্তিসম্পন্ন পাঠক তাঁহার ইঙ্গিত ও নির্দেশ অনুসরণ করিয়া জীবনের গোলোকধাঁধার মধ্য দিয়া গতিপথ করিয়া লইতে পারেন। এইখানেই গ্যেটের সমধিক উপযোগিতা। গ্যেটে আমাদের দুরন্ত কামনা, দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই—তাঁহার নিজের জীবনে ও সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আচরণে অসংযত প্রণয়াবেগের, নৈতিক পদস্খলনের বহু দৃষ্টান্ত পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত চ্যুতি-অসংযম প্রাণশক্তির বৃথা অপচয় ঘটায় নাই; ইহা পূর্ণতর বিকাশের সহায়তা করিয়াছে। তিনি অনিন্দনীয়তার সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে জীবনের বিচার করেন নাই— আবেগের তীব্রতা, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি, নব নব অনুভূতির প্রচণ্ড অভিঘাত যে জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাই তাঁহার মতে শ্লাঘনীয় ও সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্যের অনুবর্তনশীল। জৈব বিজ্ঞান বংশানুক্রম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও ক্রমবিবর্তন ধারা সম্বন্ধে যে নূতনতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তাঁহার জীবন-বিচার তাহার পূর্ণ পর্যালোচনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার সচেতন শিল্পবোধও অনন্যসাধারণ। কবিপ্রতিভার গতি, পুষ্টি ও পরিণতির প্রত্যেকটি স্তর, বাহিরের উপাদান কিরূপে কবিমানসের রূপান্তর ঘটায় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ। বৈজ্ঞানিক, নিরাসক্ত, সত্যসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া তিনি কবিপ্রকৃতির অন্তর-রহস্য, কাব্যসৃষ্টির লোকোত্তর চমৎকৃতি ও ভাব-বিভোরতাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে এরূপ সূক্ষ্ম, সচেতন বিশ্লেষণশীলতা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্যের অপার্থিব ইন্দ্রজাল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে যে স্মরণীয় উক্তি করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে তাঁহার নিজ কবিতা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, আদিম বিস্ময়ের ফুল ও পরিণত, রসসমৃদ্ধ প্রজ্ঞার ফল তাঁহার কাব্যে সার্থক সমন্বয়ে সংহত হইয়াছে।

গ্যেটে চিত্তপ্রকর্ষ ও মানস সমুন্নতির যে উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাধারণ মান তাহার তুলনায় বহু নিম্ন পর্যায়ের। জাহ্নবী-তরঙ্গের সমস্ত বেগ ও বিক্ষোভ জটাজূটের মধ্যে শান্তভাবে সংহরণ করার শক্তি এক মহাদেবেরই ছিল। গ্যেটের পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায়ই কেহ সমন্বয়সাধনায় তাঁহার আদর্শের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া দুই বিরাট মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সমগ্র বিশ্বের মানসসংহতি এরূপভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে যে ইহার কেন্দ্রিকতা ও ভারসাম্য আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন শক্তিশালী সাহিত্যিকও জীবনকে উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেন। উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, অণু-পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একটি বিশেষ ভাব বা প্রবণতাকে অতিরঞ্জিত মর্যাদা দানই আধুনিক সাহিত্যের রীতি। সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে এখন একদেশদর্শিতার ছাপ পড়িয়াছে ও ইহা গ্যেটের আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যেরই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এক রবীন্দ্রনাথের মানস প্রসার, নির্মল বিচার-বুদ্ধি ও সার্বভৌম গ্রহণশীলতা মহাকবি

গ্যেটের আদর্শের সহিত অনেকটা সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ বাংলা সাহিত্যের চিত্তদৈন্য তাহার কল্পনাসমৃদ্ধির মধ্যেও অত্যন্ত সুপ্রকট। গ্যেটের কবিতার সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার মানসবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া আমাদের বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত কাজী আবদুল ওদুদ মহাকবি গ্যেটের সহিত বাঙালি পাঠকের পরিচয় স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'কবিগুরু গ্যেটে' বাংলা সাহিত্যে মানসবৈদগ্ধ্যের গৌরবময় পরিচয়। এই গ্রন্থে সুধী ওদুদ সাহেব কবির জীবনচরিতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার আচরণের ব্যাখ্যা লইয়া যে যে স্থলে বিভিন্ন চরিতকারের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে ওদুদ সাহেব সেই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় মতটি যুক্তিপ্রমাণপ্রয়োগসহ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আলোচনার মধ্যে তাঁহার সত্যান্বেষী বিচারবুদ্ধির সুষ্ঠু পরিচয় মিলে। গ্যেটের পরিণত বয়স পর্যন্ত যে রূপোন্মাদ তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে ও বারবার নৈতিক সংযমের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, কাজী সাহেব তাহার যথার্থ তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বস্ফুরণে ও মানসপরিণতিসাধনে তাহা কিরূপে সহায়তা করিয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। বিরাট প্রতিভার আলোচনায় শুচিবায়ুগ্রস্ত সঙ্কীর্ণ নীতিবাদের মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য। নিষেধাত্মক অনুশাসন তাঁহাকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাঁহার সত্তাকে শীর্ণ করে। অপরাধের ভিতর দিয়াই তিনি পুণ্যের পথে অগ্রসর হন, ধূলিস্পৃষ্ট হইয়াই তাঁহার আত্মা মার্জিত স্বর্ণপাত্রের ন্যায় আরও সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কাজী সাহেব-বিবৃতি কবির জীবনী পাঠে বাঙালি পাঠকের মনে তাহার সনাতন, অস্থিমজ্জাগত সংস্কার ভেদ করিয়া এই সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালির যে অন্ধ, যান্ত্রিক গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অভিযান চালাইয়াছেন, গ্যেটের জীবনী তাহারই সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিষেধক।

কাজী সাহেবের গ্রন্থে শুধু গ্যেটের ব্যক্তিত্বই আমাদের নিকট প্রোজ্জ্বল হইয়া ফুটে নাই, তাঁহার কাব্যসাধনার প্রেরণা ও উৎকর্ষও সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার কাব্যিক ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাসটি অতি পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে। তরুণ জীবনের অপরিণত ভাবকুহেলিকা ও আবেগমত্ততা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া প্রশান্ত গাম্ভীর্যময় পরিণত প্রজ্ঞার দীপ্ত সূর্য তাঁহার সমস্ত মনোলোককে উদ্ভাসিত করিল তাহার অতি মনোজ্ঞ চিত্র লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাগুলির ভাবার্থসংকলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচার একসূত্রে গ্রথিত হইয়া তাঁহার রচনার সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের মনেও এ বিষয়ে একটি ব্যাপক, সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করে।

ইহা ছাড়াও আর-একটি দিক দিয়া লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের দাবী আছে। তিনি গ্যেটের কবিতাবলীর কোন কোন অংশের বাংলা ভাষায় যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার সাবলীলতা অতি চমৎকার হইয়াছে। আমি জর্মান ভাষায় অনভিজ্ঞ, কাজেই মূল জর্মানের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও ভাববৈশিষ্ট্য এই

অনুবাদে কতদূর রক্ষিত হইয়াছে সে বিষয়ে মতপ্রকাশের আমার কোন অধিকার নাই। তবে ইংরেজী অনুবাদের সহিত তুলনা করিলে কাজী সাহেবের অনুবাদ যে কোনও অংশে নিকৃষ্ট এরূপ প্রতীতি জন্মে না। বাঙালি অনুবাদকের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। অনুবাদিত কাব্যাংশ-সমূহের স্বচ্ছন্দ গতি, সূক্ষ্ম ভাবের সাবলীল প্রকাশ ও কবিত্বশক্তি যে উচ্চাঙ্গের হইয়াছে তাহা অনুবাদকে স্বাধীন রচনার আদর্শে বিচার করিলে সহজেই অনুভূত হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির রীতি কোথাও অশোভনভাবে উল্লংঘিত হয় নাই। অনিপুণ অনুবাদের উৎকট বৈদেশিক গন্ধ কোথাও আমাদের বোধশক্তিকে পীড়িত করে না। ইংরেজ ও জর্মান একই বংশসম্ভূত, একই সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, চিন্তারাজ্যের একই স্তরের অধিবাসী। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান ও ভাষান্তরীকরণ অনেকটা সহজ ও স্বভাবধর্মী। কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাঙালির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের যে গভীর ব্যবধান তাহা সাহিত্যের অনুবাদকের পক্ষে একটি বিশেষ দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষত গ্যেটের মত যুগনেতা, লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবির মর্যাদা অনুবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হওয়া কঠিন। কাজী সাহেব যে এই দুঃসাধ্য-সাধনে আশাতীতরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার অনুবাদে মহাকবির কাব্যপ্রতিভা ও মননশীলতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার যে কোন বিপর্যয় ঘটে না, তাহাই উহার কৃতিত্বের নিদর্শন।

বাঙালির রসপিপাসু চিত্ত আজ নানা আঘাতে জর্জর, নানারূপ প্রমাদশীলতায় উদ্‌ভ্রান্ত, নানা সঙ্কীর্ণতার চাপে রুদ্ধশ্বাস। আজ প্রাথমিক প্রয়োজনের কুজ্ঝটিকা, সংশয়-বিদ্বেষের বিষবাষ্প, নরকবহ্নির ধূমাকুল শিখাবিস্তার তাহার মানসলোককে শ্বাসরোধকারী অন্ধকূপে পরিণত করিয়াছে। মুক্ত বায়ুর, উদার বিস্তৃতির যে ক্ষণস্থায়ী পুলকরোমাঞ্চ তাহার সাহিত্যজীবনকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার অবসান হইয়া সেখানে নিশীথ-দুঃস্বপ্নের প্রেতচ্ছায়াগ্রস্ত বিভীষিকা নামিয়া আসিয়াছে। গ্যেটের কবিতার রসোপলব্ধির উপযুক্ত অবসর ও চিত্তপ্রসার আজ আমাদের আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তথাপি এই নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ, সৌন্দর্যলিপ্সু মনোভাব আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের শ্যামল স্বপ্ন আমাদের চিত্তকোণ হইতে নির্বাসিত করিলে সমস্ত জাতির অপমৃত্যু ঘটিবে। তাই এই রুচিবিকার ও আদর্শ-বিচ্যুতির যুগে গ্যেটের কবিতা আমাদের মনে সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কার্যকরী হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। বর্তমানের মূঢ় উদ্‌ভ্রান্তি ও বিকৃত আত্মঘাতী উন্মত্ততা হইতে যাহা আমাদিগকে শাশ্বত কল্যাণময় বিশুদ্ধ ভাব ও চিন্তার উর্ধ্বলোকে লইয়া যাইবে, সঙ্কীর্ণ হিতবাদের দিক দিয়াও তাহার মূল্য অপরিসীম।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লঘুগুরু। প্রবন্ধাবলী। শ্রীরাজশেখর বসু। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইদানীং। শ্রীপরিমল রায়। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স্ লিমিটেড। মূল্য দু টাকা।

ইন্দ্রজিতের খাতা। ইন্দ্রজিৎ। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শুধু নন, অনন্য বা অতুলনীয়। পরশুরামের বেনামীতে লেখা তাঁর প্রখ্যাত রচনাবলীতে যে সকৌতুক বুদ্ধির দীপ্তি, যে শানিত অথচ সুস্মিত বিদ্রূপ দেখা যায়, ঠিক রসরচনা না হলেও, এই প্রবন্ধগুলিতেও তারই ছোঁয়াচ লেগে বিশেষ একটি মার্জিত শ্রীর উদ্ভব হয়েছে। এ হল লেখনীর গুণ, লেখার ভঙ্গীর গুণ, একান্তভাবে বিষয়নির্ভর নয়। ইংরেজিতে যাকে স্টাইল বলে, বাংলায় যার প্রতিশব্দ দেওয়া কঠিন, যা বিশেষ একটি ব্যক্তিস্বরূপের বাঙ্‌নিবদ্ধ রূপ, তারই কারণে, যদিও এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা, সমুদয় বিষয়গুলির মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছু নেই, তবুও পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্তই আকৃষ্ট করে রাখে। বাংলা ভাষা, পরিভাষা, বানান, সাহিত্যের আদর্শ, রস, রুচি, তা ছাড়া বাঙালির নাম-তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনাগুলি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়েছে, তাতে বিতর্ক হয়তো অনেক উঠতে পারে, কিন্তু রচয়িতা আপনার বক্তব্য যেরূপ সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেই এক উপভোগের বিষয়, এবং বিদ্যা এবং বিনয় উভয়েরই পরিচয় পরিস্ফুট থাকাতে বাদ থেকে বিতণ্ডায় পৌঁছুবার কোনো সুযোগ কাউকে দেওয়া হয় নি। অধিক কী, এ সব বিষয়ে ভিন্ন মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরাও এই গ্রন্থপাঠে চিন্তা করবার মতো নূতন কিছু সূত্র পেয়ে উপকৃত হবেন, এরূপ মনে হয়। ডাক্তারি-কবিরাজি বা বাঙালি ভদ্রসন্তানের জীবিকাসমস্যা বা ঘনীকৃত তৈল এ-সব সম্পর্কে রাজশেখর বাবুর মন্তব্য যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বা প্রণিধানযোগ্য হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। অন্য দিকে এই গ্রন্থের প্রার্থনা, তিমি, খ্রীষ্টীয় আদর্শ প্রভৃতি কতকগুলি রচনা রাজশেখর বসু ও পরশুরাম উভয়ে মিলে লিখেছেন এ কথা বলা যায়; এ-সব ক্ষেত্রে লেখক আমার বা আপনার বা আর-কারও মানসিক জড়তার অর্থাৎ ভ্রান্ত সংস্কার ও ভ্রান্ত অহমিকার ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন সত্য, অপ্রিয় ব্যবচ্ছেদ করেছেন সেও হয়তো ঠিক, তবু বক্তব্যের ও বাচনের বৈশিষ্ট্যে মনোহরণ যে করেছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সর্বশেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে; প্রবন্ধটি ছোটো হলেও সুন্দর এবং লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধার চমৎকার প্রকাশ। এই গ্রন্থের লঘুগুরু নাম এই কারণেই সার্থক যে, গ্রন্থকার আপাত-লঘু বিষয়েরও আন্তরিক গুরুত্ব বুঝিয়েছেন আর গুরু বিষয়ও তাঁর আলোচনায় আদৌ গুরুভার হয় নি। কয়েকটি তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—

১৩০ পৃষ্ঠায় দেখছি, "যদি ভবিষ্যতে বাংলা অক্ষর সরল করবার জন্য যুক্তব্যঞ্জন তুলে দেওয়া হয়, তখন অবশ্য হস্ চিহ্নের বহুপ্রয়োগ দরকার হবে।" ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বভাবতঃই হসন্ত ধরে নিয়ে অকারের একটি চিহ্ন যদি কল্পনা করা যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকাতে এ প্রস্তাব আজ নূতন নয়) তা হলেও হয় না কি?

১০২ পৃষ্ঠায় অপপ্রযুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তে 'বলাকা'র উল্লেখ এইভাবে হয়েছে, "অনেকে কবিতায় শ্রেণী অর্থে 'বলাকা' লিখছেন।" অনেকে লিখছেন কি না জানি নে, এবং অনেকের লেখাতেও হয়তো বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থের 'বলাকা' নামকরণে ও ঐ গ্রন্থের বিখ্যাত একটি

কবিতায় শব্দটির ঐরূপ 'ভুল' প্রয়োগে মুশকিল বাধিয়েছেন ; বাংলা ১৩০২ সালেও তিনি মানসপ্রত্যাগত হংসশ্রেণীর বর্ণনায় লিখেছেন "আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল"। এইসব লেখা বাংলা সাহিত্য থেকে মুছে ফেলবার কোনো উপায় যখন নেই, 'বলাকা' শব্দের এরূপ প্রয়োগকে ভুল না ব'লে শব্দের অর্থ-প্রসারের দৃষ্টান্তস্বরূপে মেনে নেওয়াই ভালো।

'অব্যবসায়ী' হয়েও বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে লেখক যা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা ছন্দোবিৎ বা ছন্দোজিজ্ঞাসুদের বিশেষ মননেরই যোগ্য। কিন্তু, "কেবল কানের উপর নির্ভর করে অক্ষর-বৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা করা চলে না" এ কথা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না। কেবল জিহ্বার উচ্চারণ-রীতি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্বনিবিবেকের উপর নির্ভর করেই যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ সম্ভব— আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদেরই চিন্তার জড়তা বা সংস্কারের বাধা থাকাতে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ নিয়ম নির্দেশ করা অতিশয় দুরূহ, এই পর্যন্তই বলা যেতে পারে। ছাপা পাতা চোখের সামনে রেখে অক্ষরগণনায় ধোঁকা লাগতে পারে— এজন্য কবিতায় 'আজো' 'আমারি' লেখা, অনাবশ্যক ভীরুতা মাত্র। লেখকরা যদি সাহস দেখান (অবশ্য, ছন্দে দখলও দেখানো চাই) পাঠকরা শীঘ্রই ঐ সম্পর্কে যা-কিছু কুসংস্কার থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে পারবেন। ১৩৯ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করা হয়েছে 'শিখিয়ে দিত' পদাবলীতে 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের স্বভাবসিদ্ধ চার ধ্বনির (স্বরের ?) ব্যতিক্রম হয়েছে। এখানে চোখের দেখাতেই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে ব'লে মনে হয়। আসলে এই শব্দের উচ্চারণ আমরা করি শিখ্‌য়ে (য়=য), শি—খি—য়ে উচ্চারণ সাধারণতঃ করি নে। তাই রবীন্দ্রনাথ এরূপ প্রয়োগ (যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, উড়িয়ে গোখুর-রেণু, হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি ইত্যাদি) অজস্র করেছেন, অথচ ছন্দোবিচারে প্রত্যেকটি নির্দোষ ব'লে গণ্য হবে।

পূর্বেই বলেছি, এগুলি তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা।— প্রকাশকের প্রতি নিবেদন, মুদ্রণপ্রমাদ আরও কম হলে শোভন হ'ত এবং গ্রন্থের মলাট ও আখ্যাপত্র আর-একটু আধুনিকরুচিসম্মত তথা পরিচ্ছন্ন করলে দোষ হ'ত না।

আলোচ্য অন্য দুখানি বইয়ের লেখক-দুজন বাংলা সাহিত্যে নব আগন্তুক যে নন লেখাতেই তার প্রচুর প্রমাণ আছে। ইদানীং এরূপ লেখা আরও অনেকে লিখেছেন বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন এবং সে লেখাকে 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ বা রচনা ব'লে পরিচিত করার একটি রেওয়াজ চ'লে গেছে। আর্ট সম্বন্ধে 'ব্যক্তিগত' কথাটায় আপত্তি করবার আছে। হয় কথাটি অর্থহীন, যেন 'সোনার পাথর বাটি', নয়তো অনাবশ্যক। অবশ্য, 'ব্যক্তিগত' কথাটার অহেতুক এই ব্যবহারের 'হেতু' কী বুঝি। এরূপ লেখায় লেখকের ব্যক্তিত্বের বিশেষ ছাপ থাকে বা থাকা উচিত ; এ লেখার কেন্দ্রস্থলে লেখক-ব্যক্তিটি বিশেষ ক'রে আছেন— আছে তাঁর নিজেরই সুখদুঃখ, ভালো লাগা আর মন্দ লাগা। কিন্তু, আর্ট মাত্রেরই তো এ গুণ অল্পবিস্তর থাকা চাই। লেখায় (তেমনি আঁকায় ও অন্যান্য আর্টে) ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ ছাপকেই স্টাইল বলে এবং এই স্টাইলই রচনার চরম উৎকর্ষের নিরিখ, সাহিত্যে বা নন্দনতত্ত্বে এ কথা নূতন নয়। কিন্তু, তা বলে কোনো আর্টই ব্যক্তি-গত নয় (যেরূপ লেখাকে 'ব্যক্তিগত' বলা হচ্ছে সেও নয়), ব্যক্তিতে গিয়ে সমাপ্ত বা সমাধিস্থ নয়, বরং ব্যক্তি-আগত বা ব্যক্তিত্বপ্রসূত বললেই ঠিক বলা হয়।

আসলে প্রত্যেক রচনাতেই ব্যক্তি আর বিশ্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে, অঙ্গাঙ্গীভাবে, বর্তমান। ব্যক্তির আপন চেতনায় ও উপলব্ধিতে যা বিশেষ রূপ গুণ ও বেদনা নিয়ে ধরা দিয়েছে তা বিশ্বেরই বিষয় বিশেষ আধারে ধরা— তা বিশ্বগত, তা নইলে তার প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা বা সার্থকতা ছিল না। তা হলে আলোচ্য রচনাবলীকে বলা যায় কী ? এ তো দর্শন নয়, বিজ্ঞান নয়, গল্প বা কবিতা নয়, 'প্রবন্ধ' বলতেই যা বুঝি তাও নয়। খেয়ালী রচনা বা খেয়ালী নিবন্ধ (খামখেয়ালী নাই বা বলা গেল ?) বললে দোষ দেখি নে। এ তরীতে ব্যক্তির খেয়াল, বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ মেজাজ (mood) কাণ্ডারী হয়ে বসেছে। এক বাঁধা ঘাট থেকে অন্য বাঁধা ঘাটে পাড়ি জমানোই এ যাত্রার লক্ষ্য নয়— কিছু ঢেউ খাওয়া, কিছু পালে এবং গায়ে হাওয়া লাগানো, উদয়াস্তের কিছু কণকারুণ রশ্মি চূর্ণ চূর্ণ ঊর্মিমালার শিখর থেকে চয়ন করা, হয়তো ক্ষণকালের জন্য নৌকো উল্‌টিয়ে স্রোতে হাবুডুবু খাওয়া, হয়তো বুড়ো বটের বিলম্বিত জটাবলীর অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে দিবাস্বপ্নে মগ্ন হওয়া, এই তার নির্বিশেষ 'উদ্দেশ্য'। এ জাতীয় রচনায় বিলিতি যে-সব লেখক নামজাদা হয়েছেন তাঁদের নাম আমাদেরও উল্লেখ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এরূপ লেখা কমলাকান্ত শর্মার সময় থেকেই বাংলাতেও চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপ্রবন্ধে এর একাধিক নমুনা মিলবে ; তাঁর পঞ্চভূত গ্রন্থ এইজাতীয় রচনারই একটি অতুলনীয় মালিকা বলা চলে।

ইদানীং বইটিতে একটি পরিহাসপটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীক্ষ্ণধী মার্জিত মনের পরিচয় আছে ছত্রে ছত্রে। রচনাগুলি বিচিত্র বিষয় নিয়ে ; প্রায় প্রত্যেকটিতে যেন এক-একটি ছোটো গল্পের আভাস আছে। কিন্তু গ্রন্থকার গল্প না লিখে প্রবন্ধ লিখেছেন যে এজন্য পাঠকদের কোনো খেদ হবে না— গল্পটা তো অল্প কয়েকটি রেখার টানে আঁকা ছবির মতো ফুটেই উঠল, সেই সঙ্গে কথার খেলায় ও ভাবনার কৌশলে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেটি কম লাভ নয়— বস্তুতঃ সেইটিই পরম লাভ বলা যেতে পারে। ফলে, পাঠকের এই লেখককে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই বোধ হবে, যেন সকালে সন্ধ্যায় সময়ে আর অসময়েও চা বা কফি -সিঞ্চিত আর তাম্রকূটধূমসুরভি কত অবসরে এঁর সঙ্গে একই আসরে বসে বহু আড্ডা দেওয়া গেছে ; ইনি নিজে যদিও নাগরোচিত (=নাগরিকোচিত) কৌতুকহাস্যের সীমা কখনো পেরোন না, অন্যের উপভোগ থেকে থেকে অট্টহাস্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গড্ডলিকা আর কজ্জলীতে পরশুরাম নিজের ব্যক্তিরূপটিকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে নিজস্ব একটি দর্পণে অতিকৃত বা ঊনকৃত ক'রে সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্রের এক-একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিমল রায়ের হাতে যে দর্পণ আছে সেও তাঁর নিজের কারখানাঘরে তৈরি, তাতেও দ্রষ্টব্য বিষয়ের চরিত্র ঠিক রেখে চেহারায় একটু উনিশ-বিশ করা হয়েছে— যেটুকু না হলে স্কেচ হয়, ক্যারিকেচার হয় না— পরশুরামের সঙ্গে তাঁর মুখ্য তফাৎ এই একটা যে, এই আর্টিস্ট নেপথ্যে নয় সর্বদা আমাদের সামনেই যেন হাজির রয়েছেন, আর এঁর খরবিদ্রূপ ও স্মিত কৌতুকের বিষয় যেমন অন্য পাঁচজন তেমনি লেখক নিজেও। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বহু বিচিত্র ছবি, বহু করুণ অভিজ্ঞতা, বহু অদ্ভুত অবস্থাবিপাক এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে পাওয়া যাবে (দু-এক ছত্রে এক-একটা বিশেষ 'পরিস্থিতি'র সম্পূর্ণ পরিবেশ-সৃজনেও লেখকের অসামান্য দক্ষতা দেখা যায়)— তার কোনোটিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনোটি উল্লেখ করা যায় না। তবু 'বহুবচন' এবং 'শিউনন্দন' বর্তমান পাঠককে বিশেষ করে চমৎকৃত করেছে। একবচন ছেড়ে দ্বিবচন প্রয়োগে জিহ্বার জড়তা অনেকেরই আছে ; কোন্‌ ফর্মুলার সাহায্যে এরূপ লোকও সাত-দিন-সাত-রাত্রি সৌজন্যপূর্ণ আলাপচারিতে অন্যকে

আপ্যায়িত করতে পারেন— সে এক মহা আবিষ্কার। তেমনি চাপরাশীপুঙ্গব শিউনন্দন দারোয়ানির উপর যে থীসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. নেবার চেষ্টায় আছে, সে তো যে-কোনো বিষয় নিয়ে যে-কোনোরূপ ডাক্তারি বা পি-এইচ. ডি. -প্রার্থীর আদর্শ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, পরিমল বাবুর ভাষায় "এম. এ. বা প্রেমে পড়াতে" যাঁদের ইতিপূর্বে বহু রাত জাগতে হয়েছে, এখন থেকে তেমন কোনো কৃচ্ছ্র না ক'রেও তাঁরা থীসিস-রচনায় সমর্থ ও ডাক্তারি-লাভে সিদ্ধকাম হবেন এবং শিউনন্দন বা তাঁর চরিতকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন আশা করা যায়।

উল্লিখিত তালিকার তৃতীয় বইখানিতে পাঠককে আর একবার মানসিক ঋতু-পরিবর্তন ও লেখার রীতি-পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ছদ্মনামা লেখক ধরা দিতে চান, অথচ ধরা দেন নি। রবীন্দ্রনাথের গানের ছত্র উদ্‌ধৃত ক'রে আমরাও বলতে পারি— হে মাধবী, ভীরু মাধবী, তোমার দ্বিধা কেন! যাই হোক, সুকুমাররুচি সহৃদয় এই লেখকের স্বাভাবিক একটি সংকোচে ও ব্রীড়ায় এই লেখাগুলির কল্পনাকারু ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বড়ো সুন্দর স্ফূর্তি পেয়েছে, সুতরাং সার্থকও হয়েছে। এগুলি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এক-বৎসর-কাল ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির প্রকার না হলেও আকার-আয়তন ছিল কতকটা পূর্বনির্দিষ্ট। এই কাটাছাঁটা জর্নালিজ্‌ম্‌এর দায় নিয়েও লেখক যে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন রস-পরিবেশন করতে কৃতকার্য হয়েছেন সে তাঁর অল্প ক্ষমতার পরিচয় নয়। কিন্তু, ক্ষমতা এক কথা, আর আয়াসশূন্য স্ফূর্তি আর এক কথা। সম্পাদকের দৃষ্ট বা অদৃষ্টগোচর পেয়াদা সপ্তাহে সপ্তাহে দ্বারে দেখা না দিলে ইন্দ্রজিৎ এ খাতা হয়তো খুলতেন না আদবেই সেও এক কথা, আর কেবলমাত্র ভিতরের তাগাদায় যখন-খুশি যেমন-খুশি লিখতে যদি পেতেন, তা হলে এ রচনা আরও রসোত্তীর্ণা, আরও রূপবতী, আরও লঘুগতি নিশ্চয়ই হ'ত সে হল আর এক কথা। বিদগ্ধজনের চিত্তবিনোদনের উপযোগী তথা অবসর-সময়ে ডেক্‌চেয়ারশায়ী দিবাস্বপ্নে বা উড়ু-উড়ু ভাবনায় সঙ্গদানের উপযোগী নানা গুণই এ রচনাগুলিতে আছে। লেখক যেমন লাইব্রেরিলোকবিহারী সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ব'লে লেখার ছত্রে ছত্রেই ধরা দিয়েছেন, বিশ্বলোকেও তাঁর সজাগ চোখ আর কান সর্বদা খোলা আছে; এ লেখাগুলিতে কথা অর্থাৎ গল্প আছে, কৌতুক আছে, কটাক্ষ আছে, কল্পনা আছে, কবিত্ব আছে, পদে পদে ভাষাভঙ্গীর চমৎকারিত্ব আছে— বার বার মন ব'লে ওঠে, 'সাবাস!' কিন্তু, বনের পাখিকে ধরা হয়েছে খবরের কাগজের খাঁচায়, এরকম একটা বোধও যেন সকল উপভোগের তলে তলে থেকে মনকে পীড়া দেয়। আর্টিস্টের কাছে তাগিদ থাকা চাই, কিন্তু সেটি সদাসর্বদা ঘাড়ে এসে না পড়লেই হল। আবার, প্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয়— না, না, ডাকবে না, ডাকবে না, অমন ক'রে বাইরে থেকে। যে উপলক্ষ্যের খুঁটিনাটি খবর সকালে 'আনন্দবাজার' খুললেই চোখে পড়বে, যে উৎসাহদাতা অন্নদাতার বা সম্মানদাতার নাম ঠিকানা টেলিফোন গাইডেই হয়তো স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে— সে যে আসল উপলক্ষ্য নয়, সে যে আসল প্রেরণাদাতা নয়, মনে হয় এ সত্যের ভাণও ভালো। কিন্তু, বেলা যায়, বেলা যায়, ডাকের বেলা যায়, এ সুরে ঐরূপ কোনো সত্য বা সত্যাভাসকেও মনের মধ্যে আশ্রয় দেওয়া যায় না। লেখাগুলি ভালো লেগেছে ব'লেই লেখার এই মৌলিক ত্রুটির কথা বলতে হল। এবং এ কথাও বলতে হল যে লেখক দুটি মুদ্রাদোষ ত্যাগ করতে পারলে সুখের বিষয় হ'ত। একটি হল যত্র তত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছত্র বা ছত্রাংশ উদ্‌ধৃত করা।

আর একটি হল ইংরেজি পদ, ইংরেজি পদসমুচ্চয় ও ইংরেজি বাক্যের অতিপ্রয়োগ। ইন্দ্রজিতের অধিকাংশ আলাপই উপভোগ্য ; কোনো-কোনোটি চমৎকার ; এবং খেয়ালী রচনা যখন, ভিন্নমতের অভিমানে তর্ক তোলা বাড়াবাড়ি হবে— কেবল অল্প কয়েকটি রচনা ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে বা ব্যাপারে একান্তভাবে জড়িত ব'লে তাদের সাহিত্যিক মূল্য অল্প বা নেইও বলা চলে, এই গ্রন্থে সেগুলির সংকলন না হওয়াই ভালো ছিল। কয়েকটি উল্লেখ করছি, যেমন, জনৈকা পাঠিকার প্রতি, চিঠির তাড়া, দৈবজ্ঞবৃত্তি। ট্রেন ফেল ও ব্যাঙ্ক ফেল নিয়ে লেখক আশ্চর্য রসালো গল্প জমিয়েছেন বলতেই হবে। সোনার কাঠি, সিঙ্গার মেশিন, চুরিবিদ্যা, ইন্‌সম্‌নিয়া, বিদ্যাসাগরী চটী, নীলকুঠি, পাকা চুল, তমালগাছ— এরূপ একটা সূচীপত্র তৈরি করতে বসলেও বোঝা যাবে বিষয়ের বৈচিত্র্য কতদূর। শেষোক্ত রচনায় একটি সংশয় কিন্তু মনে উঠেছে, সেইটির উল্লেখ করেই এই গ্রন্থ-আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। তমাল আর কামরাঙ্গা এক বস্তু কি ? বস্তুতঃ তা নয়। ইন্দ্রজিৎ অনুমান করেছেন ঠিকই, বৃন্দাবিপিনে এই তরুর সংখ্যা-প্রাচুর্য আছে। এর সৌন্দর্য কিসে তা বলা যায় কি ? ফুলে নয়, ফলে নয়, পত্রে নয়, বিশালতায় বা নিবিড়তায় নয়— তবে কিসে ? ছত্রাকারে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে যে এক-একটি নাতিবৃহৎ চিরশ্যাম বিতান রচনা করে, শাখাকাণ্ডের যে একটি ভুষোমাখানো কালো রূপ— শ্রীরাধিকা তাতে কী এমন শ্রী দেখেছেন ? তা তো বলা যায় না। একমাত্র ভাবরসেই মন স্থির রয়েছে কৃষ্ণপ্রিয়ার কৃষ্ণবর্ণ ঐ তমাল গাছে। ইন্দ্রজিৎ এই প্রসঙ্গে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Yarrow Unvisited ও Yarrow Visited কবিতার উল্লেখ যে ভাবে করেছেন তাতেও উক্ত মরমী কবির দৃষ্টি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে ভুল ধারণা হতে পারে। শেষোক্ত রচনার সূচনা বটে—

And is this— Yarrow ?

কিন্তু, শেষের দিকে কবি বলেছেন—

I see— but not by sight alone

. . . where'er I go,
Thy genuine image, Yarrow !
Will dwell with me— to heighten joy
And cheer my mind in sorrow.

কাজেই, দ্বাপর কেটে গেছে, কলিও কাটবে— তার পর নূতন সত্যযুগে নূতন ক'রে ও সত্য ক'রে তমাল গাছটিও কেউ দেখবে না এ কথা বলা যায় না।

কানাই সামন্ত

স্বীকৃতি : এই সংখ্যায় মুদ্রিত স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায়ের ব্লক দুটি 'প্রবাসী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।